সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

মণীন্দ্রনাথ সমাজদার

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
বা এ ১৯২০

পাণ্ডুলিপি
গবেষণা উপ-বিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা-সংকলন-ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণ
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার

মূল্য : একশত টাকা মাত্র

SAMSKRITA-PRAKRITA-ABAHATTHA SHAHITYER ETIBRITTA (History of Sanskrit-Prakrit & Abahattha Literature) by Manindra Nath Samajder. Published by Bangla Academy, Dhaka. Bangladesh. 1st. ed. 1986. Price : 100·00.

পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গীয় ৺ নিশিকান্ত সমাজদার

এবং

পরমারাধ্যা জননী স্বর্গীয়া ৺ হরিমতি দেবীর

পুণ্য স্মৃতিতর্পণার্থ-

সূচীপত্র

ভূমিকা

পণ্ডিত শ্রীমণীন্দ্রনাথ সমাজদার ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' এর ভূমিকা লেখার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত উপযুক্ততায় আমার সন্দেহ থাকলেও তাঁর স্নেহের দায়িত্ব-ভার শিরোধার্য বিবেচনায় সাধ্যমত চেষ্টা করছি।

ধীরে সুস্থে ইতিবৃত্তের পাণ্ডুলিপি পড়বার সুযোগ পাই নি। মুদ্রণোত্তর 'ফাইলফর্মা' দেখে দেখে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যেটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি তাতে বলতে পারি যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা তাঁর এ বই সমাজের একটি চাহিদা আংশিকভাবে পূরণ করবে। ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় বহু সুধীজন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যের সে সব ইতিহাস আলোচনার পথ উন্মুক্ত করেছে প্রশস্ত করেছে। পণ্ডিত মহাশয়ের এ উদ্যোগ বাংলাদেশে এই প্রথম এবং নতুন চিন্তাধারার দিশারী।

পার্জিটার (এফ.ই.) সাহেবের Ancient Indian Historical Tradition এবং Puranic Text of the Dyansties of the Kali Age প্রকাশিত হওয়া থেকেই প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন সাংস্কৃতিক গবেষণার ধারা ক্রমিক প্রসারিত হচ্ছে। কেবল বায়ুপুরাণের অবলম্বনেও প্রাচীন সাংস্কৃতিক ইতিহাস (Cultural History from the Vayu purana by Devendra Kumar Rajaram Patil) লিখিত হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষায় প্রাগ্রসর ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান যুগে আলোচ্য ইতিবৃত্তের মত বইর একান্ত দরকার। বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষার নিরীখে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে কেবল বাংলালিপি ও বাংলাভাষার উপর নির্ভর করেও এ ইতিবৃত্তের সাহায্যে সুপ্রাচীন কালথেকে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এতদঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিকাশের দিকগুলো অনুধাবন করা চলে। ধীরে ধীরে অবলুপ্যমান সংস্কৃতশিক্ষা উজ্জ্বল ঐতিহ্যের অনুশীলনে উৎসাহহীনতা বাড়িয়ে চলছে এবং তা আত্মসচেতনার পরিপন্থী। সংক্ষিপ্ত হলেও এ ইতিবৃত্ত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে-এ আশা আমি করি।

বাংলাদেশ যে একটি চিরসিদ্ধ স্থান এবং জনপদ আর, তার সভ্যতা-সংস্কৃতিও যে অতি প্রাচীন কালথেকেই ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে—এ তথ্য এ ক্ষুদ্র পুস্তকেও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে, বিশেষ বিশেষ বইর বিষয়-বিবরণী মাঝে মাঝে থাকলে আরও ভাল হত। তথাপি, বেদথেকে শুরু করে তাবৎ বৈদিকসাহিত

এবং মহাপুরাণ-উপপুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত-নিরুক্ত-পাণিনি-যাবতীয় পুঁথি-পুস্তক থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে যেভাবে প্রাচীন সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবকাঠামো তৈরি করার গবেষণামূলক প্রয়াস এ গ্রন্থে প্রতিপন্ন তা' অসাধারণ — সন্দেহ নেই। শাস্ত্রানুসারী অনুশীলনের ধারায় বিভ্রান্তি এড়িয়ে প্রাচীন শাস্ত্র-প্রত্ন ব্যবহার করার পরিপ্রেক্ষায় প্রত্যক্-তত্ত্বের উদ্ভব এবং বিস্তার, রাজশেখর-সমস্যা, হলায়ুধ-সমস্যা, স্মার্ত্তসংহিতাগুলোর পৌর্বাপর্য নির্ধারণ, রামায়ণ এবং মহাভারতের কাল-নির্ধারণ এবং প্রাচীন সেসব গ্রন্থথেকে ঐতিহাসিক তথ্য আহরণ, ইতিহাসের উপাত্তসংগ্রহ প্রভৃতির অসংখ্য নির্দেশনা এ ইতিবৃত্তে থাকায় গ্রন্থখানা আয়তনের তুলনায় বেশী গুরুত্ব ধারণ করে আছে। সংস্কৃতের পাশাপাশি প্রাকৃত এবং অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্তও এখানে আছে বলে তুলনামূলক আলোচনায়ও সহায়তা করবে।

আমাদের দেশে এতকাল এ-জাতীয় বইর অভাব অনুভূত হয়েছে। অল্প প্রয়াসে এত সব জানার কোন অবলম্বনই ছিল না। পণ্ডিত মহাশয়ের এ গ্রন্থ সে অভাব মোচনে অনেকটা কার্যকর হবে। ভাষার কাঠিন্য এ বইতে আছে তবে তা তেমন অসুবিধা ঘটাবে না! আর্য সনাতন সংস্কৃতির ধারায় শিক্ষা-দীক্ষার বহুমুখী প্রসার অবলম্বনীয় বই-পত্রের বিষয়াবলীর উপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে। নানা উপায়ে কাল বিভক্ত করে সুদূর অতীত থেকে ক্রমিক বর্তমান কালের দিকে এগিয়ে আসার পদ্ধতিতে বিষয়গুলো অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্বনিয়ন্তা পণ্ডিত মহাশয়ের কর্মময় দীর্ঘজীবন দান করুন।

শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

অবতরণিকা

আরব্ধ কাজের আংশিক সমাপনও অনেক সময়, যথেষ্ট বলে গ্রহণ করতে হয়। গ্রন্থের নাম যদিও 'সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' তথাপি এ'র মাধ্যমে আমাদের অতীতের সংস্কৃতির ক্রম-বিকাশের ধারাব দিগ্‌দর্শন ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কাগজ কলম নিয়ে আকাশের মুক্তাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে দৃশ্য সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে গেলেই লিখতে হবে- হয়, আভাত নীলিমার কথা নয়তো, তারকামালা-বলাকা-সারস লহরীর কথা, মেঘের কথা ইত্যাদি। আকাশেব নিজস্ব কোন তথ্য হয়তো, সে লেখার মধ্যে থাকবেই না। কারণ আকাশ অদৃশ্য বস্তু। তার রূপ নেই, আকৃতি নেই, রং নেই, চোখেব গ্রাহ্য কোন গুণই নেই। এ অবস্থাটা কোন এক-জনের বেলায় নহে, অতীত অনাগত বর্তমানের যে কোন ব্যক্তির বেলায়ই সমান। সুদূর অতীতের বা অতিদূরের সংস্কৃতিও অনেকটা, দৃষ্টি-অন্তরালিত ওই আকাশের মত। অতীত মাত্রই পুরোবর্তিতা-অতিক্রম করে চলে যাওয়া কালের অতলে লুকানো কিছু। অনতিপূর্বকালিকের সম্বন্ধে তবুও যেন দেখি দেখি ভাবটা মনের মধ্যে জাগরুক কিন্তু দূর অতীত সুদূর অতীত সুপ্রাচীন অতীত সম্বন্ধে সে ভাবটাও দুর্লভ। অথচ তার জিজ্ঞাসা, অথবা জিজ্ঞাসা-ই বা বলি কেন, একেবারে জানবার পিপাসাই যেন অপরিহার্য। কিন্তু কি উপায়? সে কালের সংস্কৃতির বা শিক্ষা-দীক্ষার দৃশ্যত্ব শ্রব্যত্বাদি যাবতীয় অনুভবগম্যতা চিরকালের জন্য অতীত-কুহরে বিলীন হওয়ায় কেবল সাক্ষ্যবহ নিদর্শন অবলম্বনে কোন রকম ধারণা লাভ করা ছাড়া অন্য কিছু সম্ভব নহে। নিদর্শনের মধ্যেও কোনটা বা একেবারে মূক, কেবল তার আঙ্গিকের অনুশীলন দ্বারা কোন আভাস দিতে পারে। কোনটা তারচেয়ে অনেক বেশী উপস্থাপন করতে সক্ষম তার মধ্যেকার সঙ্কেতনিবদ্ধ কথাদ্বারা। এ দুয়ের দ্বিতীয়টাই অধিকতর উপযোগী। একারণেই অতীতের শিক্ষা-দীক্ষাব বাহন পুঁথি-পুস্তকের উপর নির্ভর করে সংস্কৃতির আলোচনা ছিল এখানে মুখ্য।

জগতে দু'প্রকার বস্তুরই মাত্র সমাবেশ দেখা যায়—বিনশ্বর এবং অবিনশ্বর। ন্যায়দর্শন অনুসারে,—পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ আত্মা (পরমাত্মা বা ঈশ্বর হতে অভিন্ন) এবং মন—এই কয়টি বস্তু ছাড়া আর সমস্তই বিনশ্বর। আমাদের আলোচ্য অবলম্বনীয় যাবতীয় বস্তুই বিনশ্বর এবং কাল তার অনেক কিছুই চিরতরে অনস্তিত্বের কুহরে চিরবিলীন করেছে। তথাপি, এখনও আমাদের নাগালের মধ্যে অনেক প্রাচীন বইপত্র আছে যাব সাহায্যে সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সংস্কৃতির

কোন প্রকার রূপরেখা-অঙ্কন সম্ভব হতে পারে। অস্পষ্ট জিনিষের ছবিও অস্পষ্ট হয় কিন্তু আকুতিভরা প্রাণ নিয়ে, সহৃদয় মন নিয়ে লক্ষ্য করলে নিশ্চয়ই তার অন্তরাবেদন উপেক্ষা করা যায় না। বর্তমান জগতের অত্যন্ত সুপ্রসর সংস্কৃতির মূলেও কালের অতলে তলিয়ে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া মানব-সমাজের অবদান স্বীকার করার মত অত্যন্ত হাল্কা উপেক্ষাবুদ্ধিমূলক স্বীকৃতির ক্ষেত্র এটা নয়। অতীতের পূর্বপিতৃ-পৈতামহজনের সাথে আমাদের যে রক্তের বন্ধন রয়েছে, প্রাতিবেশিক সম্পর্ক রয়েছে তার টান তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হতে পারে না। আপন ভাবের উদ্বোধনে আকর্ষণ-আভিমুখ্য হতেও পারে। প্রাচীন পুঁথি-পুস্তকের কালানুক্রমিক বিন্যাসের মাধ্যমে এতদঞ্চলের অর্থাৎ প্রাচ্যভূমির জ্ঞানানুশীলনের পটভূমিকায় চিন্তা-চেতনার, জীবন-জীবিকার উত্থান-পতনের অনেক কিছু ধরা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে বাধাও অনেক। আমরা যে কেবল সংস্কারবদ্ধ তা-ই নয় ভীতও বটে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পরকালের ভীতি এখানে আরোপ করেও বলা যায় যে—নতুন কোন কিছুই যেন আমরা সমান দৃঢ়তায় গ্রহণ করতে পারি না—'পুরাণো আবাস ছেড়ে যাই যবে, মনে ভেবে মরি কি যেন কি হবে।' কালের গতিধারায় তালে তালে চলতে গিয়ে যেমন নিজেদের অতীত ঐতিহ্য ভুলে যেতে বসেছি, তেমন সহজলভ্য অবলম্বন-উপায়-উপাদান সঙ্গতির অভাবও দ্রুত ভুলে যেতে আমাদেরে বাধ্য করে। আত্মসচেনতার অভাবে যেমনটা শরীরে দিন দিন উপচীয়মান রোগ-ব্যাধির জীবাণু বা বীজাণু বেড়ে বিপত্তি ঘটায়, ধ্বংসের দিকেও বা নিয়ে যায়, ঠিক তেমন-ভাবেই এক্ষেত্রেও আত্মভোলা হলে দুঃখজনক পরিণতি এসে পড়তে পারে বৈ কি? ইতিহাসে অর্থাৎ নিজেদের ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক উদ্যোগে আমরা যে পশ্চাৎপদ তা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। ঐতিহাসিক উপাদানের যে অভাব আছে তা বোধহয়, সত্য নহে। কেবল দরকার তদনুসারী উদ্যোগ। তাই, যে কালের যে সব গ্রন্থরাজি আছে তার কালানুক্রমিক বিন্যাসের ধারায় সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গ এবং আঙ্গিক লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যেই উল্লিখিত সাহিত্যের আলোচনা।

খৃষ্টপূর্ব বহুকাল আগেথেকে শুরু করে ক্রমিক খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালী-বঙ্গদেশবাসীর সাংস্কৃতিক বিকাশ বিবর্তনের সাথে সম্পর্ক-সংপৃক্ত এবং তৎপ্রসঙ্গে প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থের উদ্দেশ-বিস্তার প্রভৃতিই কেবল এ গ্রন্থের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সে অনুসারে, যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ (বৈদিক এবং অবৈদিক বা লৌকিক) উদ্দিষ্ট-নিরূপিত হয়েছে তার বাইরেও অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে যা এ গ্রন্থের নামকরণের প্রেক্ষিতে উপস্থানীয়ের মধ্যে গণ্য কিন্তু উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ প্রেক্ষিতে তা অপরিহার্য মনে হয় না। সংস্কৃত ভাষার পরিধি এত বিশাল যে তার গ্রন্থ-সম্ভারের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ততম অংশের স্থান সঙ্কুলানও এ ইতিবৃত্তে অসম্ভব। স্মরণাতীত কালথেকে

অবিচ্ছিন্ন ধারায় ভোগ-বিলাস-চঞ্চল রাজপ্রাসাদেও সংস্কৃত চর্চা—সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন লক্ষ্য করা যায়, সংসারত্যাগী যতি সন্ন্যাসীরাও নিভৃত আশ্রমে বসে সংস্কৃত সাহিত্য-সাধনায় সর্বোপরি দক্ষতা দেখিয়েছেন, শাস্ত্রব্যবসায়ী সম্পন্ন-মধ্যবিত্ত-বিত্তহীন সুধীমহলে সংস্কৃত চর্চার সর্বত প্রসারী প্রবাহ অবাধ অপ্রতিহত ছিল। সমাজের নিম্নতম পর্যায়থেকে শুরু করে উচ্চ মহোচ্চতম স্তরের মানুষও সংস্কৃতের প্রচার প্রসার কল্পে সাধ্যমত চেষ্টা করেছে বলেই, কি বা ধর্মশাস্ত্র, কি-ই-বা অর্থশাস্ত্র-অর্থকরীশাস্ত্র-কামশাস্ত্র প্রতিক্ষেত্রেই অতি উন্নত মনীষার নিদর্শন এখনও ম্লান হয় নি। সুতরাং, অত বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য-সম্ভারের আলোচনার ইচ্ছা, প্রয়োজনের তাগিদেই খাট করতে হয়েছে। তবে, দিগ্‌দর্শনন্যায়ে এর সাহায্যে সংস্কৃত সাহিত্যের বৈপুল্য এবং স্বাধীন-স্বতন্ত্র তত্ত্বসম্ভার অবশ্যই, অনায়াসলভ্য হবে।

প্রাকৃত ভাষাও বৈদিককাল থেকেই প্রচলিত। সংস্কৃতের পাশাপাশি প্রাকৃত ভাষা এ উপমহাদেশে সর্বত্র প্রচলিত ছিল যার আঞ্চলিক রূপের পার্থক্য-প্রণোদিত অনেক-গুলো আঞ্চলিক নতুন ভাষার অস্তিত্ব এখন সংশয়াতীত। পিঙ্গল মুনিকৃত প্রাকৃতছন্দঃ-সূত্র (যা প্রাকৃতপিঙ্গল বা প্রাকৃতপৈঙ্গল রূপে পরিচিত) এবং বাল্মীকি প্রণীত প্রাকৃতসূত্র নামক প্রাকৃত ব্যাকরণের গ্রন্থই প্রাকৃত ভাষার বৈদিক কালীনতার যথেষ্ট প্রমাণ। তবে, সংস্কৃত ভাষার প্রচার-প্রসারের যে গ্রন্থ-নিদর্শন রয়েছে সে তুলনায় প্রাকৃতের স্থান সংস্কৃতের নীচে—এটা পরিষ্কার। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সম্পূর্ণ বঙ্গদেশের সর্বত্র এক এবং অভিন্ন হলেও তার আঞ্চলিক রূপবৈষম্য যতটা প্রকট, প্রাকৃত ভাষায়ও সেরকম ছিল। সেকারণে মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত প্রাকৃতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে তুলনামূলক নিরূপণও রয়েছে। মাগধী প্রাকৃত, গৌড়ী প্রাকৃত যাকে পূর্বীপ্রাকৃত বলা হয়, পশ্চিমা প্রাকৃত দক্ষিণী প্রাকৃত প্রভৃতি পদদ্বারা নির্দেশে নানা প্রাকৃতের উল্লেখ প্রাচীন পুঁথি-পুস্তকে পাওয়া যায়। প্রাকৃতের মধ্যদিয়ে অর্থাৎ গৌড়ী প্রাকৃতের বা পূর্বীপ্রাকৃতের মধ্যদিয়ে বিবর্তিত হয়ে গড়ে উঠেছে বাংলার অনেক শব্দ। বাংলায় প্রচলিত 'তদ্ভব' শ্রেণীর শব্দগুলোই তাই। কালানুক্রমিক বিন্যাসে যথাসম্ভব উপস্থাপিত প্রাকৃতসাহিত্যও মোটামুটি যথার্থ ধারণা দিতে পারবে বলে আশাকরি।

পালিগ্রন্থগুলো আমরা পাই বৌদ্ধধর্ম-সাহিত্যের মধ্যে। পালিশব্দটির মুখ্য অর্থ বা শাস্ত্রে প্রায়োগিক অর্থ আজ পর্যন্তও প্রায় অনির্ধারিত আছে। গৌতম বুদ্ধের কালথেকে পালিগ্রন্থের বহুল প্রচার বিপুল প্রসার চলে আসছে যা এখনও একেবারে কম আলোচ্য নহে। তার মধ্যে নানা সংশয়িত অর্থের উঁকি-ঝুঁকি বেশ স্পষ্ট। 'সুত্তপিটকে' 'সংযুত্ত-নিকায়পালি' প্রভৃতি পালিশব্দযুক্ত গ্রন্থনাম বাস্তবে,

ভাষার্থছাড়াও প্রতীতি যোগায়। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণন (ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি) লিখেছেন:

"Buddhism in all forms goes back to the life and teaching of the Buddha. While the Austerities practised by him till he attained enlightment appeal to the Hinayana, the pali or the Southern School, his life of Service and Compassion for 45 years after the attaiment of enlightment is the authority for the Mahayana, the Sanskrit or the Northern School."

এখানে ব্যবহৃত 'pali' শব্দটি প্রকৃত পক্ষে, যে অর্থে ব্যবহৃত তাও সার্বত্রিক নহে। এগ্রন্থে যথাস্থানে নিরূপিত, ভাষা অর্থে পাটলিপুত্রীয় প্রাকৃতভেদও অবশ্যই পরীক্ষামূলক নিরূপণ। পালি গ্রন্থের ভাষার সহিত সংস্কৃতভাষার নৈকট্য এত বেশী যা অসায়াসে ধরা পড়ে। যেমন--

"দিস্বান রূপানি মনোরমানি,
অথো পি দিস্বান অমনোরমানি।
মনোরমে রাগপথং বিনোদয়ে,-
ন চাপ্পিয়ং মেত্তি মনং পদোসয়ে ।।"

আধোরেখার নীচে উল্লিখিত 'সংযুত্তনিকায়পালি' গ্রন্থের '৯৪ অদন্তঅনুত্তসুত্তং' এর অন্তর্গত ৯৬ অনুচ্ছেদের এ শ্লোকটি যদি সংস্কৃতে অনুবাদ করা যায় তবে, স্বভাবত হবে—

[দৃশ্যানি রূপাণি মনোরমাণি,
অথাপি দৃশ্যান্যমনোরমাণি।
মনোরমে রাগপথং বিনোদয়ে,
ন চাপ্রিয়ং মে'তি মনঃ প্রদোষয়ে।।]

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র প্রসিদ্ধ ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দদ্বয়ের সংমিশ্রণজাত উপজাতি ছন্দের এ শ্লোকটির মত পালিগ্রন্থের যে কোন অংশের ভাষার সংস্কৃতায়নও অতি অল্প পরিবর্তনের সাহায্যেই করা সম্ভব।

প্রাকৃত ভাষার গদ্যরূপও অতি অল্প পরিবর্তনে সংস্কৃতে পরিণত হতে পারে। যেমন, "রঞো বাসিঠি পুতস সামি সিরি পুলুমায়িস সবছরে সতমে ৭ গিম্হপংখে পচমে ৫ দিবসে পথমে ১" (Taken from The Inscription No. 14 of Karle

১, General preface, 2nd. para from নালান্দা-দেবনাগরী-পালি-গ্রন্থমালায় সুত্তপিটকে সংযুত্ত নিকায়পালি, বিহার রাজকীয় পালি প্রকাশন মণ্ডল, ১৯৫৯ (খৃঃ)

Inscriptions) [রাজ্ঞো বাশিষ্ঠিপুত্রস্য স্বামিশ্রীপুলুমায়িনঃ সংবৎসরে সপ্তমে ৭ গ্রীষ্মপক্ষে পঞ্চমে ৫ দিবসে প্রথমে ১]

প্রকৃতপক্ষে জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়দ্বয় জনসাধারণের ভাষা--প্রাকৃতের অবলম্বনে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে। সহজ বোধ্য এবং সর্বজনবোধ্য গল্প-উপদেশ-গাঁথাবহুল সেসব সমকালে সংস্কৃতের পাশাপাশি চলে এসেছে। জৈনদের গ্রন্থের ভাষা এবং পালি-গ্রন্থের ভাষায় মূলত প্রভেদ দুর্লক্ষ্য। থেকে থাকলে তা আঞ্চলিক প্রভেদ মাত্রই মনে হয়। উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান গ্রন্থের সংহত তালিকামাত্রই এখানে প্রদত্ত হয়েছে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে পাওয়া যায় —'শাস্ত্রেষু সংস্কৃতাদন্যদপভ্রংসতয়োচ্যতে'— শাস্ত্রে অর্থাৎ দর্শনতত্ত্বাদির গ্রন্থে সংস্কৃত বাদে অন্যভাষা---অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষা অপভ্রংস বলে গণ্য হয়। দণ্ডী নিজে তো আর এ রীতি উদ্ভাবন করে সাহিত্য-তত্ত্বের গ্রন্থে বিধান দেন নি, তিনি চলমান সমাজ-স্বীকৃতির কথাই উল্লেখ করেছেন মাত্র। হয়তো, একারণেই জৈন-বৌদ্ধদের গভীর তত্ত্বগ্রন্থগুলোও সংস্কৃত ভাষাতেই প্রণীত। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার সহাবস্থান সম্বন্ধে জি. এইচ তার্লেকর লিখেছেন —

> "The Sanskrit drama was bred in such an atmosphere where, in life, Sanskrit and Prakrit were the media of the cultured and the non-cultured in the society respectively. The use of the Prakrit dialects in Sanskrit plays of the classical period points to the fact that these together with Sanskrit were intelligible to the spectators. The hero speaks in Sanskrit and the heroine responds in Prakrit and the hero further goes on in Sanskrit. All this would not have been possible if both were not intelligible to the characters concerned and the spectators. In the popular plays like prahasana, the people's language, i. e. Prakrit was dominant."*

এখানে ইংরেজী উদ্ধৃতির মধ্যেও প্রাকৃত ভাষাকে জনসাধারণের ভাষা বলা হয়েছে। 'চার্লস্ ফেব্রি'-এঁর 'Five thousand years of Indian Theatre' প্রবন্ধে[১] প্রাকৃত ভাষার ব্যবহারের দীর্ঘ অস্তিত্ব প্রমাণিতও হয়। তথাপি বর্তমানে তার ক্ষেত্র খুবই সঙ্কুচিত হয়েছে। আমাদের মাতৃভাষা বিবর্তিত হয়েছে গৌড়ী প্রাকৃত বা পূর্বী প্রাকৃতের মধ্যদিয়ে—এ কারণে প্রাকৃতের সাথে সম্পর্কও অনস্বীকার্য। সাংস্কৃতিক বিকাশে প্রাকৃত ভাষার সেবা এবং অনুশীলন সংস্কৃতের তুলনায় কম হলেও হয়েছে। তার গ্রন্থোৎপত্তির খতিয়ানও যথাসম্ভব দেয়ার চেষ্টা করেছি।

* 'Studies in the Natyasastra' p. 38.

১. Western Railway Annual, 1955—56

অপভ্রংশ ভাষার অপর এক অধ্যায় আমাদের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হয়েছে। 'অবহট্‌ঠ' সাহিত্য ওই ভাষারই বিষয়। প্রাকৃতের তুলনায়ও এটার ক্ষেত্র অনেক সংক্ষিপ্ত কিন্তু তারমধ্যে পরিস্ফুট নতুন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে সম্বন্ধে প্রাপ্ত গ্রন্থের বা পদের কেবল রচয়িতাদের পরিচিতি এবং তার সাথে সঙ্গতিশীল অন্যান্য তথ্য এখানে দিয়েছি। যথাস্থানে সে সম্বন্ধে পাওয়া যাবে যে গুহ্য সাধনতত্ত্বের অস্পষ্টায়িত উপস্থাপনায় যে আর্থী ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে, সংস্কৃতিক্ষেত্রে সেটাই নবতম বৈশিষ্ট্য। বাংলা, আসামী এবং উড়িয়া ভাষারূপে বিবর্তনের একান্ত দ্বারবর্তী প্রাকৃতই অথবা প্রাকৃতের উল্লিখিত ত্রিবিধ বিবর্তনোন্মুখিতাই অবহট্‌ঠের মধ্যে অনুধাবনীয়।

বার্তিকসূত্রের শেষ অংশে কাত্যায়ন নিরুক্তকেও একপ্রকার ব্যাকরণ বলেছেন—'নাম ধাতুজমাহ বিরুক্তে ব্যাকরণে'। এ সূত্রটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা যে নামগুলো ব্যবহার করি সেগুলো সাধারণত, বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম-অব্যয়-ক্রিয়া এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। তার প্রতিটি নামই ধাতুজ অর্থাৎ ধাতুজাত বলে নিরুক্ত ব্যাকরণে কথিত হয়—কাত্যায়নের এ সূত্রের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষার একটি বিশেষ রীতি বা শৈলী পাণিনিরও বহু বহু কাল পূর্বথেকে অনুসরণের মূল সূত্র পাওয়া গেল। আমরা যে যাস্কাচার্যকে নিরুক্তকার বলে থাকি তাঁর সে নিরুক্তও একপ্রকার ব্যাকরণ বা পদব্যুৎপাদক শাস্ত্র। ব্যাকরণে নিরুক্তকে পঞ্চবিধও বলা হয়েছে, যথা—

বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যয়শ্চ
দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগ—
স্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্॥

কোথাও বর্ণের আগম, কোথাও বা বিপর্যয়, কোথাও আবার বর্ণের বিকার, অন্য কোথায় বা বর্ণের নাশ, এ ছাড়া, ধাতুর অর্থের অতিশায়ন—এ পাঁচ প্রকার প্রক্রিয়াও নিরুক্তের মধ্যে রয়েছে। যাস্ক নিজেও পূর্ববর্তী অনেক কয়জন নিরুক্তকার বা নিরুক্ত ব্যাকরণকার রূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁরাও তাহলে, হয় যাস্কের জীবৎকালে, নয় পূর্ববর্তী পদব্যুৎপাদক শাস্ত্রকার। তাঁদের সে সব শাস্ত্রের একখানাও আমাদের কালে এসে বোধ হয়, পৌঁছায় নি। তাই পরিষ্কার বুঝা গেল পদব্যুৎপাদক শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষার ইতিহাসে সুপ্রাচীন। সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যেই পদব্যুৎপত্তির প্রক্রিয়া পাওয়া যায়। সামবেদের 'বৈপুল্যসূত্র' তো ব্যুৎপত্তির প্রমাণ শাস্ত্ররূপেই প্রথিত। তাই কাত্যায়ন সংস্কৃত ভাষার প্রতিটি নামের মূলেই কোন না কোন ধাতুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছেন এবং দোহাই দিয়েছেন সুপ্রাচীন পদব্যুৎপত্তির প্রমাণ

শাস্ত্র নিরুক্তের। তিনি যাস্কের নিরুক্ত ছাড়াও কোন নিরুক্ত দেখেছিলেন কিনা জানবার উপায় নেই। বোধ হয় দেখেছিলেন নইলে নিরুক্তকার অনেকের খবর যাস্কের নিরুক্তে পেয়েও নিরুক্তের সাধারণ উল্লেখ করবেন কেন? তা ছাড়া যাস্কের সঠিক কাল নির্ধারিত না হলেও তাঁকে পাণিনির চেয়ে কেবল পূর্ববর্তী বহু পূর্ববর্তী বললেও চলে না কারণ যাস্কের সপ্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে মহাভারতে। শান্তিপর্বের ৩৪২তম অধ্যায়ে ৭২-৭৩ নং শ্লোকদ্বয়ে শিপিবিষ্ট-যাস্ক সংবাদে বেদব্যাস লিখেছেন—

যাস্কো মামৃষিরব্যগ্রো নৈকযজ্ঞেষু গীতবান্।
শিপিবিষ্ট ইতি হ্যস্মাদ্ গুহ্যনামধরো হ্যহম্।। ৭২।
স্তুত্বা মাং শিপিবিষ্টেতি যাস্ক ঋষিরুদারধীঃ।
মৎপ্রসাদাদধোনষ্টং নিরুক্তমভিজগ্মিবান্।। ৭৩।"

"ধীর স্থির ঋষি যাস্ক বহু যজ্ঞে আমার (বিষ্ণুর) গুহ্য শিপিবিষ্ট নাম ধরে স্তুতি গান করেছে। উদারচেতা ঋষি আমাকে শিপিবিষ্ট নামেই স্তব করে সন্তুষ্ট করে আমার অনুগ্রহেই অতীতে নষ্ট হয়ে যাওয়া নিরুক্ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।" —মহাভারতের এখানে পরিষ্কার করে বলা হল যে নিরুক্ত আরও প্রাচীনকালে ছিল এবং ভগবদারাধনার ফলেই ঋষি যাস্ক সে বিষয়ে জানতে পেরেছেন। 'শিপিবিষ্ট' নামটি ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। যাস্কের নিরুক্তের নিঘণ্টু কাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয়স্তবকে চৌরাশী পদের ৩৭ সংখ্যক পদ শিপিবিষ্ট। বিষ্ণুর এ নামটি সাক্ষাৎ ঋকসংহিতায়ও আছে (৭.৬ ২৫.৬, মন্ত্রে)। যাস্ক ঋষির স্তবনকে 'গীতবান্' পদদ্বারা প্রকাশ করায় ধারণা হয়—তিনি সামবেদীয় ছিলেন। পূর্বোল্লিখিত বৈপুল্যসূত্রও সামবেদীয়। এর মাঝে কোন যোগসূত্র থাকাই সম্ভব। যা হোক, যাস্ককে পাণিনির আগেকার বলে অবিসংবাদে মানা হয়। তিনি মহাভারতের কালেও প্রাচীন ঋষি এটা মনে থাকা ভাল।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' এখন আর কেবল প্রাবাদিক নহে, প্রত্যক্ষ পাঠ্য আলোচ্য অনুশীলিতব্য এক বাস্তব শাস্ত্র। এ শাস্ত্র প্রণয়ন করেই কৌটিল্য প্রাচ্যের মেকিয়াভেলি বলে খ্যাত। নন্দবংশের রাজত্ব উচ্ছিন্ন করে মগধের রাজসিংহাসনে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে প্রতিষ্ঠা করা কৌটিল্যের মহতী কীর্তি। মহামতি অশোকের পিতামহ মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে (সম্ভবত) সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। চাণক্য তো তখন প্রবীণ। 'অর্থশাস্ত্র' রচনার সঠিক কাল না পাওয়ায়, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের (অমিত্রঘাত) সিংহাসনারোহণের (২৯৭ খৃষ্টপূর্বাব্দ) পূর্বপর্যন্ত কোন কালে রচিত বলে অনেকেরই মত পাওয়া যায় কিন্তু এ বিষয় কেহই কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন নি যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসনে আরোহণেরও পূর্বে রচিত

হয়েছিল কি না? যা হোক, কৌটিল্য যে রামায়ণ, মহাভারত এবং মনু-প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন তার প্রমাণ 'অর্থশাস্ত্র'-এর মধ্যেই রয়েছে। বিনয়াধিকারিক অর্থাৎ বিনয়বিষয়ক ১ম অধিকরণের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে—

"কোপাদ্ জনমেজয়ো ব্রাহ্মণেষু বিক্রান্তঃ,
তালজঙ্ঘশ্চ ভৃগুষু। ৬।
... ...
মানাদ্ রাবণঃ পরদারানপ্রযচ্ছন্,
দুর্য্যোধনঃ রাজ্যাদংশংশ্চ। ৮।
মদাদ্ দম্ভোদ্ভবো ভূতাবমানী,
হৈহয়শ্চার্জ্জুনঃ। ৯।
হর্ষাদ্ বাতাপিরগস্ত্যম্ অত্যাসাদয়ন্,
বৃষ্ণিসংঘশ্চ দ্বৈপায়নমিতি॥ ১০।"

"ক্রোধের বশবর্তী হয়ে জনমেজয় মাননীয় ব্রাহ্মণের প্রতি গায়েব জোর দেখাতে গিয়ে,
এবং তালজঙ্ঘ নামক রাজা ভৃগুবংশীয়দিগের প্রতি জোর খাটাতে গিয়ে। ৬।,
অতিমানের আশ্রয়ে অপহৃত পরের স্ত্রী ফিরিয়ে না দেয়ায় রাবণ,
এবং দুর্যোধনও রাজ্যের কিছু অংশ ফিরিয়ে না দেয়ায়। ৮।,
অহঙ্কারমত্ত রাজা দম্ভোদ্ভব প্রজাসাধারণের প্রতি অবমাননাকর আচরণ করে,
এবং হৈহয়বংশীয় অর্জুনও (কার্তবীর্যার্জ্জুন) অহঙ্কারে মত্ত হয়ে। ৯।,
অতি উৎফুল্ল বাতাপি অগস্ত্যকেও উদরসাৎ করে,
এবং বৃষ্ণিবংশীয়রা দ্বৈপায়নকে অবমাননা করে। ১০।"
সগণ সমভিব্যাহারে সরাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

এখানে মাননীয় বিভাণ্ডকতনয় শৃঙ্গীর (ঋষ্যশৃঙ্গ) প্রতি জনমেজয়ের অসদাচরণ, দুর্যোধন কর্তৃক রাজ্যের কিঞ্চিৎ অংশ ফিরিয়ে দিতে অনীহা, মাহিষ্মতীর হৈহয়বংশীয় রাজা কার্তবীর্যার্জুন কর্তৃক জমদগ্নি মুনির কামধেনু অপহরণাদি দুষ্কর্ম, বাতাপি কর্তৃক অগস্ত্যকেও উদরসাৎকরা এবং বৃষ্ণিগণ কর্তৃক ব্যাসের অবমাননা প্রভৃতি মহাভারতীয় বৃত্তান্তের এবং রাবণ কর্তৃক সীতাকে ফিরিয়ে না দেয়ার রামায়ণীয় প্রতিফল-বৃত্তান্তের যে সূচনা আছে তাতে সন্দেহের কারণ নেই। সুতরাং, খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের বিদ্যাপারঙ্গম প্রবীণতম কৌটিল্য যে গ্রন্থের প্রাচীন ইতিবৃত্তাংশকে সিদ্ধবৎ গ্রহণ করেছেন সে গ্রন্থ (বেদব্যাসের মহাভারত) যে যাস্কাচার্যের উল্লেখ করেছে তিনি যে অতি প্রাচীন নিরুক্তকার-বৈয়াকরণ তাতে সংশয় থাকার কারণ

নেই। রাজনীতি বিষয়ে যে কৌটিল্যের পূর্বকালেও অনেক গ্রন্থ-গ্রন্থকার ছিলেন সে কথাও 'অর্থ শাস্ত্রের' প্রারম্ভেই কৌটিল্য স্বয়ং বলেছেন --

"ওঁ নম: শুক্র-বৃহস্পতিভ্যাম্।
পৃথিব্যা লাভে পালনে চ যাবন্ত্যর্থশাস্ত্রাণি
পূর্বাচার্যৈ্যঃ প্রস্থাপিতানি প্রায়শস্তানি সংহৃত্য
একমিদমর্থশাস্ত্রং কৃতম্। ১।"

"শুক্র এবং বৃহস্পতিকে প্রণাম করি। রাজ্যলাভ করার এবং পালন করার বিষয়ে পূর্বকালের আচার্যগণ কর্তৃক যতগুলো অর্থশাস্ত্র প্রচারিত প্রতিষ্ঠাপিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলো সংগ্রহ করে তার প্রতিপাদ্য গ্রহণ করে এই একখানা 'অর্থশাস্ত্র' করা হল।" শুক্রাচার্য এবং আচার্য বৃহস্পতিকে তো সর্বপ্রথম প্রণাম করাদ্বারাই অর্থশাস্ত্র বিষয়ে প্রাথমিক এবং সর্বাধিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তারপর, পূর্ববর্তী অনেক আচার্যের অর্থশাস্ত্র প্রণয়নের তো এখানে বাচিক-ভাষিক উপস্থাপনই রয়েছে। অতএব, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বকালেও অর্থশাস্ত্রের বহুল প্রচার ছিল এবং কৌটিল্যের পরেও কামন্দক প্রভৃতির 'নীতিসার' প্রভৃতি গ্রন্থের পরম্পরা আমাদের কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। আর, বাল্মীকির রামায়ণ এবং দেবব্যাসের মহাভারত তখনই সমাজের সর্বক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, নইলে, তার মধ্যেকার ঘটনার দৃষ্টান্ত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' এর মত বাস্তববিষয়-মূলক শাস্ত্রে খাটে কি করে?

এ পর্যন্ত আমাদের পুরাণগুলো সম্বন্ধে বিদ্বানদের গবেষণার তথ্য সম্বলিত DIKSHITAR Purans, A study.[১] এবং Progress of Indic studies by PUSALKAR[২] প্রভৃতি গ্রন্থের অভিমতের অনুরূপ লিখেছেন দেবেন্দ্রকুমার রাজারাম পাতিল—

"Wilson is generally regarded as a pioneer in the field. His heavy volume containing a lengthy preface and introduction on the Visnu Purana with its translation and learned notes thereon is too wellknown to need mention......He was not much interested in historical facts lying embedded in them. He greatly underrated the antiquity of the compilation of the extant texts and some of his views are now considered as being only of academic interest. Col. Vans kennedy, Wilson's contemporary, no doubt regarded the puranas as a class of ancient literature, but he also didnot contribute much from the historian's point of view. There were also minor attempts made by

১. IHQ. 8. 747.
২. Published by Bhanderkar Oriental Research Institute, 1942.

Burnouf, col Wilford and by the compilers of the catalogues of manuscripts like Aufrecht and Eggelling but they too did not concern themselves with their historical aspect. This was the condition of Pauranik researches upto about the beginning of this century"[১]

এখানে পৌরাণিক গবেষণার বিষয় যে কথা বলা হয়েছে, আমি বলব, তা কেবল পৌরাণিক বিষয়ে নহে, বরং ঐতিহাসিকভাবে সমগ্র আর্য সনাতনীদের তথা জৈন-বৌদ্ধদের গ্রন্থভিত্তিক এবং অন্যান্য সংগৃহীত প্রাচীন লেখভিত্তিক গোটা সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বরূপ উদঘাটনেও সমানভাবে প্রযোজ্য। বেদ, সূত্রসাহিত্য, স্মার্তসন্দর্ভ দর্শন শাস্ত্রাদির পৌর্বাপর্যমূলক সিদ্ধান্তেও সংশয়ের নিরসনে প্রাচীন গ্রন্থের অনুসরণ না করে নানা বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। অথচ, প্রাচীন গ্রন্থে তার নিরশন কুত্রাপি রয়েছে যেমন, বেদব্যাস কর্তৃক যজুর্বেদ পৃথক্ বিন্যস্ত হওয়ার পরবর্তী বৌধায়নের শ্রৌত-গৃহ্য-ধর্মসূত্র, তারপরে ভারদ্বাজ-আপস্তম্ব-হিরণ্যকেশী-বাধূল প্রভৃতির অনুরূপ সূত্র সাহিত্য প্রণয়নের উত্তর কালে বৈখানস সূত্রের সৃষ্টি হয়েছে। হিরণ্যকেশীর সূত্রসাহিত্যের বৈজয়ন্তী টীকার বরাতে ডঃ ডব্লিউ. ক্যালাণ্ড লিখেছেন—

"In the verses with which Mahadeva introduces his commentary, called the Vaijayanti, on the Srautasutra of Hiranyakesin, he informs us that a certain Muni in the shape of a partridge (tittiri) accepted the yajurveda from its author, Vyasa On this veda Baudhayana, in order to preserve its meaning, composed a Sutra of too great length (or unwieldiness, atigaurava); thereupon Bharadvaja did the same, and atfer him Apastamba composed his well-known Sutra Then came Hiranyakesin, who put togather another Sutra; after him vadhula composed his Sutra which originated in kerala-land (or Malabar), and the last was the meritorious Sutra of the teacher of the vaikhanasas."[২]

এ মত অপরিশীলিত বটে। বৈখানস সূত্রের বেঙ্কটেশ কৃত টীকা অনুসারে, সূত্রকারের নাম বিখানস। টীকা-কারের প্রণাম শ্লোকটি এই—

যেন বেদার্থবিজ্ঞেয়ো বেদার্থং বিজ্ঞায়] লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
প্রণীতং সূত্রমৌখেয়ং তস্মৈ বিখানসে নমঃ॥

চলতি প্রবাদান্তরমূলক এ শ্লোক অনুসারে, কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখা দ্বিধা বিভক্ত—ঔখেয় অথবা ঔখীয়শাখা এবং খাণ্ডিকীয় শাখা। শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত ম্যাক্স

১. Introduction to his 'Cultural Histo.y from the vayu purana'.

২. Introduction to his vaikhanasa smarta sutram., published by the Asiatic Society of Bengal, cal. 1929.

মূলারের মতে কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখা পাঁচ ভাগে বিভক্ত—১। আপস্তম্বীয়, ২। বৌধায়নীয়, ৩। সত্যাষাঢ়ীয়, ৪। হৈরণ্যকেশীয় এবং ৫। ঔখেয়।[১] মনু-সংহিতার অনেক স্থলে 'বৈখানসমত' 'বৈখানসশাস্ত্র' প্রভৃতি পদ থাকায় অভ্রান্তভাবে বলা চলে যে বৈখানসসূত্রই আগেকার। যেমন—

> পুষ্পমূলকফলৈর্বাপি কেবলৈ র্বর্ত্তয়েৎ সদা।
> কালপক্কৈঃ স্বয়ং শীর্ণৈ বৈখানসমতে স্থিতঃ।। মনুসং ৭/২১

এখানে মনে করতে পারা যায় যে, অহিংস মতাদর্শে বৌদ্ধ-ধর্মে আমরা যতটা অনুরাগ দেখি তার চেয়ে অনেক বেশী আস্থা-অনুসরণ বৈখানসপন্থী কৃষ্ণযজুর্বেদীয়ের লক্ষ্য করা যায়। উদ্ধৃত শ্লোকে বৈখানস মতবাদীদিগের জীবিকার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেয়া আছে। এখানে বলা হয়েছে—সর্বদাই পুষ্প-মূল-ফল আহার করে থাকবে। ফলও যখন পরিপক্ক হয়ে নিজে নিজে বৃন্তচ্যুত হবে তখনই কেবল তা আহার্যরূপে, গ্রহণীয়। গাছের ফল পর্যন্ত ছিঁড়ে খাওয়ার প্রতি নিষেধ আরোপ করায় হিংসাবর্জনের পরিধির ব্যাপকতা অবশ্যই বিস্ময়কর। এ শাস্ত্র যে প্রাগ্ বৌদ্ধ যুগের তা যথাস্থানে প্রাপ্য।

অত্র অবতরণিকা, প্রকৃতপক্ষে, গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তুর সহিত অঙ্গাঙ্গিত্বে জড়িত। সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাবাহিকতা উপস্থাপনের সহজ সরল পথ এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি কিন্তু বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশীলনে সে রকম পথ যে গঠিত হয়ে চলছে তা প্রাচীন শাস্ত্রের পরিমণ্ডলে গবেষণায় পরিক্রমণরত সুধীবৃন্দ বিলক্ষণ অবহিত আছেন। অথচ সে বিষয়ের খণ্ডাংশগুলো এক সঙ্গে জুড়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় আমাদের যথেষ্ট তৎপরতার অভাবই ঐতিহ্য-পরাঙ্মুখতার পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না। যা কিছু আছে তা যেমন ঐতিহাসিক, যা কিছু ছিল তাও ঐতিহাসিক—একথা অস্বীকার্য নহে। থাকলেই কোন না কোন স্থান কাল পাত্রাদির সহিত সম্বন্ধ-সংপৃক্ত হতেই হয়। প্রয়োজনানুসারী ঐতিহাসিকবিশেষের খতিয়ানে তার খবর থাক বা না থাক। তাছাড়া, প্রাচীন কালের অত শত শত গ্রন্থ একটি সংস্কৃতির পথ ধরে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেছে, বিশ্লেষণ করেছে - যা অহৈতুকও হতে পারে না এবং উদ্দেশ্যহীন-উপযোগহীন ছিল না। নাট্যশাস্ত্র যে এদেশেও প্রাথমিক কাল থেকেই প্রচলিত ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যতত্ত্ব - উভয়ই নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্গত। নাট্যসাহিত্যের এখন পর্যন্ত

১. Ancient Sanskrit Literature by M. Muller.

আবিষ্কৃত সর্বপ্রাচীন গ্রন্থগুলো মহাকবি ভাসের। গণপতি শাস্ত্রী ভাসের কাল নিরূপণ করেছেন—

"From the flowing tone of Bhasa's sanskrit and the conversational style of his dialogues which are short, easy, graceful and colloquial we are inclined to think that sanskrit was a spoken language in Bhasa's time, and so we place him after Panini, before the letter's grammer got a strong foolhold, and possibly before katyayana (350 B.C)."[১]

আমরা পেয়েছি ভাসের অনেকগুলো নাট্যসাহিত্য। তিনি নিজে কোন নাট্যতত্ত্বের বা সাহিত্যতত্ত্বের গ্রন্থ লিখেছিলেন কি না —জানা যায় না। বোধহয় লেখেন নি। তাঁর অতগুলো নাট্যসাহিত্যের কোথাও তার কোন আভাসও নেই[২]। অথচ তার নাটকে বা অন্যান্য নাট্যসাহিত্যে ব্যবহৃত নাট্যাঙ্গ-প্রতিপাদক পদগুলোরও তিনি উদ্ভাবয়িতা নিশ্চয় ন'ন। তা অনেক পূর্বথেকে চলতি ছিল প্রসিদ্ধ ছিল বলেই তিনি তা ব্যবহার করেছেন। নাটক, নাটকীয়, রঙ্গ, সূত্রধার, স্থাপনা, প্রস্তাবনা, প্রেক্ষক, বিষ্কম্ভক প্রভৃতি বিশেষ সংজ্ঞাগুলোর মধ্যদিয়েই ধারণা করা যায় যে মহাকবি ভাসের কালেও অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রারম্ভকালেও নাট্য-সাহিত্য-নাট্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা সর্বজনীন হয়েছিল। ভরতমুনি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র ভাসেরও পূর্বকালের। সুনিপুণ গবেষক ডঃ মনোমোহন ঘোষ লিখেছেন—

"We may, therefore, place the NS [Natyasastra]in about 500 B.C. This will exactly suit many other data as well as his cronological relation with kautilya (circa 350 B.C.) who makes a quotation from him."[৩]

প্রত্যেকেই সম্ভাব্য অধস্তন কাল নির্ণয় করেন এবং তার সাহায্যেই পৌর্বাপর্যের সঙ্গতি রক্ষিত হয়। অথচ আলোচ্য নাট্যশাস্ত্রকে জিজ্ঞাসু মুনিবৃন্দ নাট্যবেদ বলে অভিহিত করেছেন—

"মুনয়ঃ পর্য্যুপাস্যৈনমাত্রেয়প্রমুখাঃ পুরা।
পপ্রচ্ছুস্তে মহাত্মানো নিয়তেন্দ্রিয়বুদ্ধয়ঃ।। ৩।
যোঽয়ং ভগবতা সম্যগ্ গ্রথিতো বেদসংমিতঃ।
নাট্যবেদঃ কথং ব্রহ্মন্ উৎপন্নঃ কস্য বা কৃতে।। ৪।" *

১. Ibid. P 61.

২. খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে মহাকবি বাণভট্টও—কেবল নাটক লিখেই ভাস কবিযশ লাভ করেছিলেন বলেও লিখেছেন হর্ষচরিত নামক আখ্যায়িকায়।

৩. Natyasastra, P. lxxxii. 'নাট্যশাস্ত্র' প্রথম অধ্যায়।

'পুরাকালে আত্রেয়প্রমুখ সংযতেন্দ্রিয় মহাত্মা মুনিবৃন্দ মুনিবর ভরতের নিকটে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

প্রভো, বেদসম্মত যে নাট্যবেদ আপনি সম্যক্‌ভাবে গ্রথিত করেছেন তা কিসের জন্য কিভাবে প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল ?

মুনিবৃন্দের প্রশ্নের অন্তরালেই লুকিয়ে আছে নাট্যশাস্ত্রের দূর অতীত প্রথম আবির্ভাবের তত্ত্ব আর, ভরতমুনি ছিলেন তার সংস্কর্তা। ভরতমুনির এ নাট্যশাস্ত্র যে ব্যাপক বিষয়ের সূক্ষ্ম সঙ্গতিশীল নাট্যসাহিত্যাদির তত্ত্বের নির্দেশক তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি গ্রন্থে সঙ্গীত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

গীতবাদ্যনৃত্যত্রয়ং নাট্যং তৌর্যত্রিকঞ্চতৎ।
সঙ্গীতং প্রেক্ষণার্থেঽস্মিন্‌ শাস্ত্রোক্তে নাট্যধর্ম্মিকা ॥

সঙ্গীত এবং গীত বা গীতি-গান ভিন্ন সংজ্ঞা-সংজ্ঞিত্বে নিরূপণীয় হতে পারে।

সঙ্গীতে সুর-তাল-লয় প্রভৃতির সমভিব্যাহারে পদ অনেক ক্ষেত্রে অধিক হৃদয়-গ্রাহী হয়ে থাকে এবং তা কোন সক্ষম সাধকের নিভৃত সাধনায়ও নিয়োজিত হতে পারে কিন্তু দর্শক-শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বাদ্য এবং নৃত্য প্রভৃতির সহযোগে হেমচন্দ্র কথিত পূর্ণ আঙ্গিকের মাধ্যমে পরিবেশনের প্রসঙ্গই বেশী। সে উদ্দেশ্যে রচিত পদ সেই সুপ্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতেও আছে যা যথার্থ সুললিত সঙ্গীতরূপে সুপ্রাচীন কালেও ব্যবহৃত হয়েছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদ, বিল্বমঙ্গলের স্তুতি-গীতি-পদ তো সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত সঙ্গীতপদ-ই বটে। পালি-প্রাকৃতেও অনুরূপ পদ আছে এবং ছিল। অবহট্‌ঠে রচিত পদগুলিও সুললিত সঙ্গীতের উপযোগী। আর বাংলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণব কবিদের পদ বা শাক্তপদ সঙ্গীতের ধারায় একটি শাশ্বত নিয়মের অনুসরণ করে চলছে যা রাগ-রাগিনী আখ্যায় প্রচলিত। সুপ্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত চলমান– ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী এবং মেঘমল্লার (হনুমান এবং ভরতমুনির মতে), আর, ভৈরব, বসন্ত, পঞ্চম, নটনারায়ণ, শ্রী এবং মেঘমল্লার (কল্লিনাথ এবং সোমেশ্বরের মতে)-রাগের উদ্ভবও সেই সুপ্রাচীন কালেই। দু চারটি রাগ বা রাগিণীর নামে পার্থক্য থাকলেও 'ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী' বলে যে প্রবাদ-বাক্য আমাদের জানা, তা প্রায় যথার্থ। দামোদরকৃত সঙ্গীতদর্পণ বা সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থে পূর্বাহ্নে ১৫টি রাগিনী (বিভাষা-ললিতা-কামোদা-পঠমঞ্জুরী-রামকীরী-রামকেলী বেলোয়ারী-গুর্জরী-দেশকারী-সুভগা-পঞ্চমী-গড়া তুড়ী-ভৈরবী-কৌমারী), মধ্যাহ্নকালে ৭টি রাগিণী (বরাড়ী-মায়ূরী-কোড়া-বৈরাগী-ধানসী-বেলাবলী-মোরহাটী), সায়ংকালে ১৪টি রাগিণী (গান্ধারী-দীপিকা-কল্যাণী-পুরবী-কানড়া-শাবরী-গৌরী-কেদারা-পাহিড়া

মায়ূরী(?)-মালশী-নাটী-ভূপালী-সিন্ধুড়া) গেয় বলে উল্লেখ আছে। রাগ ৬টির গান-করার সময় নিরূপিত হয়েছে প্রদোষ, অপরাহ্ণ এবং রাত্র। রাত্র ১০ দণ্ডের (৪ ঘণ্টা) পর যে কোন রাগ বা রাগিণী গীত হতে পারে বলে নির্দেশও আছে আর, বর্ষাকালে যে কোন সময় মেঘমল্লার গীত হতে পারে নির্দেশিত আছে। সংক্ষিপ্ত এ কয়টি পংক্তির মাধ্যমেই লক্ষ্য করা যায় যে আমরা এখনও এ বিষয়ে কখনও শুদ্ধভাবে কখনও মিশ্রভাবে প্রাচীন সঙ্গীততন্ত্রই অনুসরণ করি যেহেতু, আরোহ-অবরোহে, বাদী-সংবাদীতে, আস্থায়ী-অন্তরায় এবং মুর্চ্ছনায় কোন হেরফের এখন পর্যন্তও হয় নি। সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রায় শতখানেক প্রাচীন গ্রন্থের নাম করা যায়। সুর সাধনে যে 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা' প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয় তাও প্রাচীন। ষড়্‌জ বা (বা সড়্‌জ)—ঋষভ-গান্ধার মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত নিখাদ (বা নিষাদ) স্বরগ্রাম নামে উল্লিখিত সপ্তসুরই বটে।

নৃত্য সম্বন্ধেও প্রাচীন পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে আছে। তাণ্ডব এবং লাস্যরূপে স্থূলত বিভক্ত দ্বিবিধ নৃত্যের মধ্যে তাণ্ডবের ভেদ দু'টি -পেবলি এবং বহুরূপ। আর, লাস্যেরও ছুরিত এবং যৌবত বা মধুর নামে দু'টি প্রকার নিরূপিত হয়েছে। প্রাচীন এই 'ছুরিত'ই মহাকবি কালিদাসের কালেই 'ছলিত' হয়েছিল। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে মালবিকার নৃত্যকে ছলিতক বলা হয়েছে। ইহার নিয়ম-কানুন আলোচনা করলে পরিষ্কার নৃত্য কলার তৎকালীন চিন্তাধারা প্রশংসাই পাবে; তাল সম্বন্ধেও সঠিক বোল নিরূপণমূলক তালযন্ত্রে রূপায়ণের দীর্ঘ পদ্ধতি আছে। এ সম্বন্ধে শিক্ষণীয় গ্রন্থরাজি সেই সুপ্রাচীন কালথেকেই এতদ্দেশে অনুশীলিত হয়ে আসছে। উল্লিখিত সঙ্গীতদর্পণে যে প্রচলন-স্থানের একটি তালিকা পরিবেশিত হয়েছে তার মধ্যেও 'বঙ্গ' নাম লক্ষণীয়। তালিকাটি এই—

> অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-তেলঙ্গ-ভূলিঙ্গ-হাবঙ্গ-সুবঙ্গ-যুপলঙ্গ-খেলঙ্গ-সৌবীর-কীর-কাশ্মীর-নাভীর-নাহীর-সিন্ধু-জালন্ধর-মগ-মগধ-নিষধ-মলয়-হীহয়-গজাহ্বয়-মালব-জালব-মরু-মূরু চোল-উৎকল-কুন্তল-সিংহল-হবিকেল-কেরল—কোশল-মল্লিবাল-মল্ল-ভল্ল-সৌবিদল্ল-বাত-কিঞ্জাত-গুজরাত-গুর্জর-কালঞ্জর-গৌড়-দ্রবিড়-ঔড্রা সর্বেদী-কাঞ্চী-পাঞ্চাল-সৌরাষ্ট্র-শবর-লৌহাবর-খশ-কীকশ-বকপ-কামরূপ-হরিগর্ভ-বিদর্ভ-দুর্গট-বাট-কীকট-দেবেঙ্গন টঙ্গন-নাট-ভোট-কবাট-করহাট-কর্ণাট-কুন্তিক-আবন্তিক-কনকারজ-কান্য-কুব্জ-ভোজ-কাম্বোজ-তোজ-তুখার-বিহার-বল্লীহার-রাজগেহ-বিদেহ-বাহ্লীক-চঞ্চরীক-ত্রিগর্ত্ত-আনর্ত্ত প্রভৃতি দেশে রাগ-রাগিণী প্রচলিত আছে।

সংস্কৃত-প্রাকৃতাদি সাহিত্যের অনুশীলনের মধ্যদিয়ে ভৌগোলিক এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান যথেষ্ট সম্প্রসারিতও হতে পারে। সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারায় এ বিষয়ে অনুশীলন ব্যাপক ক্ষেত্রেই হওয়া সঙ্গত।

সে প্রয়োজনেও, অসমর্থিত বা অতিরিক্ত পুরাণ বলে কতিপয় পুরাণ আছে যেগুলো সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা হয় নি। অধ্যাত্মভাগবত, একাম্রপুরাণ, কেদারকল্প, কালাগ্নি, জৈমিনীভাগবত, দেবীভাগবত, ধর্মপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, নীলমতপুরাণ, পরানন্দপুরাণ, বিখ্যাদপুরাণ, মহাভাগবতপুরাণ, দেবীপুরাণ, বাশিষ্ঠোপপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ আখ্যায় প্রচারিত হয়ে আছে। অনেকেই খবর রাখে না যে ওগুলো আর্যধারার প্রকৃত পুরাণ নহে। পরে উল্লিখিত বল্লাল সেনদেবের 'দানসাগর' প্রসঙ্গে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার অনেক সন্ধানের দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষায় এগুলো বিবেচ্য। 'সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' বিষয়ক আলোচনায় এগুলো স্থানপেতে পারে বটে কিন্তু উল্লিখিত ধর্মীয় প্রধান অপ্রধান বা প্রাথমিক পরবর্তী ধারা ধরেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃত পুরাণের পংক্তিতে তাই এগুলো দেয়া যায় নি।

সংহিতার শ্রেণীতেও কপিলসংহিতা, গর্গসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা, বশিষ্ঠসংহিতা, বামদেবসংহিতা, সৌভরিসংহিতা প্রভৃতি অসমর্থিত সংহিতাই বটে। তবে, এগুলো সংস্কৃত সাহিত্যের অঙ্গ। সাহিত্য যদিও পুঁথি-পুস্তকের বাইরেও থাকতে পারে যেমন, শিলালেখ তাম্রপট, মুদ্রা প্রভৃতির আকারে প্রাপ্ত প্রাচীন অগণিত লেখ-মধ্যে লক্ষ্য করার যায় তথাপি, প্রাচীন গ্রন্থের ধারাটিই মাত্র এখানে আলোচিত। এটাই প্রাচীন সংস্কৃতির উপস্থাপনে প্রধান।

আমাদের ভাষা বাংলা যার সর্বাধিক নির্ভর সংস্কৃত ভাষার উপর। প্রাকৃত ভাষা বহুবিধ নামে-ভেদে সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি অতিপুরাতন কালথেকে চলে এসে বাংলা ভাষার উৎপত্তির এবং সর্বজননী প্রসারের চাপে এদেশে একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে। এমনটা যে হবে বা হতে পারে তা কাব্যমীমাংসাকার রাজশেখর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বা তারচেয়েও আগে বলেছিলেন তাঁর কাব্যমীমাংসায়। তিনি লিখেছেন[১] —

'বারানসী হতে পূবের দিকের মগধ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী সংস্কৃত ভাষার পড়াশুনায় বেশ দক্ষ কিন্তু প্রাকৃত ভাষার প্রতি তাঁদের কুণ্ঠা প্রকট। এ সম্বন্ধে আমি আপনাকে জানাতে চাই—রাজন, নিজেদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও একান্ত ইচ্ছা করেই গৌড়ীয়গণ প্রাকৃতভাষা বর্জন করবে এবং সে অঞ্চলে নতুন ভাষার সৃষ্টি হবে।'

১. পঠন্তি সংস্কৃতং সুষ্ঠু কুণ্ঠা প্রাকৃতবাচি চ। বারানসীতঃ পূর্বেণ যে কেচিন্মগধাদয়ঃ ॥
রাজন্ বিজ্ঞাপয়ামি ত্বাং স্বাধিকারজিহাসয়া। গৌরস্ত্যজতু বা গাথামন্যা বাস্তু সরস্বতী ॥

আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ইংরেজ-জার্মান-ফরাসী-ইটালীয়-আমেরিকান প্রভৃতি বহু বিদ্বৎসমাজ প্রচুর অনুশীলন করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য যাই থাক, গবেষণার লক্ষ্য যা-ই হোক, পদ্ধতিগত বিশ্লেষণে তাঁরাই পুরোধা। তাঁদের পরিচায়িত পথে এ উপমহাদেশেরও অনেকে প্রাচীন গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে ইতিহাসের পরিধির সম্প্রসারণে অনেকটা কৃতকার্যও হয়েছেন এবং হচ্ছেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য অনুসরণীয় পন্থা সম্বন্ধে ডঃ গুস্তব অবার্ট লিখেছেন—

> "Owing to the meagreness and often to the untrustworthiness of the historical material, an Indian historian must be continually on the look-out for new tracks in which to pursue his researches The task of a scientific historian is difficult in itself, but it is made still more so, if a scholar is anxious to make original researches and strike-out for himself a new path in Indian history, as, in addition to other qualifications, he must be a linguist possessing some Knowledge of the language of the people into whose past he is inquiring."১

এ অনুসারে, সংস্কৃত প্রাচীন সাহিত্য অনুশীলন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য, যদি অতীত সংস্কৃতি বিষয়েই শুধু নয়, আধুনিক ইতিহাসের মধ্যে প্রাপ্য উত্থান-পতন বিষয়ে এবং বর্তমান ভৌগোলিক বিষয়ের প্রাচীন পরিচিতি বিষয়েও আমরা কিছু জানতে চাই। সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক পরিসরে ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে সর্বাধিক। পরবর্তী গুরুত্বের ধারক-বাহক হচ্ছে প্রাকৃত-পালি, তার পরে অবহট্‌ঠের স্থান। এ সম্বন্ধে ডঃ 'বুলার' এঁর প্রচেষ্টার বিষয় সি. এইচ. টনি (C H. Tawney) যা লিখেছেন তা অবশ্য জ্ঞাতব্য—

> "The Prabandhacintamani [of Merutunga Acarya] belongs to a class of compositions, the existence of which does, to certain extent, blunt the edge of the reproach frequently directed against sanskrit literature, that with the single exception of the Rajatarangini, there is to be found in it no work meriting the title of history. To remove this reproach was the lifelong aspiration of the late Hofrath Professor Buhler. Professor Jolly, in the interesting obituary of Buhler, which he wrote for the grundriss der Indo-Arischen philologic, quotes from a letter of Buhler's addressed to

১. The original Inhabitants of India. p. 2.

Noldeke in 1877, "You are a little behind the age with your notion that the Indians no historical literature. In the last 20 years, five fairly voluminous works have been discovered, emanating from authors contemnorary with the events which they describe. Four of them I have discovered myself, viz, Vikramankadevacarita, Gaudavaho, Prthvirajadigvijaya and Kirtikaumudi. I am on the track of more than a dogen more It is owing to Professor Buhler's exertions that so many of these chronicles, historical poems and historical romances have been adited. It was his suggestion that I undertook the present translation, and it will be evedent to any one, who takes the trouble to read my noots, that, without his assistance and encouragement, it would never have been able to "pass the ferry backward into light."২

1. It appear from the proceedings of the Asiatic Society of Bengal, for March, 1900, p. 70 ahd ff., that Mahamahopadhyaya Haraprasad Sarti, M·A. has found a Ms. named Ramapalacarita, by Sandhyakara Nandi, giving an account of Ramapala, king of Gauda, who succeecded his father, Vigrahapala in 1080."২

প্রাচীন পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের গুরুত্ব এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক। হাতে লিখে বই পুঁথি প্রণয়ন এবং অনুলিপির মাধ্যমে প্রসার-প্রচারের উপর নির্ভর করেই এতদঞ্চলের লেখা-পড়া, চির প্রাচীনকাল চলেছে। হুগলীর মিশনারী সাহেবরাই এদেশে-অর্থাৎ এ উপমহাদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র। তার পূর্ব পর্যন্ত একটানা কয়েক হাজার বছর ছিল কেবল সেই হাতে লেখার কাল। তাতে যত গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, অনুলিপি পরম্পরায় বিস্তারিত হয়েছে ছড়িয়েছে, যা থেকে বিপুল অংশ ইংলণ্ডে, জার্মানে, ফ্রান্সে, ইটালীতে, এমেরিকায় এবং আরও বহু দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়ার পরেও যা কিছু রয়ে গিয়েছে তার সবকিছু এখন পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নি। ন্যায়-দর্শন প্রভৃতির অসংখ্য আকড় টীকা ভাষ্যাদি সমেত হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি এখনও কেবল পাণ্ডুলিপি হয়েই কালের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে আছে। বাংলাদেশ-নেপাল-ভারতের মোট পাঁচ শতেরও বেশী প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে অধিকাংশ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি জমা

২. from the prefacc of his Eng. translation of prabandhacintamani by Merutunga Acarya. published by the Asialic sooiety. Calcutta. 1899.

আছে। অর্থের অভাবে, সময়ের অভাবে, যোগ্যতার অভাবে, উপযোগিতাবোধের অভাবে, সে সবের অনেক স্থানেই এখন পর্যন্ত বইগুলোর সংক্ষিপ্ততম পরিচিতি পর্যন্ত করা হয় নি। তবুও, দেশে-বিদেশে এমন অনেক Descriptive Catalogue তৈরী হয়েছে, যেগুলোর সাহায্যে বহু গ্রন্থের হদিশ করা চলে। The Library of India Office in London, and Asiatic Society of Bengal (Calcutta). Royal Asiatic Society, London and Bombay, Sanskrit College Library, Calcutta, Hindu University. Benaras, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত ক্যাটালগ" এর অনুসরণ করে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির তথ্য নির্ণয় করাও কঠিন ব্যাপার। খ্যাতনামা সংস্কৃতবিৎ জার্মান পণ্ডিত থিয়োডর অফ্রেক্ট এঁর Catalogus Catalogorum সংস্কৃত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বিষয়ে এক অসামান্য আকড় গ্রন্থ। তার ১ম, ২য় এবং ৩য় খণ্ডে বা অংশে নির্দেশিত ক্যাটালগগুলোর একটি সমন্বিত তালিকা ইংরেজী বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে অত্র ইতিবৃত্তের শেষে দিয়ে দেয়া হল। তাঁর সে গ্রন্থ New Catalogus Catalogorum নামে পরিবর্দ্ধিত আকারে ভাবতে পুনর্মুদিত হচ্ছে কিন্তু উভয়ই দুর্ভল। সেকারণে অনায়াসে তন্মধ্যেকার মূল ক্যাটালগগুলোর (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে নতুন যোজনা বাদে) সদ্ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া প্রয়োজনীয় মনে হয়। কারণ, উক্ত মূল গ্রন্থে গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের নাম নাগরী অক্ষরে, আর, পরিবর্দ্ধিত সংস্করণেও তা-ই। অথচ, এ ইতিবৃত্তে যেমন বাংলা অক্ষরে যাবতীয় গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে, তেমন তৎসৌকর্যার্থে এ তালিকা, হয়তো, বেশী কাজে লাগবে। 'সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালি' এর নাগরী বর্ণমালার সম্পর্ক মজ্জাগত। দক্ষিণী এবং উত্তরী লিপিভঙ্গীতে তাতে কিছু পার্থক্য থাকলেও তা অকিঞ্চিৎকর। বাংলা অক্ষরের সাহায্যে, কেবল দু'-চারটি বিশেষ ধ্বনির ক্ষেত্র বাদে, উহা সমানভাবে লেখা চলে এবং এদেশের নাগরী অক্ষর ও সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালির পঠন-পাঠনের যে দশা, তাতে বাংলা অক্ষরের সাহায্যে না লিখিত হলে চলেই না-মনে হয়।

গ্রন্থ প্রণয়ন করা, মনে হয়, যেন নৈতিক কর্তব্য। সহায়-সম্পদে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে অসাধারণ হয়েও এ নৈতিক দায়িত্ব অনেকেই পালন করেছেন। শাতবাহন, হর্ষবর্দ্ধন, ভোজরাজ, বল্লালসেন, ভূলোকমল্ল সোমেশ্বরদেব, হেমাদ্রি, চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর, বিশ্বনাথ, হলায়ুধ, বটুদাস প্রভৃতির গ্রন্থগুলো আমাদের পথনির্দেশক অবলম্বন। দূর বিদেশের প্রাচ্যভাষা-নিষ্ণাত সুধীবৃন্দের নাম অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়। তাঁরা আমাদের অতীত ঐতিহ্যের দিকে সারাবিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এঁদের সংখ্যাও এত বেশী যে অল্পে নাম করে তুলে ধরা চলে না। তাঁদের মহৎ অবদানই আমাদের প্রেরণার উৎস। এঁদের সকলের প্রতি সমান শ্রদ্ধা-আনুগত্য নিবেদন করে' বাঙালীর সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্রমধারার

পরিপ্রেক্ষায় 'সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' বিষয়ক এ ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়নের কাজে হাতদিয়েছিলাম কিন্তু প্রয়োজনীয় বই-পুথির অভাব যেমন সাবলীলতায় বাধা তেমন পারিপাশ্বিকতার মধ্যেও স্বতন্ত্র-স্বাধীন বিচরণে প্রতিবন্ধকতা অনুপেক্ষণীয়। এ অবস্থায় যাঁদের কাছথেকে উৎসাহ পেয়েছি, প্রেরণা পেয়েছি এবং যাঁরা অবলম্বন গ্রন্থ-সংগ্রহে সৌকর্য করেছেন তাঁদের মধ্যে – বরিশাল সুপ্রীম কোর্টের (হাইকোর্ট ডিঃ) এডভোকেট মঃ আবদুল মালেক মুন্সী, ডাঃ এস.সি. রায়, ফাদার আর্ত্তুরো স্পেজিয়ালে, মুঃ শাহ্‌জাহান মিয়া (আমার ভূতপূর্ব সহকর্মী) প্রমুখ বন্ধুবর্গ প্রধান। এঁরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। গ্রন্থ সংগ্রহ এবং শত শত গ্রন্থের ব্যবহারের সৌকর্য সাধন করে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান রতন, মধ্যম পুত্র শ্রীমান মাণিক, কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান হীরেণ, পুত্রপ্রতিম শ্রীমান নিখিল চাটার্জী, মধ্যম শ্যালক শ্রীমান রথীন চক্রবর্তী এবং জামাতা শ্রীমান তপন চাটার্জী আমার অনেক ক্লেশের লাঘব করেছে, এদেরে করি আশীর্বাদ-- সাংস্কৃতিক অবদানে এরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হোক। গ্রন্থ মুদ্রণপ্রকাশনা বর্তমানে বড়ই কঠিন হয়েছে।

আমার অনুরোধে বাংলা একাডেমী-কর্তৃপক্ষ মুদ্রণের ব্যবস্থা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রণয়নের পর প্রকাশনা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা যার অভাবে প্রণেতার ক্ষোভ না থেকে পারে না। উল্লিখিত মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া তাঁর 'পাণ্ডুলিপিপাঠসমীক্ষা' নামক গ্রন্থে, মৎপ্রণীত 'গ্রন্থবিবরণী' গুলোর একটি তালিকা শেষ অংশে প্রকাশ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাণ্ডুলিপি শাখায় গবেষণাসহকারীরূপে কাজ করার কালে (১৯৭৬-৮৪ খৃঃ) ওগুলো লিখেছি। ঐ 'গ্রন্থবিবরণী' নামেই বিবৃতিমূলক গ্রন্থপঞ্জীর মোট ১০ খণ্ড বই সেখানে মুদ্রণ প্রতীক্ষ রয়েছে। বাংলা-সংস্কৃত-হিন্দি-প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার প্রায় ৩০০০ গ্রন্থের বিবৃতিমূলক নিবন্ধন উক্ত খণ্ডগুলোয় বিদ্যমান। বাংলা লিপির ব্যবহারে বাংলা ভাষায় বিবৃতিমূলক গ্রন্থতালিকা কেবল বাংলাভাষার পাণ্ডুলিপির থাকলেও সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার পাণ্ডুলিপির অন্য কোথাও নেই। প্রণেতা আমি হলেও সে সবের মালিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তথাপি ভাবি— বার্দ্ধক্যে অবসরপ্রাপ্ত জীবনে তার প্রকাশ দেখে যেতে পারব কি ?

আমরা বঙ্গীয় সুপ্রাচীন জাতি। ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় আরণ্যকে প্রথমাধ্যায়ে যে— "প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ।"---পংক্তিটি আছে তার প্রসঙ্গ প্রভৃতির অনুশীলনে পরিষ্কার প্রতিপন্ন হয় যে—প্রথম আরণ্যকে উপস্থাপিত সনাতন আর্যাচারের পন্থা অতিক্রম করে বঙ্গীয়রা, মগধীয়রা (বগধ পদটি মগধ অর্থেই

প্রযুক্ত হওয়া সম্ভব। শাঙ্খ্যায়ন আরণ্যকের ৭ম অধ্যায়ের ১৩শ অনুচ্ছেদে পরিষ্কার 'মগধ' শব্দের প্রয়োগ আছে।[১]) এবং চেরপাদগণ বেড়িয়ে গিয়েছিল অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে। বৌধায়নের ধর্মসূত্রেও (১/২/১৩-১৪ সূ) বঙ্গের উল্লেখ আছে। সুতরাং অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির বিকাশ-বিবর্তন অন্তত, সেই আরণ্যকের কাল থেকে চলে এসেছে। খতিয়ে দেখতে গেলে অতীতের গভীরে অবতরণ করতে হবে। সংস্কৃতি বা শিক্ষা-দীক্ষা কেবল পড়াশুনার মাধ্যমে গড়ে ওঠেনা বটে কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা অনুধাবন করতেও অবলম্বনগুলো অবশ্যই যাচাই করতে হয়। নিরবলম্বন শিক্ষা হয় না, সংস্কৃতি হয় না। আত্ম-পরিচির মধ্যেই থাকে মৌলিক স্বরূপ। তার প্রকাশভঙ্গী নানাভাবে-ভাষায়-সজ্ঞায় হতে পারে এবং হয়ে চলছেও। গোড়ার তত্ত্ব জানা না থাকলে বর্তমান আকার-প্রকার সব তথ্য দিতে পারেনা। যেমন,—আমাদের পদবী এখন সমাজদার। এটার সাহায্যে না জানা যায় আমাদের শ্রেণীরূপ, না বুঝা যায় তার কোন মর্ম। একটি তৎসম বাংলা পদে ফারসী প্রত্যয় বা পদাংশ যোগ করে (সমাজ+দার) গঠিত এ পদবী যে ফার্সী-প্রভাবকালীন তা শব্দতত্ত্বের মধ্য দিয়েই বুঝা যায়। অথচ আমাদের সনাতন আর্য শ্রেণীগত পরিচিতি এই যে—সামবেদীয় কৌথুমী শাখার বাৎস্যগোত্রের রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আমরা। পূর্বে পদবী ছিল ভট্ট, যা বঙ্গদেশের বিশেষ প্রথামূলে হয়েছিল ভট্টাচার্য। আমা-অপেক্ষা উর্ধ্বতন ১১শ তম পুরুষ হরিদাসও ভট্টাচার্য পদবীতে প্রথিত ছিলেন। আরও পূর্বেকার পিপ্পলা গ্রামীয় (পিপ্পলাই গাঁঞি) পরিচিতি নিয়েই তিনি 'ফুল্লশ্রী' গ্রামে স্থিত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র হরিরাম এবং পৌত্র রামজয়, রাজানুগ্রহ জ্ঞাপক 'সমাজদার' খেতাব ব্যবহার করে 'চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না'-প্রবাদের প্রেক্ষিতে কোন অসুবিধা তো নয়-ই, বরং সামাজিক সুবিধা ভোগ করে-ছেন মেনে নিলেও এটা এক প্রকার বিবর্তন—অস্বীকার করার উপায় নেই। রাজনৈতিক পরিবর্তনের খাত বয়ে এরকম বহু বিবর্তন ঘটেছে সংস্কৃতিতেও, অনু-সন্ধান থাকলে, মূলসূত্রের সহিত সম্পর্ক ছিড়ে যায় না। কুলজী প্রসঙ্গ এ ইতিবৃত্তে আলোচনা করি নি। সেটা আর এক সাহিত্যের ধারা। তা সংস্কৃতে এবং বাংলায় দু'প্রকার পাওয়া যায়। 'ঘটক পঞ্জী' যদিও ঠিক কুলজী নহে তথাপি প্রায় সমপঙ্ক্তিভাজই-

১. "only they differ as to the meaning of the words—'vayamsi vangavaga-dhascerapadas'. Sayana renders them as birds, trees (vanagata vrksah), plants -
Possibly vanga-Magadhah may be read. See my sankhayana Aranyaka. p. 46, n. 4; Baudhayna Dharmasutra 1, 2, 13. and 14"—From Aitareya Aranyaka translation by A. B. Keith.

বটে। বাল্মীকির রামায়ণে আদিকাণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে অযোধ্যাপুরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে পাওয়া যায় যে--মাগধ শ্রেণীর একদল ব্রাহ্মণ কুলজী সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত ছিল। এ প্রথাও বৈদিক কালেরই। রাম-লক্ষ্মণাদির বিবাহ সভায় দশরথের এবং জনকের বংশাবলী আলোচনার কথাও আছে (রা. আ. কা, ৭০-৭১ অধ্যায়)। এ সমস্ত কারণে সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন শিক্ষণীয় গ্রন্থ তার কাল-চিহ্নিত উদ্বিতি-বিস্তৃতির আলোচনা করতে গিয়েই সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্‌ঠের কথা এসে পড়েছে।

অশোক-অনুশাসনের কালানুক্রমিক সম্পাদনা অনেক হয়েছে। পাঠোদ্ধার, অর্থ নির্ধারণমূলক আলোচনায় মতভেদ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। জেনারেল কানিংহাম যা বলেছেন (১৮৭৭ খৃঃ)[১] তার সাথে পুরাপুরি একমত হতে পারেন নি ফরাসি পণ্ডিত ই. সিনার্ট। তিনি যে সিদ্ধান্ত করেছেন (১৮৮১-১৮৮৮ খৃঃ)[২], তাও সর্বাংশে স্বীকৃত হয় নি চারুচন্দ্র বসু ও ললিত মোহন করের 'অশোক অনুশাসনে' (১৯১৫ খৃঃ) যদিও তাতে কানিংহামের গবেষণার পদাঙ্ক অনুসৃত হয়েছে। দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত অশোকানুশাসন (১৯২০ খৃঃ), গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা ও শ্যামসুন্দর দাসের যুগ্ম সম্পাদনায় হিন্দিতে 'অশোককী ধর্মলিপিয়াঁ' (১৯২৩ খৃঃ); এ.সি. উলনারের Asoka Text and glossary, ১৯২৪ খৃ: এবং ই. হুল্‌ৎস্ প্রণীত Inscriptions of Asoka—প্রভৃতি একটার পর আর একটা করে বেরিয়ে চলছে এবং গবেষণার কিঞ্চিৎ ফলবৈষম্যও প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষামূলক আলোচনাই ঐতিহাসিক নতুন বিষয়ে সম্ভাব্য। আমার দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃত তথ্যানুসন্ধিৎসায় যদি কোন প্রকার উপযোগী বিবেচিত হয়, তবে পরিশ্রম সার্থক বিবেচিত হবে। এ গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের প্রকাশনারও আশা রাখি। সে ব্যাপারে যে কোন সহৃদয় তথ্যানুসারী নির্দেশ কাম্য।

২৮/৯/১৯৮৬ খৃঃ — ইতি
ঝাউতলা ২য় গলি — বিনীত
বরিশাল, — গ্রন্থকার
বাংলাদেশ।

১. Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I
২. Les Inscription de piyadasi, by E. Senart.

বাংলাদেশ চিরন্তন ভৌগোলিক স্থান

"বাংলাদেশ" শব্দ দ্বারা এখন আমরা যে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রটির নির্দেশ করি, তা' রাজনৈতিকভাবে গঠিত একান্ত একটি আধুনিক রাষ্ট্র। ইংরেজশাসন-আমলের বাংলাদেশ আখ্যায় আখ্যায়িত ভূ-খণ্ডের এক অংশে, স্বাধীন সার্বভৌম হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে আমাদের এই বাংলাদেশ। রাজনৈতিক ব্যপদেশে বাংলাদেশ শব্দটি, উল্লিখিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রটির একক নাম—তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যপদেশ ছাড়া, ভৌগোলিক ব্যপদেশেও, এই শব্দটি-ই দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেই ব্যবহার, অবশ্যই ব্যাপক অর্থে—মানতে হবে। রাজনৈতিক ব্যবহারে এ শব্দটি যতটুকু ভূখণ্ডের নির্দেশে পর্যাপ্ত, ভৌগালিক ব্যবহারে সেটি অনেক ব্যাপক ভূখণ্ডকেই বুঝায়। ব্যবহার্য শব্দই ব্যবহারের মধ্যদিয়ে বিবর্তন ধারায় পড়ে বিবর্তিত হয়। 'বাংলাদেশ' শব্দের প্রথম অংশটি ('বাংলা') সেভাবে বিবর্তিত হয়েছে। বিবর্তিত হয়েও, সাধারণত, বিবর্তন-পূর্ব অর্থেই প্রযুক্ত হয় শব্দ-গুলো। 'বাংলা' শব্দটির বিবর্তন-পূর্ব রূপ হচ্ছে বঙ্গ। ওটিই বঙ্গাল, বাঙ্গাল, বাঙ্গলা, বাঙ্গালা—প্রভৃতি বিভিন্ন উচ্চারণের মধ্যদিয়ে বিবর্তিত হতে হতে বাঙ্গলা→ বাঙলা→বাংলা আকারে এসে পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং খণ্ডিত বাংলার যে অংশে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, রাষ্ট্রিক অর্থে 'বাংলাদেশ' শব্দে সেটিকে বুঝালেও, ভৌগোলিক অর্থে বুঝাবে অনেক ব্যাপক বঙ্গদেশকে। তা' ছাড়া, সাংস্কৃতিক বাংলা, হয়তো ভৌগোলিক বাংলার চেয়েও অনেক ব্যাপক পরিধি গ্রহণ করতে পারে। সংস্কৃতিটা ভৌগোলিক বাংলার বা বঙ্গের আওতাগত হয়েই স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল বলে, সাংস্কৃতিক বিকাশের আলোচনায় ভৌগোলিক অর্থেরই প্রাধান্য থাকা উচিত। ভৌগোলিক অর্থে—বঙ্গ, বঙ্গদেশ, বাঙ্গালাদেশ, বঙ্গাল, বঙ্গাল-দেশ, Bengala, Bengal এবং বাংলা—সব ক'টিই পর্যায় শব্দরূপে বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইতিহাসে এগুলোর যে কোন একটি শব্দই সেই ব্যাপক বাংলাদেশ বা সমগ্র বঙ্গদেশ অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। বিশেষত, সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তা' একান্তপক্ষেই সঙ্গত। যেহেতু, সংস্কৃতিটা গড়ে উঠেছিল সমগ্র বঙ্গদেশকে-ব্যাপ্ত করে।

বঙ্গ বা বঙ্গদেশ যথার্থই একটি সুপ্রাচীন ভূস্থলী।[১] কত প্রাচীন তা' নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় এবং আমাদের পরিচিত কোন সীমিতকালের পরিমাপে নির্ণয় করাও চলে না।

টোলে সংস্কৃত পড়ার কালে একটি শ্লোক শুনেছিলাম, যার অর্থ—"এখন যেখানে হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত, সেখানে অতিপ্রাচীনকালে, প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় সমুদ্র সংযোগী, মকরকুম্ভীরাদির আবাস বিশাল সমুদ্র বিরাজমান ছিল।"[২] শ্লোকটি কোথাকার, তার সঠিক হদিস দেয়া সম্ভব না। শুনেছি ওটি নাকি মহাভারতের শ্লোক। সে যা'-ই হোক না কেন, শ্লোকটি যে সত্যার্থক তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমানকালের বিজ্ঞানীদের অনেকে হিমালয়ের অনেক তুঙ্গশিখরেও প্রস্তরীভূত সমুদ্রতলজাত শৈবাল প্রভৃতি দেখে যথার্থই বিশ্বাস করেছেন যে, হিমালয় পর্বতমালা সমুদ্রগর্ভথেকে উত্থিত হয়েছে। হিমালয়থেকে দক্ষিণাভিমুখী ভূ-ভাগ ক্রমাবনত। ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় উৎক্ষেপজনিত সে মহাভয়ঙ্কর ঘটনার হয়তো, এখনো পরোক্ষ সাক্ষ্য মিলে যায় লালমাটির তত্ত্বে, যে মাটি হিমালয়কে কেন্দ্র করে উত্তরে এবং দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত ক্রমনিম্ন হয়ে ঢালু হয়ে আছে। হিমালয়ের উত্থানকালেই, বোধ হয়, ভূগর্ভোত্থিত গলিত নানা ধাতব স্রোত দু'পাশে গড়িয়ে গিয়েছিল এবং কালে কালে তা অমন মাটিতে পরিণত হয়েছে। প্রবাদরূপে শ্রুত ওই শ্লোকের মূল্য যা-ই থাক না কেন, বঙ্গদেশের প্রাচীন অংশ থেকে হিমালয়-অবধি ভূভাগের ক্রমিকোচ্চ গঠন-বৈচিত্র্য হিমালয়ের সহিত যুগপৎ আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে কিনা—সে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

ভূ-গোলকের অভ্যন্তরস্থিত অতিমাত্রার তাপের ধীর বিকিরণমূলক চাপ-বৈষম্যের ফলে, ভূত্বকের আকুঞ্চন-প্রসারণ-জাত সেই দূর অতীতের ভূখণ্ডোৎপত্তির প্রতিভোত্থিত অস্পষ্ট ধারণার আলোকে, যে ভূস্থলীর উৎপত্তি-বিষয়ে সুপ্রাচীনত্ব বোধগম্য, ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের সহিত সাম্য স্থল-বৈশিষ্ট্য সহকারে লগ্নাবস্থা, যে ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করে। ভারতের সমগ্রভূভাগের সহিত ইহার ভূভাগও ঐক্য সূত্রেই চির আবদ্ধ থাকায় উৎপত্তিতেও নিসর্গের বা ভূ-প্রকৃতির সমপ্রাথমিকতা অস্বীকার করা যায় না। ফলে, হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টির সাথে যুগপৎ কেবল বঙ্গদেশেরই নয়, বরং গোটা ভারতবর্ষের সৃষ্টির যে আনুভূতিক পরিবেশন পাওয়া যায় একটি বিখ্যাত বাংলা গানে—

---

১. স্থলী = অকৃত্রিম ভূভাগ। 'কৃত্রিমাকৃত্রিময়োঃ স্থলং স্থলী'—অমরকোষ।

২. তত্রাসীজ্জলধিঃ কশ্চিৎ প্রাচ্য-প্রতীচ্যগো মহান্।
মকরকুম্ভীরাবাসো যত্রেদানীং হিমালয়ঃ ॥

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে,
উঠিল জননী ভারতবর্ষ।" ইত্যাদি,

তারসাথে ঐক্যমত্য পোষণ, হয়ে দাড়ায় অতি স্বাভাবিক। সুতরাং, বাংলাদেশ শব্দের প্রতিপাদ্য বঙ্গ বা বঙ্গদেশের ভূমি ওই হিমালয়ের মতই সুপ্রাচীন, পৃথিবী পৃষ্ঠের কায়সাংগঠনিক বিবর্তন-ধারায়, নৈসর্গিক প্রযত্ন-বিশেষের ফলে, ভারতবর্ষের সৃষ্টির সাথেই যুগপৎ সংগঠিত হয়েছিল। দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরের উত্তর কূলের, দক্ষিণদিকে ক্রমাপসরণের ফলে, কিছু কিছু উত্থিত চরাঞ্চল নবগঠিত হলেও, তদতিরিক্ত অংশ অবশ্যই সুপ্রাচীন। বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক বিকাশের আলোচ্য ধারায় সুপ্রাচীন ভূখণ্ডের সম্পর্কই সর্বাধিক গুরুত্ববহ। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ক্রমেই দক্ষিণদিকে সরে যাবে, জেগে ওঠবে চর, ভূভাগ, তার ফলে দেশের আয়তন বাড়বে, বাড়তি জনতার স্থান সমস্যাও সেভাবে অনেকটা মিটে যাবে। তাই বলে ওসব বাড়তি অঞ্চল কোন আলাদা ভূস্থলী নয়। সেই সুপ্রাচীন বঙ্গভূমিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ছোট চাড়া গাছটাই ক্রমে শাখা-প্রশাখাব বিস্তার করে মহামহীরুহে পরিণত হয়। যতই শাখা-প্রশাখা বাড়ুক না কেন, তা' সেই মূলবৃক্ষটির-ই অবয়ব—শরীরাংশ। এখানেও সমতল ভূখণ্ডেব বৃদ্ধি কেবল মূল সেই সুপ্রাচীন বঙ্গভূস্থলীব, যা একদা হিমালয় পর্বতেব সাথে, গোটা ভারতবর্ষের ভূস্থলীর সাথে (অবশ্য, যদি বিন্ধ্য সাতপুরা আড়াবলী পর্বতমালা হিমালয়ের চেয়ে আগে উত্থিত না হয়ে থাকে) যুগপৎ বা একক্ষণেই আবির্ভূত অবিচ্ছেদ্য অংশই বটে।

দক্ষিণের রত্নাকব বা সাগর, যাকে পববর্তীকালে ভৌগোলিক বিশেষ সংজ্ঞার আওতাগত করে উপসাগব—বঙ্গোপসাগর বলা হয়, তা' বাস্তবে পরম করুণাময় বিশ্ব-স্রষ্টার অসামান্য আশীর্বাদস্বরূপ। কেবল অবস্থান দ্বাবা বিশ্বের দূর-দূরান্তের সাথে জলপথের সম্পর্কই রক্ষা করে না, কেবল মৎস্যাদি সম্পদ, বা অসংখ্য উপজাত-দ্রব্যের যোগান দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়তাই করে না, স্থলগঠনের মাধ্যমে দেশের আয়তন বর্দ্ধনেবও দায়-দায়িত্ব বহন করে। তা' কারোর চোখে পড়ুক বা না পড়ুক প্রতিনিয়ত সে কাজটি করে চলছে ঐ রত্নাকর সমুদ্র বঙ্গোপসাগর।

বঙ্গ বা বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং আয়তন-জ্ঞাপক সীমানা সম্বন্ধেও প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে কিছু কিছু খবর মেলে। তবে, আধুনিক কালের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ে, যেভাবে অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশের ব্যবহারে, যথাক্রমে, উত্তর-দক্ষিণ সীমানা এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম সীমানা, নিখুত অঙ্কিত রেখার সাহায্যেও ব্যক্ত করার প্রচলন হয়েছে, ততটা নিখুত সীমানা, প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে দেখান যাবে না। ভিন্ন

উদ্দেশ্যে প্রণীত গ্রন্থের পরিবেশনও ভিন্ন ধর্মীই হবে। তবে, কোথায় বা ভূপৃষ্ঠের কোন্‌খানে বঙ্গ বা বঙ্গদেশ রয়েছে, এবং সেটা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা জানা যাবে সেরকম শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে। 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে' পার্বতীকে ভৈরব বলেছেন --

"হে শিবে, দক্ষিণে রত্নাকর—সমুদ্র থেকে শুরু করে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূ-ভাগ, সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক 'বঙ্গদেশ', (আমা কর্তৃক) পূর্বেই তো কথিত হয়েছে।"[১]

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ--এই সীমানার অন্তরালের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগকে যে অতি প্রাচীন কাল থেকেই বঙ্গদেশ বলা হত তা এই ভৈরবের উক্তিতে পরিষ্কার প্রতিপন্ন হয়। ভৈরব নিজে কিন্তু দেশটির নামকরণ করেন নি, পূর্বাপর প্রচলিত নামটি দ্বারা দেশের নির্দেশ করে, উত্তর-দক্ষিণের সীমানা ধরে অবস্থানটার কথা উল্লেখ করেছেন এবং এই দেশটা যে সাধন-ভজনে সর্বরকম উপযুক্ত, সিদ্ধি-প্রদায়ক স্থান, তা-ই শুধু বলেছেন। আর, সীমানা নির্দেশের মাধ্যমে অনায়াসেই প্রতিপন্ন হয় যে, ওটা কোন প্রশাসনিক কাঠামোয় সীমায়িত স্থানের উল্লেখ নয়। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের চেয়ে, সম্ভবত আগেকার গ্রন্থ মহাভারতে ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন নদ-নদী, পর্বত-পাহাড় এবং জনপদ বা দেশের উল্লেখ রয়েছে বিস্তৃতভাবে। সেখানেও "অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ" প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়।[২] বিশেষত্ব এই যে,— 'পুণ্ড্র'[২] শব্দও পৃথক করে বলায় অবস্থাগত কিছু নতুন আভাস মেলে।

উল্লিখিত শক্তি সঙ্গমতন্ত্র এবং মহাভারতের চেয়ে অনেক আগেকার গ্রন্থ ঐতরেয় আরণ্যক। তাতেও অধিবাসিবিশেষিত বঙ্গ নাম পাওয়া যায়। সর্ব প্রাচীনতম গ্রন্থ—বেদের অংশ এই আরণ্যক। তার মধ্যে উল্লেখ থাকা, বিশেষতঃ, অধিবাসী সমেত নির্দেশ থাকা, দেশটির সুপ্রাচীনত্বের নিঃসংশয়তার সাক্ষাৎ শাস্ত্রিক প্রমাণ বা ভাষিক নিদর্শন। ঐতরেয় আরণ্যক এবং উল্লিখিত মহাভারতের উক্তিতে, বঙ্গদেশে তখনই, বিশেষ পরিচিতি প্রাপ্ত স্থায়ী জনবসতির উল্লেখই রয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকের -- "বঙ্গা বগধাশ্চের পাদাঃ" উক্তির মধ্যে বঙ্গ, বগধ (সম্ভবত 'মগধ'-শব্দের পূর্বরূপ) এবং চেরপাদ—শব্দ কয়টি অধিবাসীদের বুঝাতে বহু বচনান্ত

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব সিদ্ধিপ্রদায়কঃ ।।
অতঊর্দ্ধং জনপদান্নিবোধ গদতো মম ।। ৩৮ ।।
অঙ্গা বঙ্গাঃ কলিঙ্গাশ্চ যকৃল্লোমান এবচ।
মল্লাঃ সুদেষ্ণাঃ প্রহ্লাদা মাহিকাঃ শশিকাস্তথা ।। ৪৬
পুণ্ড্রা ভর্গা কিরাতাশ্চ সুদৃষ্টা যামুনাস্তথা।
শকা নিষাদা নিষধা স্তথৈবানর্ত্তনৈঋতাঃ ।।৫১, ভীষ্ম পর্ব, ৯ম অধ্যায়

করে ব্যবহৃত। জনমানবহীন স্থানকে জনপদ বলা চলে না। তাই, শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের কালে, মহাভারতের কালে, এমনকি ঐতরেয় আরণ্যকের কালেও বঙ্গদেশে যে স্থায়ী অধিবাসী গড়ে উঠেছিল তাতে কোন সংশয় নেই। ঐতরেয় আরণ্যক এবং মহাভারতের কালের মধ্যে অতিদীর্ঘ ব্যবধান। বঙ্গ, বগধ, এবং চেরপাদ শব্দত্রয়ের বহুবচনে যথাক্রমে বঙ্গাঃ, বগধাঃ, চেরপাদাঃ হয়ে থাকে (বঙ্গাঃ+বগধাঃ+চেরপাদাঃ= বঙ্গা-বগধাশ্চেরপাদাঃ), অধিবাসী অর্থে দেশবাচক বা স্থানবাচক শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন কলিঙ্গাঃ অর্থ কলিঙ্গের অধিবাসীবৃন্দ। সুতরাং, অনুমান করতে দোষ নেই যে, ঐতরেয় আরণ্যকের কালে বঙ্গশব্দে গোটা বঙ্গদেশ (যা শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে সীমা-নির্দেশ সহকারে উল্লিখিত) নির্দেশিত হত।

শতপথব্রাহ্মণ এবং ঐতরেয়ব্রাহ্মণ—অপর দু'খানা বৈদিক সাহিত্য। তারমধ্যেও যে ভাবে বঙ্গদেশীদেরে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে তৎকালীন অধিবাসীদের আচার-আচরণমূলক স্বরূপ ধরা পড়ে। উন্নত আর্য সংস্কৃতির মূল ধর্মগ্রন্থের উল্লিখিত দু'খানা ব্রাহ্মণে যে অসুর বা দস্যু বলে নির্দেশ করা হয়েছে তাতে, অন্তত, এটুকু অনুমান করা চলে যে, বঙ্গীয়রা দুর্ধর্ষ ছিল।

মহাভারতের অনুসরণে এটাও বলা চলে যে, মহাভারতের যুগে বঙ্গদেশবাসীরা ম্লেচ্ছও ছিল না, সম্ভবত, অনার্যও ছিল না। কেন না, এখানে[১] সারাটা ভারতবর্ষকে দুটি ভাগ করে তার যাবতীয় নদী, জনপদ এবং শৈলশ্রেণীর বর্ণনা রয়েছে। প্রথমটায়, সম্ভবত, আর্যাবর্তের মধ্যেকার, তারপরে দক্ষিণ ভারতের ঐ ত্রিবিধ-বিষয়ের ফিরিস্তি দেয়ার পরে, ম্লেচ্ছ শ্রেণীর আলাদা ফিরিস্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে। তন্মধ্যে বঙ্গদেশীয়দের উল্লেখ নেই। তা'ছাড়া, 'অসুর' পদদ্বারা তাঁদের তো অনার্য আখ্যায়ও ফেলা চলে না; কেন না, অসুরগণও তো আর্যাচারের একান্ত বহির্ভূত নয়। শুক্রাচার্য অসুরদের গুরু। তাঁর সহায়তায় অসুররাও তো কত কত যাগযজ্ঞ ক্রিয়া কাণ্ড করেছে বলে পুরাণ-উপ-পুরাণে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বৃত্রাসুরের ইন্দ্রধ্বংসার্থ যজ্ঞের কাহিনী তো সেই প্রায় বৈদিক কালেরই ঘটনা বলে' ফলাও করে লেখা রয়েছে[২]। তবে? তবে কি ঐতরেয়ারণ্যকের কালের পূর্বেই বঙ্গদেশীয়রা আর্যাচারী-দের তালিকায় ভুক্ত হয়েছিল? নাকি আর্যাচার আর বৈদিকাচারের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? হয়তো তা' নেই। মহাভারত বঙ্গীয়দিগকে অসুরও বলে নি। পক্ষান্তরে, আর্যশ্রেণীর মধ্যেই গ্রহণ করার নানা ঘটনা মহাভারতে বিধৃত আছে।

১. ভীষ্ম পর্বের ৯ম অধ্যায়।
২. 'যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাৎ'—পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও দীর্ঘ আলোচিত হয়েছে।

অন্যথা, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় বঙ্গরাজ সমুদ্রসেনের পুত্র চন্দ্রসেন, পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব এবং তাম্রলিপ্তের রাজাদের উপস্থিতি সম্ভবই ছিল না। আরও লক্ষ্য করার বিষয়—যে, মহাভারতের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা, কিংবা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময়কার এবং ভীমের দিগ্বিজয়কালের যাবতীয় রাজ-রাজরার প্রসঙ্গ রাজনৈতিকভাবে উপস্থাপিত। গোটা বাংলাদেশ সে সময়ে অনেকগুলো খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়ে পৃথক পৃথকভাবে শাসিত হতেছিল। সে অবস্থায় মূল ভৌগোলিক বঙ্গের আলোচনাই অপ্রাসঙ্গিক ছিল। তাই ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে স্বয়ম্বর সভায় বা যুদ্ধাভিযানে যাওয়ার উল্লেখ রয়েছে সে সব স্থলে।

মূল ভৌগোলিক অবস্থানে, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীর এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূলরূপ উত্তর-দক্ষিণ সীমানা শক্তিসঙ্গমতন্ত্রীয় বর্ণনাথেকে পাওয়া গেল বটে কিন্তু পূর্ব-পশ্চিম সীমানার নির্দ্ধারণ নেই কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ভূস্থলীর বাস্তব অবস্থার মধ্যদিয়েই। ভূস্থলীর সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষায় অনুধাবন করা চলে যে,--ভারতবর্ষের মূল ভূ-ভাগ হিমালয় থেকে দক্ষিণে যেমনটা একটানা বহুদূর সম্প্রসারিত, বঙ্গদেশের ভূমি সেরকম হওয়ার সুযোগ পায় নি। হিমালয় থেকে দক্ষিণে কিয়দ্দূর এগিয়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এসে শেষ হয়েছে। এভাবে সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পশ্চিমে গঙ্গা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের কোন শাখাদ্বারা বিভাজিত হয়ে পূর্ব-উল্লিখিত সুবিশাল ভূ-ভাগ, বাস্তবেও এক বিশাল স্থান এবং সেখানকার অধিবাসীরাও যে ঐতরেয় আরণ্যকের কালেও কোন রকম সুসভ্য জাতি হিসাবে গড়ে উঠেছিল---ধারণা করা যায়। উল্লিখিত অসুর বা দস্যু পদ, অসভ্যত্বের পরিচায়ক নয়। অন্তত, আর্যশাস্ত্রে তা' হয় না। যাস্কের নিরুক্তের অবিরুদ্ধ এবং অগ্নিপুরাণের নাম-লিঙ্গানুশাসন অধ্যায়ের একান্ত অনুসারী অমরকোষ গ্রন্থে অসুর পদের যে সকল প্রতিশব্দ বা পর্যায় শব্দ[১] রয়েছে তার মাধ্যমেও এ তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁরা আচারবান্, ক্রিয়ান্বিত ছিল, দেব-দ্বেষী ছিল, বেদদ্বেষী নয়।

পৃথিবীর অনেকগুলো দেশের আলোচনা আরম্ভ করার একটা প্রাথমিক ভিত্তি পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বেলায় তা' প্রায় নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। তদুপরি অনুধাবনে দেখা যায়-- দেশের মাটিও যেমন অত্যন্ত পুরাতন, অধিবাসীদের স্থায়ী বসবাসের বিষয়টাও অভাবনীয়রূপে পুরাতন বা প্রাগৈতিহাসিক। অথচ, সেই

১. অসুরা দৈত্য-দৈতেয়া দনুজেন্দ্রারিদানবাঃ।
শুক্রশিষ্যা দিতিসুতাঃ পূর্বদেবাঃ সুরদ্বিষঃ।।

অতিপুরাতন জনগণের বিষয় পর্যালোচনা করার মাল-মসলাও নেহাত-ই সীমিত। তথাপি তা' জানবার ব্যগ্রতা, বোঝবার উদগ্রবাসনা মানুষের মধ্যে যে নেই বা ছিল না, তা'নয়। মানুষ জানতে চেষ্টা করেছে—এমন সুজলা, সুফলা, সমতল প্রায় বঙ্গভূমিতে কে বা কাহারা এসেছিল সেই আদিকালে? কোন একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণীই এতবড় জায়গাটা জুড়ে ছিল বলে অনুমান করবার পক্ষেও যেমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই, পক্ষান্তরে, নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি-বলে বিভিন্ন আদিমানব গোষ্ঠীরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। আলোচ্য বিষয় তাই, এই ত্রিমুখী জটিলতার আবর্তে এদিক-সেদিক করে চলতে বাধ্য। সাংস্কৃতিক মূল রূপ, এবং তার ক্রমিক বিকাশ অবশ্য, পরিপার্শ্ব-প্রভাবিত হয়ে গড়ে ওঠে। যে কোন উপায়ে তাবৎ পরিপার্শ্বের কিনারা ধরতে পারলে আলোচ্য বিষয়ের বাস্তব রূপ পাওয়া যাবে—এই প্রয়োজনেই ভূস্থলী বা বঙ্গ-ভূ-পরিমণ্ডল, প্রাগৈতিহাসিক অধিবসতির কাল এবং অধিবাসীদের গোষ্ঠীগত স্বরূপের নির্দ্ধারণের কাঠামোয় ঐতিহাসিক রূপায়ণ, নিশ্চিতই একটি নিপুণ অনুশীলন সাপেক্ষ ব্যাপার।

আধুনিক কালের ঐতিহাসিকগণ মানুষের ইতিহাসটাকে টেনে-হেঁচড়ে খৃষ্টকালের একদম কাছাকাছি এনে দাঁড় করাতে যেন আদা-জল খেয়ে লেগে আছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় ডায়নোসারের সৃষ্টি এখন থেকে কুড়ি কোটি বছর আগে এবং তার সম্পূর্ণ অবলোপও এখন থেকে তের কোটি বছর আগে হয়ে গিয়েছে—অনুমান করতে গবেষকগণ কোন কুণ্ঠা বোধ করেন না। মানুষের সৃষ্টি এবং তার উত্থান-পতন নিয়ে যাঁরা ইতিহাস তৈরি করেন, তাঁরা যেন উল্লিখিত টানা-হেঁচড়া করবার পক্ষপাতী। অথচ, গবেষণীয় যাবতীয় তথ্যকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করা কি অনুচিত? যদি তা না হয় তবে, উল্লিখিত প্রবণতা যে কোন প্রকার যুক্তি-তর্কের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, তা বলাই সঙ্গত।[১] ডায়নোসার প্রত্নপ্রস্তর যুগের প্রাণী বলে স্বীকৃত। প্রত্নপ্রস্তর যুগেও মানুষ ছিল।

উল্লিখিত বৈদিক সাহিত্যত্রয় - ঐতরেয় আরণ্যক, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ এবং শতপথ-ব্রাহ্মণ, সাক্ষাত বেদেরই তো অংশ। তাতে যে বঙ্গদেশের উল্লেখ, বঙ্গদেশের

১. মানুষের সৃজনী শক্তির আদিমতা প্রভৃতি ধরেই তো যুগের বিভাগ। অন্যভাবেও বলা যায়—ডায়নোসার প্রস্তরযুগের প্রাণী। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামনোবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার গ্রন্থ—'জন্মান্তরবাদ, রহস্য ও রোমাঞ্চ'। তাতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া শহরের 'জোয় ভারতয়ে' এর কাহিনীর অনুসরণে বলা চলে যে,—ডায়নোসার যুগের ব্যাপ্তিকালের মধ্যেই, হয়তো, মনুষ্যকাল কিঞ্চিৎ, অন্তর্নিবিষ্ট।

অধিবাসীদের দৈশিক পরিচিতিমূলক অভিধার মাধ্যমে স্থিতিশীল গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের আভাস, এবং তাঁদের তৎকালীন জীবন-জীবিকা বা তেজ-বীর্য কিংবা আচার-আচারণ সম্বন্ধে কূট মন্তব্য, তা অবশ্যই তাঁদের সুপ্রাচীনত্বের প্রমাণ। মনুষ্য সৃষ্টি যে তারও বহু বহুকাল আগেই হয়েছিল, তা' মানতে কারো কোন মতভেদ থাকার কারণ নেই।

উল্লিখিত বৈদিক গ্রন্থত্রয় বাদেও বহুগ্রন্থে বঙ্গশব্দের সুপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বাল্মীকির রামায়ণে বঙ্গশব্দের উল্লেখ। রামায়ণ কতকাল আগে প্রণীত হয়েছিল তারও সঠিক নির্দ্ধারণ এবং তার সপক্ষে সঠিক প্রমাণ-প্রয়োগ খুব সহজে দেয়া যাবে না। তবে, যথাস্থানে ইহা প্রমাণ করা যাবে যে—রামায়ণও বৈদিক কালের ব্যাপ্তির মধ্যেই প্রণীত হয়েছিল। বৈদিক কালের ব্যাপ্তি কত শতাব্দী তা' যদি ধারণায় আসে তবে, রামায়ণের সৃষ্টি অনুধাবনে অসুবিধা হবে না।

মনুসংহিতাও অতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র। এ গ্রন্থ, বাল্মীকির রামায়ণের চেয়েও আগেকার এবং বৈদিক কালেরই সৃষ্টি। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ১৮, ৩০, ৩১, এবং ৩২ সংখ্যক অধ্যায় চারটিতে মনু-শ্লোকের উদ্ধৃতি রয়েছে।[১] মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৩/৪৪ সংখ্যক শ্লোকদ্বয় একটি চমৎকার খবর দিয়েছে—

"ধীরে ধীরে ক্রিয়ালোপ (অবশ্য কর্ত্তব্য বৈদিক আচার-আচরণের লোপ) হওয়ার ফলে, এবং ব্রাহ্মণদের দেখা না পাওয়ার কারণে, পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীনা (সম্ভবত ভোঁট চীনা), কিরাত, দরদ, খশ--আখ্যায়িত এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি, লৌকিক ব্যবহারে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল।[২*]

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে যে ১২টি ক্ষত্রিয় জাতির কথা বলা হয়েছে, তন্মধ্যে যে পৌণ্ড্রক শব্দ রয়েছে, তা' যদি বঙ্গদেশের অন্তর্গত পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধনের ক্ষত্রিয়দিগকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে, অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে

১. ভীমাচার্যকৃত 'ন্যায়কোষ' এর ২৪ পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২. শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ ৪৩। ('ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ'-পাঠান্তরও আছে)।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥ ৪৪।

* Royal Asiatic society of Bengal, Calcutta হতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মনুস্মৃতি'র মেধাতিথিকৃতটীকায়ও পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে—পুণ্ড্রকাদি শব্দ এখানে ক্ষত্রিয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে, যদিও সে সব সাধারণত, জনপদ বাচক।

মনুসংহিতার কালের চেয়েও অনেক পূর্বকালেই পুণ্ড্রবর্দ্ধনে ক্ষত্রিয়জাতি ছিল, যাঁদের ধীরে ধীরে ক্রিয়ালোপ হওয়ার ফলে লোকব্যবহারে শূদ্র-তুল্যতা এসে পড়েছিল। পরবর্তী আলোচনায় যথাস্থানে পাওয়া যাবে যে মনুসংহিতা বৈদিক কালের গ্রন্থ এবং বাল্মীকির রামায়ণের চেয়েও আগেকার, যেহেতু, রামায়ণে মনুসংহিতার উদ্ধৃতি রয়েছে। আগেথেকে যদি ওসব ক্ষত্রিয়রা ক্রিয়ান্বিত না থাকবে, তবে ক্রিয়ালোপ হয় কিভাবে? দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণদের দর্শন-ই বা তাঁরা না পায় কিভাবে? তবে কি এমন কোন অনাচারী কাণ্ড, ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছিল যার ফলে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা পুণ্ড্রবর্দ্ধন ছেড়ে গিয়েছিল? মনুসংহিতার এই মন্তব্য তো ঐতিহাসিক পটভূমিকায় করা হয়েছে। অথচ, ঐতিহাসিকরা সে তথ্যের উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ। যা' হোক্, মনুসংহিতাকে ইতিহাস কালের স্তরে দাড় করা গেলে অবশ্যই প্রতিভাত হবে যে, মনুসংহিতায় বিধৃত ওই লোক-ব্যবহারে সে সব ক্ষত্রিয়জাতি অতি প্রাচীন কালেই হীনমর্যাদ হয়েছিল। তবে, তা' আর্যায়ণের পরের ঘটনা—সন্দেহ নেই। অন্যথা, পুণ্ড্রকগণ ক্ষত্রিয় হয় কি প্রকারে?

যা' হোক্, রামায়ণ এবং মহাভারত সম্বন্ধে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখানে আলোচ্য বিষয়—প্রাচীন সংস্কৃতি। সে হিসাবে এ দুই প্রাচীন মহাকাব্য অবশ্য অবলম্বনীয়। সংস্কৃতি-বিষয়ের অসংখ্য তথ্য এ গ্রন্থদ্বয়তে প্রচুর। সূর্যবংশের আদর্শ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকে কেন্দ্র করে রামায়ণে' এবং চন্দ্রবংশের আদর্শ পুরুষ যুধিষ্ঠির ও যদুবংশের আদর্শ ব্যক্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে কেন্দ্র করে মহাভারতে অসংখ্য সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচিত হয়েছে। আধুনিক ধারণাসম্মত ইতিহাসের গ্রন্থ রামায়ণও না, মহাভারতও না, তা' সত্য কথা। কিন্তু ইতিহাসের তথ্য বা উপাদান কেবল ইতিহাস থেকেই নিতে হবে - এমন কি কোন যুক্তিগ্রাহ্য নিয়ম আছে? অনেক জীবনীগ্রন্থ ইতিহাসের তথ্য দেয়, কোন কোন নাট্যসাহিত্য, বা আখ্যায়িকা, কিংবা উপন্যাস প্রভৃতিও ইতিহাসের মাল-মসলার যোগান দেয়। গৌতম বুদ্ধের জীবনীর মধ্যে ললিত বিস্তরে এবং জাতকে ঐতিহাসিক তথ্য নেই? মালবিকাগ্নিমিত্রে শুঙ্গবংশীয় যুবরাজ অগ্নিমিত্রের চরিত্র-চিত্রণ পাওয়া যায় না? নাগানন্দ নাটকে গ্রন্থকার এবং সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার খবর দেখি না? এমন কি, শরচচন্দ্রের বাংলা উপন্যাসের মাধ্যমেও তৎকালীন হিন্দু-সমাজে কৌলিন্যমূলক কুসংস্কারের উপস্থাপন চোখে পড়ে না? তবে? তাই বলছি ঐতিহাসিক তথ্যের আকড় রামায়ণ এবং মহাভারত, এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস দাড় করাতে একান্ত পক্ষেই আলোচ্যগ্রন্থ। আলাদা-আলাদা পত্রের সমন্বয়ে হাতে লিখে গ্রন্থ বিস্তারের যুগে কোন গ্রন্থের মধ্যে ২/৪টা

শ্লোক হয়তো কোথাও প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না, তথাপি মনে রাখা দরকার যে,—তার মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে ছড়ান বহু আলোচিত সব গ্রন্থগুলোয় সে সব প্রক্ষেপ ঢোকতে পারে না। তা' ছাড়া মূল কাঠামোয় প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাই নেহাৎ কম। রামায়ণে তো প্রক্ষিপ্ত হওয়ার জায়গাই একান্ত সঙ্কীর্ণ, মহাভারতে তা' কুত্রাপি সম্ভব হলেও তা' দ্বারা গোটা গ্রন্থখানার স্বস্থান-ভ্রংশন একান্তই অযৌক্তিক নয় কি? তথাপি, ইতিহাসের মহাজনদের মধ্যেও বিভ্রান্তি দেখা যায়।

পণ্ডিতগণের মতে খ্রী: পূ: দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে মহাভারত বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।"—লিখেছেন ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার।[১] তাঁর মত ইতিহাসের আচার্যের এরকম লেখা থাকলে ইতিহাসের সত্যোদ্‌ঘাটনের আশা সুদূর পরাহতই, মনে হয়। "মহাভারত বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে"—কথাদ্বারা তিনি যে প্রচুর প্রক্ষিপ্ত-ঢোকবার ইঙ্গিত করেছেন, সে ইঙ্গিত-নির্দেশিত স্থলগুলো চিহ্নিত করতে কি কিছু সময়ক্ষেপ করা তাঁর উচিত ছিল না? পক্ষান্তরে, যে গ্রন্থে প্রক্ষেপ ঢোকবার কথা ব্যক্ত করেছেন সে গ্রন্থের প্রক্ষেপ-পূর্ব অংশ অর্থাৎ মূল অংশ কতকাল আগে প্রণীত হয়েছিল বলে তিনি মনে করতেন—সে সম্বন্ধেও একান্ত নিষ্ক্রিয়ই থেকেছেন। ফলে, এ জাতীয় কথার মাধ্যমে কতখানি সত্যের অস্বীকৃতি, এবং কতখানি অনৈতিহাসিক বিষয়ের অতিস্বীকৃতি যে তাঁর গ্রন্থ-মধ্যেই থেকে গেল—তা'ও একবার ভেবে দেখেন নি। বাস্তবে বক্তব্য এই যে—বেদব্যাসকে অস্বীকার করে, অথবা তাঁর ঐ অমর সাহিত্যথেকে তথ্য আহরণে বিরত থেকে এদেশের ইতিহাসে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। যে যুগের কথা আলোচনার বিষয়, তখনকার ঘটনা-পরম্পরা, আধুনিক ধারণা সম্মত কোন ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধও নেই বা থাকার কথাও না। ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ বিষয়, সে গ্রন্থের প্রসঙ্গে যেখানে যে আকারে ও প্রকারে বিধৃত রয়েছে, সেটুকু খুঁজে নিয়ে কাজে লাগানই একান্ত উচিত। মনে রাখা দরকার যে—সম্পূর্ণ বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ এবং মহাভারত, ভাষিক বা শাস্ত্রিক প্রত্ন বিশেষ। যথাস্থানে প্রতিপন্ন হবে যে, মহাভারতও প্রাগৈতিহাসিক গ্রন্থ এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরই সৃষ্টি।

•

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর এবং তার কাত্যায়নকৃত বার্তিক সূত্রের ভাষ্যকার পতঞ্জলি, নি:সংশয়ে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের লোক। তিনিও তাঁর মহাভাষ্যে

১. বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৭

কাত্যায়ন অন্তত খৃষ্টপূর্ব চতুর্থশতকের লোক। তিনিও অঙ্গাঃ, বঙ্গাঃ, সুহ্মাঃ, পুণ্ড্রাঃ,—শব্দগুলো দ্বারা দেশবিশেষিত (রাজনৈতিক) জাতির বা অধিবাসীর উল্লেখ অঙ্গ এবং বঙ্গ শব্দ দ্বারা উভয় দেশের উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত বার্তিককার করেছেন। এঁদেরচেয়ে আরও প্রাচীন শাস্ত্রকার কশ্যপ, রবির আধিপত্য বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য বহু দেশের বা স্থানের সহিত বঙ্গ এবং পুণ্ড্রের উল্লেখ করেছেন। কশ্যপের এই উল্লেখ বহু গুরুত্ব বহন করে। কশ্যপের ধারা ধরে প্রাচীন জ্যোতিঃ-শাস্ত্রকারগণের অনেকেই যেমন,—আর্যভট্ট, বরাহ, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, রোমক সিদ্ধান্তকার শ্রীষেণ, পুলিশসিদ্ধান্তকার – প্রভৃতি, রবির আধিপত্যাধীন বিষয়-গুলোর মধ্যে বঙ্গদেশের উল্লেখ করেছেন। দেশীয় অধিবাসীদিগকে বুঝাবার জন্য, অথবা ওতপ্রোত সম্বন্ধে জড়িত দেশীয় বিষয়গুলো বুঝাতে, কশ্যপের উক্তির মধ্যে বঙ্গ এবং পুণ্ড্র ছাড়াও, বর্দ্ধমানেরও পৃথক উল্লেখ লক্ষ্য করার বিষয়। বল্লাল সেনের 'অদ্ভুতসাগর' নামক জ্যোতিষের গ্রন্থেও রব্যদ্ভুতাবর্তের মধ্যে কশ্যপের সে বচন উদ্ধৃত হয়েছে। অথচ, বল্লাল সেন নিজেই তাঁর রাষ্ট্রকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। বল্লাল সেনের এই বিভাজন যে একান্ত পক্ষেই প্রশাসনিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্থান-কাল-বিশেষিত ইতিহাসের স্থলে প্রশাসনিক বিভাগও আলোচনায় স্থান পেতে পারে, তবে তা' ভৌগোলিক নির্দেশের বিষয়ে পড়ে না।

উল্লিখিত অসংখ্য প্রাচীন পুথি-পুস্তকের উক্তির মাধ্যমে নিঃসংসয়ে ধারণা করা চলে যে বঙ্গ বা বঙ্গদেশ ভৌগোলিক অর্থে ব্যাপক শব্দ এবং তার প্রতিপাদ্য ভূস্থলী অতিপ্রাচীন জনবসতির স্থান। সেখানকার অধিবাসীও বৈদিকসাহিত্যের কালেই পৃথক সত্তায় সত্তাবান ছিল। বঙ্গ, বঙ্গদেশ, বঙ্গাল, বঙ্গালদেশ,বাঙ্গালা, বাঙ্গালদেশ, বাঙ্গলা, বাঙলাদেশ, বাঙলা, বাংলা –একই শব্দের ক্রমবিবর্তিত রূপমাত্র, প্রায়শ-ই পর্যায় শব্দ রূপে ব্যবহৃত।

রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন সার্বভৌম আমাদের 'বাংলাদেশ' সৃষ্ট হওয়ার অনেক আগেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি," গানে তৎকালীন সমগ্র বঙ্গদেশ অর্থেই 'বাংলা' নামটির ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক দিক থেকে তা' এখন স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের অভিধা বা সংজ্ঞা অথাৎ নাম।

পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সুহ্ম, রাঢ়, তাম্রলিপ্তি, সমতট, হরিকেল বা হরিকেলীয় কখনো বঙ্গদেশের ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয়। এ শব্দগুলো দ্বারা বঙ্গদেশের ভূপরিমণ্ডলের মধ্যবর্তী অংশ-রাজ্য প্রতিপন্ন হত। গৌড় শব্দে কখনো সমগ্র দেশকেই বুঝান

হয়েছে। পঞ্চগৌড় শব্দের মধ্যে যে গৌড় শব্দটি তা' অবশ্য, বৃহত্তর গৌড় সাম্রাজ্যের জ্ঞাপক। সারস্বতদেশ (পাঞ্জাব), কান্যকুব্জ, মিথিলা এবং উৎকল —অপর গৌড় চতুষ্টয়। পঞ্চ গৌড়ের নাম এবং প্রসঙ্গ স্কন্দ পুরাণেও আছে।*

গৌড় রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে পদ্ম পুরাণের পাতাল খণ্ডের ৭৫তম অধ্যায়ের একটি উক্তি বেশ সন্দেহের সৃষ্টি করে। উক্তিটি এই —

"কাবেরী নদীর তটভূমি দ্বারা বিশোভিত পরম রমণীয় গৌড়দেশে সাত্ত্বিক নামক বাড়ব কঠোর তপস্যা করেছিলেন।"[১]

কাবেরী নদী তো দক্ষিণ ভারতে 'মায়াভরম,' এর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে এখন প্রবাহিত। তা হলে ? অতদূর পর্যন্ত কখনও গৌড়রাজ্যের বিস্তার তো অন্য কোথাও ইতিহাসে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, অন্য কোন কাবেরী নদী, বা অন্য কোন গৌড় রাজ্যেরও হদিস পাওয়া তো দুষ্কর। কাবেরী নদীর অতদূরে সরে যাওয়া ভাবাও তো কঠিন। ইহার গ্রন্থিমোচন ইতিহাসের পক্ষে সত্যিই বড় সমস্যা হয়ে আছে। পুরাণের উক্তি তাই অনৈতিহাসিক বলে যত তাড়াতাড়ি নাসিকা-কুঞ্চন সম্ভব, ততটা তাড়াতাড়ি শিলালেখ-তাম্রপট্ট বা তাম্রশাসন, কিংবা প্রাচীন মুদ্রার বেলায় খাটে না, খাটান উচিত না। আছে শ্রীচন্দ্রের তাম্রপট্টেও-। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের 'পৃথ্বী' বিজয়াভিযানের প্রসঙ্গে—[২]

"ভুক্ত্বা চঙ্গদধীনি (?) কৃষ্ণশিখরিগ্রামেষু কৌতূহলাৎ
বিন্ধ্যস্যাপ্যধিমেখলাবনতলং পীত্বা সরুঙ্গানদীঃ।
জেতুর্যস্য বলৈ র্ব্যগাহি মলয়ঃ শৃঙ্গোপলপ্রস্খলৎ-
কাবেরীজলবেণিজর্জ্জররবব্যামিশ্রকোলাহলৈঃ ॥"

এই মনোরমশ্লোকটি যে কাবেরী নদীর তটভূমি পর্যন্ত ত্রৈলোক্যচন্দ্রের বলের (সৈন্যের) উপস্থিতির সূচনা করে, তা' হেলায় উড়িয়ে দেয়া বোধ হয়, উচিত নহে। প্রশ্নপদক চিহ্ন পর্যন্ত অংশটুকুর প্রকৃত পাঠ উদ্ধার্য বটে।

* সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিল কৌৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ ॥

১. গৌড়দেশে মহারম্যে কাবেরীতীরভূষিতে।
বাড়বঃ সাত্ত্বিকো নাম্না চচার পরমং তপঃ ॥

২, পশ্চিম ভাগ তাম্রশাসন Bhattasali commemoration volume, Dhaka university.

সাংস্কৃতিক বিকাশের আলোচনা করতে গেলেই সুপ্রাচীন অবস্থা জানতে হয়। সংস্কৃতি শব্দটা দ্বারা প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতির বা অগ্রগামিতার সামগ্রিক বিষয় ব্যক্ত হয়। শিক্ষা এ ক্ষেত্রে বিদ্যা শিক্ষাই গ্রাহ্য। কোন না কোন ভাষার তাবৎ অঙ্গের মধ্যে অপরিহার্য অবলম্বন গ্রহণ করে ক্রমিক বিকাশের প্রয়াস এ গ্রন্থে মুখ্য তবে, প্রাগৈতিহাসিক কালথেকে বর্তমানের অভিমুখে শিক্ষার বাহনরূপে যে সব ভাষা এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের বই-পুঁথি আলোচ্য তা' একত্রে উপস্থাপন চলে না। কারণ, এমন অনেক বিষয় আছে যা বর্তমান কালে অপ্রায়িক হয়ে পড়েছে। সুপ্রাচীন কালে শিক্ষার অঙ্গনে যে সকল বই-পত্র প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা যায়— তার নিখুঁত আনুক্রমিক উপস্থাপন কাম্য হলেও সম্ভব অসম্ভবের প্রেক্ষিতে ন্যূনতা-দ্বিরুক্তি-ক্ষেত্র-বৈষম্য প্রভৃতি বিবেচ্য। বিদ্যাশিক্ষা ছাড়াও অনেক প্রকার শিক্ষা আছে এবং ছিলও, যার তৎকালীন অবস্থাও তৎকালীন বইপত্রের মধ্য থেকে আহরণ করাই কর্তব্য। তাই সংস্কৃতির ব্যাপক বিষয়াবলীর কেবল সূচনামাত্রও অপূর্ণ থেকে যেতে পারে, যার জন্য কালানুক্রমিক আলোচনায় অবতরণ একান্ত অপরিহার্য। সে উদ্দেশ্যে মৌলিক সূত্র উদ্ঘাটন বক্ষ্যমান বিষয়ত্রয়ের মাধ্যমে করা দরকার। উল্লিখিত সংজ্ঞা বা নাম দ্বারা সূচিত স্থানটির সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয় ক্রমিক গ্রাহ্য।

আর্যদের প্রভাবের পূর্বকালেও বঙ্গের সেই আদিম আধিবাসীদের যে উন্নত মানের সভ্যতা, সংস্কৃতি ছিল. তা এখন প্রায় সংশয়াতীত হয়ে গিয়েছে। কোন নিদর্শন না পাওয়া পর্যন্ত যে ধারণা থাকে নিষ্প্রমাণ—অহেতুক অনুমান মাত্র। নিদর্শন মিলে গেলেই তা' হয় যথার্থ অনুমান—সঙ্গত হৈতুক ধারণা। নিদর্শনগুলোর সাথে গবেষকদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পরে, সেগুলোর সম্ভাব্য ব্যবহার-অনুধাবনের মধ্য দিয়ে, নির্মাতাদের-ব্যবহারকারীদের জীবন চর্যার অনুমান করা সম্ভব হয়—ইহাই রীতি। বঙ্গদেশেও সেরকম নিদর্শন প্রত্ন সামগ্রীর সন্ধান মিলেছে—বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত "পাণ্ডু রাজার ঢিবি" বলে পরিচিত সুপ্রাচীন স্থান খনন করে। সেখানে যে সব জিনিষ-পত্র পাওয়া গিয়েছে তার মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে যে, সেগুলো বাঙালীর আর্যায়ণের আগেকার সামগ্রী (৭) প্রত্ন গবেষণায় কাল-নির্দ্ধারণী আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেই ওরকম ধারণায় নাকি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ওই প্রশংসার্হ উদ্যোগের ফলে, ইতিমধ্যেই—অতীত দিনের ইতিহাস-গবেষকদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে,—আদিম বঙ্গদেশীয়-গণের স্থায়ীভাবে বসবাস, গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবন যাপন, উন্নত কারিগরি,

স্থাপত্য শিল্প-- প্রভৃতি ছিল। প্রত্নসামগ্রীগুলোকে খৃষ্টপূর্ব অন্তত দেড় হাজার বছর আগেকার বলে, মোটামুটি ধারণাও করা হয়েছে।[১]

বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয়া চলে যে, আবিষ্কৃত প্রত্নসামগ্রীর মাধ্যমে সভ্যতা সংস্কৃতিবিষয়ক অনুমান কোন ক্রমেই সঠিক নির্ণয় দিতে পারে না। অবশ্যই তা' হবে আংশিক এবং নিম্নমানের ধারণার পরিপোষক। কোন রাজামহারাজার বাড়ীও যদি দীর্ঘ-দীর্ঘকাল চোর-ডাকাত লুটেরাদের অবাধ লুণ্ঠনের পর কোন উন্নত এবং উদারমনা সমাজাভিজ্ঞ ব্যক্তি পরিদর্শন করেন, এবং লুন্ঠনাবশিষ্ট জিনিষগুলো সংগ্রহ করে, তার মাধ্যমে সেই রাজা-মহারাজার বাড়ীর লুণ্ঠনপূর্বাবস্থা দাড় করতে চেষ্টা করেন, তা হলেও কি তা সঠিক কাঠামোয় দাড় হবে? অবশ্যই না। অত্যন্ত উদার মনে সুনিপুণ চেষ্টা করলেও না। এসব প্রত্নের বেলায়ও তো তেমন-ই ঘটনা। এখানে প্রধান লুন্ঠনকারী হচ্ছে কাল। দীর্ঘদিন ধরে অপহরণ করেছে সে অবাধে। তাতে যে টুকুর অস্তিত্ব টিকে ছিল, তা-ই মাত্র পাওয়া গিয়েছে খনন কার্যের ফলে। তার মাধ্যমে কি তৎকালীন বঙ্গীয়দের জীবন-চর্যা সঠিকভাবে ধরা যাবে? কালনির্দ্ধারণী পদ্ধতিটিও তো একান্ত পক্ষেই স্থূল। তবে, ওসব প্রত্নসামগ্রী যে সভ্যতার নিদর্শন তাতে তো আর সন্দেহের অবকাশ নেই। বাস্তবে, ও গুলো একান্ত আদিমকালের নিদর্শনও নয়। ওসব জিনিষের মাধ্যমে তাম্র-প্রস্তর যুগের বা তারও অনেক পরের অবস্থারই কিঞ্চিৎ আভাস মিলেছে।

অন্যান্য বহু সামগ্রীর মধ্যে একটা হচ্ছে বৃহদায়তন প্রস্তরনির্মিত মঞ্চ (platform)। অন্যসব বাদ দিলেও, শুধু এই একটা জিনিষের মাধ্যমেও কি তাঁদের, উন্নতমানের রুচি, সঠিক হিসাব-জ্ঞান উন্নত স্থাপত্য কারিগরি, সৌখীন জীবন-জীবিকা, উন্নতমানের অস্ত্রপাতি হাতিয়ার-পত্র, চিরস্থায়ী সম্পদ গঠনের আকৃতি -প্রভৃতি জানা যায় না? বলতেই হয় - তাঁদের ভাষা ছিল, পরিকল্প তৈরি করার বুদ্ধি ছিল, কার্যে পরিণত করার কৌশল ছিল, যান্ত্রিক (সে যে ধরনেরই

১, ১৯৬২ ও ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে অজয় নদের দক্ষিণে "পাণ্ডুরাজার ঢিবি"তে খুব ব্যাপক ভাবে এবং নিকটবর্তী আরও কয়েকটি স্থানে সামান্যভাবে মাটি খনন করিয়া যে সমুদয় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দেড়হাজার বছর আগে সিন্ধুনদের উপত্যকায় মধ্যভারত ও রাজস্থানের অনেক জায়গায় যেমন তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল বাংলাদেশের এই (সম্ভবত অন্য) অঞ্চলেও সেইরূপ সভ্যতা সম্পন্ন মনুষ্যগোষ্ঠী বাস করিত।' ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২০

হোক না কেন) ব্যবহার জানা ছিল। স্থূলত, সভ্যতা-সংপৃক্ত আসবাব পত্রের সৃজন, সংগ্রহণ, সংরক্ষণ, ব্যবহার, রুচি সবই ছিল। পাথরে নির্মিত সুগঠিত মঞ্চ তো আর চারটিখানে কথা নয়।

সে যা-ই হোক, আর্যদের সংস্পর্শে যাওয়ার আগেও বঙ্গদেশবাসীরা উন্নতই ছিল। দুর্ধর্ষও বোধ হয় ছিল। অন্যথা, ঐতরেয়ব্রাহ্মণে তাঁদের অসুর প্রভৃতি আখ্যা দেয়া হবে কেন? আরো এক টু অনুধাবন করা দরকার যে, ঐতরেয়ব্রাহ্মণের অসুর উক্তি কিন্তু অনার্যরূপে পরিচায়ণও বলা যায় না। কেননা, অসুরমাত্রই অনার্য ছিল এমন কথা বিশ্বাস করা যায় কি ভাবে? অসুরগণের বৈদিক শাস্ত্রানুশীলন, যোগ-তপস্যা-যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি ভূরি ভূরি আস্তিক কাজের বর্ণনা আছে বেদে, উপনিষদে: পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে সর্বত্র। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে উদাত্তাদি স্বরের বেঠিক উচচারণে যজমানেরই ক্ষতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাতে যজমান স্বয়ং বৃত্রাসুর। আর, এ ঘটনা পতঞ্জলির নিজের উদ্ভাবিতও নয়। পুরাণাদিতে বৃত্রাসুরের সে যজ্ঞের কাহিনী বর্ণিত আছে। অসুরেরা দ্বিজদ্বেষীও ছিলনা। ছিল দেবতাদ্বেষী। শুক্রাচার্যই তো অসুরদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র গুরু। শুক্রাচার্যও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

উল্লিখিত বিভিন্নমুখী আলোচনার মাধ্যমে প্রতিভাত যে বঙ্গের ভূ-স্থলী অতিশয় প্রাচীন। পশ্চিমের অতলান্তিক মহাসাগর এবং পূর্বের প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোজন-রূপে যে সুপ্রাচীন পাবাবার পৃথিবীর এ অঞ্চলে তরঙ্গের লহরী তুলে বিরাজ করত তার তলদেশথেকে উদ্ভিন্ন ভূ-স্তর গগনবিচুম্বী শির উচু করে জেগে সুবিশাল প্রাচ্য-ভূমির গোড়া-পত্তন করেছিল হয়ত, প্রত্নপ্রস্তর যুগেরও কোটী কোটী বছর আগে। তখন গোটা পৃথিবীই ছিল হয়ত অশান্ত কিম্ভূত, কিমাকার। মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতিও বিবর্তন-জাত। কালে কালে সেভাবে বিবর্তিত হয়েছে স্থান, গজিয়েছে উদ্ভিদ, আবর্তিত হয়েছে অনুকূল জল-বায়ু, জন্মেছে প্রাণ। তারও কত পড়ে যে মানুষের অস্তিত্ব প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল তা'-ই বা কে জানে? পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলথেকে যদি এ অঞ্চলে আদিম নরগোষ্ঠী বা গোষ্ঠীবর্গ এসেই থাকে তবে তা যেহেতু সেই আদিকালে সেহেতু নিশ্চয়ই সে সব ছিল একান্ত আদিমতা-সংপৃক্ত। আর সে কারণেই প্রথমটায় তাদের কোন পরিশীলিত জীবন-জীবিকা ছিল বলে বিশ্বাস করা কঠিন। অন্যদিকে, যদি ওই হিমালয় পর্বতমালার সহজাত অধিত্যকা-উপত্যকা-সমতল-ক্ষেত্রময় প্রাচীয় এ ভূ ভাগেই মনুষ্যের উদ্ভব ঘটে থাকে তাহলেও তাদের আদিম দশা একান্তই অপরিশীলিত আদিমতাময় ছিল। এমনটা যে একেবারেই হতে পারে না,

বহির্বিশ্ব থেকে আমদানী একেবারে অবধারিত এমন কথা বলা চলে না। অনেকে মনে করেন— সৃষ্টিকর্তা একজন অবশ্য স্বীকার্য। তিনি যদি মহাকাশে এখানে সেখানে নক্ষত্রমণ্ডল বসাতে পারেন, সূর্য বানাতে পারেন, চন্দ্র সৃষ্টি করতে পারেন পৃথিবীর এক খাবলা মাটি নিয়ে তবে, পৃথিবীর জলরাশি-স্থলরাশির মত, আগুন-বাতাসের মত, পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের মত এ অঞ্চলেও প্রাথমিক মানুষ গড়তে পারবেন না কেন? যেটাই হয়ে থাক, তা একান্ত অজ্ঞাত। নিছক আন্দাজ করে কিছু বলা চলে মাত্র। পরবর্ত্তীকালে আমরা আমাদের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের সাংস্কৃতিক তথ্য যতটা জানতে পারি তা আর্য সংস্কৃতির বটেই। এ কারণেই আর্যায়ণ নামক এক নুতন তত্ত্বের স্বীকৃতি প্রায় অবিসংবাদিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সনাতন আর্যরা তাঁদের মূল ভূখণ্ড অথবা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম উপনিবেশক্ষেত্র অতিক্রম করে পারিপার্শ্বে ক্রমিক বিস্তার লাভ করেছিল যার পরিণামে বাঙালীর অর্থাৎ বঙ্গ-ভূ-স্থলীর সেই সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল আর্যায়ণের প্রক্রিয়া। সনাতন আর্যদের মহাশক্তি-রূপে কাজ করেছে ধর্মশাস্ত্র যার মহনীয়তায় মুগ্ধ হয়েছিল এ উপমহাদেশের প্রায় তাবৎ জনতা। বাঙালীর সাংস্কৃতিক বিকাশের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলেই কিভাবে যে সংস্কৃত প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ক্রমধারায় আলোচনা এসে পড়ে সে তথ্যও পরিষ্কার ফুটে উঠবে এখানে।

আর্যদের ধর্মশাস্ত্র

বেদ এবং বৈদিক সাহিত্য:

আর্যদের ধর্মশাস্ত্র বলতে অনেক শাস্ত্র-গ্রন্থের সমন্বিত রূপ বুঝায়, যার মধ্যে প্রধান বেদ। বেদ বা বৈদিক সাহিত্য মাত্র একখানি গ্রন্থের নাম নয়। 'বেদ'-এই দু'টি অক্ষরগঠিত নামটি দ্বারা যে শাস্ত্র-সমুদ্র বোঝান হয়ে থাকে তা হঠাৎ ধারণায় আনাও কঠিন। যে গ্রহটায় আমরা বাস করছি, তাতে যে কতশত পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, চত্বর-মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর, হাওড়-বিল-খাল—প্রভৃতি রয়েছে, তার কোন ইয়ত্তাই নেই। তবু ও কি একটি 'পৃথিবী' বা অনুরূপ অন্য কোন শব্দ দ্বারা সেটাকে আমরা বুঝাই না? ছোট্ট একটি শব্দ দিয়ে বললেই অর্থটা বা প্রতিপাদ্য বস্তুটা, সব সময়, ছোট্ট হয়ে যায় না। 'বেদ' শব্দও অর্থের অর্থাৎ প্রতিপাদক শব্দ 'বেদ' এবং প্রতিপাদ্য 'বৈদিক সাহিত্য'-এর বেলায় ব্যাপারটা ওই রকম। এক বিপুলায়তন সাহিত্য বৈদিক সাহিত্য। ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব রূপে পরবর্তীকালে বেদব্যাস কর্তৃক যাহা চার ভাগে উপবিভক্ত হয়েছিল, তার সমগ্র সংহিতাংশ, ব্রাহ্মণাংশ এবং উপনিষদ্-গুলোই কেবল নয়, বরং তার সাথে অঙ্গ বিদ্যাগুলোও ছিল প্রথম থেকে-ই। অঙ্গছাড়া অঙ্গীর সত্তা পূর্ণরূপে হতেই পারে না। অঙ্গগুলোর আলাদা কার্যকারিতা থাকলেও অঙ্গীর সত্তার পূর্ণায়ণে অঙ্গগুলোর অন্তর্ভাবন একান্ত পক্ষেই অপরিহার্য।

বেদের অঙ্গবিদ্যাও ছয় প্রকার: ১। শিক্ষা ২। কল্প, ৩। ব্যাকরণ, ৪। নিরুক্ত, ৫। ছন্দঃ এবং ৬। জ্যোতিষ। জ্যোতিষও আবার দু'ভাগে বিভক্ত—গণিত জ্যোতিষ এবং ফলিত জ্যোতিষ। উল্লিখিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি যে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি বা ক্ষেত্রমিতি, ত্রিকোণমিতি এবং চাপীয় ত্রিকোণমিতি সে বিষয়গুলোও ছিল, যা পরবর্তী শুল্বসূত্রাদি বিবিধ শাস্ত্রের মাঝে বিস্তারিত হয়েছে, তা' অবশ্য স্বীকার্য।

অঙ্গবিদ্যাগুলো সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন যে, ওগুলো পরবর্তীকালে হয়েছে। তাঁদের সে বক্তব্যের কোন গ্রাহক প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে, ওগুলোর বৈদিক কালিকতা-প্রমাণে কোন অপূর্ণতা নেই। শিক্ষাগ্রন্থ না থাকলে বেদের পঠন-পাঠন চলত কি ভাবে? শিক্ষাগ্রন্থ প্রাথমিক বর্ণপরিচয়ের এবং উচ্চারণের সাধারণ নিয়ম-কানুনের গ্রন্থ। তা' না থাকলে বর্ণমালার সমাম্নায়িক পাঠ (বর্ণানুক্রমিক

পাঠ), উচ্চারণতত্ত্ব, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত উচ্চারণের ধারা, স্বরের লঘুত্ব-গুরুত্ব-বিষয়ক মাত্রা-জ্ঞাপন, অথবা একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক, প্লুতমাত্রিক উচ্চারণ, অর্দ্ধ-মাত্রিক বর্ণের জ্ঞান, অনুস্বারের কোথাও স্বরত্ব, কোথাও বা ব্যঞ্জনত্ব নিয়ম, বিসর্গের উচ্চারণের স্থানভিত্তিক পার্থক্যজ্ঞান—প্রভৃতি শিক্ষা করত কি ভাবে? বেদ গ্রন্থের কোন গ্রন্থকার স্বীকার করা হয় না, ওটা ঐশ্বরিক বাণী। যে সকল ঋষি ওগুলো প্রথম জেনেছেন বা প্রকাশ করেছেন, সে লিপির মাধ্যমেই হোক বা মৌখিক হোক, তাঁদেরে দ্রষ্টা বা প্রথম অবলোকনকারী বলা হয়। শিক্ষাগ্রন্থ তো আর সে রকম সাক্ষাৎ বেদ নয়। ইহার প্রণেতা আছে। যে যার ইচ্ছানুসারে যথার্থ নিয়ম-কানুন ব্যক্ত করার উপযোগী শিক্ষাগ্রন্থ রচনা করতে পারে। করেছেও অনেকে। তাই ওগুলো ছাড়া বেদের পঠন-পাঠন চলতেই তো পারত না। অতএব বেদের আবৃত্তিতে প্রাস্তুতিক পর্বেই শিক্ষাগ্রন্থ অধীত-অধ্যাপিত হত মানতেই হয়। একান্ত প্রাথমিক বর্ণজ্ঞান-কালেই এ জাতীয় শিক্ষাগ্রন্থ অনুসরণ করা হচ্ছে সহজতর এবং নির্ভরযোগ্য পন্থা, যেহেতু, এজাতীয় গ্রন্থ ছাড়া, একবার বেঠিকভাবে বর্ণোচ্চারণা-দিতে অভ্যাস হয়ে গেলে, তা শোধরান বড় কঠিন। সুতরাং বেদের সৃষ্টিও যে কালে, শিক্ষাগ্রন্থের সৃষ্টিও তখন-ই হয়েছে। পরবর্তীকালের আমরা এখনও যে সকল শিক্ষাগ্রন্থের এবং গ্রন্থকারের সন্ধান পাই তাঁদের পৌর্বাপর্য অত সহজে ঠিক করা যাবে না, তবে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের গ্রন্থকার। গ্রন্থকারদের নাম-বিশেষিত যে সকল শিক্ষাগ্রন্থ বৈদিককালে এবং তৎপরবর্তী সময়ে ছিল বলে মনে করা চলে, তাঁদের কতিপয়ের গ্রন্থ—

১। আত্রেয় শিক্ষা,	২। আপিশলীয় শিক্ষা,	৩। আরণ্যক শিক্ষা,
৪। কাত্যায়ন-শিক্ষা,	৫। কাহল-শিক্ষা,	৬। কেশব-শিক্ষা,
৭। কৌশিকি-শিক্ষা,	৮। গৌতম-শিক্ষা,	৯। চাবায়ণীয় শিক্ষা,
১০। তৈত্তিরীয় শিক্ষা,	১১। নারদীয় শিক্ষা,	১২। পাণিনীয় শিক্ষা,
১৩। পারাশর শিক্ষা,	১৪। বৌধায়ন শিক্ষা,	১৫। ভারদ্বাজ শিক্ষা,
১৬। মাণ্ডুক্য শিক্ষা,	১৭। মাধ্যন্দিনীয় শিক্ষা,	১৮। যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা,
১৯। লোমশ-শিক্ষা	২০। বাজসনেয় শিক্ষা,	২১। বাল্মীকি-শিক্ষা,
২২। বশিষ্ঠ-শিক্ষা	২৩। ব্যাড়ি-শিক্ষা,	২৪। ব্যাস-শিক্ষা,
২৫। শম্ভু-শিক্ষা—প্রভৃতি।		

এ সমস্ত শিক্ষাগ্রন্থগুলোর মধ্যে আরণ্যক, মাণ্ডুক্য, মাধ্যন্দিনীয় এবং বাজসনেয় শিক্ষা চারটি তো বৈদিক শ্রেণী-বিশেষিত হয়েই আছে। এদের সাক্ষ্যে পরিষ্কার প্রতিপন্ন হয় যে, বেদের বিভিন্ন শাখার প্রয়োজনে বৈদিককালে পৃথক্ পৃথক্

শাখা-বিশেষিত শিক্ষাগ্রন্থ ছিল। হাজার হাজার বছর পেরিয়ে আমাদের কালেও তার অনেকগুলো এসে পৌঁছে গিয়েছে। তন্মধ্যে উল্লিখিত ২/৪ খানা এখনো তত্তৎ বৈদিক শাখীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিতও আছে। তৈত্তিরীয় শিক্ষাখানাও কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখাধ্যায়ীদিগের বিশেষ ধরণের শিক্ষাগ্রন্থ। তা'ছাড়া, অত্রি, কৌশিকি, গৌতম, নারদ, পরাশর, বৌধায়ন, ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, লোমশ, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতিও সেই বৈদিককালেরই সম্প্রদায়-প্রবর্তক গ্রন্থকার। শম্ভু, ব্যাড়ি আপিশলি, কাহল, কেশব, পাণিনি —এঁরাও বৈদিককালের না হলেও, খৃষ্টপূর্বকালের লোক, তা নিঃসংশয়। পূর্বাপর ধারায় বৈদিক পদ্ধতির অনুসরণ-জ্ঞাপনের প্রয়োজনেই বৈদিক কালের শিক্ষাগ্রন্থগুলোর মধ্যেই এঁদেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাকরণও এক প্রকার বেদাঙ্গ। তাও, যে আকারে-প্রকারে, যে আখ্যায় অভিধায় থাক না কেন, বৈদিককালেও ছিল — সন্দেহ নেই। ব্যাকরণ-মাফিক ব্যবহারই তো বৈদিক সাহিত্যের সর্বত্র। ব্যাকরণে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি ছাড়া তেমন ব্যবহার অসম্ভব। আমার এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে, আলোচ্য বিষয়ের ক্রমধারায় বেদব্যাসের কাল এখনো আসে নি। বেদব্যাস যে অষ্টাধ্যায়ী-প্রণেতা মহামুনি পাণিনির চেয়ে অনেক আগেকার ব্যক্তি - তা নির্দ্বিধায় বলা চলে। প্রাসঙ্গিকভাবে মহাভারতের 'গীতা' প্রসঙ্গের এক মাহাত্ম্য-ভাষণ আছে পদ্ম পুরাণে। সেখানে ভগবদুক্তির মধ্যে মহাভারত রচনার প্রশস্তি-কীর্তনও আছে—যার মধ্যে বলা হয়েছে—

"আঠারখানা মহাপুরাণ, নয়প্রকার ব্যাকরণ, এবং চারখানা বেদ সম্যক্ মন্থন করে (তার প্রায়োগিক যাবতীয় নিয়ম-কানুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে) ঋষি বেদব্যাস মহাভারত প্রণয়ন করেছেন।"[১]

বেদব্যাসের কালেও অনেক ব্যাকরণ ছিল, যার মধ্যথেকে নয়প্রকার ব্যাকরণ (সম্ভবত সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য নয় প্রকারই) মহাভারত প্রণয়নের সময় তিনি আলোচনাও করেছেন।

পাণিনির চেয়ে অনেক কাল আগের নিরুক্তকার যাস্ক, তাঁর নিরুক্তের মধ্যে প্রসঙ্গাগত কতক প্রাচীন বৈয়াকরণের নাম উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে—১। ঔদুম্বরায়ণ, ২। ক্রৌষ্টুকি, ৩। শতবলাক্ষ, ৪। মৌদ্গল্য, ৫। শাকপূণি, ৬। শাকটায়ন, ৭। স্থৌলাষ্ঠীবী, ৮। আগ্রায়ণ, ৯। ঔপমন্যব, ১০। ঔর্ণবাভ, ১১। কাত্থক্য,

১. অষ্টাদশ পুরাণানি নব ব্যাকরণানি চ।
নির্মথ্য চতুরো বেদান্ ভারতং কৃতবান্ ঋষিঃ ॥ পদ্ম পুঃ পাতাল খণ্ড, গীতামাহাত্ম্যাধ্যায়।

১২। কৌৎস, ১৩। গার্গ্য, ১৪। গালব, ১৫। চর্মশিরা, ১৬। তৈটিকি, ১৭। বার্ষায়ণি এবং ১৮। শাকল্য এই আঠারজন বৈয়াকরণের নাম আছে। এঁরা সবাই পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সমীচীন ব্যাকরণ লিখেছিলেন, যাঁরা পাণিনির চেয়ে অন্তত বহুশত বছর আগেকার নিরুক্ত-প্রণেতা যাস্কের কাছেও ছিলেন প্রাচীন।[১] যাস্ক নিজে সম্ভবত, বেদব্যাসের অনেক পূর্ববর্তী লোক।*

পাণিনিও তাঁর পূর্বেকার অনেক বৈয়াকরণের নাম অষ্টাধ্যায়ীতে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে যাস্কের উল্লেখের বাইরে—১। আপিশলি, ২। স্ফোটায়ন, ৩। ভারদ্বাজ, ৪। কাশ্যপ, ৫। চাক্রবর্মা, এবং ৬। সেনকের নাম পাওয়া যায়। তা'ছাড়া, অষ্টাধ্যায়ী-প্রণয়নে সর্বপ্রথমই চৌদ্দটি মাহেশ্বর সূত্র উল্লেখ করে তা' অষ্টাধ্যায়ীর অঙ্গীভূত করেছেন তিনি। পাণিনি নিজে যে একজন অতি প্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ তা'তো অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর কাল-নির্দ্ধারণ যদিও একেবারে অবিসংবাদিত নয়। ডঃ আহমদ্ শরীফ, তাঁর 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য" গ্রন্থে পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের বলে মানছেন।[২] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] গোল্ডষ্টুকারের মতে পাণিনির কাল খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী।[৪] সুতরাং পরিষ্কার জানা যায় যে, ৬ প্রকার বেদাঙ্গের অন্যতম—ব্যাকরণ, সুপ্রাচীনকালে, অর্থাৎ বৈদিককালেও, বৈদিক সাহিত্যের সাথে যুগপৎ আলোচিত হত। বৈদিক, সাহিত্যের কাল-নির্ণয় করতে এসব আলোচনা, ইতিহাসগত করে অনুশীলন করা, অধ্যেতৃবর্গের চিন্তা-চেতনাকে ধীরে ধীরে সুদূর অতীতে পৌছে দিতে সাহায্য করে। অন্যথায় সেই দূর অতীত ধারণায় আনা-ই অসম্ভব।

নিরুক্ত হচ্ছে, ভাষার—অর্থাৎ আর্যভাষার[৫]—বেদের জ্ঞান অর্জনে, শিক্ষা এবং ব্যাকরণের মতই সহায়ক অঙ্গশাস্ত্র। বৈদিক এবং অবৈদিক যাবতীয় সংস্কৃত ভাষা

১. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা প্রণীত 'প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা', ২য় সং, ৮ পৃঃ।
* অবতরণিকায় যাস্কের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২. পৃঃ ২, অনু ২য়, পং, ৫ম।

৩. বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২, অনুচ্ছেদ ২।

৪. "The Mahabharata, by Goldstucker T.

৫. 'আর্য' শব্দটি প্রথমে, বোধ হয়, কয়েকটি কৌলিক ভাষা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন, টিউটোনিক, ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত, রাশিয়ান—প্রভৃতি। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষাভাষী শ্রেণীটাই আর্য্যশব্দ দ্বারা বুঝান হয়।
নিরুক্তে অর্য্য শব্দের অর্থ ঈশ্বর। তাই ঈশ্বরানুসারী ধর্মই আর্য্যধর্ম। যাস্কের নিরুক্ত ১ম অধ্যায়, ২২শ পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা করতে উল্লিখিত শিক্ষাগ্রন্থ সর্বপ্রথম পাঠ্য। তার পরেই ব্যাকরণের স্থান। বৈদিক এবং লৌকিক বা অবৈদিক সংস্কৃত ভাষার সাধারণ বিধি-বিধান, সামগ্রিকভাবে ব্যাকরণে আলোচিত, যদিও বৈদিক সংস্কৃতের বিশেষ বিশেষ বিধি-নিষেধের সমন্বয়ে বৈদিক ব্যাকরণও পৃথক্‌রূপে আলোচনার বিষয়। নিরুক্ত সেরকম সর্বসাধারণ সংস্কৃতাধ্যায়নে ব্যাপৃত নয়। বেদের শব্দকোষ—নৈঘন্টু। তার টীকা বা ভাষ্য নিরুক্ত। নিরুক্তে বেদমন্ত্রের উৎপত্তিবীজ, উৎপত্তির প্রয়োজন এবং প্রায়োগিক সিদ্ধান্তিত অর্থই মাত্র বিবৃত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের একটি মাত্র বচনে নিরুক্ত এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থের স্বরূপনির্দ্ধারণী রয়েছে। হলায়ুধ তার উদ্ধৃতি দিয়ে আপন গ্রন্থের পরিপোষণও করেছেন[১] যাস্ক যে একাই নিরুক্তকার নন, তা' তাঁর নিরুক্ত পর্যালোচনা দ্বারাই জানা যায়। তিনি অনেক নিরুক্ত এবং নিরুক্তকারের উল্লেখও করেছেন। বহু প্রতিষ্ঠানে অদ্যাপি নিরুক্ত গ্রন্থের বহু পাণ্ডুলিপি রক্ষিতও আছে। নিরুক্তের ভাষ্যব্যাখ্যা এবং দুর্গকৃত ভাষ্য, বেদার্থ-জ্ঞানে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়। যাস্কাচার্যের গ্রন্থে 'গো' শব্দ থেকে 'দেবপত্নী' শব্দ পর্যন্ত শব্দগুলো ১ম কাণ্ডে সঙ্কলিত। সেসব শব্দের অর্থনিরূপণাত্মক নৈঘন্টুক বা নৈরুক্তক ও দৈবত-কাণ্ডে অর্থনির্দ্ধারণীই নিরুক্ত।

অপর বেদাঙ্গ 'কল্প'নামে অভিহিত। এ জাতীয় গ্রন্থ, সাধারণত সূত্রাকারে লিখিত। বিশাল বেদের বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড সমূহের সৌত্রিক স্বল্প-ভাষণের মধ্যদিয়ে উপস্থাপন এবং বিন্যাস অতীব তাৎপর্যবহ। এসব গ্রন্থ না থাকলে, ইতিকর্তব্যতা-বহুল বৃহৎ বৃহৎ বৈদিক ক্রিয়ার সুষ্ঠু রূপায়ণ কঠিন হয়। এ গ্রন্থগুলো সর্বসাধারণের আবশ্যিক আলোচ্য নয়। বৈদিক ক্রিয়ায় ব্যাপৃত ব্যক্তিদের পক্ষেই ইহার উপযোগিতা বেশী ছিল এবং এখনো একেবারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় নি। পঠন-পাঠন, বোধ হয়, কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাজন বৃত্তি প্রচলিত না থাকায় শুধু জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ছাড়া, অন্য উদ্দেশ্যে পঠিত-পাঠিত হওয়া অসম্ভাব্য ছিল। অথচ, লক্ষ্য করার বিষয় যে, বেদাঙ্গ বলে, অর্থাৎ মূলবেদ থেকে ভিন্ন হওয়ার কারণে তা' যে কোন সম্প্রদায়ের পড়তে কোন শাস্ত্রিক বাঁধা নেই। কাঠিন্য এবং প্রযোজনের সীমাবদ্ধতার জন্য, তুলনামূলকভাবে সম্প্রসার অনেক কম। তথাপি সেই সুদূর বৈদিক কাল থেকে চলতে চলতে, আমাদের একালেও আসতে পারে নি, তা নয়। তবে উত্তর ও মধ্য ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতেই, বর্তমানে উহার অস্তিত্ব রক্ষা হয়েছে বেশী।

নিরুক্তং যত্র মন্ত্রাণাং সমুৎপত্তিং প্রয়োজনম্।
প্রতিষ্ঠানং স্তুতিশ্চৈব ব্রাহ্মণশ্চাভিধীয়তে। ব্রাহ্মণসর্বস্ব, বেদাধ্যয়ন-বেদার্থজ্ঞান-প্রশংসা।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, জার্মাণ সংস্কৃতজ্ঞ 'গুস্তব অপার্ট' দক্ষিণ ভারতীয় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের যে দু'প্রস্থ গ্রন্থবিবরণী (Descriptive catalogue) প্রণয়ন করেছেন, তার মধ্যে অন্তত ৮ খানা কল্পসূত্রের নিবন্ধন রয়েছে। উনবিংশ খৃষ্টীয় শতাব্দীর শেষ ভাগেও যেখানে 'গুস্তব অপার্ট'-এঁর তালিকায় অতগুলো কল্পসূত্র রয়েছে[১], তখন তা যে পূর্বকালে প্রচুর পঠন-পাঠনের বিষয় হত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষত বাংলাদেশেও তখন, (আর্যায়ণের পরে, সেই আদ্যিকালেই তো) বৈদিক যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ছিল এবং তা' খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্তই নেহাৎ কমও ছিল না। সুতরাং, বৈদিক কালে আর্যদের মধ্যে যে তা' পুনঃপুন অনুশীলনীয় অতি প্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থের অন্যতম ছিল, তা' অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কোন্ মন্ত্রটি কোন্ কাজে প্রযোজ্য সে সব নিরূপণের গ্রন্থ কল্পসূত্র। আশ্বলায়নের কল্পসূত্র, বোধায়নের কল্পসূত্র, আপস্তম্বের কল্পসূত্র প্রভৃতি কল্পসূত্রগুলোর মধ্যে প্রধান।

অপর বেদাঙ্গ ছন্দ। এই বেদাঙ্গটি সর্বত্র সর্বজন-গ্রাহ্য বেদাঙ্গ। যেমন বৈদিক সংস্কৃতে, তেমনই লৌকিক সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতেও ইহার সমান ব্যবহার। সুতরাং, বঙ্গদেশেও, আর্যায়ণের কাল থেকে ইহার যে আলাপ-আলোচনা, পঠন-পাঠন চলেছে, তাও যেমন মেনে নিতে হয়, তেমন তার পূর্বকালেও আর্যদের ইহার অনুসরণ তো ছিলই। বৈদিক কালের বৈদিকে এবং লৌকিকে ব্যবহার্য ছন্দবিষয়ক গ্রন্থ 'ছন্দশ্চিতি' এখনো পাওয়া যায়।[২] এ ছাড়া, পিঙ্গল মুনির 'বৈদিক ছন্দঃসূত্র', এবং 'প্রাকৃতপিঙ্গল' নামক ছন্দের গ্রন্থ তো চিরপ্রসিদ্ধ। বেদ-বিভাগ বা বেদ-বিন্যাসের পরে প্রত্যেক বেদের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য শিক্ষা-দীক্ষায় এসে পড়ে। ফলে, এক বেদের অনুসারীদের বৈদিক চর্চায়, অন্যদের সাথে কিঞ্চিৎ পার্থক্য গড়ে ওঠার জন্য প্রত্যেক শ্রেণী আলাদা আলাদা ছন্দবিশ্লেষণের প্রয়াস পায়। প্রত্যেক বেদের কেন, অনেক শাখারও বৈশিষ্ট্য নিয়ে ছন্দের গ্রন্থের ইতস্তত উল্লেখ এবং তার কিছু কিছু গ্রন্থের প্রাচীন নিবন্ধন পাওয়া যায়। গদ্যেরও ছন্দ আছে। তবে, গদ্যের চেয়ে পদ্যের প্রচলন, হয়তো বা রচনা সরস করার প্রয়োজনেই, অধিকতর ছিল। বৈদিক ছন্দ এবং লৌকিক ছন্দের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। উভয়ধর্মী ছন্দই যে, সুপ্রাচীন বৈদিক কালেও ছিল, তার প্রমাণ মেলে।

১। C. C. by Theodor Aufrecht, oppert 879, 4713, 4806, 4919, 5168, 5455, 5865, and 8212 Nos.

২. মহামুনি পতঞ্জলির এবং দণ্ডীর দু'খানা, 'ছন্দশ্চিতি'র সন্ধানও পাওয়া যায়। তা' বোধ হয়, বৈদিক ছন্দের গ্রন্থের অনুসারেই প্রণীত আলাদা গ্রন্থ।

বেদের সংহিতাংশ (যজুর্বেদের কিয়দংশ বাদে) সম্পূর্ণই ছন্দবদ্ধ শ্লোকে রচিত। গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ, এবং জগতী—এই সাতটি ছন্দের অন্যতম ছন্দেই, প্রায়শ, বেদমন্ত্র গ্রথিত। প্রত্যেক ছন্দেরই ধরা-বান্ধা, পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম আছে। ছন্দের শাস্ত্র বা অনুশাসন ব্যতিরেকে নিয়ম-শৃঙ্খলিত শ্লোকের সৃষ্টি হতেই পারে না। সুতরাং বৈদিককালেই এই বেদাঙ্গটিও ছিল। প্রাকৃত ভাষাও যে বৈদিককালেও ছিল এবং পিঙ্গলমুনি বৈদিককালেরই লোক তা' পরবর্তী আলোচনায় যথাস্থানে পাওয়া যাবে।

অপর বেদাঙ্গ জ্যোতিষ শাস্ত্র। এই শাস্ত্রটির প্রচলন সর্বদেশে এবং সর্বকালে। বিদ্যার্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব অর্জনে, সমাজে উপযোগ সৃষ্টিতে, বৈদিক ক্রিয়াকর্মের উপযোগী দিন-ক্ষণের সঠিক নির্বাচনে, উৎপন্ন রোগ-ব্যাধির পরিণাম-জ্ঞানে, জাত বালক-বালিকা-পশু-পাখী সবার ভবিষ্যৎ পরিশীলনে উৎপাত-লক্ষণ-জ্ঞানে, অদ্ভুত লক্ষণের যাবতীয় জিজ্ঞাসার সদুত্তর উদ্ভাবনে, স্ত্রী-পুরুষের শুভাশুভ লক্ষণ-জ্ঞানে, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঝড়-বৃষ্টি-প্লাবন-প্রভৃতির জ্যোতিষিক পর্যালোচনায়, কৃষির প্রকর্ষ-অপকর্ষ নির্দ্ধারণে এবং এরকম আরও অসংখ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের একক সামর্থ্য, সেই অতি পুরাকালেই পরিজ্ঞাত ছিল। তাই, তৎসৌকর্য-সাধক অংক, জ্যামিতি বা ক্ষেত্রমিতি, ত্রিকোণমিতি, চাপীয় ত্রিকোণমিতি—সবই অল্প-বিস্তর আলোচনা করতে হয়েছে উল্লিখিত প্রায়োগিক ক্ষেত্রগুলোয় এবং আরও অনেকস্থলে। চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ, ছায়া-উপচ্ছায়াপাত, ক্রান্তিপাত, অয়নচলন, কেতু-গ্রহের বা ধূমকেতুর গতি-আগতি—প্রভৃতির অনুশীলন, কেবল একালের বিদ্যা নয়। সেকালেও এসবের চর্চা ছিল। তাই, সম্ভাব্য বৈগুণ্যের প্রতিকার প্রভৃতিরও অনুসন্ধান, শাস্ত্রে পাওয়া যায়। লগধের 'বেদাঙ্গজ্যোতিষ' (উভয়-গণিত ও ফলিত), জৈমিনীয় 'জ্যোতিঃসূত্র', পরাশরীয় জ্যোতিঃসংহিতা—প্রভৃতি এ বিষয়ে বৈদিককালের প্রধান প্রধান উপজীব্য গ্রন্থ।

এ বিষয়ের নিষ্কর্ষে বলা চলে যে, উপরের বিভিন্নমুখী পর্যালোচনায় যে, বৈদিককালেই বেদের অঙ্গবিদ্যাগুলোও ছিল বলে জানা যায়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ (শাস্ত্রিক) বেদেই বহুস্থানে লিপিবদ্ধ আছে। শুক্ল যজুর্বেদের উপনিষদাবলীর অন্যতম—সুবালোপনিষৎ। তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে,[১]

---

১. তস্যৈতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেবৈতদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষাময়নং ন্যায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাণি—ইত্যাদি। সুবালোপনিষৎ, ২য় খণ্ড ॥

"ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র---প্রভৃতি সেই পরম পুরুষ থেকেই আবির্ভূত হয়েছে।" উৎপত্তি-বিষয়ে বিশ্বাস যা'ই থাক্‌না কেন, বস্তুগুলো না থাকলে সে সবের নাম করা কিভাবে সম্ভব? উপনিষদ্‌গুলো বেদের অংশ। সংহিতায় বা ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে (অথবা, আরণ্যক ব্রাহ্মণাংশের মধ্যে) উপনিষদগুলো সন্নিবেশিত রয়েছে। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ এবং ছান্দোগ্যোপনিষৎ প্রভৃতিতে বহু স্থলে বেদাঙ্গের উল্লেখ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

সুদূর অতীতের দুর্লক্ষ্যকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকালের দিকে আসতে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অবলম্বন-ই প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ। সে সবের প্রমাণসিদ্ধ পৌর্বাপর্যক্রমে কালের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে বিন্যাস করাই নির্ভরযোগ্য এবং যুক্তিসিদ্ধ উপায়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বলা চলে যে, বেদ এবং বেদাঙ্গের পরেই স্থান পেতে পারে উপবেদ চতুষ্টয়। বেদ যেমন চার প্রকার—ঋগ্‌, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব নামে, তেমন উপবেদও চার প্রকার---আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ এবং বাস্তুশাস্ত্র। শৌনকের চরণব্যূহের মতে[১] —ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্বেদ, যজুর্বেদের উপবেদ ধনুর্বেদ, সামবেদের উপবেদ গান্ধর্ববেদ এবং অথর্ববেদের উপবেদ শস্ত্রশাস্ত্র। শ্রীমদ্‌ভাগবতে অথর্ববেদের উপবেদ বলা হয়েছে--বাস্তু শাস্ত্রকে। ব্যবহারও চলছে ভাগবতের মত অনুসারে।

আয়ুর্বেদ অর্থ চিকিৎসা-শাস্ত্র। ইহাকে বৈদ্যক শাস্ত্রও বলা হয়। মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদ সেই প্রাথমিক জন্মক্ষণ থেকেই ছিল---ইহা অনস্বীকার্য। আর্যদেরে আমরা যে কালেই প্রথম লক্ষ্য করি না কেন, সেটা কোনক্রমেই তাঁদের আদিমতা-সংপৃক্ত নয়। তাঁদেরে লক্ষ্য করার কালেই লক্ষ্য করি তাঁদের অসংখ্য শাস্ত্র-গ্রন্থ, এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি-দীপ্ত জীবনচর্যা। সুতরাং সেকালে, সে পরিবেশে, যে ভাবে তাঁদের বিপুলায়তন বৈদিক সাহিত্য পাওয়া যায় সুগঠিত আকারে, সুপরিশীলিত প্রকারে, ঠিক তেমন ভাবেই পাওয়া যায় তাঁদের, রোগ-ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপযোগী আয়ুর্বিজ্ঞান বা আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদের স্রষ্টা বা প্রণেতা মনে করা হয় প্রজাপতিকে। তিনি আয়ুর্বেদ প্রণয়ন করে দিয়েছিলেন শিষ্য ভাস্করকে। ভাস্করও আয়ুর্বেদের স্বতন্ত্র সংহিতা প্রণয়ন করেছিলেন। ভাস্করের শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমেই আয়ুর্বেদ বিস্তৃতি লাভ করে। যাঁহারা উপযুক্ত শিষ্য নির্বাচন করে' সমীচীন সংহিতা, অর্থাৎ

১. ঋগ্বেদ স্যায়ুর্বেদোপ বেদো যজুর্বেদস্য ধনুর্বেদোপবেদঃ।
সামবেদস্য গান্ধর্ববেদোপবেদোঽথর্ববেদস্য শস্ত্রশাস্ত্রাণীতি॥ শৌনকের চরণব্যূহ।

আয়ুর্বেদ-বিষয়ক সংহিতা বা গ্রন্থ প্রণয়ন করে' লোকসমাজের চির কল্যাণ সাধনে অগ্রভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের একটি তালিকা রয়েছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে।[১] পুরাণ (মহাপুরাণ-উপপুরাণ) গ্রন্থগুলো যে, আমাদের অতীত দিনের তথ্য সরবরাহের কত বড় আকড়, তা বলে শেষ করা যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত বলেছে —

ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নকুল, সহদেব, অর্কি, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, করথ এবং অগস্ত্য—এই ষোলজন বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ব্যাধিনাশক বলে কথিত হয়। এঁদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ সমীচীন গ্রন্থ রয়েছে। বৈদিককালের এসব প্রাতঃস্মরণীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রকারগণের তালিকাটি দিয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ যে স্মরণীয় কাজ করেছে তা' অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করতে হয়। অন্যথা, অতীতের অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া এঁদের সন্ধান পাওয়া যেত কি ভাবে? অতএব জানা যাচ্ছে যে, আয়ুর্বেদের মত সর্বসাধারণের কল্যাণকারী শাস্ত্র এবং শাস্ত্রবেত্তা চিকিৎসকশ্রেণীও আর্যদের মধ্যে, সেই আদ্যিকালেই ছিল—এ মানতে কোন অসুবিধা দেখি না। এ-সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পরে পাওয়া যাবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শৌনকের 'চরণব্যূহ' গ্রন্থের মতে ধনুর্বেদ, যজুর্বেদের উপবেদ। মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে ধনুর্বেদের প্রণেতা বলা হয়। ইহাকে (ধনুর্বেদকে) সোজা কথায়, যুদ্ধবিদ্যা বলা যেতে পারে। যুদ্ধেরও প্রশিক্ষণ চাই। তৎকালে সে সম্বন্ধে এই শাস্ত্রই একমাত্র নির্দেশনার আকড়। মূল গ্রন্থ ছাড়াও অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে ইহার অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধবিদ্যাকে যদিও ক্ষাত্রবিদ্যা বলা হয়, তথাপি অন্যেরাও যে ইহা অধ্যয়ন করত, তার অসংখ্য আখ্যান-উপাখ্যান পুরাণাদি শাস্ত্রে পাওয়া যায়। শাস্ত্রাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব মহড়া এ-বিদ্যায় আবশ্যক।

সামবেদের উপবেদ গান্ধর্ববেদ। ইহাতে গানের নানা বিষয় রয়েছে। পরি-শীলিত গীতিশাস্ত্রের মূল এই গান্ধর্ববেদ, প্রাথমিক বলে স্থূল নয় কিন্তু অতি সূক্ষ্ম। তাল-লয় সহকৃত গীতি বা গান সেই আদ্যিকালেও ছিল, ইহা কম বিস্ময়ের কথা নয়। এ বিষয়েও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে।

---

১. ধন্বন্তরির্দিবোদাসঃ কাশীরাজোঽশ্বিনীসুতৌ।
নকুলঃ সহদেবোঽর্কিশ্চ্যবনো জনকো বুধঃ ॥
জাবালো জাজলিঃ পৈলঃ করথোঽগস্ত্য এবচ।
এতে বেদাঙ্গবেদজ্ঞাঃ ষোড়শ ব্যাধিনাশকাঃ ॥ ব্রহ্মবৈ. পু., ব্রহ্ম খ. ১৬ অধ্যায় ॥

অথর্ববেদের উপবেদ বাস্তুশাস্ত্র। ধনুর্বেদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অস্ত্র এবং শস্ত্র উভয়ই আছে। তবে, অথর্ববেদের উপবেদ শস্ত্রশাস্ত্র হলে,[১] তার বিষয়গুলো কিছু ভিন্ন রকম? শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে এ উপবেদের নাম বাস্তুশাস্ত্র। শৌনকের চরণব্যূহ এবং ভাগবতের মতপার্থক্যের নিরসন কঠিন কার্য।

১. চরণব্যূহের মতে।

সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকালের দিকে অভিসরণ

শুধু 'দিগ্‌দর্শন-ন্যায়ে' উপরের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এটা অন্তত প্রতীয়মান হয় যে, সেই বৈদিককালেই, আর্যরা সর্বতোমুখী জ্ঞান-গবেষণার হিমালয়ায়মান শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করে অত্যুন্নত সামগ্রিক সভ্যতার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে কৃতকার্য হয়েছিল। তাঁদের জাতি-গোষ্ঠীর ক্রমধারাও যেমনভাবে বর্তমান, তেমনি তাঁদের সে সব শাস্ত্রগ্রন্থের অস্তিত্বও, এখন পর্যন্ত টিকে আছে। অতীতকে জানতে একমাত্র সেকালের গ্রন্থই নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হতে পারে। যদিও এদেশের গ্রন্থের যে পরিমাণ অংশ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিদেশে পাচার হয়ে হয়ে সে সব বিদেশে পাহাড়-প্রমাণ হয়ে আছে, এদেশে আছে অতি সংক্ষিপ্ত অংশমাত্রই। তা'ও যে সব প্রতিষ্ঠানে আছে, সে সব জায়গায় গবেষকদের প্রতি অনৌদার্যের ফলে ব্যবহার বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছে! দীনেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক 'বাঙালীর সারস্বত অবদান' গ্রন্থে লিখিত পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔদার্য এবং সহানুভূতিশীলতা এবং পুঁথি-প্রাপ্তির সহজতর পন্থা, সত্যিকার অর্থেই, আদর্শ স্থানীয় হলেও, তার অনুসরণ অন্যত্র নেই, তথাপি, যে অংশ মুদ্রিত হয়েছে, এবং যা কিছু পাণ্ডুলিপি প্রাচীনগ্রন্থ পাওয়া যায়, তাব মাধ্যমে সুপ্রাচীন থেকে বর্তমান পর্যন্ত ঐতিহাসিক সেতু সম্ভব না হলেও, অন্তত, সোপান-কাঠামো তৈরি হতে পারে ---তাতে সন্দেহ নেই।

ডঃ আহমদ্ শরীফ কর্তৃক বিধৃত খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী এবং ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক বিধৃত খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হচ্ছে পাণিনির কাল। এই দুই মহাপণ্ডিতের অনুমানের মাঝামাঝিও যদি পাণিনীর কাল ধরা হয়, তবুও নানাবিধ গবেষণায় যা' প্রতিভাত হয় তদনুসারে নিরুক্তকার যাস্কের কাল আরও বহু বছর পিছিয়ে যাবে। আর, যাস্ক কর্তৃক নিরুক্তে উল্লিখিত, এ প্রবন্ধেও পূর্বে লিখিত, সেই আঠারজন সুপ্রাচীন বৈয়াকরণদের মধ্যেকার সর্বপ্রাচীন জনের কাল যে আরও বহু পিছিয়ে যাবে তা'নিঃসন্দেহ। যেহেতু, উল্লিখিত যাস্ক কর্তৃক বিধৃত অতগুলো বৈয়াকরণ বা নিরুক্তকার একসময়ে জন্মান নি নিশ্চয়ই। খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে---এঁদের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবহিত কালের পৌর্বাপর্য রয়েছে:- বোধায়ন তো প্রায় বৈদিককালেরই লোক। তিনিও তাঁর 'ধর্মসূত্রে' মৌদ্‌গল্যের উল্লেখ করেছেন। মৌদ্‌গল্যের পিতা মুদ্‌গল-এঁর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন জাতুকর্ণ্য। জাতুকর্ণ্য একজন সুপ্রাচীন

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। জাতুকর্ণ্যের উল্লেখ আছে 'কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে' এবং 'সাঙ্খ্যায়নশ্রৌতসূত্রে'। জাতুকর্ণ্যের পিতা জাতুকর্ণও একজন সুপ্রাচীন চিকিৎসক। ঔদুম্বরায়ণের পিতা ঋষি ঔদুম্বরও একজন গ্রন্থকার। তাঁর অন্তত তিনখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়—ব্রতনির্ণয়, রাগবিহিংসন ব্রতনির্ণয়, এবং ঔদুম্বরী সংহিতা। ঔদুম্বরীসংহিতা নিম্বার্ক বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ। ভাবলেও বিস্ময় লাগে যে, সেই বৈদিককালেও বৈধহিংসা ছাড়া স্বেচ্ছামত পশুবলির বিরুদ্ধে, রাগবিহিংসন থেকে অর্থাৎ ইচ্ছামত পশুহত্যা থেকে বিরত থাকাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করার স্মার্ত গ্রন্থ—'রাগবিহিংসন ব্রত নির্ণয়' প্রণীত হয়েছিল। ঋক্-প্রাতিশাখ্যে শাকল্যের (১৮) পিতার এবং তাঁর গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 'শাকলমত' প্রসিদ্ধ বৈদিক গ্রন্থ। শাকলসংহিতা এবং শাকলসংহিতাপরিশিষ্ট জ্যোতিষের প্রামাণিক গ্রন্থদ্বয়। তা'ছাড়া, তাঁর ব্যাকরণ তো আছেই। আগ্রায়ণের (৮) পিতা বলে ধারণা করা হয় আগ্রয়ণকে। তাঁর শ্রৌতপরিশিষ্টের নিবন্ধন আছে শ্রীধর আর.ভাণ্ডারকরের 'ডেকান কলেজ' ক্যাটালগে (D154B). আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রে কৌৎসের (১২) উল্লেখ রয়েছে। আপস্তম্বের ধর্মসূত্রে কৌৎস (১২) এবং বার্ষ্যায়ণির (১৭) উল্লেখ পাওয়া যায়। গার্গ্য (১৩) এবং গালবের (১৪) ব্যাকরণ গ্রন্থ ছাড়াও স্মৃতিগ্রন্থে বহুত্র উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যে বাল্মীকির (শিক্ষা গ্রন্থের ২১) উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যের এই উল্লেখ আদি কবির কালনির্দ্ধারণে বিশেষ সহায়ক। রামায়ণকার বাল্মীকি এবং উল্লিখিত অন্যতম শিক্ষাগ্রন্থ-প্রণেতা বাল্মীকি একই ব্যক্তি। সুতরাং রামায়ণের কালনির্ণয় অবশ্যই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তা ঐ তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যের অনুবলে নিরূপিত হতে পারে। এত সব জটিল পৌর্বাপর্য বিন্যাস না করেও ধারণা করা চলে যে, উল্লিখিত প্রাচীন বৈয়াকরণগণ, শিক্ষাগ্রন্থ-রচয়িতৃগণ, খৃষ্টপূর্ব ২/২½ হাজার বছরের পূর্বেরও হতে পারেন সুতরাং আর্যদের জ্ঞান-গ্রন্থ-গরিমা সেই আদিকালেই অভাবনীয়রূপে পরিপুষ্ট ছিল, উন্নত ছিল, মানতেই হয়।

উপরের কালনির্দ্ধারণী আলোচনায় আভাস পাওয়া যায় যে, পাণিনি (খৃঃ পূঃ ৫ম্ বা ৭ম্ শতাব্দী) কর্তৃক উল্লিখিত কিন্তু, যাস্ক যাঁদের নাম করেন নি, তাঁদেরে পাণিনির পূর্বে এবং যাস্কের পরে গ্রহণ করে, আলোচনা চলতে পারে। তা'হলে' স্ফোটায়ন (২), আপিশলি (১), ভারদ্বাজ, (৩), কাশ্যপ (৪), চাক্রবর্মা (৫), এবং সেনক (৬)-প্রভৃতির আগেকার যাস্ক, প্রায় খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগেকার হয়ে

১. ৫।১৩, ৯/৪, ১৮।৬-তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

দাঁড়ায়, যেহেতু বেদব্যাসের মহাভারতেও যাস্কের সপ্রসঙ্গ উল্লেখ আছে। আবার, এই যাস্ক যে ১৮জন প্রাচীন বৈয়াকরণের উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যেকার পূর্বে আলোচিত পৌর্বাপর্য অনুধাবনে আরও যে পাঁচ-সাত শত বৎসর পিছিয়ে যেতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং অভাবনীয়রূপে বিস্তৃত বিশাল এই প্রাচীন-কালের গণ্ডী ক্রমে ক্রমে পেছনে কতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌছাবে—তা' এই মুহূর্তে বলা যায় না। এখনো অনেক প্রাক্তন নিদর্শন বা আলামত পড়ে রয়েছে যে-গুলোর কালিক বিন্যাস অবশ্যই করে দিতে হয়। তাতে অবস্থা শেষ পর্যন্ত যে অন্য রকম হয়ে পড়তে পারে, সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া চলে না। কোন গান-বাজনার বৃহৎ আসরে, প্লাটফর্মের বা বেদীর কিংবা মঞ্চের একান্ত নিকটে দর্শক-শ্রোতার অতিমাত্রায় ভিড় জমে গেলে, একটু দূরের দর্শক-শ্রোতৃমণ্ডলীকে যেভাবে ক্রমে ক্রমে আরও বেশী দূরে সরে যেতে হয়, সেভাবে, বেদ-বেদাঙ্গের কালের পরে অথচ বর্তমানকালের আগে অর্থাৎ মধ্যস্থলে নিবেশ্য অসংখ্য নিদর্শনের চাপে দূরের কাল আরও দূরে ভাবতে হতে পারে। জায়গা দিতে না পারা তো ঐতিহাসিকদের কাজ নয়। তাই, জায়গা দিতে হবে অনেকগুলো স্মৃতি সংহিতার, অনেক মহাপুরাণ-উপপুরাণের, রামায়ণের, মহাভারতের দর্শন-শাস্ত্র-গুলোর, সূত্রসাহিত্যের, তবে এসে পৌছা যাবে—খৃষ্টপূর্ব ৫ম বা ৭তম শতাব্দীতে অর্থাৎ মহাবৈয়াকরণ—পাণিনির কালে। তারপরে অবশ্য, তেমন অসুবিধা নেই। সে থেকে ২/১ শ' বছর বাদেই তো মহাবীরের জৈন ধর্মের এবং গৌতম বুদ্ধের কাল। সে কালে এসে গেলে সাংস্কৃতিক আলোচনা অনেক স্বস্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। একান্ত অজ্ঞানতার তামসী সীমানার মধ্যেকার বিষয়গুলোকে ইতিহাসের আলোকে নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় সময়ের কিছু অপচয় তো হবেই। তথাপি, অনুসন্ধিৎসুদের ধৈর্য থাকতেই হবে। ইতিহাসের যথার্থ রূপ দিতে হলে অস্তিত্ববান্ বস্তুগুলোর স্থানত এবং কালত বিন্যাস ছাড়া, কোন ঐতিহাসিকেরই অধৈর্য হওয়া উচিত না, এবং গ্রন্থকলেবরের আংশিক বৃদ্ধিও সহনশীলতায় মেনে নিতে হয়। সংক্ষেপ করার অজুহাতে বাস্তব বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়া, ইতিহাস প্রণয়নে অপচেষ্টারই নামান্তর। ডঃ আহমদ্ শরীফের পূর্বোল্লিখিত পাণিনির কাল (খৃষ্টপূর্ব ৭ম্ শতাব্দী) উড়িয়ে দেয়া যায় না। পাণিনি যে গৌতম বুদ্ধের আগেকার লোক, তাতে সন্দেহ নেই। তবে, পাশ্চাত্য পণ্ডিত Goldstucker, পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব ৮ম্ শতকের বলে মেনে নিয়েছেন।

পূর্বে উল্লিখিত, মহাভারত রচনার সময় বেদব্যাসের প্রাক্তন নয় প্রকার প্রামাণিক ব্যাকরণ অনুশীলনের প্রসঙ্গ থেকে বুঝা যায়—উল্লিখিত, বেদ এবং বেদাঙ্গের কালের

বহুকাল পরের লোক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। তিনিই একত্র বিমিশ্র অবস্থা ঘেঁটে, চার ভাগে বেদের বিন্যাস করেছিলেন। কতকাল বসে বেদ সে রকম বিমিশ্র দশায় উপনীত হয়েছিল, তা'-ই বা কে জানে? কূর্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতির বর্ণনা অনুসারে, বেদ-বিভাগের সাথেই শাখা-প্রশাখার বিস্তারের কাহিনী সংশ্লিষ্ট। বেদের শাখা-প্রশাখা বিস্তারের কালেই যে বঙ্গদেশেও আর্য-প্রভাব, আর্য-সংস্কৃতি এসে পড়েছিল তার সাক্ষ্য-প্রমাণও বেদেই আছে। তাতে যদি কালের পৌর্বাপর্যও ধরা পড়ে তো উত্তম কথা। বেদের-বিভাগ-বিন্যাস বেদব্যাসেরই কার্য। যার জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের সম্মানিত উপাধি হয়েছে—বেদব্যাস (বেদবিভাজক)। যে উপাধি একক তাঁর এবং তা' সর্বজন ব্যবহারে এখন পর্যন্তও অম্লান আছে। আগেই যদি শাখা-প্রশাখার বিস্তার না ঘটে থাকে তবে, এই সময় থেকে যে তা' হয়েছিল—তা' অস্বীকার করার উপায় নেই।

ইতিহাসের যুগপ্রবর্তক বেদব্যাস এখন অনেকের কাছেই সন্দেহাতীত ঐতিহাসিক পুরুষ। কুরুক্ষেত্রের মহাসমর এখন আর কেহ কল্পকাহিনী মনে করে না। সেটা প্রমাণসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, 'হ্যাঁ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাস্তব ঘটনা'। এখনও সেখানে দূর অতীতের সাক্ষ্যবহ নিদর্শন, তেমন স্পষ্ট না হলেও, আছে। বেদব্যাসের তপঃক্ষেত্র —ব্যাসগুহা (ব্যাসগুম্ফা) হিমালয়ের দুর্গম এলেকায় হাজারো পুণ্যার্থি-সমাগমে এখনও মুখরিত হয়ে ওঠে। সেই ঐতিহাসিক পুরুষ যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অনেক পর পর্যন্তও জীবিত ছিলেন, তা' অনেক গ্রন্থে পরিষ্কার প্রতিপন্ন। বেদবি-ভাগের পরেই হয়তো, যে জোর প্রচারাভিযান স্তিমিত সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার পরিণতিতে বেদও আর্যবসতির কেন্দ্র অতিক্রম করে দূরে প্রসার লাভ করতে থাকে, এবং আর্যাবর্তের পরিধি, শেষটায় সম্প্রসারিত হয়। বঙ্গদেশও আর্যাবর্তের মধ্যেই অবস্থিত। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে পৌণ্ড্রক বাসুদেব দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করেছিল সে বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাত নামক জনপদের সম্ভবত একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিল।[১] তার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উক্ত তিনটি স্থান এবং তাঁর নামের তাৎপর্যও উপস্থাপন করে যে আর্যাবর্তের মধ্যে অবস্থিত এসব অঞ্চল আর্যাচারী ছিল এবং প্রাচ্য ভূভাগে বৈদিক প্রাচ্য শাখাদি বৈদিককালেই প্রসার পেয়ে থাকবে।

১. বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাতেষু রাজা বলসমন্বিতঃ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবেতি যোঽসৌ লোকাভিবিশ্রুতঃ ॥ মহাভা, সভাপ, ১৪শ অঃ ২০ শ্লো

বৈদিক সাহিত্যের বিবরণ

বেদ সুপ্রাচীন আর্য ধর্মশাস্ত্র সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ইহা বিশ্বের আদিমতম গ্রন্থ। ধারণাতীত দীর্ঘকাল চলতে চলতে ইহার অঙ্গের অবক্ষয়ও কম হয় নি। পুরাণ গ্রন্থের অনেক ক'খানায়ই বেদের বিবরণী অল্পাধিক রয়েছে। তাতে, ঋগ্বেদের শাখা ২১টি, যজুর্বেদের ১00, সামবেদের ১000 এবং অথর্বেদের ৯টি শাখার বিবরণ থাকলেও এখন তা সম্পূর্ণ পাওয়া যান না। বর্তমানকালে যে কোন বৃহৎ গ্রন্থের যেভাবে খণ্ড, পরিচ্ছেদ, প্রকরণ, অধ্যায়—প্রভৃতি নামে নানা উপচ্ছেদ নির্দ্ধারিত হয়, বেদ-গ্রন্থেও সেভাবে ছেদ বা ভাগ-বাটারা দেখা যায়। কিন্তু নাম-গুলো অন্যরকম। খণ্ড (Volume) অর্থে মণ্ডল, পরিচ্ছেদ অর্থে অনুবাক, প্রকরণ অর্থে সূক্ত, কবিতা-অর্থে ঋক্ এবং তার নিম্নে শ্লোক। অবক্ষয়িত অবস্থায়ও ঋগ্বেদের আশ্বলায়নী, সঙ্খ্যায়নী, শাকলা, বাস্কলা এবং মাণ্ডুকা শাখা পাঁচটি টিকে আছে। তাতে, ১0 মণ্ডলে, ৮৫ অনুবাকে, ১0২৮টি সূক্তে ১0৬২২টি ঋক্ বা কবিতা রয়েছে। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণও পাওয়া যায় ২ খানা। মহিদাস ঐতরেয়-প্রণীত ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, এবং ঋষি কুষিতকপ্রণীত কৌষিতকিব্রাহ্মণ।

যজুর্বেদ দুইভাগে বিভক্ত—শুক্ল যজুর্বেদ এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদ। উহা যথাক্রমে বাজসনেয়ী এবং তৈত্তিরীয় নামেও অভিহিত। এখন মাত্র কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন শাখাদ্বয় শুক্লে, এবং তৈত্তিরীয় শাখা কৃষ্ণযজুর্বেদে পাওয়া যায়। এ বেদেও, শুক্ল যজুর্বেদের 'শতপথব্রাহ্মণ' এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদের 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ২ খানাই পাওয়া যায়। অন্যগুলোর অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না।

সামবেদের অবক্ষয় হয়েছে আরও বেশী। কৌথুমী এবং রাণ্যায়নী শাখা দু'টি ছাড়া অন্যকোন শাখা পাওয়া যায় না। আট খানা ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে শুধু 'সামবিধান ব্রাহ্মণ' খানাই লভ্য। অন্য ব্রাহ্মণগ্রন্থ ভারতের দাক্ষিণাত্যে থাকার সম্ভাবনা আছে।

অথর্ববেদের ৯টি শাখার মধ্যে কেবল শৌনক শাখাই পাওয়া যায়। আর, গোপথ ব্রাহ্মণ খানাও আছে প্রায় পরিপূর্ণরূপে। অন্য ব্রাহ্মণও একান্ত অলভ্য হয়ে যায় নি।

ভারতের ব্রহ্মাবর্ত[১] স্থানটিই আর্যদের কেন্দ্রীয় বসতি-স্থান। সেখানথেকে পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, এমন কি, নৈঋতাদি কোণেও শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটেছিল। দিগ্‌বিশেষিত শাখার নামকরণের মাধ্যমেই তা' প্রতিপন্ন হয়। প্রাচ্য-কঠশাখা, প্রাচ্যসামগশ্রেণী, উদিচ্যকঠ, উদীচ্যসামগ প্রভৃতি নজির পাওয়া যায়। কে বলতে পারে যে ঐ প্রাচ্যকঠশাখা এবং প্রাচ্যসামগশ্রেণীর রাণ্যায়নীয় ৯ খানা শাখাই (প্রশাখা), ব্রহ্মাবর্ত থেকে পূর্বদিগ্‌বর্তী অঙ্গ, বঙ্গ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রভৃতি স্থানে সম্প্রসারণের কোন সঙ্কেত বহন করে কি না? প্রাচীন 'ব্রহ্মাবর্ত' স্থানটি বর্তমান ভারতের পাঞ্জাব-হারিয়ানা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল।

বেদের সংহিতা গ্রন্থগুলোর কোন রচয়িতা স্বীকার করা হয় না। উহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাণী বা শাব্দব্রহ্ম। যে সকল ঋষির মাধ্যমে ওগুলো প্রথম পরিব্যক্ত হয়েছে তাঁদিগকে বলা হয় দ্রষ্টা। কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থের রচয়িতা আছে। উপনিষদ্‌গুলোও ভ্রম-প্রমাদাদি রহিত আপ্তবাক্যরূপেই স্বীকৃত। মৎস্যপুরাণের মতে ৯১ জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তন্মধ্যে, ৮৫ জন ব্রাহ্মণ, ৩ জন ক্ষত্রিয় এবং ৩ জন বৈশ্য। মৎস্য পুরাণ, সম্ভবত, বিশেষ কোন লক্ষ্যে এই ঋষিদের ৯১ জনের মাত্র উল্লেখ করেছে, বাস্তবে, আরো বহু বৈদিক ঋষি আছেন।

১. সরস্বতী দৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং স্থানং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥

বেদব্যাসের কাল নির্দ্ধারণ

উল্লিখিত বেদ-বিভাগও অতিপ্রাচীন কালের ঘটনা। বেদ-বিভাগকর্তা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেরও বেশ কয়েক বৎসর পরে দেহ রক্ষা করেছেন। ঐ বেদ-ব্যাসের কালকেই যদি ধর্মশাস্ত্রের বা স্মৃতি সংহিতার নিম্নতম কাল ধরা হয়, যেহেতু, স্বয়ং বেদব্যাসও স্মৃতিসংহিতা প্রণয়ন করেছেন, তাহলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন কোন অসামঞ্জস্য হয় না। অবশ্য, বেদ-ব্যাসেরও অনেক আগেকার স্মৃতিসংহিতা বা ধর্মশাস্ত্র এবং সেসবের গ্রন্থকারদের সন্ধান পাওয়া যায়। তথাপি, যত পূর্বকাল থেকে হোক না কেন, বেদ-ব্যাসের কাল পর্যন্ত তাঁদের কালের ব্যাপ্তি ধরা চলে। আগে পরে হবেই। সবাইতো আর একসঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন নি। কত শতাব্দী, না কি সহস্রাব্দী স্মৃতি সংহিতা-কারদের কালের পরিব্যাপ্তি তা, নিশ্চিত করে বলা যায় না। কোন কোন মহাপুরাণে স্মৃতি-সংহিতকারদের অনেকের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের সকলে আর বেদব্যাসের সমসাময়িক হতে পারেন না, অনেকে অনেক আগেকার--নিঃসন্দেহে ধরা যায়। পক্ষান্তরে, মহাপুরাণ এবং উপপুরাণগুলোর কালিক অবস্থান স্মৃতি সংহিতাকারদের পরেই নির্বাচন করতে হবে। স্মৃতিকারের সংখ্যা অনেক বেশী হলেও, ছত্রিশজন অত্যন্ত প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত, যথা---

১। অঙ্গিরা, ২। অত্রি, ৩। আপস্তম্ব, ৪। উশনা, ৫। ঋষ্যশৃঙ্গ, ৬। কাত্যায়ন, ৭। কাশ্যপ, ৮। গোতম, ৯। চ্যাবন, ১০। ছাগলেয়, ১১। জমদগ্নি, ১২। জাবাল, ১৩। দক্ষ, ১৪। নারদ, ১৫। পরাশর, ১৬। পিতামহ, ১৭। পৈঠিনসি, ১৮। প্রচেতা, ১৯। প্রজাপতি, ২০। বৃহস্পতি, ২১। বৌধায়ন, ২২। ভৃগু, ২৩। মনু, ২৪। মরীচি, ২৫। যম, ২৬। যাজ্ঞবল্ক্য, ২৭। লিখিত, ২৮। লোমশ, ২৯। বশিষ্ঠ, ৩০। বিশ্বামিত্র, ৩১। বিষ্ণু, ৩২। ব্যাস, ৩৩। শঙ্খ, ৩৪। শাতাতপ, ৩৫। সম্বর্ত্ত এবং ৩৬। হারীত।

৩৩ সংখ্যক 'শঙ্খ' এবং ২৭ সংখ্যক 'লিখিত' নামের দু'জন সংহিতাকারের যৌথভাবে প্রণীত সংহিতাও রয়েছে। তন্মধ্যে এই ৩৬ জন সংহিতাকারদের নামের তালিকা আছে, যার মধ্যে এঁদের দুজনও বর্তমান।[১]

১. মনুর্বিষ্ণুর্যমোদক্ষ, ইত্যাদি শঙ্খ-লিখিত সংহিতা ॥

সনাতন ধর্মাবলম্বীদিগের ধর্মীয় সামাজিক জীবনে স্মৃতিশাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা করবে, ওটা করবে না, এটায় পুণ্য হয়, ওটায় পাপ হয়—ইত্যাকার বিধি-নিষেধাত্মক নানা বিধি-ব্যবস্থা এই সব স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারেই এযাবৎ চলে আসছে। ধরে নেয়া হয় যে,—এই সব স্মৃতিসংহিতা সর্বরকমে বেদের অনুসারিতায়ই রচিত। সংহিতাকারগণ সাধারণ মানুষ ন'ন। যোগী, চিন্তানায়ক বলেই যথার্থতত্ত্ব অনুধাবনের যোগ্যতা এঁদের ছিল। এঁদের প্রত্যেক নামের সাথে 'সংহিতা' বা 'স্মৃতি' কিংবা 'ধর্মশাস্ত্র' শব্দ যোগ করলেই সংহিতাগুলোর নাম হয়ে যায়। সমানক্ষেত্রে মনুসংহিতার মতেরই প্রাধান্য থাকবে বলে চিরকাল স্থির সিদ্ধান্ত চলে আসছে। এজন্যই বলা হয়- 'মনুর অর্থের বিপরীত স্মৃতি নিন্দনীয়।'[২] পৃথক্‌ক্ষেত্রে অথবা বিশেষ বিধানে প্রত্যেক স্মৃতিই সমগুরুত্বের অধিকারী। নিষ্কর্মমূলক এসব তত্ত্ব সঠিক উদ্‌ঘাটনের জন্যই স্মৃতিনিবন্ধও চিরকালই প্রণীত হয়ে আসছে। সে সব নিবন্ধ প্রধানত এইসব স্মৃতিসংহিতার ভিত্তিতে রচিত হয়। দেশ-কালের উর্ধে পতিষ্ঠিত এসব স্মৃতি-সংহিতা অবলম্বন করেই, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মহাস্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যও ২৮ খানা স্মৃতিতত্ত্ব (নিবন্ধ) প্রণয়ন করেছেন। তাঁর আগের বা পরের সকল স্মার্তনিবন্ধকারগণই এই একই পন্থায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাই, পূর্বসূরিদের স্বীকৃতিমূলক বিধায় এসব স্মার্তগ্রন্থ জন-সমাজে গ্রহণীয়, অন্যথা নয়—এই ধারা অবশ্য লক্ষণীয়। রঘুনন্দন ভট্টাচার্যও তাঁর তিথিতত্ত্বে, তিথির স্বরূপনির্বাচন করতে বলেছেন—'তথাচ ষট্‌ত্রিংশন্মতম্‌' (অর্থ—সেবকমই, প্রসিদ্ধ ৩৬ জন সংহিতাকারের মত) 'এঁদের দোহাই দিয়েই যত ধর্মশাস্ত্রীয় নিবন্ধ, বিধি-ব্যবস্থা।

উল্লিখিত ৩৬ জন সংহিতাকারের তালিকায় ১৭ সংখ্যক পৈঠিনসি। পৈঠিনসি একজন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় স্মার্ত। 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থে হলায়ুধ, পৈঠিনসির অনেকবার উল্লেখ করেছেন, তাঁর সংহিতার বচনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তা'ছাড়া, হেমাদ্রি, মদনপারিজাত, বিজ্ঞানেশ্বর, মাধবাচার্য-প্রভৃতি গ্রন্থ-গ্রন্থকারগণ পৈঠিনসির স্মৃতি থেকে বচন গ্রহণ করেছেন। বৌধায়ন, আপস্তম্ব, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতির ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত পৈঠিনসি, নিজ সংহিতায়, উল্লিখিত ৩৬ জনের মধ্য থেকে অন্তত ১৬ জনের নামোল্লেখ করেছেন। পৈঠিনসির সংহিতায়- অত্রি, আপস্তম্ব, উশনা, গোতম, জমদগ্নি, জাবাল, দক্ষ, ভৃগু, মনু, যম, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, ব্যাস, শঙ্খ, সম্বর্ত এবং হারীতের নাম এবং মতামতের উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে, সমস্ত মহা-

২. বেদার্থৈকনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতম্‌।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে।। বৃহস্পতি সংহিতা।

পুরাণ এবং উপপুরাণ (অন্তত যেগুলোর নিবন্ধন রয়েছে নারদীয় পুরাণে) গুলোর গ্রন্থকার (প্রণেতা বা সম্পাদক) রূপে বেদব্যাসকে জানা যায়। ঐ বেদব্যাসই যে ব্যাসস্মৃতিরও প্রণেতা, তা' বোধহয় সত্য। তা'হলে, পৈঠিনসি ও বেদব্যাস সমকালীন ব্যক্তিদ্বয়। যেহেতু পদ্মপুরাণে পৈঠিনসির প্রসঙ্গ আছে। পৈঠিনসিকর্তৃক উল্লিখিত ১৬ জনের, মধ্যে বেদব্যাসও আছেন। অবশিষ্ট ১৫ জন, হয় পৈঠিনসির পূর্বকালের নয়তো সমকালের—মানতেই হয়।

পদ্মপুরাণেও সংহিতাকারদের—দক্ষ, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, ব্যাস এবং হারীতের নাম পৈঠিনসির নামের সহিত পাওয়া যায়। ফলে, এঁরাও পদ্মপুরাণের কালের বা তার চেয়ে আগেকার না হয়ে পারে না।

যাজ্ঞবল্ক্যেরও বেদব্যাসের সমকালীন হওয়াই সম্ভব। বেদব্যাস, পুত্র শুকদেবকে যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট পাঠিয়েছিলেন অধ্যয়নের জন্য। এখানকার সংহিতা-প্রণেতা কাত্যায়ন, বার্তিককার কাত্যায়নের চেয়ে পৃথক ব্যক্তি যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিতে কাত্যায়নের নাম আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিতেও উল্লিখিত হয়েছে—উশনা, কাত্যায়ন, গোতম, যম, লিখিত, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, ব্যাস, শঙ্খ, শাতাতপ, পরাশর, সম্বর্ত এবং হারীতের বচন। এখানে উল্লিখিত কাত্যায়ন এবং বার্তিককার কাত্যায়ন— উভয়ে ভিন্ন ব্যক্তি — ইহা আগেই বলা হয়েছে।

অবশিষ্ট স্মৃতিকারদেরও, এইভাবে পর্যালোচনায় সুপ্রাচীনত্ব প্রতিভাত হয়। অতএব ধরে নেয়া যায় – স্মৃতিসংহিতাগুলোও অতিপুরাতন কালেরই। সবাই না হলেও, অনেকেই বেদব্যাসের চেয়ে বহু পূর্বকালের, কেহ কেহ তাঁর সমকালীন, দু'চারজন তাঁর অনতিকাল পরেরও হতে পারেন। কারো কারো গ্রন্থ বৃহৎ এবং লঘুরূপে দু'প্রস্তও পাওয়া যায়। হয়তো, বৃহৎ গ্রন্থেরই সারসঙ্কলনাত্মক লঘুসংহিতার সৃষ্টিও অতি পুরাকালেই হয়েছিল, নয়তো, কিছুটা পার্থক্যমূলকও হতে পারে। এভাবে, উল্লিখিত ৩৬ জন ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতার, অন্তত ৪০/৪১ খানা গ্রন্থ, বেদের চেয়েও বেশী আলোচিত হয়ে থাকবে। এখনো ধর্মীয় এবং সামাজিক তথা অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এগুলোই প্রয়োজনে আসে বেশী। বেদ, সে তুলনায় অনেক কম ব্যবহার্য।

উল্লিখিত স্মৃতিসংহিতাকারদের মধ্যে বৌধায়নও রয়েছেন (২১ নং)। তাঁর সম্বন্ধে অনেকের সংশয়ও দেখা যায় যে, ধর্মসূত্রকার বৌধায়ন এবং স্মৃতিসংহিতাকার

বৌধায়ন এক ব্যক্তি কি না? ধর্মসূত্রও বৈদিক কালের গ্রন্থ, এবং স্মৃতিসংহিতা-খানাও সেকালেই রচিত বলে প্রতিপন্ন। একই সময়ে একনামে সমান বিষয়ের, সমান গুরুত্ববহ একাধিক গ্রন্থকারের সন্ধান বিরল। তদুপরি, উভয় গ্রন্থের প্রতিপাদিত বিষয়ের সমানক্ষেত্রে মতসাম্য প্রভৃতি প্রমাণ করে যে উভয় গ্রন্থের গ্রন্থকর্তা এক বৌধায়ন। বৌধায়নের কাল-নির্দ্ধারণী আলোচনায়ও বৈদিক কালিকতা পাওয়া যায়। ড: রমেশচন্দ্র মজুমদারও লিখছেন—"বৈদিক যুগের শেষ ভাগে রচিত বৌধায়ন ধর্মসূত্রে পুণ্ড ও বঙ্গদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতাব বহির্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।"*

বৌধায়নের ধর্মসূত্র বৃহৎ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ শ্রৌতসূত্র নামেও পরিচিত। বহুগ্রন্থের একত্র সংগ্রথন থাকলে তা' গ্রন্থাবলী নামেই, বর্তমান কালে ব্যবহৃত হয়। সে অনুসারে বৌধায়নের ধর্মসূত্র বা শ্রৌতসূত্রকে গ্রন্থ না বলে গ্রন্থাবলী বলাই বাস্তবধর্মী হয়। এই গ্রন্থখানার ভিতরকার পৃথক্ পৃথক্ অংশ, পৃথক্ গ্রন্থরূপে চিরকাল সমাজে প্রচলিত। তাই, প্রাচীন পুঁথি-পুস্তকের নিবন্ধনীতে সেরকম নিবন্ধনের বিষয় হয়ে আছে নিম্নলিখিত একশ' খানা গ্রন্থ:

১। অগ্নিচয়নকারিকা, ২। অগ্নিষ্টোমপ্রয়োগ, ৩। অগ্নিষ্টোমসূত্র, ৪। অগ্নিহোত্রবিধি, ৫। অগ্ন্যাধানপ্রয়োগ, ৬। অতিরাত্র [যাগ] প্রয়োগ, ৭। অগ্ন্যারম্ভনীয়, ৮। অগ্নিধ্রপ্রয়োগ, ৯। আগ্রায়ণসূত্র, ১০। আধান, ১১। আধান প্রয়োগ, ১২। আধানহোম প্রকরণ, ১৩। অপ্তোর্যামসূত্র, ১৪। আপ্তোর্যাম প্রয়োগ, ১৫। উত্তরসূত্র, ১৬। উন্নেত্রি প্রয়োগ ১৭। উপব্যাহরণ প্রয়োগ, ১৮। ঐকাহিক চাতুর্মাস্য প্রয়োগ, ১৯। ঐষ্টিক প্রায়শ্চিত্ত, ২০। কর্মান্তসূত্র, ২১। কল্পসূত্র কারিকা, ২২। কাঠকসূত্র, ২৩। কাম্যেষ্টি, ২৪। কাম্যেষ্টি প্রয়োগ ২৫। কোকিল সৌত্রামণি প্রয়োগ, ২৬। চয়ন-পঞ্চম-প্রস্তাবকারিকা, ২৭। চয়ন-প্রথম-প্রস্তার কারিকা, ২৮। চয়ন-মন্ত্রানুক্রমণী, ২৯। চয়নসূত্র, ৩০। চাতুর্মাস্য পদ্ধতি,

---

* মোটেই না। বৌধায়ণ বলেছেন—অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥

বৌধায়নের ওই কথায়ই জানা যায় যে এসব দেশে আর্যতীর্থক্ষেত্র ছিল। কি করে তা হয়? দেশবাসীরা আর্যেতর হলে সেখানে আর্য্য তীর্থস্থান তো আর নিজে নিজে হয় নি। তাই ঘটনা অন্যরূপ। মৎস্যাদি ভক্ষণ প্রভৃতি এসব দেশের সদাচার হলেও নিরামিষাশী আর্যাচারের দৃষ্টিতে, হয়তো, কদাচার। এসব বহু কারণে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কথা বলেছেন বৌধায়ন।

৩১। চাতুর্মাস্য প্রয়োগ, ৩২। চাতর্মাস্যসূত্র, ৩৩। জ্যোতিষ্টোম পদ্ধতি, ৩৪। দর্শপূর্ণমাস পদ্ধতি, ৩৫। দর্শপূর্ণমাস প্রয়োগ, ৩৬। দর্শপূর্ণমাস প্রায়শ্চিত্ত, ৩৭। দর্শপূর্ণমাস-প্রায়শ্চিত্ত-কারিকা, ৩৮। দর্শপূর্ণমাসসূত্র, ৩৯। দিগ্‌বিজয়েষ্টি প্রয়োগ, ৪০। দ্বাদশাহ-রাজসূয়-বাজপেয়-সূত্র, ৪১। দ্বৈধসূত্র, ৪২। নক্ষত্র-শান্তি, ৪৩। নক্ষত্র-সত্র, ৪৪। নক্ষত্র-সত্র প্রয়োগ, ৪৫। নক্ষত্র-সত্র-হৌত্রবিধি, ৪৬। পশু প্রয়োগ, ৪৭। পশুবন্ধ প্রয়োগ, ৪৮। পশু সূত্র, ৪৯। পুনরাধেয় প্রয়োগ, ৫০। পৌণ্ডরিক প্রয়োগ, ৫১। প্রতিপ্রস্থাতৃ প্রয়োগ, ৫২। প্রবর্গ্য সূত্র, ৫৩। প্রায়শ্চিত্ত কারিকা, ৫৪। প্রায়শ্চিত্ত সূত্র, ৫৫। ব্রহ্মত্ব প্রয়োগ, ৫৬। ব্রহ্মযজ্ঞ, ৫৭। মন্ত্রাণুক্রমণী, ৫৮। মহাগ্নিচয়ন, ৫৯। মহাগ্নিচয়ন প্রয়োগ, ৬০। মহাগ্নিবিধি, ৬১। মিত্রবিন্দা, ৬২। মৃগারেষ্টি সূত্র, ৬৩। মৃগারেষ্টি প্রয়োগ, ৬৪। মৃগারেষ্টি হৌত্র, ৬৫। মৈত্রাবরুণ সোম প্রয়োগ, ৬৬। যজমান প্রয়োগ, ৬৭। যজ্ঞ প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, ৬৮। যতিসমারাধন বিধি, ৬৯। রহস্যেষ্টি পদ্ধতি, ৭০। রুদ্র-পদ্ধতি, ৭১। লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা, ৭২। লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিধি, ৭৩। বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা, ৭৪। শান্তিখণ্ড, ৭৫। শুল্বসূত্র, ৭৬। সন্ন্যাসবিধি, ৭৭। সর্গসত্র, ৭৮। সহস্রভোজনসূত্র, ৭৯। সাবিত্র চয়নপ্রয়োগ, ৮০। সোমকারিকা, ৮১। সোমপঞ্চক, ৮২। সোমপদ্ধতি, ৮৩। সোমপ্রয়োগ, ৮৪। সোমভক্ষণবিধি, ৮৫। সোমমন্ত্রাণুক্রমণিকা ৮৬। সোমসূত্র, ৮৭। সোমাগ্নিষ্টোম বিধি, ৮৮। সৌত্রামণি পদ্ধতি, ৮৯। সৌত্রামণিপ্রয়োগ ৯০। হৌত্রপ্রয়োগ (গৃহ্যসম্বন্ধীয়) ৯১। গৃহ্যসূত্র, ৯২। আহিতাগ্নিনির্ণয়, ৯৩। গৃহ্যপ্রয়োগ, ৯৪। গৃহ্যমালা, ৯৫। গৃহ্যাগ্নিসাগব, ৯৬। দর্শশ্রাদ্ধবিধি: নিজ গ্রন্থের টীকা, ৯৭। পুনরাধান-টীকা-সুবোধিনী, ৯৮। প্রবরখণ্ড ভাষ্য, ৯৯। প্রায়শ্চিত্ত টীকা, এবং ১০০। প্রায়শ্চিত্তেষ্টি চন্দ্রিকা।

বোধায়নের সমকক্ষ না হলেও, উল্লিখিত স্মৃতিগ্রন্থকারদের মধ্যে অনেকে বহু সমীচীন গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনেকেই, তন্মধ্যে, প্রায়ই বোধায়নতুল্য, যেমন— আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন, গোভিল, গোভিলপুত্র, দ্রাহ্যায়ণ, পারস্কর, পরাশর — প্রভৃতি। শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র এবং শুল্বসূত্র — গ্রন্থত্রয় আপস্তম্বের গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত। বিষয়াবলীর গুরুত্বে তা প্রায়ই বোধায়নের ধর্মসূত্রের তুল্য।

আশ্বলায়নের গ্রন্থ প্রচুর। বৈদিক কালের গ্রন্থকারদের মধ্যে এঁর একটি মর্যাদান্বিত স্থান আছে। তাঁর গ্রন্থগুলো —১। শ্রৌতসূত্র, ২। গৃহ্যসূত্র (যাহা আকারে প্রকারে প্রায়ই বোধায়নের গ্রন্থের কাছাকাছি), ৩। অগ্নিহোত্র হোমপদ্ধতি, ৪। অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতি, ৫। অপরপ্রয়োগ, ৬। অগ্নীধ্র প্রয়োগ,

৭। আধানসূত্র, ৮। ঔর্দ্ধদেহিক পদ্ধতি, ৯। পুনরুপনয়ন-বিধান-কারিকা। ১০। গৃহ্যসূত্র মন্ত্রসংহিতা, ১১। চাতুর্মাস্য সূত্র, ১২। দর্শপূর্ণমাস সূত্র, ১৩। দ্বাদশাহ হৌত্র প্রয়োগ, ১৪। গৃহ্যপরিশিষ্ট, ১৫। পার্বণশ্রাদ্ধবিধি, ১৬। পূর্ব প্রয়োগ, ১৭। প্রায়শ্চিত্ত বিধি, ১৮। ব্রহ্মত্বসিদ্ধান্ত, ১৯। ভোজনবিধি, ২০। মহারুদ্রবিধান, ২১। মহাসরস্বতী স্তোত্র, ২২। বিনায়ক স্তবরাজ, ২৩। শান্তি প্রক্রিয়া, ২৪। শ্রাদ্ধপদ্ধতি (সাধারণ), ২৫। শ্রাবণী, ২৬। সন্ধ্যাবিধি, ২৭। সরস্বতী-দ্বাদশ নাম স্তোত্র, ২৮। সোম প্রায়শ্চিত্ত, ২৯। স্থালীপাক, ৩০। স্থালীপাক প্রয়োগ (পদ্ধতি), ৩১। হোম প্রয়োগ।

গোভিলও খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করে আর্যশাস্ত্রকারদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার আসন পেয়েছিলেন। তাঁর সর্বপ্রধান গ্রন্থ ১। গৃহ্যসূত্র। সামবেদীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম—সামাজিক সংস্কৃতির অধিকাংশ ইতিকর্তব্যতার নির্দ্ধারণে এ গ্রন্থের ভূমিকা অনন্য। তা' ছাড়া, ২। অভিষেকমন্ত্র, ৩। উপনয়নতন্ত্র, ৪। গৃহ্যাকারিকা, ৫। গোপ্রধানতত্ত্ব, ৬। গ্রহস্থাপনা, ৭। নবগ্রহ শান্তি, ৮। নারায়ণ-বলি-বিধান, ৯। নারায়ণবলি-প্রয়োগ, ১০। সামবেদীয় নৈগেয়সূত্র, ১১। সামবেদীয় পুষ্পসূত্র, ১২। রক্ষামন্ত্র, ১৩। বিবাহ-পদ্ধতি, ১৪। বিষ্ণুপূজন, ১৫। বিষ্ণুশ্রাদ্ধ, ১৬। কর্মপ্রদীপ/গোভিল স্মৃতি, ১৭। গোভিলীয় শ্রাদ্ধকল্প, ১৮। সর্গবর্গ, ১৯। স্নানবিধি, এবং ২০। সামবেদীয় গোভিল-পরিশিষ্ট—তাঁর বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ।

গোভিলপুত্রও বৈদিক কালের একজন বিশিষ্ট গ্রন্থকার। তিনি কখনো নিজনাম, গ্রন্থকর্তারূপে ব্যবহার করেন নি। পিতৃ-পরিচয়মূলক কৃতী পুত্রের এহেন নিষ্ঠা, এযাবৎ আর কারও দেখি নি। বাণভট্টের পুত্র প্রায় পিতার সমকক্ষতা অর্জন করেছিলেন, এবং পিতার আরব্ধ কাদম্বরী নামক অনন্য গ্রন্থের প্রায় সমান তালে, সমানলয়ে আকারেও প্রায় পূর্বভাগের তুল্য উত্তর ভাগ লিখে আরব্ধ পিতৃ কার্যের পূর্ণায়ণে কৃতকার্যও হয়েছিলেন—সন্দেহ নেই। তিনি তাঁর ভূষণভট্ট নাম ব্যবহার করেছেন। আর, গোভিলের এই পুত্র, কোথাও স্বকীয় নাম ব্যবহারই করেন নি। ইহা, একদিকে পিতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাতিশয় এবং অপরাপর শাস্ত্রীয় চিন্তা-চেতনায় অভিন্নরূপতা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে, পিতার প্রসিদ্ধি অম্লান থাকতে উপযুক্ত বলে বিবেচিতও হয়। গোভিল পুত্রের গ্রন্থ—গৃহ্যসংগ্রহ বা গোভিলসূত্র সংহিতা। পিতার সূত্রগ্রন্থের পুত্রকর্তৃক সংগ্রহ যেন এক নতুন জিজ্ঞাসার উপস্থাপন করে। হয় গোভিল তাঁর সূত্রগ্রন্থ সুবিন্যস্ত করে যান নি, নয়তো, কোন কারণে তা বিনষ্টির পাল্লায় পড়েছিল?

দ্রাহ্যায়ণ :—দ্রাহ্যায়ণও একজন বৈদিক যুগের উল্লেখযোগ্য সূত্র-সাহিত্যকার। তিনিও বৃহৎ এবং বহুবিষয়বিশিষ্ট, ১। শ্রৌতসূত্র, এবং ২। গৃহ্যসূত্র প্রণয়ন করেছেন। দ্রাহ্যায়ণের শ্রৌতসূত্র, গোভিলের শ্রৌতসূত্রের ন্যায় সামবেদীয় গ্রন্থ। গৃহ্যসূত্রখানা কারিকাত্মক। ইহার নাম কেহ কেহ খাদিরসূত্র ও বলেন।

পারস্কর :—ইনিও, ১। গৃহ্যসূত্র, ২। গৃহ্যপরিশিষ্ট, এবং ৩। পারস্কর-সংহিতা প্রণয়ন করেছেন। বামনের পুত্র গদাধর কর্তৃক পারস্কর গৃহ্যসূত্রের ভাষ্যপ্রণয়ন, রেণুকাচার্যের পারস্করগৃহ্যকারিকার টীকা, এবং ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থে হলায়ুধ কর্তৃক তাঁর বহু উদ্ধৃতি, তাঁর সম্বন্ধে গৌরবিত প্রতিষ্ঠারই ইঙ্গিত বহন করে। পারস্করের গৃহ্যসূত্র বৈদিক সংস্কারের তত্ত্বে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

পরাশর :—স্মৃতিসংহিতাকার পরাশর আর ইনি এক ব্যক্তি কিনা —বলা যায় না। সংহিতাকার পরাশরকে অনেকেই বেদব্যাসের পিতা মনে করেন। ইনি হয়তো, তার চেয়ে পৃথক ব্যক্তি। তথাপি তিনি খুব বেশী পরবর্তীও ন'ন। ইঁহার জ্যোতির্গ্রন্থগুলো, জ্যোতিষশাস্ত্রের সুপ্রাচীন আকড় গ্রন্থ হিসাবেই চিরকাল বিবেচিত হয়ে আসছে। পঞ্চম খৃষ্টাব্দীয় বরাহমিহির, তৎপূর্বকালের ভদন্ত বা সত্যাচার্য—প্রভৃতি পরাশরজ্যোতিষের বহু উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন। ইঁহার গ্রন্থগুলো হচ্ছে—১। উরুদায় প্রদীপ বা পারাশর হোরা। ইহা লঘু এবং বৃহৎ উভয়রূপেই পাওয়া যায়। অপর গ্রন্থ ২। গ্রহাধ্যায়, ৩। পারাশর জাতক (ফলিত জ্যোতিষ), এবং ৪। ভাষাকৌমুদী (পারাশর হোরার ব্যাখ্যা)। প্রসঙ্গত বলা চলে যে, পাঁচ পুরুষ সময়ের মধ্যে বশিষ্ঠ পরিবারে যে চারজন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী বলে প্রতিপন্ন, আর্যসংস্কৃতির গোটা ইতিহাসে তাঁদের তুল্য আর দেখা যায় না। তাঁদের অবদান সর্বাধিক। বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, তার পুত্র পরাশর। তাঁর ছেলে বেদব্যাস, আর বেদব্যাসের পুত্র শুকদেব। এই পাঁচ পুরুষের মধ্যে বশিষ্ঠ, পরাশর এবং ব্যাস ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। শুকদেবেরও গ্রন্থ আছে, তবে অনেক শুকদেবদের ভিড়ে এখন সেই শুকদেবকে খুঁজে নেয়া এবং তাঁর গ্রন্থ বার করা সহজ নহে। সে যা'ই হোক, বেদব্যাসের উক্ত পিতাই যদি, স্মৃতিসংহিতা বাদেও, এসব গ্রন্থের রচনা করে থাকেন, তবে তো, বেদব্যাসের চেয়েও ৩০/৪০ বছরের আগেকার ধরতে হয়ই।

শৌনক : বিখ্যাত শাস্ত্রকার এবং বিদ্যাতীর্থ শৌনক, সমাজে বেদব্যাসের পরেই প্রতিষ্ঠাপন্ন। সমাজের সম্ভাব্য কলুষ-অপনোদন এবং সত্যিকার মননশীলতার

উদ্বোধনে তাঁর তুলনা নেই। তিনিও বহু গ্রন্থের প্রণেতা অন্যতম কুলপতি। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে তার উদ্ধৃতি এবং উল্লেখ থাকায়, ধরে নেয়া চলে যে, তিনি আশ্বলায়নের চেয়ে কিছু আগেকার লোক। অথর্বপ্রাতিশাখ্য এবং বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যে শৌনকের উল্লেখ আছে। অথচ, আমরা জানি যে, বেদব্যাসের শিষ্য সূত, শৌনকের আতিথ্য গ্রহণ করে ভাগবত-কথা শুনিয়েছিলেন। সুতরাং শৌনকের কাল, বেদব্যাসের জীবন কালের মধ্য থেকে কিঞ্চিৎ পর পর্যন্তও যদি চলে, তবুও সে প্রাচীন কালেরই ব্যাপার। প্রাতিশাখ্যগুলোও, বেদের বিস্তার কালের গ্রন্থ। তা' বেদব্যাসের বেদ-বিন্যাসের পরেই হয়ে থাকবে। তাই, উল্লিখিত অথর্ব প্রাতিশাখ্য এবং বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যে শৌনকের উল্লেখ সম্ভব হয়েছে। শৌনকের গ্রন্থগুলো হচ্ছে ১। অনুবাকানুক্রমণী, ২। আয়ুষ্যহোমপদ্ধতি, ৩। আর্ষানুক্রমণী, ৪। উগ্ররথ শান্তি প্রয়োগ, ৫। উদকশান্তি-প্রতিসরবন্ধ প্রয়োগ, ৬। উপলেখ বৃত্তি, ৭। ঋগ্‌বিধান, ৮। ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য, ৯। ঋষিচ্ছন্দোহনুক্রমণিকা ১০। একদণ্ডিসন্ন্যাসবিধি, ১১। অথর্ববেদীয় চতুরাধ্যায়িকা, ১২। জীবচ্ছ্রাদ্ধ প্রয়োগ, ১৩। নাগবলি, ১৪। পবমানহোম বিধি, ১৫। পাদানুক্রমণী, ১৬। পুনরাধান ধার্যাগ্নিহোত্র প্রয়োগ, ১৭। বৃহদ্দেবতা, ১৮। বাস্তুশান্তি প্রয়োগ, ১৯। বিবাহ পটল, ২০। বিষ্ণুধর্ম, ২১। শান্তি-বিধি পদ্ধতি, ২২। সূক্তানুক্রমণী, ২৩। সোমোৎ-পত্তিপরিশিষ্ট—প্রভৃতি ছাড়াও, ২৪। শৌনককারিকা (গৃহ্যবিষয়ক), ২৫। শৌনক সূত্র, এবং ২৬। শৌনকস্মৃতি, আর্যসংস্কৃতিতে বিশেষ অবলম্বন।

শাঙ্খ্যায়ন: ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রণেতা শাঙ্খ্যায়ন বৈদিক কালের গ্রন্থকার। পূর্বোল্লিখিত কৌষিতকিব্রাহ্মণের প্রণেতা ঋষি কুষিতক এবং শাঙ্খ্যায়ন, মনে হয় এক ব্যক্তি। কৌষিতকিব্রাহ্মণকেই শাঙ্খায়নব্রাহ্মণও বলা হয়। শুক্ল যজুর্বেদের কৌষিতকী উপনিষৎ শাঙ্খ্যায়নব্রাহ্মণের অন্তর্গত। এই বৈদিক গ্রন্থ-প্রণেতার ১। শ্রৌতসূত্র, ২। গৃহ্যসূত্র, ৩। প্রৈষাধ্যায়, ৪। মহাব্রত, ৫। পরিশিষ্ট, ৬। প্রতিষ্ঠা, ৭। মহা-রুদ্র পদ্ধতি, ৮। রুদ্রজাপবিধি, ৯। রুদ্রন্যাস এবং ১০। বৈদিক বিধান প্রভৃতি গ্রন্থ এখনও ধর্মশাস্ত্রে উপজীব্য এবং সংশ্লিষ্ট বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। আর্য সংস্কৃতির বিকাশ-বিস্তারের ধারায় শাঙ্খ্যায়নের গ্রন্থ গুরুত্বপ্রাপ্ত।

এগুলো বাদেও, ভরদ্বাজের শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র; মানব শ্রৌতসূত্র, মানব গৃহ্যসূত্র; লাঘবায়নের শ্রৌতসূত্র, লাট্যায়নের শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র; শাট্যায়নের শ্রৌতসূত্র গৃহ্যসূত্র; শাণ্ডিল্যের সূত্র গ্রন্থ প্রভৃতি বহু প্রাচীন পুঁথি-পত্র সেই বৈদিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ক্রম-ধারায় আর্য সংস্কৃতির আকড় গ্রন্থ হিসাবে

চলছে। নারদের ভক্তিসূত্র এবং শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্র আর্য ভক্তিশাস্ত্রের সুন্দর গ্রন্থ। অন্নের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণে এ গ্রন্থদ্বয় অনন্য। দিন-কালের ব্যবধানে শাস্ত্রীয় আখ্যা-অভিধাও, ব্যবহারের মধ্যদিয়ে যে কত ভিন্নার্থে পর্যবসিত হতে পারে তা' ভাবলে বিস্ময় লাগে। নারদের ভক্তিসূত্রের দ্বিতীয় সূত্রটি হচ্ছে "সা তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা" —অর্থ, সে ভক্তিই সেই বিশ্ব নিয়ন্তার প্রতি হলে তা' পরম প্রেম স্বরূপ। আর, আজকাল, প্রেম কথাটার অর্থ কত বিকৃত হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভক্তিতত্ত্বের উদ্‌গাতারূপে শাণ্ডিল্যের এবং নারদের খ্যাতি আছে। পরবর্তীকালে ভক্তির যে প্রাবল্য নানা সম্প্রদায়ের অসংখ্য গ্রন্থে বিস্তারিত হয়েছে তার মূল এই শাণ্ডিল্য এবং নারদের উল্লিখিত সূত্র গ্রন্থ দু'খানা —এটা বিশ্বাস করাব কারণ আছে।

দর্শনশাস্ত্রের সাথে বেদের কোন কাল-বৈষম্য নেই। বেদের উপনিষদ্‌গুলোই তো আদিমতম দার্শনিক গ্রন্থ। পরমপুরুষ সৃষ্টিকর্তার ধ্যান-ধারণা, পর্যানুশীলন, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন—সবই উপনিষদে বিস্তারিত। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের চরম এবং পরম লভ্যের উদ্দেশ, উপায় এবং তার যাবতীয় আনুষঙ্গিকতা, অতি নিপুণভাবে উপনিষদে বর্তমান। সুতরাং আর্য-দর্শনের মূল গ্রন্থ উপনিষদ্। আবার, উপনিষদেই বহুবিদ্যার মধ্যে বিভিন্ন দর্শনমতের কথা পাওয়া যায়। দর্শনগুলোর শুধু যে নাম করেছে সে সব স্থানে তা নয়। সেগুলোর অধ্যয়ন অধ্যাপনার কথাই রয়েছে প্রচুব। বিভিন্ন দর্শনের উপাদেয়তা-অনুপাদেয়তা, আস্তিক্য-নাস্তিক্য হিসাবে শ্রেণীকরণ – সমস্তই ছান্দোগ্যোপনিষৎ—প্রভৃতিতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

সুতরাং বুঝা যায় না কি যে, দর্শনশাস্ত্রও বৈদিক কালেই ছিল? বাকোবাক্য শব্দদ্বারা ন্যায়-বৈশেষিকের, ব্রহ্মবিদ্যা শব্দদ্বারা বেদান্তের তো উল্লেখই রয়েছে। তা'ছাড়া, এরকম সন্দর্ভ বহু উপস্থাপন করা যায়—যার মধ্যে সাঙ্খ্য-যোগ-মীমাংসা-শৈব-শাক্ত-গাণপত্য-সৌর – যাবতীয় আস্তিক দর্শনের বিষয় আছে। রয়েছে নাস্তিক দর্শনগুলোরও। চার্বাক দর্শন, বার্হস্পত্য দর্শন, প্রভৃতি তৎকালেই ছিল। বৈদিক সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রত্ন। সংস্কৃতি বিষয়ের অনুশীলনে তাই ভাষিক সাংস্কৃতিক আলোচনা একান্ত অপরিহার্য। বৈদিক কাল কথাটাদ্বারা এমন একটা বিশাল কালকে বুঝান হয়, যে তা' কত শতাব্দব্যাপী বা কত সহস্রাব্দব্যাপী তার কোন সঠিক ইয়ত্তা ইতিহাসে নেই। থাকতে হয়তো পারতো, কিন্তু কিছুদিন পর্যন্ত একটা ঐতিহাসিক 'গোষ্ঠীতন্ত্র'ই প্রত্যক্ষ বাঁধা হিসাবে কাজ করছে। দিগভ্রান্তির ন্যায়, দৃষ্টি কুণ্ঠাও, একবার ঘটলে, সহসা ছাড়তে চায় না। নইলে, 'দানিকেন তত্ত্ব' নামক এক নতুন তত্ত্ব, এখন প্রায় সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর

লেখা গ্রন্থগুলোর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদও হয়েছে বিভিন্ন দেশে। কলিকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষার অধ্যাপক অজিত দত্ত কর্তৃক অনূদিত কয়েকখানা গ্রন্থে দেখেছি যে, প্রাচীন সুপ্রাচীন সভ্যতার সাক্ষ্যবহ শত শত জিনিষ পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে, যার সত্যিকার ব্যাখ্যা, যথার্থ পাঠোদ্ধার বা মর্মোদ্ধার এখন পর্যন্তও হয় নি। অথচ তা বর্তমান মনুষ্য সমাজের কাছে শুধু বিস্ময় রূপেই গণ্য। দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডরে মোরোনা সান্তিয়াগো'প্রদেশের ৭/৮ শতফুট মাটির তলাদিয়ে শত শত মাইল লম্বা অতিকায় সুরঙ্গশ্রেণী, অথবা ঈষ্টারদ্বীপের অত বড় বড় পাথরের মূর্তিগুলো, কিম্বা-এবকম শত শত বস্তুর যে লহর দানিকেন-এঁর গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে, তা'যে অতীতের অন্তরালে লুকিয়ে যাওয়া বহু সুপ্রাচীন সভ্যতার সাক্ষ্যবহ তা' এখন অবিশ্বাস করে নিজের মনকে বুঝদেয়া চলে না। এখন মানুষের দৃষ্টি খুলে যাওয়ার অনেক আলামত দানিকেন, পৃথিবীটা ঘুরে ঘুরে জোগার করে দিয়েছেন। কেবল বিশ্বাস করলেই হয় যে, হ্যঁা হাজারো না হলেও শত শত সুপ্রাচীন সভ্যতা খৃষ্টকালের হাজার হাজার বছর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আর, এই আর্য সংস্কৃতিটা সেবকম ধ্বংস হয়ে যায় নি, যে কোন কারণেই হোক্ তেড়িয়ে বেঁকিয়ে এখনো চলে। মনে রাখা দরকার যে, ভারত ভূমিতে আর্যরা যদি এসেই থাকে, এবং ভারতের মাটিতে বসেও বেদের কোন কোন অংশ সংযোজিত হয়ে থাকে, তথাপি বেদ তাঁদের অতিপ্রাচীন কাল-থেকেই চলতেছিল ধর্মগ্রন্থরূপে এবং ভারতে আসবার আগেকার বহু প্রাচীন তথ্য বেদের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।[১] সুতরাং যেটাকে বৈদিক কালরূপে চিহ্নিত করব, সেটায়ই সভ্যতার আরো আবো সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গরূপে মিলে যাবে। দর্শন তত্ত্বতো অবশ্যই বৈদিক কালের।[২] দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় উপনিষদগুলোই প্রথম সন্নিবেশ্য গ্রন্থ। উপনিষৎ বেদের অংশ হলেও, যেহেতু এগুলোতেই আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা-ই প্রধান, সেহেতু এগুলোকে দর্শনতত্ত্বের স্তবে সংস্থাপনই ভাল। উপনিষদের মোট সংখ্যা জানা না গেলেও, মুক্তিকোপনিষদের মধ্যে যে উপনিষৎ নিবন্ধনী রয়েছে তদনুসারে উপস্থাপিত হল :

১. "ঋগ্বেদে খ্রি-পূ ৬000 অব্দের পূর্বের স্মৃতিও আছে।" শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যা-নিধি কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ 'বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়।' ১৩৪৬ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা।

২. "ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদ মাথর্বনং চতুর্থং, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং, পিত্র্যং, দৈবং, নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং, বেদবিদ্যাং, ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং, নক্ষত্রবিদ্যাং, সর্পদেবজনবিদ্যাং, এতদ্ ভগবোহধ্যেমি।" ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭/১/২

সামবেদের উপনিষৎ, ১৬ খানা—১। অব্যক্তোপনিষৎ, ২। আরুণ্যুপনিষৎ, ৩। কুণ্ডিকোপনিষৎ, ৪। কেনোপনিষৎ, ৫। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬। জাবাল-দর্শনোপনিষৎ, ৭। জাবাল্যুপনিষৎ, ৮। মহদুপনিষৎ, ৯। মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ, ১০। মৈত্রেয়্যুপনিষৎ, ১১। যোগ চূড়ামণ্যুপনিষৎ, ১২। রুদ্রাক্ষোপনিষৎ, ১৩। বজ্রসূচিকোপনিষৎ, ১৪। বাসুদেবোপনিষৎ, ১৫। সন্ন্যাসোপনিষৎ এবং ১৬। সাবিত্র্যুপনিষৎ।

এখানকার ৬ষ্ঠ জাবাল দর্শনোপনিষৎ, এবং অথর্ববেদীয় উপনিষদাবলীর ৭ম্ জাবালোপনিষৎ, দু'খানা ভিন্ন গ্রন্থ।

যজুর্বেদের বিভাগ দু'টি। শুক্লযজুর্বেদ এবং কৃষ্ণযজুর্বেদ। উভয় শাখার, যথাক্রমে ১৯ এবং ৩২ খানা উপনিষৎ আছে। শুক্লযজুর্বেদের যথা—১। অতীতাধ্যাত্ম, ২। ঈশাবাস্য, ৩। যাবাল, ৪। তারসার, ৫। তুরীয়, ৬। ত্রিশিখী, ৭। নিরালম্ব, ৮। পরম হংস, ৯। পৈঙ্গল, ১০। ব্রাহ্মণমণ্ডল, ১১। ব্রহ্মণদ্বয়তারক, ১২। ভিক্ষু, ১৩। মন্ত্রিকা, ১৪। মুক্তিকা, ১৫। যাজ্ঞবল্ক্য, ১৬। বৃহদারণ্যক, ১৭। শাট্যায়নী, ১৮। সুবাল এবং ১৯। হংস।।

কৃষ্ণযজুর্বেদের, যথা—

১। অক্ষি, ২। অমৃতনাদ, ৩। অমৃতবিন্দু, ৪। অবধূত, ৫। একাক্ষর, ৬। কঠরুদ্র, ৭। কঠবল্লী, ৮। কলিসন্তরণ ৯। কালাগ্নিরুদ্র, ১০। কৈবল্য, ১১। ক্ষুরিকা, ১২। গর্ভ, ১৩। তেজোবিন্দু, ১৪। তৈত্তিরীয়, ১৫। দক্ষিণামূর্তি, ১৬। ধ্যানবিন্দু, ১৭। নারায়ণ, ১৮। পঞ্চব্রহ্ম, ১৯। প্রাণাগ্নিহোত্র, ২০। ব্রহ্ম, ২১। ব্রহ্মবিদ্যা, ২২। যোগকুণ্ডলিনী, ২৩। যোগতত্ত্ব, ২৪। যোগশিখা, ২৫। বরাহ, ২৬। শারীরক, ২৭। শুকরহস্য, ২৮। শ্বেতাশ্বতর, ২৯। সর্বসার, ৩০। স্কন্দ, ৩১। সরস্বতী রহস্য, ৩২। হৃদয়।

ঋগ্বেদে উপনিষৎ ১০ খানা—

১। অক্ষমালিকা, ২। আত্মপ্রবোধ, ৩। ঐতরেয়, ৪। কৌষিতকী, ৫। ত্রিপুরা, ৬। নাদবিন্দু, ৭। নির্বাণ, ৮। মুদ্গলা, ৯। বহ্বৃচ, ১০। সৌভাগ্য।

অথর্ববেদের উপনিষৎ ৩১ খানা—

১। অথর্বশিখা, ২। অথর্বশির, ৩। কৃষ্ণ, ৪। গণপতি, ৫। গারুড়, ৬। গোপালতাপন, ৭। জাবাল, ৮। ত্রিপুরাতপন, ৯। দত্তাত্রেয়, ১০। দেবী, ১১। নারদ পরিব্রাজক,

১২। নৃসিংহতাপনী, ১৩। পরব্রহ্ম, ১৪। পরিব্রাজকান্নপূর্ণা, ১৫। পরমহংস, ১৬। পাশুপত, ১৭। প্রশ্ন, ১৮। ভস্ম, ১৯। ভাবনা, ২০। মহানারায়ণ, ২১। মহাবাক্য, ২২। মাণ্ডুক্য, ২৩। মুণ্ডক, ২৪। রামতাপনী, ২৫। রামরহস্য, ২৬। বৃহজ্জাবাল, ২৭। শরভ, ২৮। শাণ্ডিল্য, ২৯। সীতা, ৩০। সূর্যাত্ম, এবং ৩১। হয়গ্রীব।

উপরে লিখিত মুক্তিকোপনিষদ্-বিধৃত ১০৮ খানা উপনিষদেই প্রত্যক্ষভাবে আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব, কর্মফল, পুনর্জন্মবাদ, প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব, নিত্যানিত্যবিবেক—প্রভৃতি আর্যদর্শনের যাবতীয় বিষয় আলোচিত হয়েছে এগুলোর উপর ভিত্তি করেই—

১। কণাদের বৈশেষিক দর্শন বা প্রাচীন ন্যায়—বৈশেষিকসূত্রম্,
২। গোতমের ন্যায়দর্শন বা তর্কশাস্ত্র····ন্যায়সূত্রম্,
৩। কপিলের সাংখ্যদর্শন (নিরীশ্বর) মূল গ্রন্থ বোধ হয় অবলুপ্ত,, সাংখ্যসূত্রম্,
৪। পতঞ্জলির (মহাভাষ্যকার থেকে ভিন্ন ব্যক্তি) যোগদর্শন বা সেশ্বর সাংখ্যদর্শন—যোগসূত্রম্,
৫। বেদব্যাসের বেদান্তদর্শন বা উত্তর মীমাংসা....ব্রহ্মসূত্রম্, এবং
৬। জৈমিনির—মীমাংসাদর্শন বা পূর্ব মীমাংসা....ধর্মসূত্রম, রচিত হয়েছে।

এ দর্শনগুলো সবই আস্তিক্যদর্শন। কপিলের সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচিত না হওয়ায় উহা নিরীশ্বর দর্শন বটে কিন্তু নাস্তিক্যদর্শন নয়। বেদের স্বীকৃতিমূলক বলেই উহা নাস্তিক্য হয় নি।

উল্লিখিত প্রধান ষড়্‌দর্শন বাদেও যে কত কত দর্শন তৈরি হয়েছে, তা' সংক্ষেপে বলাও চলে না। তার মধ্যে আস্তিক দর্শনই বেশী। নাস্তিকদর্শনের মধ্যে চার্বাকদর্শন, বার্হস্পত্যদর্শন-ই মূল। চার্বাকদর্শন যে সুপ্রাচীন এবং লোকায়তিক পদবাচ্য তা' মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। উল্লিখিত ৬খানা দর্শন আর্য-সংস্কৃতির অতি মূল্যবান অবদান।

উল্লিখিত দর্শন শাস্ত্রগুলোর মূল গ্রন্থও সুপ্রাচীন কালেই প্রণীত। যদিও পুরাণগুলোর সঙ্কলন বা সম্পাদনা করেছেন বেদব্যাস, অথচ বেদান্তদর্শনের স্রষ্টাও তিনিই, তা' ছাড়া, পূর্ব মীমাংসার প্রণেতা জৈমিনি বেদব্যাসেরই ছাত্র, সে হিসাবে, অন্তত বেদান্তদর্শন এবং মহাপুরাণ-উপপুরাণের সঙ্কলনের মধ্যে তেমন কোন কালিক ব্যবধান অনুমিত হয় না, তা' ছাড়া বেদব্যাসের পরবর্তীকালেই তাঁর ছাত্র-শিষ্য

জৈমিনিকে ধরে, পূর্বমীমাংসাসূত্রকে পুরাণের পর স্থান দেয়ার প্রসঙ্গ আছে, তথাপি কোন্ গ্রন্থ বেদব্যাস আগে প্রণয়ন করেছেন, কোন্ খানা পরে—সে রকম ভাবে জানবার সুযোগ এখন না থাকায়, শ্রেণী-বিন্যাসের খাতিরে, দর্শনের পরেই মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ সংস্থাপন করা চলে। তবে, কালিক ব্যবধান হয়তো, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশীই পাওয়া যাবে।

পুরাণ শাস্ত্রগুলো যে ইতিহাস নয় তা' সত্য হলেও অস্তিত্ব বিশিষ্ট বস্তু হিসাবে ইতিহাসে সন্নিবেশিত করতেই হয়। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের ঔদার্য নেহাতই কম। ভূগর্ভে বা কোথাও প্রাপ্ত কোন প্রত্ন সামগ্রী যেমন কোন না কোন প্রাচীন নির্দেশ বহন করে সেরূপ এগুলোও তো করে। বিশেষত, এগুলোর কলেবর বিশাল এবং তাতে বহু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এত ব্যাপক নানা আলোচনার মধ্যে বহু ঐতিহাসিক তথ্য যে নিহিত আছে— তা' নিঃসন্দেহে বলা চলে। অপর পক্ষে, না থাকলেও যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেই বলতে হবে---এগুলো অনৈতিহাসিক। কিন্তু সে রকম বলার কি কোন সুযোগ আছে? যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, আয়তন আছে, এমন ছোটও নয়—অসারও নয়, তার আলোচনা বাদ পড়বে কেন? জোর দিয়েই বলা যায়, সেগুলোর আলোচনা আমাদের ইতিহাস-সংগঠনে যথেষ্ট সহায়তাই করবে। বাংলাদেশের কেন, সারা ভারতবর্ষের-ই ইতিহাস—অর্থাৎ ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। না থাকার কারণেই, তথ্য-ঋদ্ধ যাবতীয় বস্তু কাজে লাগান দরকার। তা' হলে হারান অতীতের কিছু ইতিবৃত্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

আরব্য উপন্যাসের কল্প-গল্পও যদি কেহ কোথাও বলে থাকে তা হলে সেখানকার বক্তা, শ্রোতা, পরিবেশ তো বানাট কথা নয়। তা' তো সত্যই। গল্পের বিষয়-বস্তু যা-ই থাক। সে রকম, বৌদ্ধ জাতকগুলোর প্রতিক্ষেত্রের 'প্রত্যুৎপন্নবস্তু, তো আর মিথ্যে নয়. 'অতীত বস্তু' বা 'সমবধান' কেহ মানুক বা না মানুক। কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট পরিবেশেই তো গৌতম বুদ্ধের ভাবান্তর প্রতিচ্ছন্নতা, তার পরে 'অতীত বস্তু'র অবতারণ। সে সব জিনিষের মামুলি উপক্রম খলিফা হারুণ অর রশীদের রাজত্বকালে, কিংবা বারানীতে ব্রহ্মগুপ্তের রাজত্বকালে প্রভৃতি অংশ বাদ দিয়ে যেটুকু সত্যিকার স্থান-কাল-পাত্রের সম্পর্কান্বিত, সে টুকুর মধ্য থেকেও ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এভাবে, মহাপুরাণ-উপপুরাণ-গুলোতেও, হয়তো, কল্প-কাহিনীর ন্যায় অসমঞ্জস এবং লৌকিকে অসম্ভব ঘটনার উল্লেখ আছে, তৎসত্ত্বেও তার সবখানিতেই মিথ্যাত্ব আরোপ, ঠিক নয়। বাস্তবেরও অনেক কিছু তার মধ্যে আছে। তা' ছাড়া এগুলো আজগুবি হলেও, কোথাও রসাল

করে ভক্তি গাথা, কোথাও চমকপ্রদভাবে পুণ্যার্জনের জন্য নানা সৎকর্মের অনুষ্ঠান, স্বার্থ-লোলুপতার দুঃখজনক পরিণতি—ইত্যাদির বর্ণনার প্রাচুর্যের জন্য চিরকালই আলোচিত হয়ে আসছে। তাই, ওগুলো কখন সৃষ্টি বা সম্পাদিত সেটাই মাত্র ঐতিহাসিকভাবে স্থাপনীয় এবং তা' দ্বারাই এখানকার প্রয়োজন মিটবে। জাতক গ্রন্থগুলোর প্রতিক্ষেত্রে যতটুকু 'প্রত্যুৎপন্ন বস্তু' তা সবই তৎকালীন চলতি ঘটনা। আরব্য উপন্যাসেও যে স্থলে যে পরিবেশে গল্পটি বলা, তা' সব সত্য। গল্পগুলোর উপস্থাপ্য বিষয় সত্য না হয় না হোক।

পুরাণ গ্রন্থগুলো মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ আখ্যায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এগুলো সুপ্রাচীন গ্রন্থ। বেদব্যাস ওসবের সঙ্কলন-সম্পাদনমূলক কাজ করেছেন। কোন কোন গ্রন্থের পরিপাটি এমনই উন্নত যে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তা যাঁর ক্ষমতায় কুলোয়, তাঁর পক্ষে, অপাটব রচনা-জনিত অগৌরবের প্রতি অনীহা থাকার-ই কথা। বেদব্যাসই তা করেছেন, এবং তা সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে। ইহা ক্রমে স্পষ্ট হবে।

মহাপুরাণগুলো বিশাল গ্রন্থ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের শেষ অধ্যায়টিতে (১৩শ অধ্যায়), মহাপুরাণগুলোর নাম এবং শ্লোক সংখ্যা দেয়া আছে। তদনুসারে—

নাম	মোট শ্লোক সংখ্যা	নাম	মোট শ্লোক সংখ্যা
১। ব্রাহ্ম পুরাণ	১০,০০০	১০। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ	১৮০০০
২। পদ্ম পুরাণ	৫৫০০০	১১। লিঙ্গ পুরাণ	১১০০০
৩। বিষ্ণু পুরাণ	২৩০০০	১২। বরাহ পুরাণ	২৪০০০
৪। শিব পুরাণ	২৪০০০	১৩। স্কন্দ পুরাণ	৮১১০০
৫। ভাগবত পুরাণ	১৮০০০	১৪। বামন পুরাণ	১০০০০
৬। নারদীয় পুরাণ	২৫০০০	১৫। কূর্ম পুরাণ	১৭০০০
৭। মার্কণ্ডেয় পুরাণ	৯০০০	১৬। মৎস্য পুরাণ	১৪০০০
৮। অগ্নি পুরাণ	১৫৪০০	১৭। গরুড় পুরাণ	১৯০০০
৯। ভবিষ্য পুরাণ	১৪৫০০	১৮। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ	১২০০০

সর্ব্বমোট শ্লোক ৪০০০০০ (চারলক্ষ)

মৎস্য পুরাণের ৫৩তম অধ্যায়েও মহাপুরাণগুলোর উল্লিখিত প্রকার পরিসংখ্যান এবং মোট শ্লোকের কথা বলা হয়েছে। কূর্মপুরাণে, গরুড়, অগ্নি এবং ভাগবত বাদে অপরগুলোর উল্লেখ আছে। বামনপুরাণে ব্রহ্মপুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বরাহপুরাণে ১-৪, ৬-৭, ৯-১১, ১৩, ১৬, এবং ১৮ সংখ্যক পুরাণের উল্লেখ রয়েছে। শিব পুরাণে আছে পদ্মপুরাণ এবং নারদীয় পুরাণের কথা। বায়ু এবং শিব পুরাণদ্বয়ে, প্রায় অভিন্ন "রেবা মাহাত্ম্য' নামক অংশ আছে। তাতেও, পদ্ম, ভাগবত, নারদীয়, অগ্নি এবং কূর্মপুরাণ বাদে অন্য সব ক'খানার উল্লেখ মেলে। এছাড়া, পরবর্তীকালে রচিত যত স্মৃতি নিবন্ধ, হেমাদ্রি থেকে শুরু করে প্রায় তার প্রত্যেক নিবন্ধেই, পুরাণ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। তার পূর্বে জীমূত বাহন, বিখ্যাত দায়ভাগে (ধর্মরত্ন গ্রন্থের অঙ্গ) মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যাবতীয় স্মৃতিনিবন্ধ, বল্লাল সেনের দানসাগর, অদ্ভুতসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে প্রামাণিক মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ থেকে অজস্র উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং পুরাণ গ্রন্থগুলো, আর্যধর্মের নানা ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত, এবং তা' ধর্ম-সংস্কৃতি সম্বন্ধেও আশ্রয় গ্রন্থবিশেষ। একারণে, মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ অন্যতম ধর্মগ্রন্থরূপে গণ্য হয়।

উপপুরাণগুলোও বেদব্যাসের প্রণীত অথবা সম্পাদিত বলে বিশ্বাস করা হয়। যদিও তার অন্য বক্তার কথা গ্রন্থমধ্যেই রয়েছে, তথাপি সেগুলো ঐ আকারে-প্রকারেই বেদব্যাসের সৃষ্টি। গরুড়পুরাণের ২২৭তম অধ্যায়ে উপপুরাণগুলোর পরিসংখ্যান নিম্নরূপ—

১। সনৎকুমারীয় উপপুরাণ,		
২। নারসিংহ	,,	কূর্ম, মৎস্য এবং শিব পুরাণে উল্লিখিত।
৩। স্কান্দ	,,	
৪। শিবধর্ম	,,	
৫। দুর্বাসসীয়াশ্চর্য	,,	শিব পুরাণে উল্লিখিত।
৬। নারদোক্ত	,,	
৭। কাপিল	,,	
৮। বামন	,,	কূর্মপুরাণে উল্লিখিত
৯। উশনসোক্ত	,,	
১০। ব্রহ্মাণ্ড	,,	
১১। বারুণ	,,	কূর্মপুরাণ, শিবপুরাণ এবং বায়ুপুরাণের রেবা-মাহাত্ম্যে উল্লিখিত।
১২। কালিকা	,,	
১৩। মাহেশ্বর	,,	কূর্মপুরাণে এবং শিবপুরাণে উল্লিখিত।
১৪। শাম্ব	,,	কূর্ম, মৎস্য, শিব, বায়ু পুরাণে উল্লিখিত।

১৫। সৌর উপপুরাণ
১৬। পরাশরোক্ত ,, শিবপুরাণে উল্লিখিত
১৭। মরীচি-প্রোক্ত ,,
১৮। ভার্গবীয় ,, কূর্মপুরাণে উল্লিখিত।

একখানার পর আর একখান করে' যে মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ সম্পাদনা করা হয় নি, বরং এক সঙ্গে অনেকখানা করেই হয়েছে—তার প্রমাণ ঐ সব অন্য পুরাণে উল্লেখ। তাছাড়া. চিরপাণ্ডু প্রথায় কোন সমাপিত গ্রন্থের মধ্যেও অন্য কিছু যোগ করা অসম্ভব হয় না। বিষয়ানুক্রমণী লিখিত হয়ে গেলে, যদিও, স্বয়ং গ্রন্থকারের পক্ষেও, নতুন অংশের সংযোজন সহজ সাধ্য হয় না। অন্যের পক্ষে তো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তদুপরি, হাতে লিখে গ্রন্থ বিস্তারের যুগে লেখকগণও অসতর্ক থাকতেন না নিশ্চয়ই। এক স্থানের পুঁথির মধ্যে কেউ কিছু প্রক্ষিপ্ত করে বসলে, তা অন্যান্য স্থানে রক্ষিত প্রচলিত গ্রন্থের মধ্যে ঢোকে কি করে? তাই, ওসব গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার কথা প্রায়ই দোষ দেখানোর ব্যপদেশে মামুলী কায়দা। সে যা-ই হোক না কেন—গোড়ায় তো আর প্রক্ষিপ্ত হওয়ার কথা নেই? সেই প্রথম সঙ্কলনের কালই বেদব্যাসেরও জীবন কাল!

উপরি লিখিত মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ শুধু 'পুরাণ' শব্দ দ্বারাই ব্যবহার করা চলে এবং তা' চলেও আসছে চিরকাল। উল্লিখিত পুরাণগুলো বাদেও অনেক পুরাণ আছে তার গণনা উল্লিখিত পুরাণে না থাকলেও এবং তুল্যগুরুত্বে না হলেও সমাজে প্রতিষ্ঠিতও আছে। দেবীপুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণ—প্রভৃতি আরো পুরাণ গ্রন্থ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়। উপরি লিখিত পুরাণগুলো আর্য সনাতনী ধারার। অন্যান্যসম্প্রদায়ের মধ্যেও এর অনুকরণে কিছু কিছু পুরাণ লিখিত হয়েছে, তা' শতাব্দী ভিত্তিক খৃষ্টীয় কালের গ্রন্থোৎপত্তি-প্রসঙ্গে যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে। প্রাচীন মহাকাব্যরূপে আমরা পাই চারখানা গ্রন্থ। মহামুনি বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ এবং যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত ও খিলহরি-বংশ। এর মধ্যে রামায়ণ এবং মহাভারত সর্বাধিক আলোচ্য গ্রন্থ।

রামায়ণের প্রণেতা আদিকবি বাল্মীকির কাল-নির্দ্ধারণী আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে, (কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতার অংশ বিশেষ) বাল্মীকির উল্লেখ থাকায় বাল্মীকি যে বৈদিককালের লোক তা মানতেই হয়। পরবর্তী গ্রন্থকার বেদব্যাস রামায়ণের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন অনেক গ্রন্থে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এবং স্কন্দপুরাণে উমাসংহিতা অংশে রামায়ণমাহাত্ম্য নামক

অধ্যায়ই যোজিত হয়েছে। আবহমান কাল লোক-মুখে 'আদিকবি বাল্মীকি' বলা হয় নির্দ্বিধায়। মহাভারতে বনপর্বের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট একটি পর্ব আছে 'দ্রৌপদী হরণ পর্ব, নামে। তার মধ্যে মোট ১৮টি অধ্যায়ে রামায়ণের বিশেষ বিশেষ ঘটনা-বলীর সুশ্লিষ্ট অভিযোজন আছে। জয়দ্রথ কর্তৃক অতর্কিতে দ্রৌপদীর অপহরণ এবং ভীম কর্তৃক উদ্ধার প্রসঙ্গে অত্যন্ত ব্যথিত-মর্মাহত যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন মহামুনি মার্কণ্ডেয়। তন্মধ্যে প্রাক্তন নারীহরণের দৃষ্টান্ত দিতে তিনি সীতাহরণের ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। সুতরাং এই মার্কণ্ডেয় কর্তৃক প্রাক্তন ঘটনা হিসাবে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির কাছে উল্লেখের সাক্ষ্যেও অনুধাবন করা চলে যে —যুধিষ্ঠির প্রভৃতির জীবন কালেই তা' প্রাক্তন ঘটনা। অতএব অনুশীলন করতে অসুবিধা নেই যে, মহাভারতের রচনার কালে বা তার চেয়েও আগে রামায়ণ, সুপ্রাচীন মহাকাব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। মহাভারতের বনপর্বের ২৭৩ তম অধ্যায় থেকে ২৯০ সংখ্যক অধ্যায় পর্যন্ত বিরাট অংশ কোনক্রমেই প্রক্ষিপ্ত বলা চলে না। উহা বেদব্যাসেরই রচনা। অন্য কোন ব্যক্তি তা প্রণয়ন করতে পারলে নিজ স্বার্থের পরিপ্রেক্ষা বাদ দিয়ে মহাভারতে ঢুকানোর নিরর্থক ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে যেত না।

কোশলরাজ প্রসেনজিতের অন্যতম সভা-পণ্ডিত ঋষি অগ্নিবেশ, চাবায়ণ প্রভৃতি শিষ্যবর্গের সৌকর্যার্থে, রামায়ণের প্রসিদ্ধ ঘটনার দিন-তারিখ নির্দ্ধারণ করে 'রামায়ণসার' বা 'শতশ্লোকী রামায়ণ' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রামায়ণরহস্য নামেও উক্ত গ্রন্থের ব্যবহার হয়েছে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কলিকাতাস্থিত 'এশিয়াটিক সোসাইটী অব বাংলাদেশ' বলে পরিচিত, প্রতিষ্ঠানের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি-পত্রের যে Descriptive Catalogue করেছেন, তার ৫ম খণ্ডে উক্ত গ্রন্থেরও বিবৃতি প্রণয়ন করেছেন। রাজা প্রসেনজিত, ছিলেন মগধরাজ বিম্বিসারের সম্বন্ধী। মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিত, উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত এবং কৌশাম্বীরাজ উদয়ন, গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক এবং একদিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। উক্তগ্রন্থে সুবিশাল রামায়ণের বিশেষ বিশেষ ঘটনার সঠিক তারিখ বা চান্দ্র দিন প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করেছিলেন ঋষি অগ্নিবেশ। রামায়ণ গ্রন্থ না পেয়ে সেরকম পর্যালোচনা অসম্ভব। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে যে গ্রন্থের পর্যালোচনা হয়েছে, তা' কোন ক্রমেই প্রাচীন না হয়ে পারে না।

বাল্মীকির রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব-ই কম। যদি হয়েও থাকে, তবে তা' একান্ত পক্ষেই অকিঞ্চিৎকর। তা'ছাড়া রামায়ণের ভাষা এবং বৈদিক

সাহিত্যের ভাষায় কোন মৌলিক ভেদ নেই। পার্থক্য যা' তা আছে রচনা-ভঙ্গীতে। তা তো থাকবেই। ঋগ্বেদ সংহিতার রচনা 'মন্ত্র তন্ত্রের' অনুসরণে, আর মহাকাব্য রচনা হবে কাব্যিক কলা-কৌশল খাটিয়ে। লোক-শিক্ষার প্রয়োজনে, অতিমানব শ্রীরামের আদর্শ-জীবন উপস্থাপন যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে তো মন্ত্র প্রণয়নের রীতি চলতে পারে না। রামায়ণ সহজ-সরল পন্থায় প্রণীত বলেই বৈদিক রচনার ঢং এতে অনুপস্থিত। বেদের শ্লোকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দও আছে। তাই বলে, লৌকিক ছন্দে তো, বৈদিক গায়ত্রীর মত ত্রিপাদিক শ্লোক হতে পারে না। রামায়ণে মাত্রা বিশেষিত বৃত্তের রীতি স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। সোজা কথায় - রামায়ণের কাব্যশৈলী, ঋগ্বেদে অশোভন, পক্ষান্তরে, বৈদিক সংহিতার 'মান্ত্র পদ্ধতি রামায়ণে চলতে পারে না। সুতরাং ভাষার ঐক্যেও গাঁথুনিগত পার্থক্য উভয় বিধ রচনাকে ভিন্নাকারে পরিচায়িত করে। সেটা কাল-বৈষম্যের দ্যোতক নহে। সুতরাং ঋগ্বেদের রচনার সাথে রামায়ণের রচনার তুলনা করা একান্ত পক্ষেই অকারণ।

প্রসঙ্গত, বাল্মীকির রামায়ণের বিষয়-বস্তুর বৈষম্য ঘটিয়েছেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস— তা' বলতেই হচ্ছে। রামায়ণ বলার সাথে সাথেই তাঁর স্রষ্টা বাল্মীকির কথা মনে পড়ে, অথবা বাল্মীকি নাম শোনা মাত্রই রামায়ণের কথা মনে হয়। বাল্মীকি এবং রামায়ণ শব্দ দুটো ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। পক্ষান্তরে, বাল্মীকির রামায়ণের সাথে পরিচয় কম, এখন সেরকম লোক বেশি। কৃত্তিবাসের রামায়ণকেই জানে। অথচ, একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পণ্ডিত কৃত্তিবাস, বাল্মীকির রামায়ণ পড়েই তার বিষয় জেনেছেন। তা' হলে দাড়াল —একজন মৌলিক স্রষ্টা, অন্যজন সেই স্রষ্টার সৃষ্টি থেকে উপকরণ-আহরণকারী। উল্লিখিত বিভিন্ন পুরাণের মধ্যেকার রামায়ণ-বিষয়ক আখ্যানও পণ্ডিত কৃত্তিবাস পড়ে থাকবেন। তথাপি, কৃত্তিবাস যত ঘটনা লিখেছেন তা সে সব পুরাণে নেই। তাই, বাল্মীকির রামায়ণের উপরেই কৃত্তিবাসের পাঁচালি রচনা। বাল্মীকির আসল রামায়ণ যিনি পড়তে পারবেন তিনি কেবল পুরাণোক্ত রামায়ণীয় খণ্ডিত বৃত্তান্তে সন্তুষ্ট থাকবেন কেন?

কৃত্তিবাসের রামায়ণ কিন্তু মূল রামায়ণের খাঁটি অনুবাদাত্মকও নয়, বরং বাল্মীকির রামায়ণের অবলম্বনে, স্বাধীন-স্বতন্ত্র কায়দায় রচিত। মূল রামায়ণের অবলম্বনে রচিত হলেও, পণ্ডিত কৃত্তিবাসের রচনায় গ্রহণ-বর্জনাত্মক বৈষম্য অনেকস্থলেই লক্ষ্য করা যায়। বাল্মীকির রামায়ণে, রামের দুর্গাপূজার কোন প্রসঙ্গই নেই। পক্ষান্তরে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে এ বিষয়টি অত্যন্ত ফলাও করে লিখিত। ইহাতে কেবল যে বিষয়-বৈষম্যই ঘটেছে তা'নয়, বরং শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা-বিষয়ে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়েছে। বাল্মীকির রামায়ণে, দুর্ধর্ষবীর রাবণকে যাতে পরাজিত করা যায়

তার জন্য, জগৎ-সবিতার কাছে শ্রীরামচন্দ্র আদিত্য হৃদয়মন্ত্রে প্রার্থনা করেছিলেন। কৃত্তিবাস সেস্থলে, কত কায়দা করে, দুর্গাপূজার প্রসঙ্গ লিখেছেন। উপরে লিখিত অগ্নিবেষের 'রামায়ণসার' গ্রন্থের অবলম্বনে প্রমাণ করা চলে যে, রাম-রাবণের যুদ্ধ, মুখ্য চান্দ্র পৌষ, গৌণ মাঘ, কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া থেকে, মুখ্য চান্দ্র চৈত্র শুক্লা চতুর্দশী পর্যন্ত —মোট ৮৮ দিন চলেছিল এবং শেষদিনে রাবণের ধরাশায়ী হওয়ায় শেষ হয়েছিল। এর মধ্যে মাত্র ১৫ দিন ছিল যুদ্ধবিরতি। সে সময়ে 'শয়নকাল' বা দেবতাদের রাত্রিকাল না থাকায় কোন বোধনের বা অকালবোধনের প্রসঙ্গই ছিল না।[১] অথচ, এই বিষয়টাকে ঢুকিয়ে সাধারণের ধারণায় বিভ্রম সৃষ্টি করা হয়েছে। রামায়ণের ন্যায় অনবদ্য সাহিত্যে, বিশেষ করে যা' রামের বাস্তবজীবন অবলম্বনে রচিত, এরকম ঘটনাবৈষম্য সৃষ্টি করা আশ্চর্যজনকই বটে। তথাপি কৃত্তিবাসেরও কৃতিত্ব আছেই। বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব, তার সাথে রামের ভক্ত-পূজাবিত্ত সম্বন্ধ জুড়ে দিয়ে, উৎসবের ঘটাবাট্য বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট পটুতা দেখাতে পেরেছেন। এরকম আরও বহু ঘটনা-বৈষম্য কৃত্তিবাসের রচনায় রয়েছে। বাল্মীকির রামায়ণে, সেই বৈদিক কালের রাজ-পরিবার থেকে শুরু করে, অত্যন্ত সাধারণ মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক --নানা বিষয় অতি সুন্দরভাবে দেখান আছে। শহরের চাকচিক্য, গ্রামের অনাড়ম্বর জীবনধারা, মুনি-ঋষিদের পর্ণশালার অকিঞ্চন সংসার, ধর্মীয় উৎসব, দুর্ধর্ষের দৌরাত্ম্য, শিল্পীর শিল্পকর্ম, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি অসংখ্য ধর্মকর্ম, প্রজারঞ্জক রাজার ধর্মে আর, সাধারণের ধারণালব্ধ যৌক্তিক কর্তব্যে শাশ্বত বিরোধ-প্রভৃতি অসংখ্য তৎকালীন সামাজিক চিন্তা-চেতনা-পরিবেশ, নিখুতভাবে সংগৃহীত-সংগ্রথিত আছে রামায়ণে। সে চিরকালই অম্লান-অনবদ্য থাকবে।

বাল্মীকির রামায়ণ যে অতি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য তা সম্ভব হয়েছে তাঁর অনন্য প্রতিভা এবং রমণীয় ভাষার অতুল বৈভবে। সুপ্রাচীনকালের হলেও তার উপস্থাপনা সর্বকালের পরিমার্জিত পরিবেশনকে হার মানিয়ে দেয়। যাঁরা তা' পড়তে জানেন, তাঁরা শোনেন তাঁর মধুর ছন্দো-নিক্কণ, দেখেন হৃদয়পটে বিমূর্ত করে ফুটিয়ে তোলার তাঁর অপূর্ব দক্ষতা। সংস্কৃত তো এমনি-ই দেশ-কালাতিগ ভাষা। অঢেল তার শব্দ-সম্ভার, অভিনব তার অলঙ্করণ, হৃদয়গ্রাহী মাধুর্য। তাই, আদিকবির লেখনীধারা তেমন সুন্দর সাহিত্য-তটিনীর রূপ দিতে পেরেছে।

বাল্মীকির রামায়ণে, বেদব্যাসের মহাভারতে, খিলহরিবংশে যে, বর্তমানকালে চলতি সংস্কৃতের সাথে কিছু কিছু বেমিল চোখে পড়ে, তার কারণ, সে-সময়কার

---

১. মাঘকৃষ্ণ তৃতীয়ায়াং চৈত্রশুক্লচতুর্দশী।
অষ্টাশীতিদিনান্যেবং মধ্যে পঞ্চদশাহকম্॥

সংস্কৃত ভাষার বহু ব্যাপকতা যা' পূর্বে উল্লিখিত পদ্মপুরাণীয় গীতামাহাত্ম্যাধ্যায়ের পরিবেশনায় স্পষ্টীভূত। সেটা ভাষার দোষ নয়, 'আর্যপ্রয়োগে'র সশালীন কটাক্ষের বিষয়ও নয়, সেটা বর্তমান লৌকিক সংস্কৃতের ব্যাকরণের সংক্ষেপায়ণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। প্রাচীন ব্যাকরণে যে বিষয়ে যতটা ব্যাপক শাব্দিক প্রসারের ব্যবস্থা ছিল, তা' পাণিনির কাল থেকে অনেক সঙ্কোচিত হয়ে আধুনিক ব্যাকরণগুলোয় চলছে।

রামায়ণে কাণ্ড বা পরিচ্ছেদ ৭টি। শ্লোকসংখ্যা ২৪000। প্রথম কাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ড পরে যোজিত হওয়ার যে সব কথা পাওয়া যায় তা' অমূলক। সম্পূর্ণ রামায়ণের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গতি-বিধানও রামায়ণেই রয়েছে। শৈলীটা বা বিশেষ রীতিটা লক্ষ্য করলেই পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই বই লিখে পড়ে উপক্রমণিকা বা ভূমিকা—অবতরণিকা লেখে বাল্মীকিও তা-ই করে থাকবেন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ নামেও একখানা প্রাচীন রামায়ণ আছে। তার রচয়িতাও বাল্মীকি। ইহাতে মোক্ষ বা মুক্তির উপায় পরিবর্ণিত। দর্শনশাস্ত্র বা মুক্তিশাস্ত্ররূপে ইহার খ্যাতি আছে।

অধ্যাত্মরামায়ণ রূপেও এক রামায়ণ দেখা যায় তা' প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক বা মহাপুরাণের অংশ মাত্র। ইহার প্রণেতা বা সঙ্কলনকারী বেদব্যাস।

অদ্ভুত রামায়ণ নামে যে রামায়ণ আছে তার রচয়িতা বাল্মীকি ন'ন। কারণ, এ রামায়ণের প্রারম্ভে রামায়ণ-কর্তা বাল্মীকিকে প্রণাম করেই গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়েছে। অনেকের মতে ইহার রচয়িতাকে অদ্ভুতাচার্য বলা হয়, তা তাঁর নাম কিনা সন্দেহ আছে। এ রামায়ণে যেসব অদ্ভুত কাহিনী দেয়া আছে সে অনুসারেই হয়তো রচয়িতাকেও অদ্ভুতাচার্য অর্থাৎ অদ্ভুত রচনায় পারঙ্গম রূপে নির্দেশ করা হয়।

মহাভারতে যে রামোপাখ্যান আছে তা'ও রামায়ণের কাহিনী সঙ্কলন এবং তার সঙ্কলনকারী বেদব্যাস।

"যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে"—অর্থাৎ যাহা মহাভরত গ্রন্থে নেই, তাহা সারা ভারতবর্ষে নেই,—লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদবাক্যটিতেই মহাভারতের বিষয়াবলীর সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া যায়। সুপ্রাচীন অন্যতম বৈদিক সাহিত্য আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রে উল্লেখ[১] থাকায় মহাভারতের প্রাচীনতা অস্বীকার করার উপায় নেই। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে কেহ কেহ খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী

১. ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনুদিত 'জাতক' প্রথম খণ্ড, উপক্রমণিকা ৮. চিহ্নিত পৃঃ পাদটীকা।

মনে করেছেন, তা' নিষ্প্রমাণ উক্তি। উপরের শ্রৌতসূত্র গৃহ্যসূত্র প্রভৃতির কালনির্দ্ধারণী আলোচনায় প্রতিভাত, যে, ওসব বৈদিক সাহিত্যের বিস্তারকালের গ্রন্থ। মহাভারত একটি অনন্য আকড় গ্রন্থ। তা' থেকে তত্ত্ব এবং তথ্য যা, পাওয়া যায়, তার ঐতিহাসিকভাবে সংস্থাপন করা, সত্যানুসন্ধিৎসার প্রয়োজনে একান্ত কর্তব্য।

বেদব্যাসের মহাভারত, আকারে এবং প্রকারে একান্ত পক্ষেই অনন্য। এত ঘটনা এর মধ্যে স্থান পেয়েছে যা' ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। আখ্যান, উপাখ্যান, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, অধ্যাত্মতত্ত্ব, ভূগোল, খগোল, দর্শনতত্ত্ব, ঐতিহ্য, বিবিধ বর্ণ, শ্রেণী, বৃত্তি,—কোন্ জিনিষ যে নেই—তা-ই বলা মুস্কিল। এ গ্রন্থে পরিচ্ছেদ, পর্বনামে অভিহিত। তদনুসারে মহাভারতে মোট পর্ব ১৮টি। যথা—১। আদি, ২। সভা, ৩। বন ৪। বিরাট্, ৫। উদ্যোগ, ৬। ভীষ্ম, ৭। দ্রোণ, ৮। কর্ণ, ৯। শল্য, ১০। সৌপ্তিক, ১১। স্ত্রী, ১২। শান্তি, ১৩। অনুশাসন, ১৪ অশ্বমেধ, ১৫। আশ্রমবাসিক, ১৬। মৌষল, ১৭। মহাপ্রাস্থানিক, এবং ১৮। স্বর্গারোহণ। পর্বান্তঃপ্রবিষ্ট পর্বও আছে ৭৯টি। প্রত্যেক পর্বেই অনেকগুলো করে অধ্যায় রয়েছে। তাতে মোট ২১৫১টি অধ্যায়ে, একলক্ষ শ্লোকের সমন্বয়ে গঠিত এ গ্রন্থ এত বিশাল যে, কোনদিক্ থেকে ফিরিস্তি দিতে গেলেই বহুকথা বলতে হয়।

মহাভারতের শান্তি পর্বের ২৯২ সংখ্যক অধ্যায়টির সংজ্ঞা বা নাম—'রন্তিদেবাদী-নামিতিহাসঃ'। এছাড়াও, 'অত্র প্রাচীনেতিহাস:' 'ইতিহাস সমুচ্চয়'-প্রভৃতি নাম দেয়ার মাধ্যমে পরিষ্কার প্রতিপন্ন হয় যে, মহাভারত নিজে ইতিহাস-গ্রন্থ নয়। নইলে, উল্লিখিত পর্বটির ওরকম নাম হবে কেন? বা, উল্লিখিত প্রকারে সংক্ষিপ্ত কোন কোন অংশের ইতিহাসরূপে উপস্থাপন থাকবে কেন? তথাপি, এ খানা যে ঐতিহাসিক তথ্যে ভরপুর তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। কোন কোন ঘটনা যুধিষ্ঠির প্রভৃতির জীবনকালে সংঘটিত, কোন কোনটি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত প্রাক্তন ঘটনা। এই দুই শ্রেণীর ঘটনাগুলোকে তার আঙ্গিকের সমন্বয়ে বিন্যাস করা দ্বারা সম্পূর্ণ আলদা করা চলে। সুতরাং, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবৎকালের ঘটনাবলীর সীমানা নির্দেশের পরিমাপেই ঘটমান এবং ইতিবৃত্ত-সংপৃক্ত ঘটনাপঞ্জীর, এবং তৎসম্বন্ধপুষ্ট অন্যান্য আঙ্গিকের পর্যালোচনায়ই ঐতিহাসিক তথ্য মিলে যায়। তাই, অতীত ঘটনাপঞ্জীর একত্র সঙ্কলনাত্মক এই মহাগ্রন্থ, ইতিহাসের তথ্যোদ্‌ঘাটনেও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আর্য্যসংস্কৃতির অসংখ্য ঘটনা এবং অন্যান্য বহুতত্ত্ব এবং তথ্যের হাজারো সমাবেশে ইহা আধুনিক ধারণা সম্মত ইতিহাস-গ্রন্থ না হলেও ঐতিহাসিকদের উপজীব্য বটে।

আদিপর্বের অন্তর্গত, অন্তর্বর্তী ৭ম পর্বটি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর পর্ব। তার মধ্যেকার ১৮৬ সংখ্যক অধ্যায়টিতে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের পরিচিতির মধ্যে বঙ্গদেশের রাজপুত্রের কথাও আছে। আদিপর্বের ২২৫ সংখ্যক অধ্যায়ে, অর্জুনের বনবাসকালে মণিপুর গমন প্রভৃতি স্থান-কাল বিশেষিত ঘটনা আছে। সভাপর্বের অন্তর্গত দ্যূতপর্বে, রাজগণের আনীত—কর উপঢৌকন প্রসঙ্গে, বিভিন্ন দেশের বা রাজ্যের রাজার বর্ণনা (৫২ সংখ্যক অধ্যায়), রাজসূয় যজ্ঞের উপক্রমে ২৯ সংখ্যক অধ্যায়ে, ভীমের পূর্বদিগ্‌ বিজয়াভিযান। বনপর্বের ৮৭ সংখ্যক অধ্যায়ে ধৌম্যকর্তৃক পূর্বদিক্‌স্থিত তীর্থ বর্ণনা : ১৫৮ সংখ্যক অধ্যায়ে, আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে যুধিষ্ঠিরের গমন প্রসঙ্গ, ঘোষযাত্রা নামক উপপর্বের ২৫২তম অধ্যায়ে কর্ণের দিগ্বিজয় যাত্রা, যাতে বঙ্গ-দেশ বিজিত হয়ে অঙ্গরাজ্যের সহিত সংযোজিত হয় এবং অঙ্গ ও বঙ্গ একত্রিত একটি রাজ্য হিসাবে গণ্য হয়। উদ্যোগপর্বের অন্তর্গত যানসন্ধি পর্বে, কৃষ্ণ প্রভৃতি বহু রাজার পাণ্ডব-পক্ষে উপস্থিতি, রথাতিরথ সংখ্যান পর্বের ১৬৪-১৭১ সংখ্যক অধ্যায়াবলীর মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের শক্তির বর্ণনা ; ভীষ্মপর্বের ৫৪ সংখ্যক অধ্যায়ে কলিঙ্গরাজের বধ-বৃত্তান্ত, ১০২ সংখ্যক অধ্যায়ে ভীমকর্তৃক বঙ্গরাজের বিশাল গজবাহিনীর ধ্বংস সাধন ; ৯৬ সংখ্যক অধ্যায়ে ভগদত্তের যুদ্ধে, বঙ্গাধিপ কর্তৃক দুর্যোধনের রক্ষা ; দ্রোণ পর্বের ১১৭ সংখ্যক অধ্যায়ে কাম্বোজাদির বধ, ১১৯ সংখ্যক অধ্যায়ে পার্বতীয় সৈন্য বধ, ১৫৩ সংখ্যক অধ্যায়ে কালিঙ্গ দুষ্কর্ণাদির বধ, ১৫৫ সংখ্যক অধ্যায়ে বাহ্লীক বধ,— এ সমস্ত ঘটনা তো সাক্ষাৎ ঐতিহাসিক পটভূমিকার এবং এ সবের সাথে আমাদের দেশের তৎকালীন সম্পর্ক রয়েছে।

ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির তত্ত্বের এবং তথ্যের আকড় মহাভারত, দার্শনিক অবদানেও অনন্য। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা যে তুলনাহীন দার্শনিক গ্রন্থ তা' অস্বীকার করার লোক নেই। ভীষ্মপর্বের ২৫—৪২ = ১৮টি অধ্যায়ই হচ্ছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা। এ ছাড়াও, অন্তত ১১ খানা গীতা মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত হয়েছে। যথা --১। উতথ্য গীতা, ২। বামদেব গীতা, ৩। ব্রহ্মগীতা, ৪। শম্পাক গীতা, ৫। মঙ্কি গীতা, ৬। বোধ্য গীতা, ৭। বিচখ্নু গীতা, ৮। হারীত গীতা, ৯। বৃত্র গীতা, ১০। হংস গীতা এবং ১১। অণু গীতা। অণুগীতা অধ্যায়গুলোকে অণুস্মৃতি'ও বলা হয়। এ সমস্ত মহাভারতের দার্শনিক অবদান।

মহাভারত রচনার কালের ভারতবর্ষের নদ-নদী,-পর্বত-হ্রদ-অরণ্য-অরণ্যানী-জন-পদ-সমাজ-ধর্ম-নীতি-শিক্ষা-জ্ঞানী-গুণী-সংস্কৃতি-রীতি পদ্ধতি-প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের

একত্র সঙ্কলন মহাভারতের বৈশিষ্ট্য একথা আগেও কিছু কিছু বলা হয়েছে। অনন্য এবং অসাধারণ বৈশিষ্টের জন্য এতকাল ইহা ঘরে ঘরে চির জীবন পঠিত-অধীত-অনস্থত হয়ে আসছে আর্য সমাজের সর্বত্র। এ'র মত অপার গ্রন্থের অনুশীলনে তথ্য নিষ্কাশনের প্রযাস বর্জন করে' ঐতিহাসিকদিগের কেহ কেহ হয়ত, সাময়িক সুবিধা লাভ করেছে, চির সুবিধা পায় নি, পাবেও না। যে মহাভারত অগণিত গ্রন্থের উৎপত্তির উৎস, অসংখ্য সমস্যার নির্ভুল-ন্যায্য সমাধান, অগণ্য গল্প-গাথার একত্র সংরক্ষণাগার, তার অনুশীলন-পরিশীলনের পরিশ্রম-সাধ্য পন্থা না মারিয়ে, সোজা "যেন তেন প্রকারেণ" উপায়ে বহুব্যাপক প্রাচীনকে এড়িয়ে কিংবা অর্বাচীন বানিয়ে নিজেরাই যে শেষ পর্যন্ত সেই আখ্যায় লজ্জাকর পরিচিতি লাভ করে, তা ঐতিহাসিকদের অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকজনই মাত্র বুঝেছেন। এত বড় একটা সুশ্লিষ্ট গ্রন্থ, সে যে উদ্দেশ্যেই লিখিত হোক না কেন, কবে হয়েছে, কে করেছে - ইত্যাদি বাস্তব বিষয়গুলো ইতিহাসের আওতা থেকে বাদ পড়ে কি ভাবে?

মহাভারতের গ্রন্থকার যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এত দীর্ঘকাল সারা ভারতের অগণিত বিদ্বজ্জনের এই ঐকমত্যে ভুল থাকতে পারে না। বিশেষত, যে সংস্কৃতিতে, গ্রন্থ পাঠের পূর্বে গ্রন্থকারকে সশ্রদ্ধ স্মরণ করেই পাঠের রীতি-রেওয়াজ আজো অক্ষুণ্ণ, সে সমাজে তা' একান্তই অসম্ভব-অবাস্তব ব্যাপার। গ্রন্থখানা যখন পাওয়া যাচ্ছে, সেটা আকাশ থেকেও পড়তে পারে না, তখন, গ্রন্থকার কবেকার লোক ছিলেন---এ প্রশ্নেরও গ্রহণযোগ্য উত্তর চাই তো?

মহাভারত অত্যন্ত কঠিন গ্রন্থ নয়। সহজ-সরল সংস্কৃতেই তার অধিকাংশ রচনা। যদিও একলক্ষ শ্লোকের মধ্যে ৮৮০০ (আট হাজার আটশ') কূট শ্লোক আছে। ওগুলোকে 'ব্যাসকূট' বলা হয়,' সেগুলোর অর্থ করা একান্তই কঠিন ব্যাপার। অন্যান্য অংশ তো সাবলীল সরল। কেবল, বিশাল গ্রন্থ বলে' সুনিপুণ অনুশীলন 'দুরাস্তাং' একবার কোন রকমে আওড়ে যেতেও বেশ কিছু দিন লেগে যাবে। এই সমস্যা-সঙ্কুলতা সত্ত্বেও, টীকা টিপ্পনী প্রণয়নের গুরুতর কাজের দায়িত্বও অনেকে গ্রহণ করেছেন। বর্তমানকালে পঠন-পাঠন অনুশীলন পরিশীলনের বৈমুখ্যে, কালের গতির বৈপরিত্যে, বৈদেশিক ধারার শিক্ষাদীক্ষায় প্রশংসাপত্রের প্রাপ্তি পর্যন্ত বাস্তব বিদ্যার্থিতার প্রবণতায়, ক্রমিক কঠোর হতে কঠোরতর-জীবন জীবিকার তাড়নায়, এটা ধারণাতীত বিস্ময়ের কথা। আমি বলব---শাস্ত্র

ব্যবসায়ী পণ্ডিতদের আত্মত্যাগের ফলেই, এর অনেকগুলো টীকা-টিপ্পনীও হয়ে গিয়েছে। দিন দিন অবলুপ্যমান প্রাচীন গ্রন্থের দৈন্যের দিনেও অনেকগুলো টীকা-ভাষ্য এখনও টিকে আছে। যার এক প্রশংসার্হ তালিকা দিয়েছেন, বিখ্যাত জার্মান সংস্কৃত পণ্ডিত Theodor Aufrecht, তাঁর কালজয়ী Catalogus Catalogorum গ্রন্থে----টীকাগুলো হচ্ছে :

১। অর্জুনমিশ্রকৃত ভাবার্থদীপিকা, ২। আনন্দপূর্ণমুনি বিদ্যাসাগরকৃত ব্যাখ্যা-রত্নাবলী, ৩। চাতুর্ভুজমিশ্রকৃত টীকা---কাব্যদীপিকা, ৪। দেববোধকৃত টীকা---জ্ঞানদীপিকা, ৫। নন্দকিশোরকৃত টীকা---গূঢ়ার্থপ্রকাশিকা, ৬। নারায়ণ সর্বজ্ঞকৃত---ভারতার্থপ্রকাশ, ৭। নীলকণ্ঠ চতুর্দ্ধরকৃত---ভাবতভাবদীপ, ৮। রামকৃষ্ণ প্রণীত---প্রকাশিনী, ৯। বিমলবোধকৃত---দুর্বোধপদভঞ্জিনী। ১০। মহাভারত তিলক (সম্ভবত, সবচেয়ে প্রাচীন টীকা), ১১। মহাভারত নির্বচন, ১২। যক্ষপ্রশ্ন, ১৩। লক্ষাবতার, এই টীকা চারটির প্রণেতাদের নাম পাওয়া যায়নি। ১৪। নন্দনাচার্য কৃত টীকা, ১৫। পরমানন্দ ভট্টাচার্য কৃত টীকা, ১৬। যজ্ঞনারায়ণ কৃত টীকা, ১৭। রত্নগভকৃত টীকা, ১৮। লক্ষণ ভট্ট কৃত টীকা ১৯। বৈশম্পায়ন কৃত টীকা এবং ২০। শ্রীনিবাস কৃত টীকা।

উপরের মোটামুটি আলোচনায়, অন্তত, আভাসিত হয় যে, হিমালয় পর্বতমালার মতই সুপ্রাচীন বঙ্গস্থলী, এবং সেখানে সুপ্রাচীন মানব গোষ্ঠীর অষ্ট্রিক, মঙ্গোলীয়ান, দ্রাবিড়ীয়ান, হোমো আলপাইনাস বা আরও কোন শ্রেণীর লোক মোটামুটি গোষ্ঠী-বদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল। তাঁদেরও ভাষা ছিল, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন-যাপন করার উপযোগী চিন্তা-চেতনার পারস্পরিক আদান-প্রদানের উপযোগী মাধ্যম ছিল এবং জীবন-জীবিকার সামাজিক রূপ ছিল। কোথাও বা কায়িক, কোনখানে বা ভাষিক, কোন ক্ষেত্রে হয়তো সামাজিক কিংবা ধর্মীয় রীতি-নীতির কিছু কিছু লোপাবশেষ এখনো পাওয়া যায়, যার জন্য এঁদের আদিমতা বাংলাদেশের তদানীন্তন মাটিতে মোটামুটি স্বীকৃত হয়ে আসছে। অথচ, উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলোর কোনটার শতাংশিক হার কতছিল তার সঠিক কোন প্রমাণই ঐতিহাসিকদের এখন পর্যন্ত আয়ত্তে আসে নি। নিছক অনুমানের বিভিন্ন শ্লথ আলামত মনে করে আলোচনা করাই হয় ঐতিহাসিকদের পক্ষে সম্ভব। তবে, অতগুলো গোষ্ঠীর পূর্বাস্তিত্ব স্বীকার করা হলে, প্রথমদিকে হয়তো তাঁদের অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে স্বাতন্ত্র্যে এবং ক্রমিক সাংসর্গিকতায় গড়ে ওঠা সেই আদিম-গোষ্ঠী-ভিত্তিক মিশ্রণ অস্বীকার করার উপায় থাকে কি? যদি না থাকে, তবে, মানতেই হবে সে বিমিশ্র জাতও, বঙ্গের কোন প্রাগৈতিহাসিক কালেই ঘটেছিল।

পক্ষান্তরে, আর্যরা ভারতের ব্রহ্মাবর্তে এসে যে স্থায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, আনুধ্যানিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটিয়ে, আকর্ষণীয় আদর্শ জীবন-জীবিকার প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হয়েছিল---তা'ও অস্বীকার করার উপায় নেই। আর্যদের ধর্ম এবং সংস্কৃতি, সেরকম পরিপূর্ণতায় এসে পৌছাতে কতকাল লেগেছিল—তা'ও এযাবৎ জানা যায় নি। তবে, আন্দাজ করা হয় যে, নিশ্চয়ই তাতে দীর্ঘ দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছিল অথচ, সেই দীর্ঘকালের কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন যদি আমাদের কিছু থেকে থাকে তবে, তা হচ্ছে ঐ প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য-লহরী। যার মধ্যে, সতর্ক অনুসন্ধানে আর্য-সংস্কৃতির এবং তাৎকালিক পার্থিব নানা বিষয়ের যাবতীয় জিজ্ঞাসারই নির্দিষ্ট উত্তর মেলে।

আর্যদের ধর্ম মূলত বেদ-প্রতিষ্ঠা। বেদ এবং বেদমূলক বা বেদের অবিরুদ্ধ উল্লিখিত স্মৃতি সংহিতা, সূত্রসাহিত্য, বেদাঙ্গ ও তদনুগত শাস্ত্র-সমূহই বৈদিক সাহিত্যরূপে পরিগণিত। অঙ্গাঙ্গিত্বে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এ সকল শাস্ত্রগ্রন্থের উপরেই গড়ে উঠেছে বিশাল বৈদিক সংস্কৃতি। প্রাগৈতিহাসিক গ্রন্থ হলেও বেদ এখনও একেবারে অলভ্য কেন, দুর্লভ হয়েও যায় নি। কালের আবর্তে সুদীর্ঘকাল চলতে চলতে কিছু কিছু অংশ অবক্ষয়িত হয়েছে, তার উদ্ধারের প্রচেষ্টাও যে-কাল থেকে লক্ষ্য করা যায়, তাতে গোড়াতে যওয়ার অনেক আগেই ইতিহাস কালের আওতা ছাড়িয়ে অতীতের দুর্লক্ষ্যকালের মধ্যে গিয়ে পৌছাতে হয়। এটাই এ ক্ষেত্রে বিশেষত্ব। সদ্য গঠিত কোন ভূস্থলীর অচিরাগত অধিবাসীদের তথ্যোৎঘাটান যে রকম অল্প প্রচেষ্টায়, স্বল্প সময়ে সম্ভব হয়, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম অবধারিত।

উত্তরে অভ্রংলিহ তুষার-ধবল শৈলমালা, দক্ষিণে তরঙ্গ-নাদিত অসীম জলরাশি, মাঝে পশ্চিমে হয়তো, গঙ্গার পূর্বতীর এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণবাহিনী অসংখ্য শাখানদী, প্রাকৃতিকভাবেও যেমন বঙ্গদেশের বৈচিত্রময় ভৌগোলিক মহনীয়তা দান করেছে, তেমন উপজীবিকা সংগ্রহের সহজলভ্য নিশ্চয়তা দিয়েছে। পরবর্তীকালে বৃহত্তর আর্যাবর্তের গণ্ডীর মধ্যে পড়বার অনুকূলে ব্রহ্মাবর্তের অদূর অবস্থান, হিমালয়জ নদী-নালার প্রবাহ-পরিপোষিত বনানী, ফল, ফুল, শস্য-সব্জীর স্বাচ্ছন্দ্য-প্রভৃতি অসংখ্য প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত সম্ভার-সাম্য, তদানীন্ত বঙ্গবাসীদের চিন্তা-চেতনায় কতটা সঙ্গতি বিধান করেছিল তার খতিয়ান তৈরি করা না গেলেও আন্দাজ করা যায়—বেমিল থাকলেও, মিলও ছিল বেশীর ভাগ। সুতরাং, ইতিহাসের নাগালের বাইরের কালের কথা, শুধু অনুধাবনের মধ্যদিয়েই উপলব্ধিতে আনতে

হবে। তার জন্যই বার বার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পেছনের দিকে দৃষ্টি সম্প্রসারণ একান্ত দরকার। কোন রকমে ঐতিহাসিক সোপান কাঠামো ছাড়া এই দুর্গম ক্ষেত্রে বিচরণ সম্ভব হয় না।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থের 'প্রাচীন ইতিহাস' অধ্যায়ে মহাভারতের অনেক উল্লেখ গ্রহণ করে, গ্রীকদের বর্ণনায় 'গঙ্গরিডই' রাজ্যের বিপুল সমৃদ্ধির পরিচিতির পারস্পরিক সহযোগিতা বা ঐক্য অথবা সৌসাদৃশ্য মানতে কুণ্ঠা করেন নি, কিন্তু মহাভারতের কাল-নির্ণয়টা কি অকাট্যভাবে না হলেও নির্ভরযোগ্য করে দাঁড় করানো তাঁর উচিত ছিল না? কিন্তু তিনি যা লিখেছেন তাতে কি মহাভারতের কাল নির্ণয় হয়? তিনি লিখেছেন[১] "মনু সংহিতা রচনার তারিখ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে। সুতরাং ইহা বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ও মহাভারত যুগের মাঝামাঝি।"

তিনি ২৭ পৃষ্ঠায়[২] যা লিখেছেন, তার উদ্ধৃতি পূর্বেই দেয়া হয়েছে। তাঁর মতে, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী যদি মহাভারতের বর্তমান আকার প্রাপ্তির যুগ হয়, তবে, বৌধায়নের কোন যুগ তিনি নির্দিষ্ট করে বলেছেন কি? না, বলেন নি। তা'হলে অনির্ধারিত প্রাক্তন সীমানা আর উল্লিখিত মহাভারতের বর্তমান আকার প্রাপ্তির কালের মাঝামাঝি বললে কোন্ কালটাকে বোঝাবে? তা' ছাড়া, মহাভারত পুরা গ্রন্থখানাই যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ধারাবাহিক ঘটনায় ভরপুর। তাতে, তৎকালীন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে বহু অতীত ঘটনার উল্লেখ থাকলেও, বর্তমান (তাৎকালিক) ঘটনাবলীর মাঝে খোঁচ ঢুকাবার জায়গা নেই। সেক্ষেত্রে, শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের খবরটাও তো বেদব্যাসই অর্জুনকে শুনিয়েছিলেন। এর পরেই অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন। সঠিক ঘটনা জেনে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাপ্রস্থানের পথে নামলেন। তবে কি, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকেও অর্জুনকে পাওয়ার সংবাদ সমর্থন-যোগ্য হবে? মহাভারতের পরে বেদব্যাসের গ্রন্থ পাই কেবল শ্রীমদ্‌ভাগবত। শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পরেই রচিত কিনা, তা বলা যায় না, তবে সম্প্রচারের ক্রমধারায় নৈমিষারণ্যে উগ্রশ্রবা সৌতির নিকট শৌনক প্রভৃতি মুনিগণের প্রশ্ন অনুধাবন করলেই দেখা যাবে—তখন শ্রীকৃষ্ণ বেঁচে ছিলেন না। অথচ, তারও অন্তত ৩০/৪০ বছর আগে সংঘটিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, দুর্যোধনের পক্ষে কোন বঙ্গরাজও বিপুল পরিমাণ হস্তিবল-সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করেছেন বলে মহাভারতে পরিষ্কার

১. বাংলাদেশের ইতিহাস, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত, সপ্তম সংস্করণ, ৩১ পৃঃ ৩য় অনুচ্ছেদ।
২. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থে'।

উল্লিখিত হয়েছে, এবং ডঃ রমেশ মজুমদারও তা বলেছেন তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থের 'প্রাচীন ইতিহাস' অধ্যায়ে।[১] তবে, মহাভারতের কালেও (রচনার বা প্রণয়নের) বঙ্গদেশীয়রা সুসভ্যই ছিল। আর, মহাভারতের রচনা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনতিকাল পরে। ঐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল এবং মহাভারতের কাল পাওয়া গেলেই পরিষ্কার বুঝা যাবে—বঙ্গদেশীয় প্রাচীন অধিবাসীরা খৃষ্টপূর্ব কত হাজার বছর পূর্বহতে সুসভ্য ছিল।

ইতিহাসের বিষয় করে বেদব্যাসের সঠিক কাল নির্দ্ধারণ করা না হয়ে থাকলেও ধারণা করার মত একটা নির্ণয় হয় নি—তা নয়। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের কিছুকাল পরেও বেদব্যাস জীবিত ছিলেন এবং মহাভারত রচনার পর তার পরিশিষ্ট - খিল হরিবংশ শেষ করে, তাঁর সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে গণ্য শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রণয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণেরও পরে তিনি দেহরক্ষা করেছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ সব ঘটনার কাল নির্দ্ধারণের বহু চেষ্টা এ যাবৎ হয়েছেও এবং এখনও হচ্ছে। কাশ্মীরের ইতিহাস বলে প্রথিত রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল অনুসারে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩১৩ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তও দিয়েছেন। আমাদের মহাপুরাণ এবং উপপুরাণের সুনিপুণ গবেষণায় মগধের নন্দবংশপূর্ব রাজন্যবর্গের যে পূর্বাপর নাম বিধৃত আছে তার যথাযথ বিন্যাসেও উক্ত শাস্ত্রীমহাশয়ের সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলে মনে করা চলে।

আমাদের সংস্কৃতিতে চিরকালই বার্ষিক পঞ্জিকা গণিত হয়ে আসছে। তার মধ্যে বিগত কলিযুগেরও উল্লেখ থাকে। বিখ্যাত সন্ধ্যাকর নন্দিও 'রামচরিত' এর সমাপনী পুষ্পিকায় "শকাব্দ ১০৮১ এবং কলিযুগ সংবৎ ৪২৬০ লিখেছেন। রাজতরঙ্গিণীও এ কথাই বলে" কলির আরম্ভটার অনতিপরে বেদব্যাস দেহরক্ষা করেছিলেন।

১. ২৬ পৃঃ ৩ অনুচ্ছেদ।

আর্যদের ধর্মগ্রন্থের বিস্তার

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, আর্যগণ প্রথমে ব্রহ্মাবর্তে বা মূল আর্যাবর্তে বসতিস্থাপন করে থাকলেও তাঁদের ধর্ম এবং সংস্কৃতি, ক্রমিক আশ-পাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তাঁদের প্রসারের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় গ্রন্থ সম্ভার।

প্রত্যেক ধর্মেই ধর্ম-মতাদর্শ-কেন্দ্রিক প্রচারণা অবলম্বন করেই কোনখানে বা অনায়াসে, কোথাও বিভিন্ন সংঘাতের মধ্যদিয়ে ধর্মাবলম্বীদের অগ্রসর হতে হয়। আর্যধর্ম এবং আর্যসংস্কৃতির বেলায়ও যে সে রকম উদ্যম-প্রয়াস অবলম্বিত হয়েছে তা' বোধহয়, সত্য। কতদিন, কতকাল ধরে সে সম্প্রসার আর্য সংস্কৃতির আদর্শের সুপ্রতিষ্ঠায় চলতি ছিল তা'ও সঠিক বলা যাবে না। তবে, প্রাচীন বঙ্গদেশে তাঁদের প্রভাব-প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই যে সাংস্কৃতিক কাঠামো তৈরি হয়েছিল, যার আদর্শের সংহত তত্ত্ব, আর্যদের মূলধর্ম গ্রন্থ--বেদ এবং সম্প্রসারিত বৈদিক সাহিত্যের স্তরে স্তরে বিবৃত-বিধৃত আছে। যা' সংক্ষেপে, বৈদিক সংস্কৃতি।

পূর্বোল্লিখিত বিভাজন-পূর্ব বৈদিক কাল পর্যন্ত চতুর্বেদের একত্র সঙ্কলনাত্মক বেদ, বেদব্যাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে চারভাগে বিভাজিত হয়ে, ১। ঋগ্বেদ, ২। সামবেদ, ৩। যর্জুর্বেদ এবং অথর্ববেদ রূপে পরিচিত, এবং তা'-ই প্রধান ধর্মগ্রন্থরূপে পরিগণিত। ঋগ্বেদ, সামবেদ প্রভৃতি ভাগে উপবিভক্ত প্রত্যেক ভাগই স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্য অনুসারে, মৌলিক ভিত্তির কাজ করে। বিশাল এসব বিভক্ত গ্রন্থ, বিভিন্ন বিষয়, প্রয়োগ প্রভৃতির প্রয়োজনে বহুধা বিভক্ত হয়ে, পৃথক পৃথক গ্রন্থরূপে ছড়িয়ে পড়ে। ঋগ্বেদের সে সকল গ্রন্থের যেগুলো এই খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতেও পাওয়া যায়, তার মধ্যে --

১। অগ্নিষ্টোম হৌত্র, ২। অষ্টকখণ্ড, ৩। অষ্টাক্ষর পরিভাষা, ৪। অনুবাকানুক্রমণী, ৫। অপ্তোর্যামহৌত্র, ৬। অস্যবামীয় সূক্ত, ৭। আনোভদ্রসূক্ত, ৮। ঋগ্বেদমন্ত্রসংহিতা, ৯। ঋগ্বেদাহ্নিক, ১০। উক্থ্যাদিহৌত্র, ১১। ঋগ্বেদ-ক্রমপাঠীয় উপদেশ, ১২। ঋগর্থ নামমালা (ঋগ্বেদে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থাদি নিরূপণীয় বিবৃতি গ্রন্থ), ১৩। গলিতপ্রদীপ, ১৪। ওষধিসূক্ত, ১৫। ক্রমরত্ন, ১৬। ক্রমরত্ন

পরিভাষা, ১৭। গানী (শাকলশাখীয় উচ্চারণ বিষয়ক বা বর্ণধ্বনি বিষয়ক বিশেষ বিধান), ১৮। গৃহ্য প্রকরণ, ১৯। চয়ন পদ্ধতি, ২০। চাতুর্জ্ঞান (সূক্ত-অষ্টক-বর্গ-মণ্ডল বিষয়ক), ২১। জ্যোতিষ্টোমযাজন, ২২। দেবীসূক্ত, ২৩। দ্বারপালমন্ত্রাদি, ২৪। পরিশিষ্টকদম্ব, ২৫। পবমানাধ্যায়, ২৬। পবমানসূত্র, ২৭। বৈট্সংখ্যা, ২৮। ভূসূক্ত, ২৯। ঋগ্বেদনিরুক্ত, ৩০। ঋগ্বেদাষ্টবিকৃতি বিবরণ, —প্রভৃতি।

সামবেদের অন্তর্গত—

১। অগ্নিহোত্র পদ্ধতি, ২। অগ্নিহোত্র প্রায়শ্চিত্তপদ্ধতি, ৩। অনবগ্রহ (সামবেদের অন্যতম পরিশিষ্ট), ৪। অনুপদসূত্র, ৫। অংশপদ, ৬। অশ্বমেধপদ্ধতি, ৭। অষ্টপথব্রাহ্মণ, ৮। অহীন, ৯। আগ্নেয়বিধান, ১০। আধানবিধি (পরিশিষ্ট), ১১। আর্ষেয় ব্রাহ্মণ, ১২। আবসথ্যাধান, (পরিশিষ্ট), ১৩। সামবেদাহ্নিক, ১৪। কৌথুমি শাখীয়াহ্নিক বিশেষ বিধি, ১৫। ইন্দ্রপুচ্ছ, ১৬। উত্তর ঋক্, ১৭। উত্তরপদ,। ১৮। উৎসর্গ (পরিশিষ্ট), ১৯। উদ্গাতৃপদ্ধতি, ২০। উপগ্রন্থসূত্র, ২১। উহগান/উহ্যগান, ২২। ঋক্তন্ত্র-ব্যাকরণ, ২৩। ঋক্সংখ্যা (কৌথুমশাখীয় পরিশিষ্ট), ২৪। একসামি, ২৫। (একাহীনমন্ত্রবর্গের), ব্রহ্মসূত্র পদ্ধতি, ২৬। কল্পপঞ্জিকা, ২৭। কল্পানুপদ সূত্র, ২৮। ক্রতুসংগ্রহ (পরিশিষ্ট), ২৯। ক্ষুদ্রসূত্র, ৩০। গীতকণ্ডিকা (পরিশিষ্ট), ৩১। চলাক্ষর (গানের অনুক্রমণী), ৩২। চাতুর্মাস্যহোত্র পদ্ধতি, ৩৩। ছন্দোগপ্রায়শ্চিত্ত, ৩৪। ছন্দোগ মন্ত্রপাঠ, ৩৫। ছন্দোগান, ৩৬। জ্যোতিরতিরাত্র, ৩৭। জ্যোতিষ্টোম-প্রয়োগ, ৩৮। জ্যোতিষ্টোমমৈত্রাবরুণ পদ্ধতি, ৩৯। তণ্ডালক্ষণসূত্র, ৪০। ত্রিষ্টুপ্, ৪১। দশরাত্র ৪২। দশাবতার (পরিশিষ্ট), ৪৩। দেবতাধ্যায়, ৪৪। দ্বাদশাহ প্রয়োগ-পদ্ধতি, ৪৫। দ্বারপালমন্ত্রাদি, ৪৬। ধাতুলক্ষণ, ৪৭। ধ্রুবাগান, ৪৮। নিধনসূত্র, ৪৯। নৈগেয়ার্চিকানুক্রম, ৫০। পক্ষহোমবিধান, ৫১। পঞ্চমহাযজ্ঞবিধি, ৫২। পবমানসূক্ত, ৫৩। পুত্র সামপ্রয়োগ, ৫৪। পুত্রীয়বর্গপ্রয়োগ, ৫৫। পুত্রীয়স্থালীপাক-প্রয়োগ, ৫৬। পৌণ্ডরিক পদ্ধতি, ৫৭। পৌণ্ডরিক প্রয়োগ, ৫৮। পৌণ্ডরিক সামানি, ৫৯। প্রকৃতিনিরূপণ, ৬০। প্রকৃতিবিভাগ, ৬১। প্রণত (পরিশিষ্ট), ৬২। প্রস্তাবসত্র, ৬৩। প্রস্তোতৃ প্রয়োগ, ৬৪। প্রস্তোতৃ সাম, ৬৫। প্রোষ্ঠপদ (পরিশিষ্ট), ৬৬। বৃহতী ষষ্ঠী, ৬৭। সামবৈট্সংখ্যা, ৬৮। মশক কল্পসূত্র/আর্ষেয়কল্প, ৬৯। মাত্রা-লক্ষণ, ৭০। বাজপেয়স্তোম প্রয়োগ, ৭১। বাজপেয়াষ্টিক প্রয়োগ, ৭২। বিশেষভূত পরিশিষ্ট, ৭৩। বিশ্বজিদতিরাত্রপদ্ধতি, ৭৪। ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ, ৭৫। সমূঢ়দ্বাদশাহ পদ্ধতি, ৭৬। সামগানাংছন্দঃ, ৭৭। সামসংক্ষেপ, ৭৮। সোমোৎপত্তি (পরিশিষ্ট), ৭৯। স্তোভানুসংহার, ৮০। স্তোভানুসংহার কারিকা, ৮১। স্নানবিধি (পরিশিষ্ট),

৮২। সোমদ্রব্য পরিমাণ, ৮৩। অপ্তোর্যামহৌত্র, ৮৪। আপ্তোর্যামার্চিক, ৮৫। আওবিলা পদ্ধতি, ৮৬। সামরৌদ্রী, ৮৭। দশবিধ সামসূত্র, ৮৮। সামসংখ্যা—প্রভৃতি,

যজুর্বেদের –

১। অজদান বিধি, ২। আশীর্বাদ, ৩। যজুর্বেদাহ্নিক, ৪। কল্পকারিকা, ৫। কুষ্মাণ্ডমন্ত্র, ৬। ক্রিয়াস্বরলক্ষণ, ৭। ক্ষুদ্রকল্প, ৮। গায়ত্রী-ব্যাখ্যা, ৯। চাতুর্মাস্য-হৌত্র, ১০। চিতিকাণ্ড (শতপথ ব্রাহ্মণের ৮ম অধ্যায় হলেও আলাদা গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত), ১১। দর্শপূর্ণমাস মন্ত্রমালা, ১২। দর্শপূর্ণমাসেষ্টি প্রয়োগ, ১৩। প্রবর্গ্য কাণ্ড (ইহাও কান্ব শাখীয় শতপথ ব্রাহ্মণের ১৬শ অধ্যায় হলেও পৃথক্ গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত), ১৪। প্রায়শ্চিত্তস্থান, ১৫। যজুর্বৈট্‌সংখ্যা, ১৬। স্তোমযোগ, এবং ১৭। স্বাচার চতুর্দশী —প্রভৃতি।

অথর্ববেদেও, সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকেই, উপবিভক্ত হয়ে বহু আলাদা গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, যেমন –

১। আজ্যভাগ পূর্বতন্ত্র, ২। আথর্বণ রহস্য, ৩। আসুরী কল্প, ৪। অথর্ববেদাহ্নিক পদ্ধতি, ৫। উচ্ছুষ্মকল্প, ৬। উত্তর পরিশিষ্টীয় সন্ধ্যোপাসনাবিধি, ৭। একরুদ্রবিধি, ৮। কুন্তাপাধ্যায়, ৯। গর্ভাধানাদি সংস্কার, ১০। আথর্বণ জ্যোতিষ, ১১। দর্শপূর্ণ-মাসেষ্টি প্রয়োগ, ১২। প্রত্যঙ্গিরা সহস্রনাম (পৈপ্পলাদ শাখার), ১৩। মন্ত্রাশীর্বাদ সংহিতা, ১৪। আথর্বণ রহস্য, ১৫। অথর্বচ্ছন্দঃ, ১৬। অথবমন্ত্রলক্ষণ, ১৭। অথর্ব-বেদরহস্যোত্তরভাগ, প্রভৃতি।

এছাড়া, অথর্ববেদের মোট ৭০টি পরিশিষ্ট আছে, যার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো অন্তত, পাওয়া যায় –

১। রাজ প্রথমাভিষেক,	২য় পরিশিষ্ট,		২। পুরোহিত কর্ম,	৩য় পরিশিষ্ট,	
৩। পিষ্টরাত্রিকল্প,	৫ম্	,,	৪। ঘৃতাবেক্ষণম্,	৭ম্	,,
৫। তিলধেনুবিধি,	৮ম্	,,	৬। ভূমিদান,	৯ম্	,,
৭। হিরণ্য গর্ভবিধি,	১২শ	,,	৮। হস্তিরথদান,	১৩শ	,,
৯। পুষ্যাভিষেক,	১৪শ	,,	১০। হস্ত্যশ্বদীক্ষা	১৬শ,১৭শ	,,
১১। বৃষোৎসর্গ,	১৮শ	,,	১২। অশ্বরথদান	১৪শ	,,
১৩। অরনিলক্ষণ,	২২শ	,,	১৪। রাজ্ঞামিন্দ্রমহোৎসব	১৯শ,২০শ	,,
১৫। সম্ভার লক্ষণ,	২১শ	,,	১৬। সমিল্লক্ষণ	২৬শ	,,

১৭। ধ্রুবলক্ষণ	২৭শ	পরিশিষ্ট	১৮। জ্বালা-লক্ষণ,	২৯শ	পরিশিষ্ট
১৯। বৃহল্লক্ষহোম,	৩১শ	,,	২০। ঘৃতকম্বল	৩৩শ	,,
২১। ব্রহ্মকূর্চ বিধি	৩৮শ	,,	২২। তড়াগাদি বিধি	৩৯শ	,,
২৩। পাশুপত ব্রত	৪০শ	,,	২৪। শমন বিধি	৪৬শ	,,
২৫। চরণব্যূহ	৪৯শ	,,	২৬। গ্রহযুদ্ধ	৫১ শতম	,,
২৭। কেতুচার	৫৪ শতম	,,	২৮। ঋতুকেতুলক্ষণ	৫৫ ,,	,,
২৯। কূর্মবিভাগ	৫৬শ ,,	,,	৩০। চন্দ্রপ্রাতিপদিক	৫৭ ,,	,,
৩১। মণ্ডলবিবরণ	৫৭(?),,	,,	৩২। উল্কালক্ষণ	৫৮ ,,	,,
৩৩। বিদ্যুল্লক্ষণ	৫৯ ,,	,,	৩৪। নির্ঘাতলক্ষণ	৬০ ষ্টিতম	,,
৩৫। পরিবেশলক্ষণ	৬১ ,,	,,	৩৬। নক্ষত্রগ্রহোৎপাত	৬৩ ,,	,,
৩৭। গোশান্তি	৬৬ ,,	,,	৩৮। অদ্ভুতশান্তি	৬৭ ,,	,,
৩৯। অথর্বহৃদয়	৬৯ তম	,,	৪০। ভার্গাবীয় অদ্ভুত	৭০ ,,	,,
৪১। উৎপাতলক্ষণ	৬৪ ,,	,,	৪২। ভূমিকম্প	৬২ ,,	,,
৪৩। স্বপ্নাধ্যায়	৬৮ ,,	,,			

এছাড়া ৪৪ গার্গ্য পরিশিষ্টও পাওয়া যায়। অবশিষ্ট পবিপিষ্ট গ্রন্থগুলোও পাওয়া যায় না তা নয়। তবে, প্রসার কিছুটা কম বলেই সন্ধান করা কষ্টসাধ্য হয়েছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা[১] অনুসারেই বলি—সংস্কৃত সাহিত্যের তথ্য না নিয়ে গোটা ভারতবর্ষের, তথা তদন্তর্গত কোন সুপ্রাচীন জনস্থলীর ইতিহাস হয়ে দাড়ায় 'মিথ্যার রাশি'। সুতরাং, সুপ্রাচীন সংস্কৃতিধর বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসকে সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাও, নিঃসন্দেহে, সংস্কৃত সাহিত্যের সংস্পর্শ-প্রতীক্ষ। অথচ, এদেশের সেই প্রাচীন পুঁথি-পুস্তক যে হারে ইংলণ্ডে চালান হয়েছে, তাতে বিস্মিত হতে হয়। জার্মান সংস্কৃতবেত্তা (অথবা প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ) মহাপণ্ডিত Theodor Aufrecht লিখেছেন—

"we shall hardly ever succeed in accomplishing for Sanskrit Literature what has already been done to good purpose in several important branehcs of Arabic, namely to give an accurate description of its works, their authors, and the time these have lived in. The campass of the former is so vast, extending as it does over a period of

১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩২ সাল।

2500 years. and the lack of interest in historical in ludia is so great, that difficulties meet the Inquirer at every step. The attempt, however, to give an account of the whole of Sanskrit Literature as contained in Manuscripts deposited in India as well as in Europe, was to be made, and it fell to my lot to undertake this task. ------------------ From my own experience I know that bundles of Sanscrit Manuscripts are scatterd in Public and private Libraries of England without attracting any notice."১

সহজেই অনুমান করা যায় কি বিপুল পরিমাণ গ্রন্থই এ উপমহাদেশ থেকে সুদূর পাশ্চাত্যে চলে গিয়েছে এবং এদেশের গ্রন্থ-সম্ভার অভাবনীয়রূপে কমেছে। বিশেষত: ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যে স্তরের পুঁথিপত্র সেসব দেশে নীত হয়েছে, বিংশ শতাব্দীর সংগ্রহে আমাদের ভাগ্যে জুটেছে অনেক জীর্ণ, অনেক রকম মিশ্রণাদিদোষে দুষ্ট গ্রন্থ, খণ্ডিত যার প্রায় ৭৫ শতাংশ। তথাপিও যেসব গ্রন্থ কোন কোন প্রতিষ্ঠানে, পাণ্ডুলিপির সংগ্রহশালায় বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে এখনও অন্তিম দশায় যেন ধুকঁছে, সেগুলোরও তেমন অনুশীলনের ব্যবস্থা হলে, হয়ত, উল্লিখিত 'মিথ্যার রাশি' না হয়েও ইতিহাসটা গড়ে উঠতে পারত। একথা বলাই বাহুল্য যে, হাতে লিখে পুঁথি-সম্প্রসারের যুগে যত গ্রন্থ তৈরি হয়েছে, তার অতি সংক্ষিপ্ত এক অংশ মাত্র এ যাবৎ মুদ্রিত হয়েছে। অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপির মধ্যেই বৃহত্তর অংশ এখনও নিহিত। সে সব গ্রন্থের অন্তত আধুনিক আলোক-মুদ্রিত প্রতি বা প্রতিরূপ (copy) করে করে রক্ষা করা এবং তা' সাধারণের কাছে সুলভ করে তোলার ব্যবস্থা হলে যেমন অনুশীলন দ্বারা অতীত সম্বন্ধে অধিকতর ধারণা পাওয়া যেত, তেমন দেশের গৌরবিত ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ্য করার প্রবণতা, বেড়ে যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হয়, সেদিকে বাস্তবাভিমুখী পদক্ষেপ খুব কমই নেয়া হচ্ছে। এ সমস্ত সম্পৎ একবার নষ্ট হয়ে গেলে তা' যে আর পাওয়ার পথ নেই, এ সত্যটুকুও যেন - অধিকাংশ দায়িত্ব প্রাপ্তদের মধ্যে অপ্রতিভাত।

আমার আলোচ্য বিষয় যদিও বাঙালীর সংস্কৃতি এবং তার বিকাশ, তথাপি যেহেতু আর্যায়ণের পূর্বকালের বঙ্গদেশবাসীর কৃষ্টি বা সংস্কৃতির সম্বন্ধে কোন রকম সঠিক জানবার বা জানাবার মাধ্যম এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, যেহেতু দূর বিদেশ থেকে আগত বিভিন্ন সুপ্রাচীন জাতি-গোষ্ঠীর যেমন কায়িক তেমন সাংস্কারিক যাবতীয় পার্থক্য পুরোপুরি অবলোপে, এক নতুন মিশ্র সঙ্কর জাতিই একক অভিধায়,

১. First para of preface to the catalogus catalogorum, Heidel berg. 7th. February, 1891

এক এবং অভিন্ন বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠেছিল আর্যায়ণের আগেই এবং এই সংমিশ্র বা সঙ্কর শ্রেণীটিরও কোন নতুন সাংস্কারিক পরিচিতি উপস্থাপন করার কোন মাধ্যম বা নিদর্শনও নেই, সেহেতু, আর্যায়ণের পূর্বে আর্যদের সংস্কৃতি কেমন ছিল-তা-ই কেবল প্রাথমিকভাবে আলোচ্য হয়ে দাঁড়ায়। তা'র খাতিরেই সুপ্রাচীন কালে, অর্থাৎ আর্যদের ভারত-আগমনের কালে এবং সেখানে স্থায়ী হয়ে গড়ে ওঠার সময়ের সাংস্কারিক রূপ তুলে ধরতে পারে—এমন পুঁথিপত্রের, বস্তুত, বৈদিক সাহিত্যের কিছু অংশ আলোচিত হয়ে আসছে। আর্যরা ভারতে আসতেই, হুটকরে সুসভ্য হয়ে উঠেছিল, তার আগে তাঁদের কোন সভ্যতা ছিল না -এরকম ধারণা করারও কোন সঙ্গত কারণ দেখি না। আর্যদের যদি একটা সংস্কারহীন স্বরূপ কোন কালে ধরা পড়ত, তা' হলে না হয়, সে রকম কথা বলার কোন সুযোগ থাকত, কিন্তু তা' তো ধরা পড়ে নি? বরং তাঁদের উন্নত জীবন-জীবিকার হাজারো নিদর্শন ইতিপূর্বে আলোচিত হয়ে আসছে যার কোন এক অংশও কৃষ্টির কষ্টিকে পরীক্ষিত হলে কোন কিছুর কাছে নিম্নমানের বলে প্রমাণিত হয় না হবে না। পক্ষান্তরে, পূর্বোল্লিখিত অধ্যাপক জ্যাকোবি, বালগঙ্গাধর তিলক এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির হিসাব-নিকাশমূলক অনুমান একান্ত অমূলক বলার কোন যুক্তি-গ্রাহ্য প্রমাণ না থাকায়, যদি ঋগ্বেদের মধ্যে, (ভারতের মাটিতে বসে সঙ্কলিত বৈদিক সাহিত্যে) সেই কালেরও অনেক আগেকার স্মৃতি বিধৃত থেকে থাকে (অবশ্যই রয়েছে) তবে, আর্যদের কোন সভ্যতা-পূর্বকালিক সংস্কারহীনতা ভাবতে যাওয়া নিশ্চয়ই, সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ হবে না।

ইতিহাসে জাদরেল হলেও কিভাবে বিভ্রান্তিকর লেখা থাকতে পারে, তার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হচ্ছে একান্ত অনিচ্ছায়ও। —"এ সময়ে বঙ্গদেশে যে পুরাপুরি আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মনুসংহিতার পর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত দুইটি শ্লোক (১০-৪৩-৪৪) হইতে।[১]

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌন্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহলবা শ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ যশাঃ॥" (মূলগ্রন্থে পাঠ 'খশাঃ')

১. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কৃত 'বাংলাদেশের ইতিহাস', সপ্তম সংস্করণ, ৩১–৩২ পৃঃ।

মনুসংহিতার এই শ্লোক দু'টির অবলম্বনেই উদ্ধৃতি অংশের লেখক কিন্তু অমন সিদ্ধান্ত করে বসেছেন। অথচ, শ্লোক দু'টির অর্থ—'শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ' ধীরে ধীরে ক্রিয়ালোপ হওয়ায়; ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ'—এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনের কারণে; ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ'—এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি; 'লোকে'—লোক ব্যবহারে; বৃষলত্বং গতাঃ—বৃষলত্ব---অনাচারিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

যাঁদেরে বলা হল ক্ষত্রিয়, তারা আর্য বর্ণের বাহিরে কি করে হয়? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—ইহাতো আর্যদের বর্ণভেদ ব্যবস্থা। আর্যেতর কোন শ্রেণীর মধ্যে কি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য-শূদ্র থাকতে পারে? তা' ছাড়া, লোক-ব্যবহারে বৃষলত্বপ্রাপ্ত বা অনাচারিত্বপ্রাপ্ত বলা দ্বারাও তো সেই আর্যাচারের মধ্যেকার অনাচারিত্বই বলা হয়েছে। শূদ্রশ্রেণীও তো আর্যসভ্যতার জাতিভেদের অন্তর্গতই বটে। অধিকন্তু, তাদেরে খাঁটি খাঁটি শূদ্রও বলা হয় নাই। আচারভ্রষ্ট হয়ে শূদ্রতুল্য হয়েছে—এইটুকু মাত্র বুঝিয়েছে। অথচ, উদ্ধৃত অংশের লেখক তো এই শ্লোকটিকে আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার অর্থাৎ আর্যসভ্যতার পূর্বের প্রমাণ স্বরূপ বলে ছাড়লেন। ভাবলেন না যে, আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত না হলে ধীরে ধীরে ক্রিয়ালোপের প্রসঙ্গও থাকে না, ক্ষত্রিয়ও হওয়া চলে না বা বৃষলত্ব প্রাপ্তিও আর্যাচারের বাইরে পড়ে না। মনুসংহিতার প্রামাণিক টীকাকার মেধাতিথিও শ্লোকদ্বয়ের অর্থ করে বলেছেন --ব্রাহ্মণদের বিরোধিতা করে অবমাননা করে ক্রিয়া কর্ম ঠিকমত না করায় উল্লিখিত স্থানের ক্ষত্রিয়গণ আচারভ্রষ্ট হয়েছিলেন।

আসল কথা এই যে, মনুসংহিতাও বৈদিক কালের গ্রন্থ। তখনই পৌণ্ড্রক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আর্য সংস্কৃতির মধ্যে থেকেও আচার-বিচারে ক্রিয়ালোপাদি বশে হীন-মর্যাদ (খাঁটি আর্যাচারিদের দৃষ্টিতে) হয়ে গিয়েছিল। আমার আলোচ্য বিষয়ে এখানে আর্যাচারের পুরা অনুসরণ না করাই নতুন কৃষ্টি বা আর্যাচার-দ্রোহিতাই সংস্কৃতি। হয়ত, আর্যাচারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েও স্বপ্রতিষ্ঠ থেকে ছিল তাঁরা। পরবর্তীকালে আবার ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে মর্যাদান্বিত ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় রেখেছিল। নইলে, মহাভারতের যুগে (মনুসংহিতার বহু পরবর্তী) বঙ্গ, পুণ্ড্রক ও কিরাত দেশের অধিপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব, পাঞ্চাল-রাজকন্যা-দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় পাণিপ্রার্থী হয়ে যায় কিভাবে? তবে, উদ্ধৃত মনুসংহিতার শ্লোকের 'পৌণ্ড্রক' পদে যদি বঙ্গদেশের (ভৌগোলিক) অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ই বুঝান হয়ে থাকে, তবে, সেই ক্ষত্রিয়রাই সম্ভবত, কিছুকালের জন্য হলেও, আর্যাচারের মধ্যে থেকে তার প্রতি বিদ্রোহী হয়েছিল সর্বপ্রথম। যেহেতু, অত পূর্বকালে অপর কোন তেমন বিদ্রোহিতার পরোক্ষ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না।

আর্য সংস্কৃতির বৈদিক ধারা বাদে, অন্য একটি ধারাও অত্যন্ত প্রবল বেগে প্রবহমান। সেটি যদিও আর্য সংস্কৃতির সর্বদিকব্যাপী কখনো হয় নি বা হওয়ার সম্ভাবনাও নেই, তথাপি, যে যে ক্ষেত্রে তা সম্প্রসারিত, সেখানে সুস্পষ্ট তন্ত্র-মূলকতা দেখা যায়। কি বা মন্ত্রে, কি-ই বা পূজাপদ্ধতিতে, দৈনন্দিন সন্ধ্যোপাসনা থেকে শুরু করে মোক্ষ-মার্গীয় ক্রিয়া-কলাপে পর্যন্ত তন্ত্র-বৈশিষ্ট্য অটুট। এই তান্ত্রিক সংস্কারের নিয়ন্ত্রক শাস্ত্রও সুপ্রাচীন। তন্ত্র বেদ থেকেই উদ্ভূত।[১] অনেকে মনে করেন-অথর্ববেদ থেকেই তন্ত্রের সৃষ্টি। কতক ক্রিয়াকাণ্ডে অথর্ববেদের ক্রিয়াগুলোর অনেকটার সাথেই সাদৃশ্য প্রচুর। তাই তন্ত্রেরও বেদমূলকতা স্বীকৃত। তথাপি ক্রিয়াগুলোর কার্যক্রম এমন-ই ভিন্ন যে একান্ত স্বতন্ত্র মনে হতে পারে। যদিও, উপাসনাঙ্গ ক্রিয়া-ক্রমের মধ্যেই সে রকম পার্থক্য পরিস্ফুট। সংস্কারাদির বেলায় বৈদিক পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির ই বিবাহ পর্যন্ত সংস্কারগুলো বাধ্যতামূলক আর্যাচারে সর্বসাধারণ। তা'ক্রম-লঙ্ঘন করেও করার বিধান নেই। যেটা আগে সেটা আগেই করতে হবে, নইলে পরবর্তী সংস্কারটা হতেই পারে না। যেমন—নামকরণ এবং অন্নপ্রাশন দু'টি সংস্কার, তার আগ-পাছ-ক্রমও ওই রকম। তাতে নামকরণ না করে অন্নপ্রাশন হতে পারে না। সংস্কার কার্যে, ঔর্দ্ধদেহিক কার্যে, ব্রত-উদ্‌যাপনে, প্রতিষ্ঠায় বা এ রকম কতক ক্ষেত্রে কোন তান্ত্রিক পদ্ধতি নেই।[২] কিন্তু, পূজা-অর্চনায়, কিবা শক্তিদেবতা, কি-ই বা পুংদেবতা-সর্বত্র তান্ত্রিক পদ্ধতি আছে। বৈদিক পদ্ধতির পাশাপাশি এই তন্ত্রাচার চিরকালই চলে আসছে। এ জাতীয় ক্রিয়া--কাণ্ডের নিয়ন্ত্রক শাস্ত্র তন্ত্রশাস্ত্র নামে অভিহিত। সংস্কৃতির এ দিকটা বঙ্গে, ব্যাপক হয়েছিল।

তন্ত্রশাস্ত্রগুলোর অনেক শ্রেণীভেদ আছে---আগম, জামল প্রভৃতি। এ শাস্ত্রেরও গ্রন্থ প্রচুর। কোন কোন গ্রন্থ, অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের থাকলেও, সেই আদিকালের গ্রন্থও তার সাথেই রয়েছে। সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সামগ্রিকভাবে কখনো লিখিত হয়েছিল কিনা বলা যায় না। হয়ে থাকলেও তা' আমাদের হস্তগত হয় নি। 'মহাসিদ্ধিসারস্বত,' তন্ত্রে ৬৪ খানা তন্ত্র-শাস্ত্রের একটি তালিকা নিবদ্ধ হয়েছে [৩]

১. 'শ্রুতিশাখাবিশেষ :—ইতি শব্দকল্পদ্রুম : ('তন্ত্র' শব্দে)।

২. মহানির্বাণতন্ত্রে কিছু কিছু থাকলেও, ও গ্রন্থে কালীর মন্ত্রে ভুল থাকায়, উহার মৌলিকতা স্বীকৃত নয়।

৩. "শিবোক্তশাস্ত্রম্-তচচ, চতুঃষষ্টিসংখ্যকম্
সিদ্ধীশ্বরং মহাতন্ত্রং কালীতন্ত্রং কুলার্ণবম্।
সুসিদ্ধানি বরারোহে রথক্রান্তস্থ ভূমিষু।। ইত্যাদি

১। সিদ্ধীশ্বরতন্ত্র, ২। মহাতন্ত্র, ৩। কালীতন্ত্র, ৪। কুলার্ণবতন্ত্র. ৫। জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, ৬। নীলতন্ত্র, ৭। ফেৎকারিণীতন্ত্র, ৮। দেব্যাগমতন্ত্র, ৯। উত্তরতন্ত্র, ১০। শ্রীক্রমতন্ত্র, ১১। সিদ্ধিযামলতন্ত্র, ১২। মৎসূক্ততন্ত্র, ১৩। সিদ্ধসারতন্ত্র, ১৪। মহাসিদ্ধিসারস্বততন্ত্র, ১৫। বারাহীতন্ত্র, ১৬। যোগিনীতন্ত্র, ১৭। গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্র, ১৮। নিত্যাতন্ত্র, ১৯। শিবাগমতন্ত্র, ২০। চামুণ্ডাতন্ত্র, ২১। মুণ্ডমালাতন্ত্র. ২২। হংসমাহেশ্বরতন্ত্র. ২৩। নিরুত্তরতন্ত্র, ২৪। কুলপ্রকাশকতন্ত্র, ২৫। কল্পতন্ত্র, ২৬। গান্ধর্বতন্ত্র, ২৭। ক্রিয়াসারতন্ত্র, ২৮। নিবন্ধতন্ত্র, ২৯। স্বতন্ত্রতন্ত্র, ৩০। সম্মোহনতন্ত্র, ৩১। ললিতাতন্ত্র, ৩২। রাধাতন্ত্র, ৩৩। মালিনীতন্ত্র, ৩৪। রুদ্রজামলতন্ত্র, ৩৫। বৃহচ্ছ্রীক্রমতন্ত্র, ৩৬। গবাক্ষতন্ত্র, ৩৭। কুমুদিনীতন্ত্র, ৩৮। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র, ৩৯। মালিনীতন্ত্র, ২য় ৪০। সময়াচারতন্ত্র, ৪১। ভৈরবীতন্ত্র, ৪২। যোগিনীহৃদয়তন্ত্র, ৪৩। ভৈরবতন্ত্র, ৪৪। সনৎকুমারতন্ত্র, ৪৫। যোনিতন্ত্র, ৪৬। নববত্নেশ্বরতন্ত্র, ৪৭। কুলচূড়ামণিতন্ত্র, ৪৮। ভাবচূড়ামণিতন্ত্র, ৪৯। দেবপ্রকাশতন্ত্র, ৫০। কামাখ্যাতন্ত্র ৫১। কামধেনুতন্ত্র. ৫২। কুমারীতন্ত্র, ৫৩। ভূতডামরতন্ত্র, ৫৪। মালিনীবিজয়তন্ত্র, ৫৫। যামলতন্ত্র, ৫৬। ব্রহ্ম-যামলতন্ত্র, ৫৭। বিশ্বসারতন্ত্র, ৫৮। মহাতন্ত্র. ৫৯। মহাকালতন্ত্র, ৬০! কুলামৃততন্ত্র; ৬১। কুলোড্ডীশতন্ত্র, ৬২। কুব্জিকাতন্ত্র, ৬৩। যন্ত্রচিন্তামণিতন্ত্র, ৬৪। উত্তরতন্ত্র।।

আগমতত্ত্ববিলাসে প্রধান প্রধান ১৪৮ খানা তন্ত্রের এক তালিকা রয়েছে। তন্ত্রগুলো হচ্ছে -১। স্বতন্ত্র, ২। ফেৎকারিণী, ৩। উত্তর, ৪। নীল, ৫। বীর, ৬। কুমারী, ৭। কালী, ৮। নারায়ণী, ৯। তারিণী, ১০। বাল, ১১ সময়া, ১২। ভৈরব, ১৩। ভৈরবী, ১৪। ত্রিপুটা, ১৫। বামকেশ্বর, ১৬। কুক্কুটেশ্বর, ১৭। মাতৃকা, ১৮। সনৎকুমার, ১৯। বিশুদ্ধেশ্বর, ২০। সম্মোহন, ২১। গৌতমীয়, ২২। বৃহদ্ গৌতমীয়, ২৩। চামুণ্ডা, ২৪। পিঙ্গলা, ২৫ ভূতভৈরব, ২৬। বারাহী, ২৭। মুণ্ডমালা, ২৮। যোগিনী, ২৯। মালিনীবিজয় ৩০। স্বচ্ছন্দভৈরব, ৩১। মহামন্ত্র. ৩২। শক্তি, ৩৩। চিন্তামণি, ৩৪। উন্মত্তভৈরব, ৩৫। ত্রৈলোক্যসার, ৩৬। বিশ্বসার, ৩৭। তন্ত্রামৃত, ৩৮। মহাফেৎকারিণী, ৩৯। বায়বীয়, ৪০। তোড়ল, ৪১। মালিনী, ৪২। ললিতা, ৪৩। ত্রিশক্তি, ৪৪। রাজরাজেশ্বরী, ৪৫। মহামোহস্বরোত্তর, ৪৬। গবাক্ষ, ৪৭। গান্ধর্ব, ৪৮। ত্রৈলোক্যমোহন, ৪৯। হংসমাহেশ্বর, ৫০। হংসপরমেশ্বর ৫১। কামধেধু, ৫২। বর্ণবিলাস, ৫৩। মায়া, ৫৪। মন্ত্ররাজ, ৫৫। কুব্জিকা, ৫৬। বিজ্ঞান ললিতা, ৫৭। লিঙ্গাগম, ৫৮। কালোত্তর, ৫৯। ব্রহ্মজামল, ৬০। আদিযামল, ৬১। রুদ্রযামল, ৬২। বৃহজ্জামল, ৬৩। সিদ্ধজামল, ৬৪ কল্পসূত্র,

৬৫। মৎস্যসূক্ত, ৬৬। কল্পসূক্ত, ৬৭। কামবাজ, ৬৮। শিবাগম, ৬৯। উড্ডীশ, ৭০। কুলোড্ডীশ, ৭১। উড্ডীশ বীরভদ্রক, ৭২। ভূতডামর, ৭৩। ডামর, ৭৪। যক্ষডামব, ৭৫। কালিকাকুলসর্বস্ব, ৭৬। কুলসর্বস্ব, ৭৭। কুল চূড়ামণি, ৭৮। দীবা, ৭৯। কুলসাব, ৮০। কুলার্ণব, ৮১। কুলামৃত, ৮২। কুলাবলী, ৮৩। কালীকুলার্ণব, ৮৪। কুলপ্রকাশ, ৮৫। বাশিষ্ঠ, ৮৬। সিদ্ধসারস্বত, ৮৭। যোগিনীহৃদয়, ৮৮। কালীহৃদয়, ৮৯। মাতৃকার্ণ, ৯০। যোগিনীজাল কুবক, ৯১। লক্ষ্মীকুলার্ণব, ৯২। তাবার্ণব, ৯৩। তন্ত্রপীঠ, ৯৪। মেরুচন্দ্র, ৯৫। চতুঃশত, ৯৬। তত্ত্ববোধ, ৯৭। মহোগ্র, ৯৮। স্বচ্ছন্দ সাবসংগ্রহ, ৯৯। তারাপ্রদীপ, ১০০। সঙ্কেতচন্দ্রোদয়, ১০১। অতিস্ফুট, ১০২। ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বক, ১০৩। ত্রিপুরার্ণ, ১০৪। বিষ্ণুধর্মোত্তব, ১০৫। মন্ত্রদর্পণ, ১০৬। বৈষ্ণবামৃত, ১০৭। মানসোল্লাস, ১০৮। পূজাপ্রদীপ, ১০৯। লক্ষ্যনির্ণয়, ১১০। ভক্তিমঞ্জরী, ১১১। ভুবনেশ্বরী, ১১২। পাবিজাত, ১১৩। প্রযোগসাব, ১১৪। কামবত্ন, ১১৫। ক্রিয়াসার, ১১৬। আগমদীপিকা, ১১৭। ভাবচূড়ামণি, ১১৮। তন্ত্রচূড়ামণি, ১১৯। বৃহচ্ছ্রীক্রম, ১২০। শ্রীক্রম, ১২১। সিদ্ধান্তশেখর, ১২২। গণেশবিমর্ষিণী, ১২৩। মন্ত্রমুক্তাবলী, ১২৪। তত্ত্বকৌমুদী ১২৫। তন্ত্রকৌমুদী, ১২৬। মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ, ১২৭। রামার্চনচন্দ্রিকা, ১২৮। শারদাতিলক, ১২৯। জ্ঞানার্ণব, ১৩০। সাবসমুচ্চয়, ১৩১। কল্পদ্রুম, ১৩২। জ্ঞানমালা, ১৩৩। পুবশ্চবণচন্দ্রিকা, ১৩৪। আগমোত্তর, ১৩৫। তত্ত্বসাগব, ১৩৬। সাবসংগ্রহ, ১৩৭। দেবপ্রকাশনী, ১৩৮। তন্ত্রার্ণব, ১৩৯। ক্রমদীপিকা, ১৪০। তারা-বহস্য, ১৪১। শ্যামারহস্য, ১৪২। তন্ত্ররত্ন, ১৪৩। তন্ত্র-প্রদীপ, ১৪৪। তারা বিলাস, ১৪৫। বিশ্বমাতৃকা, ১৪৬। প্রপঞ্চসার, ১৪৭। তন্ত্রসার এবং ১৪৮। রত্নাবলী।*

মহাসিদ্ধি সারস্বত তন্ত্রে উল্লিখিত ৬৪ খানা তন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে আগমতত্ত্ব বিলাসে যে প্রধান প্রধান ১৪৮ খানা তন্ত্রের ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে, তদতিরিক্তও বহু তন্ত্র সুপ্রাচীন কাল থেকে বিশেষ পাঠ্যক্রমে চলতি ছিল। পরবর্তীকালে, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রার্দুর্ভাবে আর্য ধর্মের পাশাপাশি যেমন ও দু'টি ধর্মমত তদানীন্তন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন যোজনারূপে পাওয়া যায়, তেমন কপিল প্রভৃতি মুনিগণের প্রণীত আর্য তন্ত্রের ন্যায়, বৌদ্ধ বজ্রসত্ত্ব-রচিত তন্ত্র এবং অন্যান্যের প্রণীত তন্ত্রগুলোও পাওয়া গিয়েছে। কপিল প্রভৃতির তন্ত্র উপতন্ত্রনামেই প্রায়শ পরিচিত।

* আগমতত্ত্ববিলাস তন্ত্রখানা যদিও তন্ত্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ প্রামাণিক তন্ত্ররূপে গণ্য করেছেন, তথাপি একথা বলতে হচ্ছে যে, আগমতত্ত্ববিলাসের এই তালিকায় অনেক কখানা প্রক্ষিপ্ততন্ত্র রয়েছে।

বারাহীতন্ত্রেও তন্ত্রমাহাত্ম্যের মধ্যে কথিত হয়েছে—সর্বরকম কাম্যফলদানে সমর্থ, পুণ্যজনক তন্ত্রশাস্ত্র বেদসম্মিত বটে।[১]

বৃহৎ তন্ত্রসার গ্রন্থখানা, বাংলাদেশে তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাপক অনুসরণের সাক্ষ্যবহ। বহু প্রামাণিক তন্ত্রের সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক গবেষণার ফল ইহা। স্মৃতিশাস্ত্রের মত তন্ত্রশাস্ত্রেও মূলগ্রন্থের অর্থাৎ সর্ববাদিসম্মত গ্রন্থের প্রমাণের উপরেই নিবন্ধরচনা গ্রাহ্য। অন্যথা, নিষ্প্রমাণ উক্তি বলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তন্ত্রসার, সর্বাদৃত তন্ত্রনিবন্ধ। তা' খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে প্রণীত হয়ে, নবদ্বীপের অর্থাৎ বাংলাদেশের মুখোজ্জ্বল করেছে। তাতে প্রমাণ হিসাবে প্রাচীন যে সকল তন্ত্র গৃহীত হয়েছে, তা নিম্নরূপ—১। অগস্ত্যসংহিতা, ২। আগম সংহিতা, ৩। আগমসার, ৪। আগমকল্পদ্রুম, ৫। আগমোত্তর, ৬। আদিযামল, ৭। আগম তত্ত্ববিলাস, ৮। উত্তরতন্ত্র, ৯। ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র, ১০। একবীরাকল্প, ১১। ক্রিয়াসার, ১২।ক্রিয়াসারসমুচ্চয়, ১৩। কুলচূড়ামণি, ১৪। কল্প, ১৫। কল্পদ্রুম, ১৬ কালোত্তর, ১৭। কুব্জিকা, ১৮। কুলার্ণব ১৯। কুলপ্রকাশ, ২০। কুলামৃত, ২১। কুলাবলী, ২২। কালীহৃদয়, ২৩। ক্রমদীপিকা, ২৪। কুলোড্ডীশ, ২৫। কালীকুল সদ্ভাব, ২৬। কালীতন্ত্র, ২৭। কালীক্রম, ২৮। কুমারীকল্প, ২৯। কালীকল্প, ৩০। কালীরহস্য, ৩১। কালীকুলার্ণব, ৩২। কুক্কুটেশ্বর, ৩৩। কাত্যায়নীকল্প, ৩৪। কৌলাবলীয়, ৩৫। কুলানন্দ সংহিতা, ৩৬। কুমারীতন্ত্র, ৩৭। গণেশবিমর্ষিণী, ৩৮। গৌতমীয়, ৩৯। বৃহদ্‌গৌতমীয়, ৪০। গুপ্তার্ণব, ৪১। গন্ধর্ব, ৪২। গরুড়তন্ত্র ৪৩। চামুণ্ডাতন্ত্র, ৪৪। ছন্দঃসারতন্ত্র, ৪৫। জ্ঞানার্ণব, ৪৬। জ্ঞানমালা ৪৭। জ্ঞানতন্ত্র, ৪৮। তারা প্রদীপ, ৪৯। তন্ত্রার্ণব, ৫০। তত্ত্বসার, ৫১। ত্রিপুরাসার সমুচ্চয়, ৫২। ত্রিপুরার্ণব, ৫৩। ত্রিপুরাসার, ৫৪। বৃহৎ-তত্ত্ববোধ, ৫৫। তত্ত্ববোধ, ৫৬। তারিণীনির্ণয়, ৫৭। তারাতন্ত্র, ৫৮। তারিণীতন্ত্র, ৫৯। তন্ত্রচূড়ামণি, ৬০। দেব্যাগম, ৬১। দক্ষিণামূর্তি সংহিতা, ৬২। দিব্যতন্ত্র, ৬৩। নিগমকল্পলতা, ৬৪। নিত্যাতন্ত্র, ৬৫। নবরত্নেশ্বর, ৬৬। নারায়ণীতন্ত্র, ৬৭। নিবন্ধ, ৬৮। নারদীয়, ৬৯। নীলতন্ত্র, ৭০। নন্দিকেশ্বর, সংহিতা, ৭১। নীলসারস্বত, ৭২। নন্দ্যাবর্ত্ত-উত্তরখণ্ড, ৭৩। পিঙ্গলাতন্ত্র, ৭৪। প্রপঞ্চসার, ৭৫। পুরশ্চরণচন্দ্রিকা, ৭৬। ফেৎকারীয়, ৭৭। ব্রহ্মযামল, ৭৮। বৃহৎস্তবরাজ, ৭৯। ব্রহ্মসংহিতা, ৮০। বৃহদ্‌ভূতডামর, ৮১। বৃহৎপারমহংসী সংহিতা, ৮২। ভৈরবীতন্ত্র, ৮৩। ভাবচূড়ামণি, ৮৪। ভৈরবতন্ত্র, ৮৫। ভক্তিকল্পদ্রুম, ৮৬। ভূত-ডামর, ৮৭। মৎস্যসূক্ত, ৮৮। মালিনীবিজয়, ৮৯। মুণ্ডমালা, ৯০। মন্ত্রদেব

১. 'সর্বকামপ্রদংপুণ্যং তন্ত্রং বৈ বেদসম্মিতম্‌', বারাহীতন্ত্রে তন্ত্রমাহাত্ম্যম।

প্রকাশিকা, ৯১। মানসোল্লাস, ৯২। মায়াতন্ত্র, ৯৩। মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ, ৯৪। মহো-গ্রতারাকল্প, ৯৫। মহাকাল সংহিতা, ৯৬। যামল, ৯৭। যোগিনীতন্ত্র, ৯৮। যোগিনীহৃদয়, ৯৯। যক্ষডামর, ১০০। রুদ্রযামল, ১০১। রামার্চনচন্দ্রিকা, ১০২। রত্নাবলী, ১০৩। লক্ষ্মীকুলার্ণব, ১০৪। ললিতাতন্ত্র, ১০৫। বৈশম্পায়ন সংহিতা, ১০৬। বারাহীয়, ১০৭। বারাহীতন্ত্র, ১০৮। বিশ্বসার, ১০৯। বিষ্ণুযামল, ১১০: বিশুদ্ধেশ্বর (বৃহৎ) ১১১। বামকেশ্বর, ১১২। বিশুদ্ধেশ্বর, ১১৩। বশিষ্ঠ-সংহিতা, ১১৪ বীরাতন্ত্র, ১১৫। বীরতন্ত্র, ১১৬। শ্রীক্রম, ১১৭। বৃহচ্ছ্রীক্রম, ১১৮। শ্রীক্রমসংহিতা, ১১৯। শিবধর্ম, ১২০। শাম্ভবীয়, ১২১। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, ১২২। শিবাগম, ১২৩। সারসংগ্রহ, ১২৪। সিদ্ধযামল, ১২৫। সিদ্ধসারস্বত, ১২৬। সারদা, ১২৭। সনৎকুমার সংহিতা, ১২৮। সময়া, ১২৯। সম্মোহনতন্ত্র, ১৩০। স্বতন্ত্রতন্ত্র, ১৩১। স্বচ্ছন্দসংগ্রহ, ১৩২। সোমভুজগাবলী, ১৩৩। সঙ্কেতচন্দ্রোদয়, ১৩৪। স্বায়ম্ভুব মাতৃকান্ত্র, ১৩৫। সিদ্ধান্তশেখর, ১৩৬। হংসপারস্বর, ১৩৭। হংসমাহেশ্বর এবং ১৩৮। হনুমৎকল্প।

আনন্দতীর্থেরও 'বৃহৎ তন্ত্রসার' নামক পৃথক তন্ত্র নিবন্ধ, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মানন্দকৃত বা সংগৃহীত 'তন্ত্রসার', পূর্ণানন্দকৃত 'শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী' প্রভৃতি যাবতীয় প্রামাণ্য তন্ত্রনিবন্ধে উল্লিখিত তন্ত্রগুলো থেকেই বচন-প্রমাণ গৃহীত হয়েছে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে,– বেদানুসারী, এবং বেদমূলক এসব তন্ত্রশাস্ত্র, নতুন পন্থা-পদ্ধতির নির্দেশনায়, আপামর জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর উপস্থাপনের মাধ্যমে, তুলনামূলক স্বল্পপ্রয়াসে, অভিপ্রায় সিদ্ধির জনপ্রিয় বাদিজয়-প্রতিবাদিস্তম্ভন-বশীকরণ-আকর্ষণ-উচচাটন-মারণ-রোগোপশমন-যুদ্ধজয়– প্রভৃতি অসংখ্য প্রক্রিয়ার প্রভাবে; বিশেষত, কলিকালে তন্ত্রের ক্রিয়া অধিকতর উপযোগী বলে ঘোষণা প্রভৃতির প্ররোচনায়, অল্পেই বিস্তার লাভ করতে পেরেছে। সমাজে এক সময় বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল তান্ত্রিক ক্রিয়া। বৈদিক সংস্কৃতির সাথে তাই, তান্ত্রিক সংস্কৃতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তান্ত্রিক সংস্কৃতির বহু ধারা।

বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় যে বর্ণভেদ রয়েছে, তার প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেকেরই আশ্রমধর্ম অনুসরণ করার নির্দেশ, বৈদিক আশ্রম-ব্যবস্থা নামে পরিচিত। দ্বিজ-শ্রেণীর উপনয়ন থেকে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের রীতি-নীতি অনুসরণ করে গুরুগৃহে অধ্যয়ন করতে হয়, পাঠ সমাপনে সমাবর্তন করতে হয় পিত্রালয়ে। ইহার পরে বিয়ে করে গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের শেষে বানপ্রস্থ অর্থাৎ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে বনে প্রস্থান করে আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনায় অবশিষ্ট সময়টা কাটিয়ে দিতে হয়।

ইহা উত্তম পন্থা। অপারগ এবং অনিচ্ছুক শ্রেণী বাদে, অনেকেই এই ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ—ধর্মের অনুসরণ করত। মৃত্যু প্রত্যেকের সামনেই অপেক্ষমান, সুতরাং কেবল ঐহিক ধন-দৌলতে মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত চালিয়ে নেয়া সম্ভব হলেও, ইহ জন্মের কর্মের ফল পরজন্মেও ভোগ করতে হওয়ার প্রতি অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদের প্রতি আস্থা থাকায়, অন্তত শেষ জীবনটা আত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে নিয়োজিত করতেই জ্ঞানীরা চেষ্টিত হতেন। অপরটি হল যতি-আশ্রম বা সন্ন্যাস আশ্রম। যাঁরা সংসার করতে অনিচ্ছুক, তারাই সন্ন্যাস গ্রহণ করে আমরণ অধ্যাত্ম-সাধনায় নিয়োজিত রয়েছেন। তন্ত্রের বিধানে, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বা গার্হস্থ্যাশ্রমের মধ্যে বিশেষ কোন বিধি-নিষেধ নেই, এমনকি, বানপ্রস্থেরও অন্যথাভাষণ নেই। তবে, আধ্যাত্মিক সাধনার যাবতীয় ক্ষেত্রে তা' এক স্বতন্ত্র মতবাদ তুলে ধরেছে। তার ভাল দিক এবং মন্দ দিক উভয়ই বর্তমান।

পশ্বাচার, বীরাচার, দিব্যাচার নামে তান্ত্রিক সাধনায় বিভিন্ন আচার নির্দেশিত হয়েছে। সবগুলোই সর্বসাধারণের প্রকাশ্য নহে। এই কারণেই এসব তান্ত্রিক বিদ্যাকে গুহ্যবিদ্যা বলা হয়। তান্ত্রিক সাধনায় অলৌকিক শক্তি লাভ করার পরিণতিতে অনেক সাধক বিপথগামী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যেও অনেক প্রকার ভেদ পাওয়া যায়। কতক উগ্রকর্মের অনুষ্ঠানে নিরত থেকে সমাজের চোখে বড়ই ভীতিকর, এবং হেয় হয়ে থাকত। ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকের কপাল-কুণ্ডলার এবং কাপালিক অঘোর ঘণ্টের ছায়া অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে যে কাপালিকের চরিত্র-চিত্রণ দেখা যায়, তা-ই সেই শ্রেণীর পরিচায়নে যোগ্য নিদর্শন। আর্য ধর্মের এই তান্ত্রিক পথের অনুসরণে, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যেও নতুন নতুন সিদ্ধাচার্যদের অভ্যুদয়, এবং বজ্রসত্ত্ব প্রভৃতির রচিত বহু বৌদ্ধতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। জৈনদেরও সে রকম নতুন তন্ত্র-পন্থা থাকার কথা। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীর সম্পর্কে, অথবা গৌতম বুদ্ধের জীবনীর সম্পর্কে উপস্থাপিত 'তীর্থিক'-আখ্যার সাধক শ্রেণী ঠিক তান্ত্রিক পথের সাধক কিনা বলা কঠিন। যতি-আশ্রমেও নানাবিধ মতবাদ ঠাঁই পেয়েছিল, যার জন্য সে সর্ব তীর্থিকদের মধ্যে অনেকের জীবন-চর্যা, কিঞ্চিল্লব্ধ তপঃশক্তির উন্মাদনায় উন্মার্গীদের লোক-বিভ্রান্তিজনক ভেল্কি বলেই মনে হয়। এ রকম আরো অনেক প্রকার শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায় তান্ত্রিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে। সুতরাং প্রাগ্‌বৌদ্ধ, প্রাগ্‌জৈন যুগের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্য থেকে সংগঠিত নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ধারা উল্লিখিত বৈদিক-তান্ত্রিক সাহিত্য শ্রেণী দ্বারা পরিচায়িত হয়। আর, সে সকল জাতি-শ্রেণী-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের অসনুরণীয় উল্লিখিত প্রকারের গ্রন্থগুলো স্থান-কালের প্রায় ঊর্ধ্বে

থেকে, আদিকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর মধ্যে যা-ই থাক্না কেন, ধর্মশাস্ত্র হিসাবে একবার স্বীকৃত হয়ে গেলে তার গৌরব, অনুসারীদের কাছে থাকবেই। প্রবর্তনার উৎস বিশ্বাস পোঁটায়, দীর্ঘকালের বিশ্বাস থেকে জাত মোহও সহকারী হিসেবে পেয়ে যায়। যাঁরা একান্ত নিস্পৃহ, মুমুক্ষু, অর্থাৎ নির্গ্রন্থ,[১]— কর্মফলের বশে পুনরায় জন্ম নেয়ার বাধ্যতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাঁরাও ভগবদারাধনা, স্ব-স্ব পন্থায়ই করে থাকেন। সাবিত্রী-দীক্ষা বা উপনয়ন, বর্ণত্রয়ের অনুসরণীয় সংস্কার কর্ম। সে সংস্কার থেকেই সংস্কৃত ব্যক্তিরা বেদে অধিকারী হ'ন। তান্ত্রিক পূজা-অর্চনায় উক্ত দীক্ষার মাধ্যমে অধিকারিতা জন্মালেও[২] পুনরায় তান্ত্রিক দীক্ষা নামক সংস্কার গ্রহণ করবার রেওয়াজ বাংলাদেশে বিশেষভাবে অনুসৃত হয়। তান্ত্রিক দীক্ষা না নিলে কালীপূজা প্রভৃতি তান্ত্রিক কার্যে অধিকারই জন্মে না—মনে করা হয়। অধিকন্তু, কৌলিক তান্ত্রিকগণের বিভিন্ন অভিষেক নামক আলাদা সংস্কারও গ্রহণ করতে দেখা যায়। শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, ইন্দ্রাভিষেক—প্রভৃতি উন্নত সাধনার অনুকূল বিভিন্ন তান্ত্রিক সংস্কার। বেদাধিকারিতাহীন স্ত্রীলোক এবং চতুর্থ বর্ণেরও তান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। তন্ত্রের মত-সিদ্ধ যোগ-মার্গও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শরীরের অভ্যন্তরে কল্পিত (ক) মূলাধার (খ) স্বাধিষ্ঠান (গ) মণিপুর (ঘ) অনাহত (ঙ) বিশুদ্ধ এবং (চ) আজ্ঞাখ্য – ষট্চক্রের আনুধ্যানিক অনুসরণে সহস্রারে ব্রহ্মজ্যোতি-বিলয় অত্যন্ত কঠিন যোগ পথ। এইসব তান্ত্রিক সাধনার উপযোগী মত ও পথ নির্দেশিত হয়েছে বহু তন্ত্রে। সংহিতার মধ্যেও ঘেরণ্ডসংহিতা, অষ্টাবক্র সংহিতা, যোগি যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটক এবং রামদেব চিরঞ্জীবের 'বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি তান্ত্রিক কাপালিককে হাজির করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের কলুশতা। আবার, উঁচুদরের তান্ত্রিক সাধকেরও অভাব নেই। প্রসিদ্ধ দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালীকুল এবং শ্রীকুল নামক মৌলিক কৌল সাধনার অকলুশ পন্থা-পদ্ধতি আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে কৌলিক সাধকদের

১. ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়ঃ।
ক্ষীয়ন্তে সর্বকর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

যথার্থ ভগবদ্-দৃষ্টি লাভ করলে—হৃদয়ের গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়। সর্বসংশয়ের উচ্ছেদ হয়, সর্ব কর্মফল ক্ষয়িত হয়। তা যাঁদের ঘটে তাঁরাই নির্গ্রন্থ (গ্রন্থি বা বন্ধন যাঁদের নেই। জৈনদের যে নির্গ্রন্থ বলা হয়, তা আরোপমাত্র, বাস্তবে নির্গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হয়েছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিত্থং গুণময়ো হরিঃ॥ ১ম, স্কন্ধ ৮ম অধ্যায়, ১০ম. শ্লোক।

২. বাচস্পত্য অভিধানে সাবিত্রী দীক্ষা দ্রষ্টব্য।

মধ্যে বীরাচারীদের ধারায় দক্ষিণাচারী, বামাচারী, শ্রেণী পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, দক্ষিণাচারীদের মত বামাচারীরা একান্ত সহনশীল নয়. তাঁরা প্রক্রিয়া-বিশেষের সাহায্যে জোর করে অভীষ্ট-অর্জনে আগ্রহী। কিন্তু তাদের সেই প্রক্রিয়া-বিশেষের মধ্যেকার শবাধারের প্রসঙ্গে কাপালিকতা, পঞ্চ মকারের প্রসঙ্গে চারিত্রিক কলুশতা বহু-ক্ষেত্রেই, পথ-ভ্রংসরূপে পাওয়া যায়। একারণেই কি সনাতনী, কি বা বৌদ্ধ, গুহ্য তন্ত্রোপাসকেরা সর্বসাধারণ সমাজে তেমন শ্রদ্ধা পায় নি।

বর্তমান কালে ইংরেজী Arts শব্দ দ্বারা 'কলা' শব্দের অনুবাদ চলতি হয়ে গিয়েছে। Arts এবং Science শব্দ দ্বারা যাবতীয় বিদ্যাকে বৃহৎ দু'টি ভাগে বিভক্ত করে ব্যবহার করা হয় - কলা এবং বিজ্ঞান। প্রাচীন আর্যশাস্ত্রেও বিদ্যাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। চতুর্বিদ্যা চতুর্দশ বিদ্যা, অষ্টাদশবিদ্যা, ইত্যাদি। বেদ-১, বেদাঙ্গ-২, বেদান্ত-৩, এবং অন্যান্য যাবতীয় বিদ্যা-৪। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সরস্বতীকে গ্রহণ করা হয়। যে কোন বিদ্যার্থী অথবা অজ্ঞানাবস্থা থেকে উত্তরণেচ্ছু ব্যক্তিবর্গ পূজান্তে অঞ্জলি প্রদানে বিদ্যার চার-উপবিভাগ রূপেও সরস্বতীকে কল্পনা করে থাকেন।[১] আগের দিনে কেন, বর্তমান কালেও সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের নামে 'চতুষ্পাঠী' — শব্দ ব্যবহৃত হয়, তার অর্থও চার প্রকারে উপবিভক্ত যাবতীয় বিদ্যার পাঠ চতুষ্টয়াত্মক শিক্ষাগার।। আন্বিক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতিকে বিপুল বিদ্যা চতুষ্টয়ও বলা হয়েছে।।[২] বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দশ বিদ্যা এবং অষ্টাদশ বিদ্যার নির্দেশ আছে।।[৩] যাজ্ঞবল্ক্যও চতুর্দশ বিদ্যার নাম ধরা নির্দেশ করেছেন।[৪] চিরকাল "চতুঃষষ্ঠি কলাবিদ্যা" কথাটি লোক-মুখে শুনা যায়। শৈবতন্ত্রে তার নাম-নির্দ্দেশ রয়েছে: —

১। গীত, ২। বাদ্য, ৩। নৃত্য, ৪। নাট্য, ৫। আলেখ্য, ৬। বিশেষকচ্ছেদ্য ৭। তণ্ডুল-কুসুম-বলিবিকার, ৮। পুষ্পাস্তরণ, ৯। দশন বসনাঙ্গরাগ, ১০। মণিভূমি-কাকর্ম, ১১। শয়ন রচনা ১২। উদকবাদ্য, ১৩। উদকঘাত, ১৪। চিত্রযোগ,

১ "বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ"

২ ত্রয়ী চান্বিক্ষিকী চৈব বার্তা চ ভরতর্ষভ।
দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ।। মহাভা শান্তি প, ৫৯ অ, ৩৩ শ্লোক।।

৩. অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দশ।।
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু।। বিষ্ণু পু অংশ ৩, অধ্যায় ৬

৪. পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্ম শাস্ত্রাঙ্গ মিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ।। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

১৫। মাল্য গ্রথনবিকল্প, ১৬। শেখরাপীড় যোজন, ১৭। নেপথ্য যোগ, ১৮। কর্ণ পত্রভঙ্গ, ১৯। গন্ধযুক্তি, ২০। ভূষণ যোজন, ২১। ঐন্দ্রজাল, ২২। কৌচুমার যোগ, ২৩। হস্তলাঘব, ২৪। চিত্র শাকাপূপ ভক্ষ্যবিকার ক্রিয়া, ২৫। পানক রস রাগাসব যোজন, ২৬। সূচীবাপকর্ম, ২৭। সূত্র ক্রীড়া ২৮। প্রহেলিকা, ২৯। প্রীতিমালা, ৩০। দুর্বচক যোগ, ৩১। পুস্তক বাচন ৩২। নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন ৩৩। কাব্য সমস্যা পূরণ, ৩৪। পট্টিকা বেত্র বাণ বিকল্প, ৩৫। তর্কুকর্ম, ৩৬। তক্ষণ, ৩৭। বাস্তুবিদ্যা, ৩৮। রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ৩৯। ধাতুবাদ, ৪০। মণিরাগজ্ঞান, ৪১। আকড় জ্ঞান, ৪২। বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ, ৪৩। মেষকুক্কুট লাবক যুদ্ধ বিধি, ৪৪। শুক সারিকা প্রলাপন ৪৫। উৎসাদন, ৪৬। কেশমার্জনকৌশল, ৪৭। অক্ষর মুষ্টিকা, ৪৮। ম্লেচ্ছিতক বিকল্প, ৪৯। দেশ ভাষা জ্ঞান, ৫০। পুষ্পশকটিকা নিমিত্ত জ্ঞান, ৫১। যন্ত্র মাতৃকা, ৫২। ধারণ মাতৃকা, ৫৩। সম্পাঠ্য ৫৪। মানসী কাব্যক্রীড়া ৫৫। ক্রিয়া বিকল্প ৫৬। ছলিতক যোগ ৫৭। অভিধান কোষ ছন্দোজ্ঞান ৫৮। বস্ত্র গোপন ৫৯। দ্যূত বিশেষ ৬ । আকর্ষক্রীড়া ৬১। বালক্রীড়নক ৬২। বৈনায়িকীবিদ্যাজ্ঞান, ৬৩। বৈজয়িকীবিদ্যাজ্ঞান এবং ৬৪। বৈতালিকীবিদ্যাজ্ঞান।

উল্লিখিত ৬৪ প্রকার কলা, আর যা-ই হোক, শিক্ষাক্ষেত্রের বহুমুখীনতা যা' বহুকালের সংস্কৃতির উন্নত পারি-পাট্যের প্রমাণ, তাতে সন্দেহ নেই। আজকের দিনের আধুনিক শিক্ষাক্রমে এখনও ইহার অনেক অংশ অপঠিত-অপাঠিত থেকে যাচ্ছে অথচ তার অর্থ এ নয় যে তার মধ্যে জানবার-শেখবার কিছু নেই বলে উপেক্ষিত হচ্ছে, বরং কালের বৈমুখ্যে বাদ পড়ে যাচ্ছে। এসব কলার পঠন-পাঠন অভ্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে সংস্কৃতির ক্ষেত্র যে কত প্রশস্ত হয়েছিল তা' ভাবলে বিস্ময় লাগে না কি? তা ছাড়া কত রকম উপজীবিকা-ক্ষেত্র এর উপরে গড়ে ওঠে তাও কি সহজে নির্ণয় করা যায়? প্রাচীন শাস্ত্র অনুশীলন ছাড়া তৎকালীন সামাজিক অবস্থার অনুধাবন যে একান্তই অসম্ভব তার একটি উদাহরণও এই শৈবতন্ত্রের দেয়া কলা-তালিকা। তার 'অবলম্বনেই শ্রীধর স্বামী ভাগবতের টীকায় ইহার পুনরুল্লেখ করে শৈবতন্ত্রের গুরুত্বই কেবল প্রকাশ করেন নি, হারিয়ে যাওয়া আমাদের ঐতিহ্যের হদিস্‌ও করেছেন।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের ধারায় আরো যে কত গ্রন্থ রয়েছে এবং তার পঠন-পাঠনের সার্বত্রিক প্রসার যে কত প্রবলবেগে অধ্যেতৃবর্গের বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল, তা' ভাষায় ব্যক্ত করা চলে না। সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্ভার বেশী। প্রায় প্রত্যেকটি অর্থ বুঝাতে

বহু শব্দের ব্যবহার থাকায় রস-সঙ্গতি বা অনুগুণতা অনুসারে যোগ্য শব্দ ব্যবহারের সুযোগ এবং প্রবণতা বেশী ছিল বলে শব্দার্থ নির্ণয়ের শাস্ত্রও অনেক উন্নত ধরনের তৈরি হয়েছে। বেদের শব্দার্থ নির্ণয়ের গ্রন্থ বা বৈদিক শব্দাভিধান হচ্ছে 'নৈঘন্টুক' বা সংক্ষেপে নিঘন্টু এবং নিরুক্ত। তা দ্বারা অর্থ নির্ণয় করা গেলেও, অনায়াসে মুখস্থ রাখা কঠিন হয়। তাই, অগ্নিপুরাণের মধ্যে অত্যন্ত সোজা সরল ভাষায়, সুনিপুণ বিন্যাসে, শ্লোকবদ্ধ কোষ বা অভিধান রয়েছে। যার শুধু ছায়া অবলম্বনে নয়, বরং হুবহু নকল করার মাধ্যমে অমরার্থচন্দ্রিকা (নামলিঙ্গানুশাসন) গ্রন্থ প্রণয়ন করে অমরসিংহ অমর হয়ে আছেন। কিন্তু বহু লোকই জানে না যে, অমরকোষের অতসুন্দর রচনাধারাটিও বেদব্যাসেরই উদ্ভাবিত। অমর সিংহও অগ্নিপুরাণের কাছে কৃতজ্ঞতার প্রসঙ্গ একদম বাদ দিয়ে গিয়েছেন। রাধাকান্ত দেব প্রণীত বিশাল শব্দকল্পদ্রুম নামক অভিধান গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হয়েছে-[১]

"সকল কোষগ্রন্থের আদি, অগ্নিপুরাণোক্ত অভিধান। তাতে, প্রথমে স্বর্গ তারপরে অব্যয় বর্গ। তারপর নানার্থবর্গ। তারপর ভূ-পুর-অদ্রি-বনৌষধি-সিংহাদি বর্গ। তারপরে মনুষ্য-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রবর্গ। শেষভাগে সাধারণ শব্দ এবং তার পুং-স্ত্রী-ক্লীবলিঙ্গ বিধান রয়েছে বলে আমি নিজে দেখেছি। অমর সিংহ কিন্তু উক্ত অগ্নিপুরাণীয় অভিধানের সামান্য নামলিঙ্গ অংশের, বিশেষ্যনিঘ্নবর্গ এবং সঙ্কীর্ণবর্গ নাম দিয়ে, গ্রন্থের শেষে লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গের যোগকরে নিজের কোষগ্রন্থ রচনা করেছেন। এভাবে, জটাধরও অমরকোষের অনুকরণ করেছেন [পর্যায় নানার্থকোষ গ্রন্থে]। এ ঘটনার প্রচার খুবই কম।"

পুরাণশাস্ত্রগুলো আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ে যে কত তথ্য দিয়ে থাকে, তার ইয়ত্তা নেই। আয়ুর্বেদের প্রাচীন গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার সম্বন্ধে তা কি রকম মূল্যবান লক্ষ্য করি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের ১৬শ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে-[২]

১ "সর্বেষাং কোষাণামাদি অগ্নিপুরাণোক্তাভিধানম্। তত্রাদৌ স্বর্গপাতালাদিবর্গঃ। ততোঽব্যয়বর্গঃ। ততো নানার্থবর্গঃ। ততো ভূপুরাদি বনৌষধি সিংহাদিবর্গঃ। ততো নৃব্রহ্মক্ষত্রবিট্‌শূদ্রবর্গঃ। শেষে সামান্যানি নামলিঙ্গানি সন্তীতি ময়া দৃষ্টং। অমরসিংহস্তু উক্তাগ্নিপুরাণীয়াভিধানস্য কস্যচিৎ কস্যচিৎ বর্গস্য ব্যতিক্রমং কৃত্বা তত্রোদিত সামান্য নামলিঙ্গানাং বিশেষ্যনিঘ্নবর্গ-সঙ্কীর্ণবর্গাবিতি সংজ্ঞাং স্থাপয়িত্বা অন্তে লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গস্য যোগং কৃত্বা স্বীয়কোষং রচিতবান্। এবং জটাধরোঽপি অমরকোষস্যানুকরণং কৃতবান্। ইতি বিরলপ্রচারঃ।" শব্দকল্পদ্রুম, ভূমিকা, পৃঃ চিহ্ন।

২. "চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানং নাম তন্ত্রং মনোহরম্। ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ চকার প্রথমে সতি।।
চিকিৎসাদর্পণং নাম দিবোদাসশ্চকার সঃ। চিকিৎসাকৌমুদীং দিব্যাং কাশীরাজশ্চকার সঃ।।

১। 'চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান' নামক গ্রন্থ প্রথমে প্রণয়ন করেছেন ধন্বন্তরি। ২। দিবোদাসের চিকিৎসার গ্রন্থের নাম চিকিৎসাদর্পণ। ৩। কাশীরাজ প্রণীত চিকিৎসা-কৌমুদী। ৪-৫। অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয় চিকিৎসাসারতন্ত্র এবং ভ্রমঘ্ন নামক গ্রন্থদ্বয়, ৬। নকুল---বৈদ্যকসর্বস্ব, ৭। সহদেব---ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দন, ৮। যমরাজ করেছেন জ্ঞানার্ণব নামক মহাতন্ত্র, ৯। ঋষি চ্যাবন জীবদান নামক গ্রন্থ, ১০। যোগী জনক করেছিলেন--বৈদ্যসন্দেহভঞ্জন নামক গ্রন্থ ১১। বুধের গ্রন্থ---সর্বসার, ১২। জাবাল করেন---তন্ত্রসারক, ১৩। মুনি জাজলি--বেদাঙ্গসারতন্ত্র, ১৪। পৈল করেছেন 'নিদান,' ১৫। করথ, 'সর্বধর' নামক তন্ত্র, ১৬। অগস্ত্য করেছেন দ্বৈধনির্ণয় নামক গ্রন্থ। প্রাচীন শাস্ত্রের অনুশীলনে এরকম বহুতথ্যই পাওয়া যায়। উল্লিখিত ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যার প্রত্যেক বিষয়ের প্রাচীন-সুপ্রাচীন গ্রন্থেরও হদিস আছে। গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তা বাদ দেয়া হল।

সুশ্রুত এবং চরক নামক আয়ুর্বেদের গ্রন্থদ্বয়ও সুপ্রাচীন। ও দু'খানও সংহিতা গ্রন্থ।[১] কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের অন্যতম সভা-পণ্ডিত অগ্নিবেশ মুনি চরক সংহিতার টীকা করেছেন।[২] ভট্টার হরিচন্দ্রও সুপ্রাচীন গ্রন্থকার। তিনিও চরক-সংহিতার সমীচীন টীকা করেছেন। oxf. 187b. নং গ্রন্থখানা, সে হদিস দিয়েছে। হরিচন্দ্র প্রাচীন গ্রন্থকার। তার 'গদ্যবন্ধ' কাব্যের প্রশস্তি রচনা করে বাণভট্ট বলেছেন 'ভট্টার হরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধো নৃপায়তে'---অর্থাৎ ভট্টার হরিচন্দ্রের গদ্যবন্ধ, যেন সাহিত্য জগতে রাজকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত। চরকের রচনা-কাল সঠিক ধরতে পারা না গেলেও, উল্লিখিত টীকার মাধ্যমে, যে ভাবে খৃষ্ট পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আগের বলে চরক সংহিতাকে সহজে ধরা যায়, সেভাবে সুশ্রুতের কাল নির্দ্ধারণ হওয়া কষ্টকর। সুশ্রুতের সুপ্রাচীন টীকাকারদের মধ্যে উল্লট এবং ডহলন বা

চিকিৎসাসারতন্ত্রঞ্চ ভ্রমঘ্নং চাশ্বিনীসুতৌ। তন্ত্রং বৈদ্যকসর্ব্বস্বং নকুলশ্চ চকার সঃ॥
চকার সহদেবশ্চ ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দ্দনম্। জ্ঞানার্ণবং মহাতন্ত্রং যমরাজশ্চকার সঃ॥
চ্যাবনো জীবদানঞ্চ চকার ভগবান্ ঋষিঃ। চকার জনকো যোগী বৈদ্যসন্দেহভঞ্জনম্॥
সর্বসারং চন্দ্রসুতো জাবাল স্তন্ত্রসারকম্। বেদাঙ্গসারং তন্ত্রঞ্চ চকার জাজলির্মুনিঃ॥
পৈলো নিদানং করথ স্তন্ত্রং সর্ব্বধরং পরম্। দ্বৈধনির্ণয়তন্ত্রঞ্চ চকার কুম্ভসম্ভবঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ,
ব্রহ্মখণ্ড, ১৬শ অধ্যায়।

১. ভেলসংহিতাও অন্যতম সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ। চরক এবং ভেল---উভয়ই আত্রেয় এঁর শিষ্য। উভয় গ্রন্থই সুপ্রাচীন। আশুতোষ মুখার্জী সম্পাদিত ভেলসংহিতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২১ খৃ প্রকাশিত হয়েছে।
২ S.B 284

উহলন করেকার লোক তা এখন পর্যন্ত বলা চলে না। কিন্তু পরম্পরা প্রসিদ্ধি আছে যে সুশ্রুত গ্রন্থ চরকের চেয়ে আগেকার। গ্রন্থের ঢং এবং পরিপাটীও সে রকম ধারণা দেয়। মহারাজ কণিষ্কের সভায় একজন চরক নামক পণ্ডিত ছিলেন বলে কেহ কেহ বলেন, তার সপক্ষে প্রমাণ নেই। থাকলেও সে চরক হবে ভিন্নব্যক্তি।

উল্লিখিত প্রকারে, সুপ্রাচীন আর্যসংস্কৃতির হাজার হাজার গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় যা'র মাধ্যমে সামাজিক ভাবে দীর্ঘ দীর্ঘ কালের ব্যাপক-অনুশীলিত-পরিশীলিত আর্য সংস্কৃতি সঠিক জানা এবং তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সুপ্রাচীন বাঙালীর আদিম সংস্কৃতি নিরূপণ করতে পারা যেতে পারে।

বর্তমানের গ্রন্থ মুদ্রণের যুগে, মুদ্রিত কিছু আধুনিক গ্রন্থের মাধ্যমে পড়াশুনা চলার যুগে, সীমিত গ্রন্থাংশে সম্ভাব্য প্রশ্ন অনুশীলনের যুগে, প্রাচীন পুঁথিপত্রের উপর আস্থা তো নেই বললেও চলে, অথচ মুদ্রণ ব্যবস্থা এদেশে আগার বয়স এখনো দু'শ বছরের মত। কিন্তু আমাদের সভ্যতার ইতিহাসের কাছে দু'শ' পাঁচ'শ কেন, ২ হাজার ৫ হাজার বছরও নেহাৎ স্বল্পকাল। আমাদের সেই সভ্যতার গোড়াপত্তন কবে হয়েছে তা' কোনদিন হয়তো আবিষ্কৃতও হবে, কিন্তু সে আবিষ্কারে যে সব নজীর, যে কিছু পুঁথি-পুস্তক এখনো আছে তা' সব মুদ্রিত নয়। সেই আগের দিনের ধারায় হাতে লিখিত, যার বহত্তর অংশ এবং বাছাই বাছাই গ্রন্থাংশ পাচার হয়ে গিয়েছে ইউরোপে, আমেরিকায়। তার অনুশীলনের ব্যাপারটা তো আর গায়ে ফুঁদিয়ে করার নয়। এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে আগের দিনের গ্রন্থের অধিকাংশ। কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান, অথবা যৌথ-উদ্যোগে গঠিত কিংবা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে কেন, অন্য কোথাও আছে বলে জানা নেই যেসব প্রতিষ্ঠানের কোন একটার উদ্যোগেও সেসব প্রাচীন পাণ্ডুলিপি গ্রন্থগুলো আসন্ন বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। যাঁদের অতীত ঐতিহ্য আমাদের মতই ওই সব প্রাচীন পাণ্ডুলিপির গ্রন্থরাজির মাধ্যমেই কেবল ব্যাপকভাবে জানা যেতে পারে, সে রকম দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্রও যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিতেছেন না। ইহা পরিতাপের বিষয়। আধুনিক পদ্ধতিতে xerox printing প্রভৃতির মাধ্যমে অনায়াসে আলোক মুদ্রণ হতে পারে। স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের রক্ষায় রাষ্ট্রীয় সক্রিয়তা একান্ত দরকার।

যা হোক, নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অথবা চলিত ভাষার মধ্যেকার দু'চারটি শব্দের ব্যবহারকে ভাষিক নিদর্শন মনে করে, আদিম বঙ্গাধিবাসীদের নানা গোষ্ঠী-কল্পনা করা হলেও, তাঁদের কোন পৃথক গোষ্ঠী-সত্তা লক্ষ্য করার মত নেই। কেননা,

আর্যায়ণেরও আগে বিভিন্ন নর-গোষ্ঠীর সম্ভাব্য সংমিশ্রণের ফলে নতুন করে সংগঠিত মিশ্র জাতিরও কোন সাংস্কৃতিক স্বরূপ ধরবার বা অনুধাবন করবার অভ্রান্ত কোন নিদর্শন আজও মেলে নি। পূর্বোল্লিখিত 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' খননের ফলে প্রাপ্ত সব নিদর্শন একান্তই যদি আর্যায়ণের আগেকার বলতে হয়, তবে তার কালনির্ধারণও সেই অনুসারেই করতে হবে, যেহেতু, পূর্বোল্লিখিত মহাভারতের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যোগ-দানাদি আর্য সভ্যতার প্রমাণ এবং মনুসংহিতায়ও তৎকালীন পৌণ্ড্রক-দিগকে আর্য সভ্যতার মধ্যেকার ভ্রষ্টাচারমাত্র উল্লেখও আর্য সভ্যতার প্রমাণ। সুপ্রাচীন সে সব বঙ্গীয় পুণ্ড্রকদের নাম-ধাম, কাজ কর্ম--সবই আর্যসংস্কৃতি-সংপৃক্ত লিখিত হয়েছে। সুসভ্য সংস্কৃতিমান উন্নত জনতার সংখ্যাধিক্য না থাকলেও প্রাধান্য কেবল আজকের ব্যাপার নয়, তা চিরকালের ঘটনা, এবং তা ধরেই সত্যি-কার পরিচিতি। একান্ত অনুন্নত আঠারগণ্ডা গোষ্ঠী-নামে ভাগে ভাগে পরিচায়িত উপজাতির মধ্যে অনবলুপ্ত কিছু কিছু সংস্কৃতির বৈষম্যদ্বারা গোটা বাঙালীকে চিহ্নিত করা উচিত নয় এবং তা বাস্তবও নয়। তা'ছাড়া স্বল্প-শঙ্কর মোঙ্গলীয় নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ যাঁদের মধ্যে বিদ্যমান, তারা সেই আদ্যিকাল থেকে বঙ্গের অধিবাসীর বংশ-ধর, না পরবর্তীকালে আগত এবং উপনিবিষ্ট তা' ঠিক করে বলা চলে না। তাই, আর্য্যদের সভ্যতায়, আর্যদের ভাষায় এবং অধিকাংশ আচার-আচরণের উপলক্ষণেই আর্যায়ণোত্তর প্রাচীন বঙ্গীয়দিগকে চেনা যায়।

ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আর্য্য সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেল, তা' একক আর্যসংস্কৃতির। ওপর্যন্তই যদি বঙ্গদেশবাসীর আর্যায়ণের আগেকার বলা হয়, তাতে সেসব বিষয়ে বাঙালীর কোন অবদানই অস্বীকার করা হয়। নিখুঁত অনুসন্ধানে ওর মধ্যেও কিছু কিছু বঙ্গীয় অবদান আবিষ্কার করার সম্ভাব্যতায়, আর্যায়ণ আরো বহুকাল পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য-বীজ আগে থেকে না থাকলে, বর্ণলিপির ভঙ্গিতে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সাধনায়, উপাসনায়, উৎসবে, আতি-থেয়তায়, প্রসাদনে, শিল্পে, পোষাক-পরিচ্ছদে, খাদ্যবস্তুতে এবং এ রকম আরও বহু ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য টিকে থাকতে পারত না। ভৌগোলিক আখ্যায় সুবিশাল বঙ্গস্থলীর সুবিশাল জনতা আর্য্য সভ্যতায় আত্মপ্রকাশিত হলেও তাঁদের প্রভাবের, স্বাতন্ত্র্যের এবং বৈশিষ্ট্যের একান্ত অবলোপ ঘটে নি, বিকশিত হয়েছে মাত্র।

পাণিনির কাল এবং পরবর্তী যোজনা

ঐতিহাসিক কালের মধ্যে এসে অবতরণ করতে পূর্বোল্লিখিত আলোচনায় অষ্টাধ্যায়ী-ব্যাকরণ-প্রণেতা পাণিনির কাল অবলম্বন করতে হয়। পাণিনি, ডঃ আহমদ শরীফের মতে খৃষ্ট পূর্ব ৭ম শতাব্দী এবং প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত গোল্ড ষ্টুকারের মতে, খৃষ্ট পূর্ব ৮ম শতাব্দী,—পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। পাণিনি যে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী তা' বিশ্বাস হয়। পরবর্তীকালের হলে, জৈনধর্মের এবং বৌদ্ধধর্মের পারিভাষিক বিশেষ বিশেষ পদের ব্যুৎপত্তির নিরূপণে স্মারণিকী পাওয়া যেত অষ্টাধ্যায়ীতে। পাণিনির জন্মস্থান পড়েছে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলে। আধুনিক অনুসন্ধিৎসুরা, পাণিনির জন্মস্থান 'শালাতুর' গ্রাম পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পেরেছেন। তথাপি, অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে দূর-দূরান্তের অধিবাসী এবং ইতিহাসকার না হওয়া সত্ত্বেও, একমাত্র অতি প্রামাণিক অষ্টাধ্যায়ীর সুবাদেই এ দেশেও সম আদৃত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন পাণিনি। তাঁর নামটার জনপ্রিয়তার বদৌলতে, শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যাকরণ (অষ্টাধ্যায়ী), পাণিনি-ব্যাকরণ নামেই বেশী পরিচিত। তাঁর ঐ ব্যাকরণও, তৎকালীন ভারতের সর্বত্র অধীত হয়েছে নানা কারণে---। একাধারে লৌকিক এবং বৈদিক সংস্কৃতের একত্র সমাবেশ এই ব্যাকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অষ্টাধ্যায়ী বাদেও, 'জাম্ববতীবিজয়' এবং 'পাতালবিজয়' নামক দু'খানা কাব্যগ্রন্থ পাণিনির সৃষ্টি। 'হরিহারাবলী' নামক অপর একখানা প্রশস্তি কাব্যেরও প্রণেতা বলে পাণিনিকে পাওয়া যায়। সর্বদর্শনসংগ্রহ-গ্রন্থের ১৩শ অধ্যায়টির নাম 'পাণিনি-দর্শন'। আস্তিক দর্শনের অন্যতম এই দর্শনের মূল স্রষ্টা যদি এই আলোচ্য পাণিনিই হয়ে থাকেন (অবশ্য, তা হওয়ারই কথা, যেহেতু অন্য কোন পাণিনির সন্ধান পাওয়া যায় না) তা' হলে পাণিনির বহুমুখী সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা, অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে, সুপ্রাচীন বাঙালীরা অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসীরা, পাণিনির চেয়ে যতকাল আগেই অর্যায়িত হয়ে থাক্ না কেন, পাণিনির ব্যাকরণ এবং তার অপরাপর গ্রন্থও অবশ্যই টের পেয়েছিলেন· এবং নিজেদের প্রয়োজনেই তা' সংগ্রহ এবং অনুশীলন করে থাকবেন। অন্যথা, যে ভাষায় তাঁদের যাবতীয় ধর্মীয় পুঁথি-পত্তর, যে ভাষার মৌলিক গ্রন্থগুলো, সংস্কৃতির যাবতীয় তথ্য এবং

তত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আকড় তা' তাঁরা পড়েছেন-জেনেছেন কি ভাবে? ধর্মশাস্ত্রগুলোর কোন দৈশিকতা মানা হয় না। যে দেশে বা যে কালেই মূল ধর্মশাস্ত্র তৈরি হয়ে থাক, অনুসারীরা তা' একান্ত আপন করে নেয়, নিজেদের বলে মেনে নেয়—এটাই তো দেখা যায় সার্বত্রিক ব্যবহার। এখানেও তার কোন ব্যত্যয় নিশ্চয়ই নেই। বেদ থেকে শুরু করে যে বিশাল সাহিত্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে, যা' আর্য সভ্যতার সম্পূর্ণ পরিণাহটা জুড়ে রয়েছে, যার সাহায্যে জানা যাবে জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত অপরিহার্য সংস্কারগুলো, পিত্রাদি পরিজনের মরণে পুত্রাদির কর্তব্য, ঔর্দ্ধদেহিক বিধি-বিধান, পূজা-যাগ-যজ্ঞ-শান্তিক-পৌষ্টিক কর্ম, ব্রত-নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, শৌচাশৌচ, খাদ্যাখাদ্য, সামাজিক স্তর তারতম্য, গোষ্ঠীকর্ম, শিল্পকর্ম, চিকিৎসা—ইত্যাদি সব কিছু, যা না হলে আর্য সভ্যতার বা সংস্কৃতির কিছুই জানার উপায় নেই বা ছিল না, তা' যে, তদানীন্তন বাঙালীরাও পড়েছেন-পড়িয়েছেন, ভেবেছেন অনুশীলন-পরিশীলন করেছেন—তা' অবশ্যই। আর, তার প্রয়োজনেই বেদাঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ এবং তৎ পরবর্তী আলোচ্য সাহিত্য বা কাব্য অবশ্যই এদেশেও প্রসারপ্রাপ্ত হয়েছিল। ধর্মদ্বেষী বা নাস্তিক চিরকালই থেকেছে, থাকছে এবং থাকবেও। তা কেবল আর্য ধর্মে নয়, সব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই পাওয়া যায়। একটা জিনিষ এ সম্বন্ধে লক্ষণীয় যে, নাস্তিকের কখনো বৃহত্তর শ্রেণী বা গোষ্ঠী - দল গড়ে ওঠে না। ফাঁকে ফাঁকে তাদের দেখা পাওয়া যায়, প্রায়ই ব্যক্তিগতভাবে দু'এক জনকে। সেকালের বাঙালীদের মধ্যেও তেমন নাস্তিকের অস্তিত্ব ছিলই। তবে তারা বিদ্যাচর্চা করত না তা' নয়। দর্শনতত্ত্ব হিসাবে না হয় চার্বাকেরটাই যথেষ্ট মনে করত, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে যে সভ্যতা-সাধর্ম রক্ষা করতে বাধ্য ছিল—সন্দেহ করার যো নেই সে বিষয়ে।

আর্যধর্মে নাস্তিক শব্দের অর্থ বেদ-নিন্দুক। নাস্তিকের, সমাজে কোন মর্যাদান্বিত ঠাঁই ছিল না। সভা-সমিতিতে তাদের কোণঠাসা হতে হয়েছে। মনু-সংহিতায় বেদ-নিন্দুককে নাস্তিক বলে ধর্মাধিকরণ বা বিচার-আচারক্ষেত্র থেকে একদম বার করে দেবার নির্দেশ আছে।—"যে ব্রাহ্মণ হেতুশাস্ত্রের আশ্রয়ে সেই মূল শাস্ত্র দু'টির (শ্রুতি এবং স্মৃতির) অবমাননা করবে, সজ্জনগণ তাকে বার করে দেবে, সে বেদনিন্দুক, নাস্তিক।"[১] সাংখ্যদর্শনকার কপিল যদিও ঈশ্বর মানেন নি, কিন্তু বেদ মেনেছেন। সে কারণে কপিলও নাস্তিক ন'ন, তাঁর দর্শনও নাস্তিক্য দর্শন নয়। আস্তিক দর্শনের মধ্যে যে ৬ খানা প্রধান, সাংখ্য দর্শন তার অন্যতম।

১. যোহ বমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিস্কার্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ মনুস, ২/১১

আর্য ধর্মে চতুর্থ পুরুষার্থ বা মুক্তি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য এবং প্রাপ্য। তা' অর্জন করার জন্য ঈশ্বরের মুখাপেক্ষিতা নয়, বরং মানবিক শক্তির আশ্রয় নিয়ে অগ্রসর হওয়াই স্বাধীন এবং গৌরবিত পথ। সে পথে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের ভিত্তিতে যে সাঙ্খ্যদর্শন তৈরি হয়েছে, তার মতে, ঈশ্বর-নিরপেক্ষভাবেও মুক্তিলাভ হতে পারে। কিন্তু সে পথ বেদ-প্রতিষ্ঠ করেই প্রতিপাদিত। মূল ধর্মগ্রন্থের অবমাননায় বর্তমানেও যেমন দেখা যায়, আর্যদেরও তা-ই ছিল। তাই নাস্তিকদের কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল না।

পরিশীলিত বাঙালী-কৃষ্টির আর্যায়ণের পরবর্তী ধারা, সুপ্রাচীন কাল থেকে একটানা চলমান আর্য-কৃষ্টিব ধারার সাথে একান্ত ঐক্যে বা অভেদেই লক্ষ্য করা যায়। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক পীথাগোরাস ভারতে এসেছিলেন ভারতীয় দর্শন এবং জ্যামিতি অধ্যয়ন করতে। 'জাতক', প্রথম খণ্ডে উপক্রমণিকায় মহেশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন---"সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস খ্রী: পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়া দর্শনশাস্ত্র ও জ্যামিতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ইহা নিতান্ত সম্ভবপর।"[১] ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের তথা অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির কথা যেখানে সুদূর গ্রীসের মনীষীদিগেরও আকর্ষণ যুগিয়েছে, সেখানে একই সংস্কৃতির অনুসারী বাঙালীরা সে চর্চা করত—অনায়াসেই বুঝা যায়। সেই শতাব্দীতে, অথবা অল্প কয়েক বছর আগে থেকেও হতে পারে, জৈন ধর্মের অভ্যুদয় আর্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বিদ্রোহ হিসাবে দাড়িয়ে যায়। জৈনরাও নিজেদেরকে 'নির্গ্রন্থ' বলে কিন্তু বেদ মানে না। পূর্বোল্লিখিত মনুসংহিতাব উক্তিদ্বারা পরিচায়িত আস্তিক্য-নাস্তিক্যের আর্যকৃত সংজ্ঞায় জৈন ধর্মাবলম্বীদিগকে নাস্তিক মনে করা হত। বাঙালীরা ছিল পুরাপুরি আস্তিক। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমিতে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ) বিচরণ কালের ঘটনা 'আচারাঙ্গসূত্র' নামক প্রাচীন জৈন গ্রন্থে অবশ্যই পক্ষ-পাতদুষ্ট। মহাবীরের ভ্রমণ নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য বিহীন ছিল না। বজ্রভূমির এবং সুহ্মভূমির লোকদের দলে টানবার ব্যপদেশেই পরিক্রমণ। তাতে আর্যাচারী আস্তিক সম্প্রদায়ের হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। কুকুর লেলিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয়-ই ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ড। বয়স্ক-গম্ভীর গৃহস্থেরা তেমন কাজ করতে পারে না। আর, "চূ, চূ" শব্দ দ্বারা কুকুর লেলিয়ে দেয়ার উপস্থাপনের মাধ্যমে তৎকালীন বাঙালীদেরে যে অশিক্ষিত-বর্বররূপে দেখান হয়েছে বলে অনেক ধুরন্ধর ঐতিহাসিকরাও মনে করেন, তা' একান্ত অমূলক। যেহেতু—এই

১. পৃঃ ১

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও কুকুর লেলিয়ে দিতে লোকে 'ছো ছো', 'লে লে' বলে থাকে। বরং এটা অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা যে, সেই মহাবীরের কাল থেকে আজ পর্যন্তও কুকুর ভেজিয়ে দেয়ার প্ররোচক শব্দটি অপরিবর্তিতই রয়েছে। বড়লী শিলালিপিতে[১] তীর্থঙ্কর মহাবীরের মহাপরিনির্বাণের সময়, (খৃষ্টপূর্ব ৫৫৭ অব্দে) লিখিত আছে। ঐ লিপি তাঁর মহাপরিনির্বাণের ৮৪তম বৎসরে উৎকীর্ণ।

জৈন ধর্মের অভ্যুদয়ে আর্য সংস্কৃতির সাথে কিছু কিছু সংঘাত থাকলেও সাংস্কৃতিক বিকাশে তা' কিঞ্চিৎ নতুন যোজনা মাত্র। নতুন ধর্মমত গ্রহণের একটা অভিনব উন্মাদনা থাকে। জৈনদের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য বিদ্যাচর্চার প্রসার ছিল উল্লেখযোগ্য বেশী। ধর্মশাস্ত্রের তত্ত্বের গ্রন্থে তা' জৈনদেব নিজস্ব মতবাদের প্রবক্তৃতায় ভরপুর হলেও, জৈন ন্যায়াদি শাস্ত্রে, অন্তত প্রতিপক্ষহিসাবে পূর্বাপর চলমান শাস্ত্রতথ্যের উপস্থাপনে, তাঁদের কোন কার্পণ্য ঘটে নি। ফলে, ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা---প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে মূল শাস্ত্রীয় ভাষার (সংস্কৃতের) অনুশীলন অনেক বেড়ে যায়। সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে 'আর্হত' দর্শনের সংগ্রহও আছে। জৈনদেব উপাস্য জিন। তিনিই তাঁদের পরম উপাস্য। শ্বেতাম্বর জৈনরা গার্হস্থ্য আশ্রম করে থাকে। দিগম্বরগণই প্রকৃত নির্গ্রন্থরূপে পরিচিত। সামাজিক আচার-ব্যবহারে আর্যাচারী, কিন্তু সনাতন বৈদিক কৃষ্টি-কলাপে তাঁদের প্রথা নেই। তাই, এঁদের অভ্যুদয়ে সনাতন আর্য সংস্কৃতির পাশাপাশি জৈন সংস্কৃতিও চলতে আরম্ভ করে।

প্রাসঙ্গিকভাবে একটা প্রশ্ন দেখা দেয় যে,--'অমরার্থচন্দ্রিকা' অভিধানে, গৌতম বুদ্ধের নামের পর্যায় শব্দ দেয়া আছে।[২] তার মধ্যে ১০ম নামটি 'জিন' থাকার জন্য বৌদ্ধধর্মও, তন্মূলক জৈন পদবাচ্য হতে পারে? 'অভিধানরত্নমালা' গ্রন্থে হলায়ুধভট্টও 'জৈনধর্ম' শব্দের অর্থ লিখেছেন বৌদ্ধ ধর্ম। রাধাকান্ত দেবের বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থেও 'জৈন' শব্দের প্রসঙ্গে, উল্লিখিত হলায়ুধের অর্থও

১. রাজস্থানের আজমীব মিউজিয়মে বক্ষিত।

২. ''সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগতঃ।
সামন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোহ দ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু সঃ।
শাক্যসিংহঃ সর্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ।

দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। অমরার্থচন্দ্রিকার প্রণেতা প্রসিদ্ধ অমরসিংহও, বোধ হয়, বৌদ্ধ ছিলেন, অথবা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।[১] তিনি যে, তার কোষ গ্রন্থে অমনটা কেন লিখেছেন—বোঝা কঠিন। বাস্তবে, বৌদ্ধদের দর্শনকে বৌদ্ধদর্শন নামে এবং জৈনদের দর্শনকে আর্হতদর্শন নামে পৃথক্ ভাবে 'সর্বদর্শন সংগ্রহে' সঙ্কলন করা হয়েছে।

মহাবীর তীর্থঙ্কর নিজে যখন বজ্রভূমি-সুহ্মভূমিতে বিহার করতে এসেছিলেন তখনকার ঘটনা যা'-ই হোক্, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জৈনধর্মের প্রসারও নেহাৎ কম হয় নি। পাহাড়পুরের পুরাকীর্তির মাধ্যমেই জৈনদের সম্প্রচার-সংপ্রসার বিশেষভাবে অনুধাবন করা চলে।

''বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ'—প্রবন্ধে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, লিখেছেন—"অশোকের শিলালিপিতে নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে—"নিগংথেসু পি মে কটে ইমে (ধংমমহামাতা) বিয়াপটা হোহংতি।" অশোকের ধর্মমহামাত্যেরা নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনেও ব্যাপৃত হয়। উড়িষ্যা প্রদেশে উদয়গিরি অঞ্চলে কলিঙ্গরাজ খারবেলের যে শিলালেখ পাওয়া যায়, সে লেখ অনুমানে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের? এই লিপির প্রারম্ভে অর্হৎ ও সিদ্ধদের নমস্কার করা হয়েছে। এই মঙ্গলাচরণ হতে অনুমান করা হয় যে, খারবেল ছিলেন জৈন বা নির্গ্রন্থ। লিপির মধ্যভাগে ত্রিরত্ন, অগ্রজিন প্রভৃতি কথার উল্লেখ রয়েছে বলে সে কথা আরও নিঃসন্দেহে বলা চলে। এছাড়া, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক হতে খৃষ্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত মথুরা অঞ্চলে জৈন সম্প্রদায়ের বহুশিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, এই লেখমালায় জৈন সম্প্রদায়ের তৎকালীন বহুশাখা ও কুলের উল্লেখ আছে এবং সে উল্লেখ হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জৈন সম্প্রদায় বহুদিন হতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রসার লাভ করেছিল।

খারবেলের শিলালেখ ব্যতীত প্রাচ্যদেশে জৈন ধর্মের প্রসার সম্বন্ধে অন্য কোন প্রাচীন উল্লেখ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অথচ, উড়িষ্যা প্রদেশে জৈন ধর্ম যে বঙ্গদেশ হতেই গিয়েছিল, এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।"[২]

"আচারাঙ্গসূত্র, জৈন সাহিত্যের একখানি প্রাচীন ও প্রধান গ্রন্থ। এ গ্রন্থের অনেক অংশ যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বে রচিত হয়েছিল, তা অধ্যাপক জ্যাকোবি

১. অমরার্থ চন্দ্রিকার (নামলিঙ্গানুশাসনম্) প্রারম্ভ শ্লোকের তাৎপর্যেও তা মনে হয়।

২. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৪৬, প্রবন্ধ-'বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের প্রারম্ভ।'

বেশ স্পষ্ট করেই প্রমাণ করেছেন।"[১] এই গ্রন্থেই সুহ্মভূমি, লাঢ় ও বজ্জভূমি অঞ্চলে মহাবীরের অমর্যাদায় ক্ষুব্ধ জৈন গ্রন্থকার যা' বলেছেন, তৎসম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। "কল্পসূত্র জৈন সাহিত্যের চতুর্থ ছেদসূত্র 'আচারদশাঙ্গে'র অষ্টম দশাঙ্গ। জৈনদের মতে 'কল্পসূত্র' ভদ্রবাহুর রচিত, ভদ্রবাহু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমসাময়িক; কারণ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁকে অনুসরণ করে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে কঠোর তপস্যায় দেহত্যাগ করেছিলেন। কল্পসূত্র তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথমভাগ হচ্ছে 'জিনচরিত্র'। এ অংশকে মহাবীরের সম্পূর্ণ জীবনচরিত্র বা মহাবীরের চরিত্র বলা চলে। দ্বিতীয়াংশ 'থেরাবলী,' এ অংশে জৈন সম্প্রদায়ের প্রাচীন স্থবিরদের জীবনী ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত নানা গণ ও শাখা উল্লিখিত হয়েছে।"[১]

"এই কল্পসূত্রের দ্বিতীয়াংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভদ্রবাহুর চারজন শিষ্য ছিল, এই চারজন শিষ্যের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন গোদাস। গোদাস একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করেন, এই ধারার নাম ছিল 'গোদাসগণ'। গোদাসগণ হতে চারটি শাখার উদ্ভব হয়, এ চারটি শাখার নাম তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া এবং দাসীখর্বটিকা। দাসীখর্বটিকা কোন স্থানের নাম হলেও সে স্থান কোথায় ছিল, তা জানা যায় না। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও কোটিবর্ষ যে, উত্তরবঙ্গের দু'টি প্রধান স্থান ছিল তা' প্রাচীন শিলালিপি হতেই জানা যায়। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নাম খৃষ্টপূব দ্বিতীয় বা প্রথম শতক হতেই পাওয়া যায়, প্রথমত বৌদ্ধ বিনয়পিটকে এবং দ্বিতীয়ত মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত অশোকীয় ব্রাহ্মীলিপির অনুরূপ লিপিতে লিখিত একখানি শিলালেখে। এ লিপি অনুমান খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের। এ লিপিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পুণ্ড্রনগর বলে উল্লিখিত হয়েছে। ভরহুত স্তূপের বেষ্টনীর উপর যে সমস্ত ভিক্ষুদের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে পুঞবঢনীয় (পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়) ভিক্ষুর নামও পাওয়া যায়। কোটিবর্ষ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের শিলালিপি ও তাম্রপটে উল্লিখিত হয়েছে। বাণপুর নামক নগর কোটিবর্ষে অবস্থিত ছিল। প্রায় সকলের মতেই বাণপুর দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত বাণগড়। কোটিবর্ষ যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্ভুক্তস্থান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাম্রলিপ্ত সুপরিচিত। সুতরাং কল্পসূত্রের এই থেরাবলী হতে বোঝা যায় যে, ভদ্রবাহুর শিষ্যেরা যে চারটি ধারা ও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন, তন্মধ্যে দু'টি ছিল উত্তর বঙ্গে, অন্যটি ছিল নিম্নবঙ্গে তাম্রলিপ্তি অঞ্চলে। ভদ্রবাহু খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বর্তমান ছিলেন, সুতরাং বঙ্গদেশের জৈন ধর্ম অন্তত খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।"[১]

১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৬, প্রবন্ধ-'বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের প্রারম্ভ।'

বৌদ্ধদের বিনয়পীটকের অংশ-'দিব্যাবদান' গ্রন্থের কাহিনী অনুসারেও উল্লিখিত অনুমান সঙ্গত বলেই মনে করা চলে। অশোকের ভ্রাতা—বীতশোকের হত্যার ব্যাপারে ঘটনার বাড়াবাড়ি যা-ই লিখিত হয়ে থাক না কেন, তা' অবশ্যই বীতশোকের হত্যার অপরাধে অশোকের বিগর্হা এবং তা' অশোকের প্রথম জীবনের (কলিঙ্গজয়ের পূর্বকালের) কাণ্ড বলেই সাধারণ্যে প্রচলিত। সংশ্লিষ্ট দিব্যাবদানের অংশে[১] ভাষা-সঙ্গতিও নেই। যে যার মতলব মত অংশবিশেষের অর্থ-ধরেই লিখে চলেছেন। একের অপরাধে পাইকারী হত্যার এ গবুচন্দ্রীয় আজগুবি ইতিহাসে স্থান পাওয়াটাই যেন বিস্ময়কর মনে হয়। নিম্নে লিখিত সংশ্লিষ্ট দিব্যাবদান গ্রন্থের অংশে, তৃতীয় পংক্তিতে আবশ্যিক সংশোধন ছাড়া কোন অর্থই হতে পারে না। যা' হোক, এ গ্রন্থ অনুসারেও পুণ্ড্রবর্দ্ধনে অশোকের কালে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে নির্গ্রন্থদের স্থিতিশীল জীবন-ধারার ধারণা পাওয়া যায়। উত্তর বঙ্গে জৈন সম্প্রদায়ের প্রভাব খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যে প্রবল ছিল তার প্রমাণ হিউয়েন সাং-এঁর বিবরণী হতেও পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের বিখ্যাত জৈন গ্রন্থকার আশাধর, অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়াও ৬৩ (তেষট্টি) খানা স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ দ্বারাই জৈনদের সাংস্কৃতিক জীবনধারার কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। উন্নত শিক্ষা—সংস্কৃতির অনুবর্তনে জৈনরা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য বহু গ্রন্থ রচনা, পঠন-পাঠন, করেছেন। যার এক সংক্ষিপ্ত তালিকায়ও তাঁদের চিন্তা-চেতনার বিষয়গুলো পাওয়া যাবে—অজিত সেনাচার্যের অলঙ্কারচিন্তামণি, (সাহিত্যতত্ত্ব); দিগম্বর ইন্দ্রবাসুদেবের ত্রৈলোক্যদীপিকা, (ভূগোল); উগ্রাদিত্যাচার্যের কল্যাণকারক, (আয়ুর্বেদিক); উদয়প্রভসূরির আরম্ভসিদ্ধি, (জ্যোতিষ); গুণরত্ন সূরির ব্যাকরণের গ্রন্থ--ক্রিয়ারত্ন সমুচ্চয় এবং ষড়দর্শনের টীকা---তর্করহস্যদীপিকা; চন্দ্র সূরির ত্রৈলোক্যদীপিকা, (ভূগোল); চন্দ্রসেনের কেবলজ্ঞানহোরা, (জ্যোতিষ); জম্বুমুনি / জম্বুকবি / বা জম্বুগুরুর চন্দ্রদূত, (খণ্ডকাব্য); জিনপ্রভসূরির মঙ্গলাষ্টক, (স্তোত্র); জিনবর্দ্ধন সূরির বাগ্‌ভটালঙ্কার (টীকা); জৈনাচার্যের হস্তসঞ্জীবনী, (হস্তরেখাদি বিচার); দেবদণ্ডীর

১. "তস্মিন্ সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে নির্গ্রন্থোপাসকেন বুদ্ধপ্রতিমা নির্গ্রন্থস্য পাদয়োর্নিপতিতা চিত্রাপিতা। উপাসকেনাশোকস্য রাজ্ঞো নিবেদিতং। শ্রুত্বা চ রাজ্ঞাভিহিতং শীঘ্রমানীয়তাম্ তস্যোর্দ্ধং যোজনং যক্ষাঃ শৃণ্বন্তি অধো যোজনং নাগা যাবৎ তং তৎক্ষণেন যক্ষৈরুপনীতম্ দৃষ্টা চ রাজ্ঞা রুষিতেনাভিহিতম্। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে সর্বে আজীবিকাঃ (= নির্গ্রন্থাঃ) প্রঘাতয়িতব্যাঃ যাবদেকদিবসে অষ্টাদশ সহস্রাণি আজীবিকানাং (= নির্গ্রন্থানাং) প্রঘাতিতানি॥"

দিব্যাবদানের সংশ্লিষ্ট অংশ

জৈনেন্দ্রব্যাকরণ; ধনঞ্জয়ের 'নামমালা' ধনঞ্জয় নিঘন্টু, ধনঞ্জয়কোষ; নমিকুমারতনয় বাগভটের অলঙ্কারতিলক, শৃঙ্গারতিলক (কাব্য), ছন্দোহনুশাসন এবং তারটীকা ও বাগভটালঙ্কার (সাহিত্যতত্ত্ব); নরচন্দ্রের অনর্ঘরাঘব-টীকা, জন্মাম্ভোধি জ্যোতিষসংগ্রহ, জ্যোতিঃসার, হেমচন্দ্রীয় প্রাকৃত ব্যাকরণের টীকা—প্রাকৃত প্রবোধ; নাথমল্লের পিশাচকালচক্রযুদ্ধবর্ণন; পদ্মনন্দির রাঘবপাণ্ডবীয়-টীকা; পার্শ্বদেবের সঙ্গীত রত্নাকর, সঙ্গীতসময়সার; পুষ্পসেনের ধর্মশর্মাভ্যুদয় (কাব্য); মলয় গিরির-শব্দানুশাসন (ব্যাকরণ) এবং তার বৃত্তি; মহেন্দ্রসূরির অনেকার্থকৈরবকৌমুদী, ৩৮টি অধ্যায়াত্মক গণিত জ্যোতিষ--যন্ত্ররাজ; মেরুতুঙ্গের মেঘদূত, (খণ্ডকাব্য), কঙ্কালাধ্যায়ের বার্তিক, (আয়ুর্বেদ); যক্ষবর্মার চিন্তামণি, (শকটায়নের শব্দানুশাসনের টীকা); রাজশেখর সূরির পঞ্জিকা (শ্রীধরের ন্যায়কন্দলীর টীকা); রামচন্দ্রের রঘুবিলাপ, (নাটক), লিঙ্গনির্ণয়ভূষণ (কোষ); বাদিচন্দ্র সূরির জ্ঞানসূর্যোদয় (নাটক); বাদীভসিংহের আদ্রিরসাত্মক কথাকাব্য গদ্যচিন্তামণি; বীব আচার্যের গণিতশাস্ত্র, গণিতসার সংগ্রহ; শালিভদ্রের কাব্যালঙ্কার-টীকা; শ্রীবরের কথাকৌতুক এবং জৈনতরঙ্গিনী; হরিভদ্রসূরির ষড় দর্শনসমুচ্চয়; হস্তিমল্লসেনের অর্জ্জনরাজ-নাটক, ভরতরাজ-নাটক, মৈথিলী-পরিণয়-নাটক এবং উদয়রাজ—কাব্য প্রভৃতি; সহজকীর্তির সারস্বত টীকা; সাধুকীর্তির শেষসংগ্রহনামমালা; সিংহতিলক সূরির ভুবনদীপিকাবিবরণ; সোমতিলক সূরির লঘুপণ্ডিতকৃত ত্রিপুরস্তবের টীকা, লঘুস্তব এবং তার টীকা; সোমদেবের জৈনেন্দ্র ব্যাকরণীয় টীকা; সোমপ্রভাচার্যের শৃঙ্গার-বৈরাগ্য তরঙ্গিণী—খণ্ডকাব্য।

পৌর্বাপর্য ক্রম-বিহীন উল্লিখিত গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারদের নামের মাধ্যমেও জৈনদের সামাজিক রূপ অনুমান করা সম্ভব হয়। বৈদিক বা আর্য সভ্যতার মধ্যেই যে, আধ্যাত্মিক সাধনামূলক কৃষ্টি বা সংস্কারের বিবর্তন ঘটেছে-তা' বুঝা যায়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকেও বহু ধুরন্ধর জৈন গ্রন্থকারের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, —বর্দ্ধমান সূরি, কথাকোষ (১০৭২ খৃঃ) এবং শকুনরত্নাবলী প্রণয়ন করেছেন। সুভাষিতরত্নসন্দোহ নামক রম্যরচনাসংগ্রহ (১০৫০ খৃঃ) করেছেন অমিতগতি। শালিভদ্রের শিষ্য শ্বেতাম্বর নমি করেছেন রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারের টীকা (১০৬৯ খৃঃ)। মাণিক্যচন্দ্র সূরির রচনা কাব্যপ্রকাশটীকা-সঙ্কেত এবং পার্শ্বনাথ চরিত (১২২০ খৃঃ)। জিন প্রবোধ সূরি, পূর্বনাম পর্বত, জিনেশ্বরের শিষ্য ছিলেন। তিনি ১১২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেছেন। তিনি 'কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা-দুর্গপদপ্রবোধ' নামক উপটীকা প্রণয়ন করেছেন। প্রসঙ্গত বলা চলে যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ

শতকে মনসামঙ্গলের কবি-বিজয় গুপ্ত, বরিশাল জিলার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রাম সম্বন্ধে যে,— "পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্ডেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।"

লিখেছেন, তাতে ফুল্লশ্রীগ্রামের গৌরব-ই প্রকাশ পেয়েছে। ঐ ফুল্লশ্রী গ্রামেরই বিখ্যাত গ্রন্থকার ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র, কলাপ-ব্যাকরণের পঞ্জিকা প্রণয়ন করেছেন। এই জৈন টীকাকার জিন-প্রবোধ সূরী কর্তৃক পঞ্জিকার উপর বিবৃতি রচনা বা উপটীকা প্রণয়ন, ত্রিলোচন দাস কবীন্দ্রের কালনির্ধারণে বিশেষ অবলম্বন রূপে প্রকাশ পায়। ইহাতে ধারণা করা যায় যে, ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র অতি প্রাচীন গ্রন্থকার। কোনক্রমে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পরে আর তাঁর কাল ভাবা যায় না।[১] ফলে, ফুল্লশ্রী গ্রামও যে একটানা ৫ শত বৎসর বা আরও বেশি কাল শিক্ষিতের গ্রাম,—'পণ্ডিতনগর' ছিল—তা'ও বিস্ময়েরই কথা।

আশাধরের ৬৩ খানা স্মৃতিগ্রন্থ, অষ্টাঙ্গহৃদয়োদ্যোত, কাব্যালঙ্কারটীকা, এবং কুবলয়ানন্দকারিকার টীকা (১২৩৬ খৃঃ), দেবেন্দ্র সূরির হেমচন্দ্রকৃত শব্দানুশাসনের লঘুন্যাস বৃত্তিঃ (১২৪০ খৃঃ), রত্নশেখরের প্রবন্ধকোষ (১৪২৯ খৃঃ), প্রাকৃত-ছন্দঃকোষ, আসড়ের বিবেকমঞ্জরী (নীতি), এবং মেঘদূতের (মেরুতুঙ্গপ্রণীত) টীকা; আশাধরের (২য়) অদ্বৈতবিবেক, কোবিদানন্দ এবং ত্রিবেণিকা; মেঘবিজয়ের হেমচন্দ্রীয় শব্দানুশাসনের টীকা চন্দ্রপ্রভা (১৭০১ খৃঃ); এ ছাড়া, গ্রন্থকারদের নাম অজ্ঞাত অথচ কোন কোন জৈনাচার্যাদের প্রণীত—আয়ুর্বেদিক 'মূত্রপরীক্ষা', বাস্তুশাস্ত্র 'বাস্তুবিজ্ঞান রত্নকোষ' এবং ব্যাকরণের বাক্যমঞ্জুরী নামক গ্রন্থগুলো সুবিদিত। এসব গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে—যে কালে বা যে স্থানেই ইহা প্রণীত হয়ে থাক না কেন, জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে তো বটেই, তদতিরিক্ত সমাজেও যথেষ্ট আদরের সহিত আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশে জৈনদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি উন্নত ধরনেই অনুশীলিত হত—ইহা নিঃসন্দেহ। ফলকথা এই যে,—নির্গ্রন্থ মুমুক্ষু সম্প্রদায় আগে থেকে থাকলেও জৈনদের মধ্যে ইহসর্বস্বতার বিরোধী ধ্যান-ধারণা প্রবল থাকায় আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিভাগিতার আরোপে সে আখ্যা গৃহীত। কি শ্বেতাম্বর, কিই বা দিগম্বর সবাই পরিশীলিত জীবন-জীবিকামূলক সাংস্কৃতিক উন্নতিতে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। সূক্ষ্ম দর্শনতত্ত্বেও জৈনদের যেমন পারদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমন একান্ত ঐহিক সর্বসাধারণের গ্রহণীয় গুণাবলীর অধিকারিতারও ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে।

১. এ সম্পর্কে জয়াদিত্য-বামন সম্বন্ধীয় আলোচনাও দ্রষ্টব্য।

জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্মের মাত্র ৬৯ কিংবা ৭০ বছর পরেই গৌতম বুদ্ধের জন্ম। কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত পিপ্রাওয়া শিলালিপিতে গৌতম বুদ্ধের মহা-পরিনির্বাণ লাভের বৎসর বিধৃত আছে (খৃষ্টপূর্ব ৪৮৭ অব্দ)। শাক্যজাতি কর্তৃক গৌতম বুদ্ধের অস্থিসংরক্ষণের অতি মূল্যবান সংবাদ উল্লিখিত 'পিপ্রাওয়া লিপি'র বৈশিষ্ট্য। তদনুসারে অনুমান করা যায় যে, গৌতমবুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব ৫৬৭ বা ৫৬৬ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। গৌতম বুদ্ধের অশীতিতম বৎসর বয়সে মহাপরিনির্বাণ ঘটে-ছিল। আবির্ভাব থেকে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত ৮০টি বৎসর যে কত বড় ঘটনার তা ভাষায় ব্যক্ত করা চলে না। অলৌকিক ঘটনায় ভরপুর তাঁর সুমহৎ জীবন যে লৌকিক অর্থাৎ ঐতিহাসিক হাজার হাজার ঘটনার সাথে জড়িত, তার অনুশীলনে আর্য সভ্যতায় যে অভিনব সংযোজন-বিয়োজন সংঘটিত হতে থাকে তা'ই মাত্র আলোচনায় আনলেও, অতীতের অজ্ঞান-কুহেলী কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস পেতে পারে এ আমার ধারণা।

বুদ্ধের জন্মান্তরে ত্রিংশৎ পারমিতার অনুষ্ঠান দ্বারা সম্যক্ সম্বুদ্ধ হওয়ার ক্ষমতালাভ, বিশ্বন্তর লীলা সংবরণের পর তুষিতস্বর্গে বাস, দেবতাদের অনুরোধে পরিত্রাণহেতু জন্মগ্রহণের অঙ্গীকার—প্রভৃতি অলোকিক কিংবা অতিজাগতিক বিষয়গুলো ধর্মীয় বিশেষ আস্থা বা আস্তিক্যের মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব। সে রকম উপযুক্ত সংস্কার না থাকলেও নিছক ঘটনাবলীর পৌর্বাপর্যমূলক বিন্যাসের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ের অনেক কিছু জানা যেতে পারে :—

খৃষ্টপূর্ব ৪৮৭+৭৯ = ৫৬৬ অব্দে, বৈশাখী পূর্ণিমায়, লুম্বিনী নামক উদ্যানে জন্মগ্রহণ, এই দিনেই যশোধরা, ছন্দক, কালোদায়ী এবং অশ্ববর কণ্ঠকের জন্ম, মহামায়ার শিশু গৌতম সহ কপিলবাস্তুতে প্রত্যাবর্তন, এই শিশুকে দেখবার জন্য ত্রিকালদর্শী অসিতদেবলের আগমন, শিশু কর্তৃক জটাজুট-মণ্ডিত অসিতদেবলের শিরে আরোহণ, প্রসবের সপ্তম দিবসে মহামায়ার প্রাণত্যাগ, তাঁহার সহোদরা শুদ্ধোদনের অপর স্ত্রী--মহাপ্রজাপতি কর্তৃক গৌতমের লালন-পালন, বিশ্বামিত্র নামক আচার্যের নিকট শিক্ষাগ্রহণ, ষোড়শ বর্ষ বয়সে, সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধারার সহিত বিবাহ, সারথি ছন্দকের সহিত নগরপরিভ্রমণকালে নানা জনের জরা-রোগ-ব্যাধি-মৃত্যু সংবাদে সংসারের প্রতি বিরক্তি, অন্য ভিক্ষু সাধু দর্শনে সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প, রাহু-লের জন্ম*, ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে আষাঢ়ী পূর্ণিমায়, সারথি ছন্দকের সমভিব্যাহারে

* 'ভদ্রকল্পাবদান' গ্রন্থের--- "কপিলাখ্যপুরে কিমভবদ্ বিরহসঙ্কুলে।
যশোধরাপন্নসত্ত্বা কিদৃশী বিরহার্দ্দিতা।"

প্রভৃতি উক্তিদ্বারা বুঝা যায়---রাহুল ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই গৌতম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ছিলেন। এ বৈষম্যের একতর নির্দ্ধারণ এখন বড়ই কঠিন কাজ।

কণ্ঠকারোহণে অভিনিষ্ক্রমণ, ত্রিশ যোজন পথ পরিভ্রমণের পর অনোমা নদীর তীরে মস্তক মুণ্ডন, আভরণ ত্যাগ এবং সন্ন্যাস গ্রহণ, মল্লদেশস্থ অনুপিয় নামক স্থানে আম্রবনে সপ্তাহ বাস, মগধের রাজধানী রাজগৃহে গমন, পুনরায় গৃহী করার অভিপ্রায়ে বিম্বিসারের নানা অনুরোধ-উপরোধ অস্বীকার, আরার কালাম ও রুদ্রক রামপুত্র নামক আচার্যদ্বয়ের নিকট যোগাভ্যাস, তাঁদের উপর অনাস্থায় উরুবিল্বায় গমন, কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পঞ্চবর্গীয়দিগের সহিত মিলন, ক্রমাগত ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা, তপস্যায় অনাস্থা, তদ্দর্শনে কৌণ্ডিন্য প্রভৃতির প্রস্থানের পরে বৈশাখী পূর্ণিমায় নৈরঞ্জনা নদীতে অবগাহনান্তে সুজাতা কর্তৃক প্রেরিত পায়সান্ন গ্রহণ, বোধিদ্রুমমূলে আসনস্থাপন, উপবেশন, কঠোর সঙ্কল্প[১] এবং বুদ্ধত্বলাভ (তখন বয়স ৩৫ বৎসর, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৫৩২ অব্দে), বুদ্ধত্বলাভের পর ৭ সপ্তাহ বোধিদ্রুমমূলে অবস্থান, এই সময় উৎকলদেশীয় ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক দু'জন বণিককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাদান, ঋষিপত্তনাভিমুখে পূর্বপ্রস্থিত পঞ্চবর্গীয় দিগকে স্বমতে আনবার অভিপ্রায়ে তৎস্থানাভিমুখে গমন, মৃগদাবে গমন, কৌণ্ডিন্য-বাষ্প-ভদ্রিক-মহানাম-অশ্বজিৎকে (পঞ্চবর্গীয়) প্রব্রজ্যা দান, বারানসীবাসী যশ নামক শ্রেষ্ঠীপুত্রের পিতা, মাতা, এবং ৫৪জন বন্ধুস্থানীয়ের দীক্ষাদান এবং শিষ্যদিগকে ধর্মপ্রচারার্থ নানা দেশে প্রেরণ, উরুবিল্বায় প্রত্যাবর্তনের পথে ভদ্রবর্গীয়দিগকে দীক্ষাদান, উরুবিল্বায় উরুবিল্বাকাশ্যপ, নদীকাশ্যপ এবং গয়াকাশ্যপ নামক অগ্নিহোত্রী সহোদর ত্রয়কে দীক্ষাদান, গয়াশীর্ষে গমন, তথায় 'আদিত্ত পরিয়ায়' ভ্রমণ, রাজগৃহের নিকটস্থ 'লট্‌ঠিবনে' (যষ্ঠি বনে) গমন, তথায় মগধরাজ বিম্বিসারের আগমনে দীক্ষাদান এবং মহানারদকাশ্যপজাতক বর্ণন (৫৪৪ নং) হর্যঙ্ক বংশীয় মগধরাজ বিম্বিসার কর্তৃক বৌদ্ধ সঙ্ঘকে বেণুবন দান, শারীপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নের দীক্ষাগ্রহণ, বুদ্ধকে কপিলবাস্তুতে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য শুদ্ধোদন কর্তৃক পুনঃপুনঃ প্রেরিত দূতদিগের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ এবং

বারানসীর নিকট বর্ষাকাল যাপন, উরুবিল্বায় প্রত্যাবর্তন এবং তিনমাস অবস্থান, পৌষী পূর্ণিমায় রাজগৃহে গমন এবং দু'মাস অবস্থান, ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরে উদায়ীর অনুরোধ কপিলবাস্তুর উদ্দেশ্যে যাত্রা, কপিলবাস্তুর সন্নিহিত ন্যগ্রোধারামে অবস্থান, সেখানে বুদ্ধের সম্বর্দ্ধনার জন্য শাক্যদিগের আগমন, ভিক্ষাটনের জন্য বুদ্ধের কপিলবাস্তু

১. সঙ্কল্পের স্বরূপটি এই "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং,
ত্বগস্থি মাংসানি লয়ং প্রয়াস্তু।
অপ্রাপ্য বোধিমসমগ্র দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মত শ্চলিষ্যতি॥"

নগরে প্রবেশ, বাতায়ন হতে যশোধারার ভিক্ষুবেশী বুদ্ধের দর্শন, যশোধারার কথায় স্বয়ং শুদ্ধোদন কর্তৃক বুদ্ধের ভিক্ষাটন বন্ধকরার অনুরোধও উপেক্ষা করে, 'ভিক্ষুদের ভিক্ষা-ই একমাত্র জীবন-ধারণের উপায়' বলে মহাধর্মপাল জাতক (৪৪৭) বর্ণনা, পিতার অনুরোধে রাজভবনে গিয়ে অন্নগ্রহণ, শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নকে সঙ্গে করে যশোধারার প্রকোষ্ঠে গমন, শুদ্ধোদনের মুখে যশোধারার পাতিব্রাত্যের প্রশংসা শ্রবণে চন্দ্রকিন্নর জাতক (৪৮৫) কথন, পরদিন নন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেকের এবং জনপদকল্যাণীর সহিত বিবাহের অনুষ্ঠান নির্দ্ধারিত হয়েছে জেনে নন্দকে নিয়ে বুদ্ধের ন্যগ্রোধারামে গমন এবং তৃতীয় দিবসে তাকে প্রব্রজ্যা দান, সপ্তমদিবসে যশোধারার পরামর্শে রাহুল কর্তৃক পিতা বুদ্ধের নিকট পৈতৃক ধনের প্রার্থনা, বুদ্ধের নির্দেশে শারীপুত্র কর্তৃক রাহুলকে শ্রমণের প্রব্রজ্যা দান, শুদ্ধোদনের আক্ষেপ, পিতা-মাতার বিনানুমতিতে সন্তানকে প্রব্রজ্যা দিবেন না বলে বুদ্ধের অঙ্গীকার, কপিলবাস্তু থেকে রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন, পথে মল্লদেশস্থ অনুপিয় নামক স্থানে অনিরুদ্ধ, ভদ্রিক, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্য রাজপুত্র এবং উপালি নামক নাপিতকে প্রব্রজ্যা দান, রাজগৃহ-নগরীস্থ শীতবন নামক বিহারে অবস্থান, সেখানে অনাথপিণ্ডদ নামক শ্রেষ্ঠীকে দীক্ষাদান, এবং শ্রেষ্ঠীকর্তৃক শ্রাবস্তীতে মহাবিহার নির্মাণ, অনাথ-পিণ্ডদের নিমন্ত্রণে ভিক্ষুবর্গের সহিত বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে গমন, অনাথপিণ্ডদ কর্তৃক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে সেই মহাবিহার দান, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বর্ষায় রাজগৃহের নিকটস্থ বেণুবনে 'কলণ্ডকনিবাপে' অবস্থান এবং জীবকের চিকিৎসায় বুদ্ধের দীর্ঘ কোষ্ঠকাঠিন্যের উপশম, বৈশালীর ঐতিহাসিক মহামারীর বুদ্ধ কর্তৃক উপশমন, রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন, একাদিক্রমে তিন বছর বেণুবনে বাস, পঞ্চম বর্ষায় বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনে কূটাগারশালায় বাস, রোহিণী নদীর জল উপলক্ষ্যে শাক্য এবং কোলীয়দিগের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব বাঁধবার কথা শুনে বুদ্ধের তথায় গমন, এবং উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তিস্থাপন, (এই প্রসঙ্গে বৃক্ষধর্মজাতক (৭৪), স্পন্দন জাতক (৪৭৫) এবং কুণাল জাতক (৫৩৬) দ্রষ্টব্য), পিতা শুদ্ধোদনের রোগশয্যা-পার্শ্বে সানুচর বুদ্ধের উপস্থিতি, শুদ্ধোদনের নির্বাণ-লাভের পরে বৈশালীতে প্রত্যাবর্তন, মহাগৌতমী এবং তাঁর অনুচরীবর্গের প্রব্রজ্যা গ্রহণে দৃঢ় সঙ্কল্প এবং রাজকীয় বেশভূষা পরিত্যাগপূর্বক কেশচ্ছেদন করে পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বৈশালীতে উপস্থিতি, এবং আনন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে বুদ্ধকর্তৃক তাঁদিগকে সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতিদান, বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে গমন, এবং তথায় বর্ষা যাপন, প্রবারণান্তে রাজগৃহে গমন এবং বেণুবনে অবস্থান, বিম্বিসারের অন্যতমা রাজ্ঞী ক্ষেমার বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ, ঈর্ষ্যাপরায়ণ তীর্থিক সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতা এবং পরাজয়, তীর্থিক পূরণকাশ্যপের

জলনিমজ্জনে আত্মহত্যা, অষ্টম বর্ষায় ভর্গদেশস্থ ভেসকলাবনের শিশুমার নামক স্থানে অবস্থিতি, তত্রত্য রাজা বোধির 'কোকনদ' নামক প্রাসাদে গিয়ে ভোজন, শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন, কৌশাম্বীর নিকটবর্তী ঘোষিতারামে নবম বর্ষা বাস, বিনয় সম্বন্ধে শিষ্যদিগের মধ্যে মতভেদে বিরক্ত হয়ে বালকলোণকার নামক গ্রামে গমন, সেখান থেকে স্থবির ভৃগুর সহিত প্রাচীন বংশদায়ে গমন, অনিরুদ্ধনন্দিয়-কিম্বিলের সঙ্গে মিলন এবং তৎসমভিব্যাহারে পারিলেয্যক্ স্থানে গমন, রক্ষিতারামে ভদ্রশাল বৃক্ষমূলে অবস্থিতি, শ্রাবস্তীতে গমন, বিবদমান কৌশাম্বীর ভিক্ষুগণের সানুতাপ উপস্থিতি এবং তাঁদের মার্জনা দান, রাজগৃহের নিকট দশম বর্ষা বাস, দক্ষিণ গিরিতে একনালা গ্রামে কৃষিজীবী ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ প্রমুখের দীক্ষাদান, বৈরন্তী নগরের নিকট দ্বাদশ বর্ষা বাস, তক্ষশিলা পর্যন্ত পর্যটন, প্রত্যাবর্তন কালে সাঙ্কাশ্যা, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান দর্শন, বারানসী গমন, পুনরায় বৈশালীতে গমন, এবং সেখানে কূটাগারশালায় অবস্থান; শ্রাবস্তী ও চালিকা নামক স্থানে ত্রয়োদশ বর্ষা যাপন, চতুর্দ্দশ বর্ষায় জেতবনে অবস্থিতি, রাহুলকে উপসম্পদা দান, কপিলবাস্তুতে পুনর্বার গমন, সেখানে শ্বশুর সুপ্রবুদ্ধের দুর্ব্যবহার ও তাকে দণ্ডদান, জেতবনে প্রত্যাগমন, আলবীতে গমন, রাজগহে গমন, বেণুবনে সপ্তদশ বর্ষা বাস, চালিকার নিকটস্থ পর্বতে অষ্টাদশ বর্ষা বাস, বেণুবনে ঊনবিংশ বর্ষা বাস, জেতবনে বিংশ বর্ষা বাস, তীর্থিকগণের নানা প্রকার বিরোধিতা ও অপচেষ্টা ব্যর্থ করা (মণি শূকর জাতক (২৮৫), এর পর—

অঙ্গদেশস্থ এক শ্রেষ্ঠীর সহিত অনাথপিণ্ডদের এক কন্যার বিবাহ হয়। এই কন্যার পতিকুলের সকলে আজীবকদিগের শিষ্য ছিল। নব বধূর প্রচেষ্টায় তাদের সকলে বৌদ্ধমত গ্রহণ করেছিলেন, এসময় বুদ্ধ এই স্থানেই অবস্থান করছিলেন, সঙ্গী অনিরুদ্ধকে সেখানে রেখে শ্রাবস্তীতে ফিরে গেলেন তিনি।

এর পরবর্তী কয়েক বছরের অর্থাৎ বুদ্ধদেবের ৭১ বছর বয়স পর্যন্তের ঘটনাবলী জাতকানুসন্ধানে পাওয়া যায় না। ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু কর্তৃক পিতা বিম্বিসারের হত্যা এবং কোকালিক প্রভৃতির সংঘত্যাগ, শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের চেষ্টায় কোকালিক ব্যতীত অপর সকলের পুনরায় বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ, দেবদত্তের প্রতি দণ্ড, অজাতশত্রুর পুত্রের জন্ম এবং পিতৃহত্যার জন্য অনুতাপ, বুদ্ধের শরণ গ্রহণ, কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুত্র বিরূঢ়ক কর্তৃক প্রসেনজিতের সিংহাসনচ্যুতি এবং কপিলবাস্তু ধ্বংসন। ৭২ থেকে ৭৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ৭ বছরের এইসব ঘটনার পরে, ৭৯ বৎসর বয়সে বুদ্ধের রাজগৃহের

নিকট গৃধ্রকূটে, আম্রলট্‌ঠিকায়, নালান্দায় গমন, তত্রত্য পাবারিক আম্রবনে অবস্থিতি, পাটলিগ্রামে গমন, কোটিগ্রামে গমন, নাড়িকায় গমন, বৈশালীতে গমন, বৈশালীর নিকটবর্তী বেলুব নামক স্থানে শেষ বর্ষা বাস, এখানে কঠিন পীড়াব আক্রমণ, বয়স ৮০ বছব, তিনমাস পরে পরিনির্বাণ লাভের অভিপ্রায় প্রকাশ, মহাবনস্থ কূটাগারশালায় গমন, শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নেব নির্বাণপ্রাপ্তি, পাবা নামক স্থানে আম্রবনে অবস্থান, কুশীনগরাভিমুখে গমন, অতিশয় দুর্বলতা, আরাড়কালামের শিষ্য পুক্কশকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাদান, কুশীনগরের উপবনস্থ শালবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে অন্তিমশয্যায় উত্তর শীর্ষে শয়ন, আনন্দকে বিবিধ উপদেশ দান, চতুস্তীর্থেব (কপিলবাস্তু, বুদ্ধগয়া, বারানসী ও কুশীনগর) মাহাত্ম্য বর্ণন, সুভদ্র নামক তীর্থিককে দীক্ষাদান, ভিক্ষু-গণেরপ্রতি "ব্যয়ধম্মা, ভিক্‌খবে, সঙ্খারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ"—শেষ উপদেশ দান, ধ্যানবলে পরিনির্বাণপ্রাপ্তি, মল্লদিগের প্রযত্নে সংকারের আয়োজন, সপ্তাহকাল চিতাগ্নি না জ্বলা, মহাকাশ্যপের উপস্থিতিতে অনায়াসেই চিতাগ্নি-জ্বলন, ভক্তদিগের মধ্যে ভস্মাবশিষ্ট শারীব ধাতু বণ্টন, ভক্তগণ কর্তৃক নানাস্থানে তা' স্তূপমধ্যে সংরক্ষণ-প্রভৃতি ঘটনাবলীর অবসান ঘটেছিল খৃষ্টপূর্ব ৪৮৭ অব্দে।

শাক্যরাজপুত্রের ২৯শ বৎসর থেকে শুরু করে ৮০ বৎসর বয়স পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫২ বছরেব জীবনী যেমন তৎকালীন ভারতবর্ষের সামগ্রিক চেতনায় আলোড়নাত্মক তেমন নতুন নতুন সাংস্কৃতিক আবর্তন-বিবর্তনে ভরপুর। এ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, বাস্তবেই যুগপ্রবর্তক ঐতিহাসিক ঘটনা।

জাতক গ্রন্থগুলো যেমন বৌদ্ধধর্মের বিশ্বাস-আস্তিক্য বিষয়ে অসামান্য আকড়, তেমন তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি অনুধাবনেও সবিশেষ সহায়ক। জাতক গ্রন্থের মোট সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে'। অধ্যাপক ফৌস্‌বোল সম্পাদিত 'জাতকাথ বন্ননা' গ্রন্থে ৪৪৯টি জাতক-কাহিনী বিধৃত আছে। অধ্যাপক ই, বি. কাওয়েলও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে জাতকগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে ওল্ডেনবার্গের 'এসে অন্‌ দি জাতকস্‌' এবং এ রকম আরো বহু মূল্যবান গ্রন্থের মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধের জীবন-চর্যা, ধর্মচর্যা প্রভৃতি জানা যায়। তাঁদের ও সব গ্রন্থই প্রাচীন জাতক গ্রন্থের অনুসৃতি। তাতে জাতকের সংখ্যার তারতম্য আছে। ঘটনার মাধ্যমে কোন কোন জাতক একাধিক স্থানে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল অন্তরিত সঙ্কলন এবং বিন্যাসের মাধ্যমেই ও সব পার্থক্য ঘটে থাকলেও তা' তেমন কোন গর্হিত ব্যাপার নয়। জাতকগুলো সবই গৌতম বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত। কথন-স্থান অনুসারে সংখ্যায়নও করেছেন অনেকে। তাতে ৪৯৮টি জাতকাখ্যান পাওয়া যায়:

জেতবনবিহারে ৪১০টি, বেণুবনে ৪৯টি, শ্রাবস্তীতে ৬টি, রাজগৃহে ৫টি, কৌশাম্বীতে ৫টি, কপিলবাস্তুতে ৪টি, বৈশালীতে ৪টি, আলবীতে ৩টি, কুন্তলদহে ৩টি, কুশীনগরে ২টি, মগধে ২টি, লট্‌ঠিবনে ১টি, দক্ষিণ গিরিতে ১টি, মৃগদাবে ১টি, মিথিলাতে ১টি, এবং গঙ্গাতীর ১টি।'[১]

জাতকগুলোর প্রত্যেকটিতেই অংশ আছে তিনটা --প্রত্যুৎপন্ন বস্তু, অতীত বস্তু এবং সমবধান। প্রত্যুৎপন্ন বস্তুটি হচ্ছে--যে প্রসঙ্গে জাতক কথাটির অবতারণা। প্রসঙ্গটি যথার্থই ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা। সে সব ঘটনার মধ্যথেকে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক্, বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব ও তথ্য অতি পরিষ্কাররূপেই পাওয়া যায়। যেহেতু জাতকাখ্যানগুলো গৌতম বুদ্ধের ৩৫ বৎসর বয়:ক্রম থেকে ৮০ বৎসর বয়সের মধ্যেকার ব্যাপার, সেহেতু, প্রাপ্ত সামাজিক রূপ (প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে প্রাপ্ত) অবশ্যই, খৃষ্টপূর্ব ৫৩২ অব্দ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৪৮৭ অব্দের মধ্যকার—মানতেই হবে।

বৌদ্ধ স্বীকৃতিতে দেবতায় বিশ্বাসের সংবাদ পাওয়া যায় কুশনালীজাতকে (১২১); যক্ষ এবং দেবধর্মে বিশ্বাসের সংবাদ আছে দেবধর্মজাতকে (৬) কাষ্ঠহারিজাতকে (৭) এবং গ্রামণীজাতক (৮) প্রভৃতিতে; বিদেহী আত্মার সদ্‌গতির জন্য শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিশ্বাস জানা যায়--সৃতক জাতকে (১৮); অতি প্রাকৃতিক উপায়ের স্বীকতি আছে-নলপানজাতকে ২০; কর্মফলের এবং জন্মান্তরের স্বীকৃতির তো আর অন্তই নেই, কুলায়ক (৩১)-লোশক (৪১) প্রভৃতি অসংখ্য জাতকে তার প্রমাণ বিধৃত; মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যায় বিশ্বাসের খবর আছে সঞ্জীব জাতকে (১৫০); বে-ওয়ারিশ প্রাপ্ত বস্তুতে প্রাপকের স্বত্ব স্বীকৃত হয়েছে কাঞ্চন খণ্ড জাতকে (৫৬); জোর করে নির্বীজায়ন উচিত নয়—মতবাদ পাওয়া যায় ত্রয়োধর্মা জাতকে (৫৮); আজীবিকতার (ফলিত জ্যোতিষীর কাজ) বিরোধিতা জানা যায় নক্ষত্রজাতক (৪৯) —মঙ্গল জাতক (৮৭) প্রভৃতিতে; মানুষের শ্রেণীবিশেষত্বের স্বীকৃতি রয়েছে - তীর্থজাতকে (২৩); পূজায় পশু প্রভৃতির বলিদানের বিরোধিতা আছে অযাচিতভক্ত জাতকে (১৯); তর্কশাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষ আছে মারুত জাতকে (১৭); বাণিজ্যিক সংবাদ আছে—অপন্নক (১)—বন্নুপথ (২)—সেরিবাণিজ (৩)—চুল্লশ্রেষ্ঠী (৪) – তণ্ডুল নালী (৫) প্রভৃতি জাতকে; আজকের দিনেও যে সমস্ত কার্য্য-কলাপ গর্হিত বলে বিবেচিত—মদ্যপান, মিথ্যা-কথা, ঠগবাজি, জ্যেষ্ঠত্ব-কণিষ্ঠত্বের ব্যত্যয় -- লোলুপতা-অর্থগৃধ্নুতা প্রভৃতি, তা, সবই

১. শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনুদিত জাতক, ১ম খণ্ড

বৌদ্ধ ধর্মের দৃষ্টিতেও অনুরূপ বিবেচিত হওয়ার সংবাদ রয়েছে—বারুণি ৪৭), কুক্কুর (২২), বর্ত্তক (৩৫), বক (৩৮), বাতমৃগ (১৪), প্রভৃতি জাতকে। সরাসরি ব্রাহ্মণদ্বেষের কাহিনী মোটেও নেই, সালিত্তক (১০৭) জাতক প্রভৃতিতে যা' আছে তা' ব্রাহ্মণের অন্যায় অভ্যাসের বিরুদ্ধতা।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে সুলেখক ঈশানচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন[১] — "ষষ্ঠত :—জাতকপাঠে বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃতি অতি বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। অনেকের বিশ্বাস বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের বিরোধী। কিন্তু শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব প্রভৃতির মতের ন্যায় বৌদ্ধ মতকেও হিন্দু ধর্মের একটি শাখা বলা যাইবে না কেন? ইহাতে পরলোক আছে, স্বর্গ ও নরক আছে, কর্মফল আছে; ইহাতে ইন্দ্রাদিদেবতা, বলি প্রতি গ্রাহিদেবতা, বৃক্ষদেবতা, যক্ষরাক্ষসাদি অপদেবতা আছেন। ইহা সর্বজনীন হইলেও উচ্চজাতির প্রাধান্য স্বীকার করে, শ্রমণ ব্রাহ্মণকে সমান আদর করে, নীচ বর্ণে জন্ম প্রাপ্তি পাপের পরিণাম বলিয়া মনে করে। ইহার ক্ষণিকত্ববাদ, শূন্যবাদও বোধ হয় নিতান্ত অহিন্দু নহে; ইহার পরিনির্বাণে ও হিন্দুর কৈবল্যে প্রভেদ অতি অল্প। তবে ধর্মের যাহা বহিরঙ্গমাত্র, যাহাতে আড়ম্বর আছে, কিন্তু নিষ্ঠা বা কর্মশুদ্ধি নাই, যাহাতে যজ্ঞ হয় প্রাণিবধের জন্য, বৌদ্ধরা তাহারই বিরোধী। সে ভাবতো বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও দেখা যায়। বর্তমান হিন্দু সমাজেও বৌদ্ধপ্রভাব সর্ববাদি সম্মত। যখন আমরা নিরীশ্বর সাঙ্খ্যকারকে হিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত নহি, তখন বুদ্ধকেই বা অহিন্দু বলিতে যাইব কেন?..."[২]

বৌদ্ধদের মূল ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক নামে অভিহিত। ত্রিপিটকের মধ্যেকার পিটকত্রয়—বিনয়পিটক, সূত্রপিটক এবং অভিধর্মপিটক। প্রত্যেকটি পিটকই অতি বিশাল, এর বহু শাখা উপশাখা রয়েছে। প্রত্যেক শাখা বা উপশাখা, কোন না কোন দিক্ থেকে স্বকীয় বিযেশত্বে সমুজ্জ্বল, একারণেই পৃথক্ গ্রন্থ হিসাবে সংশ্লিষ্ট অনুসারীদের একান্ত অপরিহার্য পাঠ্য-গ্রন্থ। বুদ্ধের জীবনীর সংক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে লিখিত শিষ্যদের মতভেদের ফলেই শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ সপ্রদায় চারটি বৃহৎ বিভেদে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সৌত্রান্তিক—যোগাচার-মাধ্যমিক-বৈভাষিক রূপে চতুর্দ্ধা উপবিভক্ত বৌদ্ধদের মধ্যে দার্শনিক দৃষ্টিতেও নানা পার্থক্য এসে পড়ে। সর্বাস্তিত্ব-বাহ্য-প্রত্যক্ষত্ব-বাহ্যানুমেয়ত্ব-সর্বশূন্যত্ব-মতভেদের চতুর্দ্ধারায় উন্নত যুক্তিজাল বিস্তার মূলক বহু তাত্ত্বিক গ্রন্থের প্রণয়ন-আলাপ-আলোচনা-পরিশীলন অত্যন্ত প্রবলভাবে চলতে

১. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত 'জাতক' প্রথম খণ্ড, উপক্রমণিকা পৃঃ ১।৵
২. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত 'জাতক', ১ম খণ্ড, উপক্র পৃঃ ||/.

আরম্ভ করে। অসংখ্য শিষ্য-প্রশিষ্যের ধারায় তা' হওয়াই সম্ভব। কিন্তু মূল ত্রিপিটক অবলম্বন করেই সে সব ধারা প্রবাহিত, পরিবৃদ্ধ। ব্যাখ্যাগত পার্থক্য-কেন্দ্রিক হীনযান-মহাযানদি নানা অন্তর্ভেদ নিয়েই বৌদ্ধ ধর্ম, তৎকালের সর্বব্যাপক সনাতন আর্য ধর্মের স্থানিক পরিমণ্ডলের মধ্যে জৈন ধর্মের পাশাপাশি বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্মেও গার্হস্থ্য এবং সন্ন্যাস-উভয়ই স্বীকৃত। বাহ্যিক বেশভূষায় নয়; সত্যিকার আস্তিক্যে, নিষ্ঠায়, কুশলতায়, চিন্তায়, চেতনায় উপযুক্ত বিবেচিত হলে 'অর্হত্ব' পাওয়া যেত, সাধনায় তা' উন্নত হতে উন্নততর অবস্থায় নিয়ে যেতে হত। সন্ন্যাস গ্রহণ করাও পুনর্জন্ম প্রাপ্তিরূপে পরিগণিত হত (অঙ্গুলি-মাল-প্রভৃতির উপাখ্যান)। নির্বাণ প্রাপ্তিই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং উপযুক্ত প্রজ্ঞাপারমিতার অনুসরণই যেখানে প্রকৃষ্ট উপায়, সেখানে প্রত্যেকের পক্ষেই শেষটায় সর্বত্যাগীর ভূমিকা অপরিহার্য রূপে বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। প্রাক্তন কর্মফলের প্রাবল্য-দৌর্বল্য যুক্তি সহকারে প্রতিপাদিত হয়েছে। সর্ব বৌদ্ধশাস্ত্রের মূলরূপে পরিগণিত গৌতম বুদ্ধের বাণী সর্বাধিক গুরুত্ববহ। বুদ্ধত্বলাভের পর মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪৬টি বছরের তাঁর অসংখ্য উপদেশ, উপদেশাত্মক কথা, কাহিনী প্রভৃতি কোন একজনের পক্ষেই অধিগত করার সম্ভাবনা ছিল না। অনেকের তেমন যোগ্যতাও অভাবনীয়ই বটে। যাঁরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতায় সর্বাধিক সঙ্গ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে—শারীপুত্র, কাশ্যপ, মৌদ্‌গল্যায়ন, আনন্দ, উপালি-প্রভৃতিই প্রধান। উপালির বিশেষত্ব স্বয়ং গৌতমবুদ্ধই প্রকাশ করেছেন। উপালিকে তিনিই 'বিনয়ধর' উপাধি প্রদান করেছিলেন। এ উপাধি যেহেতু বুদ্ধ আর কাউকে দেন নি, সেহেতুই, ধরে নেয়া যায়—বৌদ্ধ বিনয়শাস্ত্রের সর্বাধিক জ্ঞাতারূপে উপালিই ছিলেন সর্ব স্বীকৃত ব্যক্তি।

উল্লিখিত কারণেই, বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পর 'বিনয়' (প্রধানত বুদ্ধের নিজ উপদেশ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কথা-কাহিনী) সংগ্রহের প্রয়োজনেই সপ্তপর্ণী গুহায়[১] প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধি আছে যে, দীর্ঘদিনের সেই সঙ্গীতিতে উপালি যে বিনয়-স্মরণ করতে পেরেছিলেন তা-ই সর্বজন-স্বীকৃতি পায়।

১. সপ্তপর্ণী গুহা—মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ, বর্তমান নাম রাজগিরি। ইহা পাটনা জিলায় অবস্থিত। মগধরাজ বিম্বিসার এবং তাঁর পুত্র অজাতশত্রু ও এখানেই বাস করতেন। রাজগৃহের চতুষ্পার্শ্বে ৫ টি পর্বত আছে। যার নাম বিপুলগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি শোনগিরি এবং বৈভারগিরি। এই বৈভারগিতেই সুপ্রসিদ্ধ সপ্তপর্ণী গুহা।

বিনয়পীটকের প্রথম সঙ্কলন সেখানেই হয়েছিল।[১] এখানকার সঙ্কলন লিখিত ভাবেই হয়ে থাকবে। নিষ্ঠাবান ভক্ত পণ্ডিত— মণ্ডলী যে মহৎ উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিলেন, আসল সে উদ্দেশ্যই বাদ রেখে সঙ্গীতির সমাপন করেছিলেন — এমনটা ভাবতে যাওয়াই হঠকারিতা। আর, লিপিজ্ঞান বা লিপির প্রচনের অভাব যাঁরা কারণরূপে উপস্থাপন করেন তাঁদের সম্বন্ধেও বক্তব্য যে, হয় তাঁরা বিজয়ী জাতির অতিগর্বে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহী, নয় আর্য সংস্কৃতির সুপ্রাচীন পুঁথিপত্রের যথোপযুক্ত অনুশীলন করেন নি। যে গ্রন্থ, গ্রন্থ জগতে সর্বাদিম বলে স্বীকৃত যার মধ্যেকার 'অ' বর্ণটি, কিংবা 'অ' থেকে ঔ, এবং 'ক' থেকে 'হ' বা 'ক্ষ' পর্য্যন্ত প্রতি বর্ণের উচ্চারণ একান্ত পক্ষেই অবিকৃত রূপে এখনো ব্যবহারে চলমান, সেই ভাষায় লিপিজ্ঞান এবং তার ব্যবহার অত্যন্ত সোজা ব্যাপার। বর্ণ এবং বর্ণের লিপিভঙ্গীর ভেদজ্ঞান থাকলেই তা' অনায়াসে তৈরি ও ব্যবহার — উভয়ই চলতে পারে। বুদ্ধ যে বিশ্বামিত্রের ছাত্ররূপে স্বর্ণকলমে লিখতেন তার কাহিনীও তাঁর জীবনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর মধ্যে গণ্য।

আর্য সংস্কৃতিতে বস্তুতত্ত্বও দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে আলোচিত। সেখানে আকাশের গুণ শব্দকে (Sound) ব্যক্ত এবং অব্যক্ত—দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে শব্দগুলোর মধ্যে বর্ণ (অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত) অভিব্যক্ত হয়, তাকে বলে ব্যক্ত শব্দ, এবং যে শব্দগুলোর মধ্যে বর্ণ ব্যক্ত হয় না, তাকে বলা হয় অব্যক্ত শব্দ। ব্যক্ত শব্দ বাগিন্দ্রিয়মাত্র-সাধ্য, অব্যক্ত শব্দ বাদ্যযন্ত্রাদিসাধ্য। বাগিন্দ্রিয় সাধ্য বর্ণ উৎপন্ন হয় আকাশে (যেহেতু শব্দ মাত্রই আকাশের গুণ, আকাশ দ্রব্য পদার্থ, তার গুণ তাকে অবলম্বন করেই থাকবে), আর অভিব্যক্ত হয় শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা— কান দ্বারা। পক্ষান্তরে লিপিটি সৃষ্টি হয় হস্ত-পদাদি কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে লেখ পত্রে বা ফলকে, তা' থাকে সেই পত্রে বা ফলকে, আকাশে নয়। আর, তার অভিব্যক্তি সরাসরি হয়-ই না। নির্দিষ্ট লিপি উচ্চার্য বর্ণের স্মারক চিহ্ন মাত্র। চোখ বা স্পর্শেন্দ্রিয়ের মাধ্যমেও চিহ্নগুলো বিদিত হয়েই স্মরণ করায়। তখন

১. "জিস্ বর্ষ বুদ্ধকা নির্বাণ হুয়া, উসী বর্ষ (ঈ. স. পূর্ব ৪৮৭ কে আসপাস) উনকে মুখ্য শিষ্য কাশ্যপ কী ইচ্ছানুসার মগধকে রাজা অজাতশত্রু কী সহায়তা সে রাজগৃহকে পাসকী সপ্তপর্ণ গুফাকে বড়ে দালান মে বৌদ্ধো কা পাইলা সংঘ একত্র হুআ জিসমে ৫০০ অর্হৎ (বড়ে দরজেকে সাধু) উপস্থিত থে। উহা পর উপালিনে, জিসকো স্বয়ং বুদ্ধনে 'বিনয়' কা অদ্বিতীয় জ্ঞাতা মানা থা, 'বিনয়' সুনায়া, জো বুদ্ধকা কহা হুআ 'বিনয়' মানা গয়া।......ওল্ডেনবার্গকে মতমে 'বিনয়' কে কিতনে এক অংশ ঈ, স পূর্ব ৪০০ সে পহিলেকে হৈ।"
গৌরীশঙ্কর হীরা চাঁদ ওঝা প্রণীত 'ভারতীয় লিপিমালা' দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৪, পাদটী, ৯

বাগিন্দ্রিয় তার উচ্চারণে ব্যাপৃত হয়ে থাকে। এ জটিল তত্ত্ব ও একটু অনুধাবনেই বোঝা যায়। বর্ণ এবং বর্ণের লিপি ভিন্ন বস্তু। পদার্থের ভেদক গুণ, গুণেরও ভেদক আছে।

কালিঙ্গজয়ের পরে মৌর্য সম্রাট অশোকের, বৌদ্ধ স্থবির উপগুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পরই আসে বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়ের কাল। দূর বিদেশে পর্যন্ত ধর্ম প্রচারের উপর্যুপরি অভিযান চলতে থাকে। খৃষ্ট পূর্ব ৫৩২ বছর আগে যে ধর্মমতের উদ্ভব, স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ যেখানে বৃহত্তর বঙ্গের সংলগ্ন অঙ্গরাজ্যে একাধিক বার ধর্মপ্রচারার্থ এসেছিলেন, অঙ্গদেশস্থ বহুলোক যেখানে বুদ্ধের মহাত্ম্যে-মহত্বে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে বঙ্গদেশে যে বৌদ্ধ ধর্মের উপস্থিতিতে খুব বেশী বিলম্ব হয় নি— তা ধারণা হয়। বৌদ্ধ 'দিব্যাবদান' গ্রন্থের কাহিনী অনুসারে সম্রাট অশোকের আমলেই যে বৌদ্ধধর্ম উত্তর বঙ্গস্থিত জৈন-ধর্মাবলম্বীদের প্রবল প্রতিপক্ষের রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা'ও মনে হয়। বঙ্গদেশ সরাসরি না হলেও পরোক্ষ মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন থেকে থাকলে বৌদ্ধ প্রভাব যে অশোকেরও আগেই এসে থাকবে তা বোধ হয় সম্ভব। পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন আদিম মানব গোষ্ঠীর পরস্পর সংমিশ্রণ-জাত বাঙালী জাতির আর্যায়ণের কথা মনে রেখে ইতিহাস-চিন্তা তেমন কোন জটিলতার আবর্তে পড়ে না। অনেক বৈদেশিক বা দেশীয় লেখকদের অস্পষ্ট অব্যাখ্যেয় কথার মাধ্যমে যে ঐতিহাসিক জট বা গাঁঠ সৃষ্ট হয়েছে তার সঠিক ব্যাখ্যা-বিন্যাস না হওয়া পর্যন্ত উল্লিখিত আবর্ত এড়ান চলে কি? এই বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণের যুগে গ্রীক লেখকের 'গঙ্গরিডই' বা 'গঙ্গারিড়ই' জাতির উল্লেখের সত্যিকার অর্থ অনুধাবনের অভাবে উল্লিখিত জটের একটি গড়ে উঠেছে :

গঙ্গরিডই কিংবা গঙ্গারিডই—এদেশের শব্দে অচল। খৃষ্ট পূর্ব ৩২৭ অব্দে অথবা খৃষ্ট পূর্ব ৩২৬ অব্দে গ্রীক বীর আলেক্সাণ্ডারের ভারতাভিযান। তখন যদি গঙ্গরিডই নামক কোন প্রবল পরাক্রান্ত জাতি থেকে থাকত, তো তাদের কোন অস্তিত্বের প্রত্ন প্রমাণ পাওয়া যেত না? না কৃষ্টি-কলায়, না জাতি শ্রেণীতে, কোথাও তো 'গঙ্গরিডই'— শব্দ-সংশ্লিষ্ট কোন আলামত দেখা যায় না। বাংলাদেশের ইতিহাসে খৃষ্টপূর্ব ৩২৬/২৭ বছর এমন একটা দূরতর কাল নয়, যে তা সন্ধান করা চলে না। গঙ্গরিডই শব্দটাই এতদ্দেশে বোধগম্য নয়। আবার তাঁরা (গ্রীক লেখকরা) এই গঙ্গরিডই জাতির পশ্চিমে 'প্রাসিয়য়' নামক আর এক জাতির উল্লেখ করেছেন? এই শব্দটিও এতদ্দেশী নয়। প্রাসিয়য় জাতির রাজধানীর

নাম নাকি লিখেছেন—পালিবোথরা। পালিবোথরা শব্দটির অর্থ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও লিখেছেন "(পাটলিপুত্র বর্তমান পাটনা)"[১] প্রখ্যাত সংস্কৃতবিৎ জার্মান পণ্ডিত উইণ্টার্ণিজ, তাঁর History of Indian Literature গ্রন্থের preface এ লিখেছেন গ্রীকদের অনেকে পাটলিপুত্র লিখতে 'palibothra' লিখেছেন। পাটলিপুত্র অর্থে প্রযুক্ত পালিবোথ্রা শব্দটি এবার বোধগম্য অর্থের জ্ঞাপক হয়েছে ঠিকই। পাটলি পুত্র যাদের রাজধানী এমন একটি জাতিকে 'প্রাসিয়য়' বললে, নিশ্চয়ই তা পালিবোথ্রা শব্দের ন্যায় বিভাষা-লিপি-বৈষম্য। আমার মনে হয় 'প্রাচীয়' শব্দটাই ওই রকম লিখেছে। প্রাচীয় বা প্রাচ্যদেশীয় তো বঙ্গদেশের সম্বন্ধে মধ্য ভারত বা পশ্চিম ভারত থেকে লেখা অসঙ্গত হয় না। বঙ্গদেশীয়গণ আর্যদের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রাচ্যীয়-ই বটে। এভাবে, গঙ্গবিডই শব্দটিও অবশ্যই 'গঙ্গাহৃদয়' শব্দের বিকৃত লেখ। ভাগীরথী এবং গঙ্গা—উভয় নামে গঙ্গার যে প্রবাহদ্বয় বর্তমানে পরিচিত, তার অন্তর্বর্তী কোন রাজ্যের গঙ্গাহৃদয় নাম বা তত্রত্য স্থায়ী অধিবাসীদের গঙ্গাহৃদয় জাতি রূপে উল্লেখ কোথাও হতে পারে, যা শুনে লিখেছে গঙ্গার পশ্চিম এবং পূর্ব- -উভয় ধারার মধ্যবর্তী ভূভাগ গঙ্গার হৃদয়ই তো, তত্রত্য অধিবাসীরা চিরকালই বাঙালী। এই রাজ্যের বিপুল গজ বাহিনীও সেই মহাভারতের যুগে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও ব্যাপৃত হয়েছিল বলে জানা যায়। গঙ্গা সুপ্রাচীন নদী, কিন্তু গঙ্গাহৃদয় বলেও কোন রাজ্যের বা জাতির উল্লেখ কোন প্রাচীন গ্রন্থে তা' আর্যধর্মেরই হোক, বা জৈনধর্মেরই হোক কিংবা বৌদ্ধ ধর্মেরই হোক, নেই। কিন্তু ঐ গঙ্গরিডই যেভাবেই সংগৃহীত হোক না কেন- -তা' বোধগম্য এতদ্দেশী শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত। 'পাটলিপুত্র' স্থলে পালিবোথ্রা লিখতে পারলে 'প্রাচীয়' শব্দ প্রাসিয়য় এবং 'গঙ্গাহৃদয়' গঙ্গরিডই হয়ে যেতে পারে না--বলা চলে না। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও গঙ্গাহৃদয় বলতে গঙ্গারিদয় বলে ফেলেন। আর ওই গঙ্গারিদয়ই হয়েছে গঙ্গরিডই। যা'ই হোক্, মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত কেন, মহাপদ্মনন্দেরও পূর্বে অভ্যুদিত বৌদ্ধধর্মের ঢেউ বাংলাদেশেও এসে পড়ার কোন বাঁধা দেখা যায় না। বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল হর্যাঙ্ক বংশীয় বিম্বিসারের রাজত্ব কালে।

ফলে, আর্য সংস্কৃতির মূল ধারার পাশাপাশি জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের দু'টি ধারা এদেশে প্রবাহিত হয়েছে সন্দেহ নেই। জৈন ধর্মের প্রভাব, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, সনাতন আর্য ধর্মের প্রভাব শতাংশিক হিসাবে প্রকাশ করা না গেলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হওয়ারই কথা। 'অনুষ্ঠানবহুল সনাতন আর্যধর্ম এবং গ্রন্থবহুল শিক্ষা

১. বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১

দীক্ষার আর্য সংস্কৃতির সাথে পাল্লা দিতে জৈনদের ন্যায় বৌদ্ধদেরও প্রচুর গ্রন্থ তৈরি হয়েছে। সঙ্ঘ বা আরাম বা চৈত্য ছিল প্রতিনিয়ত জ্ঞানানুশীলনের মহাতীর্থ। নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় বলে' যে প্রাচীন বৌদ্ধ-বিদ্যায়তনের ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তা সত্যিকার অর্থেই বিশাল বিদ্যাতীর্থ। সে যুগেও দশ হাজার ছাত্র নাকি সেখানে থেকে খেয়ে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন্‌থ সাং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে নালান্দায় গমন করেন। তখন নালান্দাবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণবংশীয় শীলভদ্র।[১] তিনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই সময় নালান্দায় পড়াশুনার বিষয় কি ছিল তাও তিনি লিখেছেন, যা' ডঃ রমেশ মজুমদারের ভাষায়---[২]

> "হিউয়েন্‌থ সাং ৬৩৭ অব্দে নালান্দায় গমন করেন। তখন এখানে ছাত্র সংখ্যা ছিল দশ হাজার এবং বৌদ্ধগণের আঠারটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ও সাংখ্য প্রভৃতি এখানে অধীত হইল।"

নালান্দার ন্যায় বিক্রমশীল বিহারও বিদ্যাচর্চার একটি প্রথম শ্রেণীর তীর্থ। সেখানে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও প্রসার করার উদ্দেশ্যে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে যান এবং সেখানে বহুগ্রন্থ রচনা করেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অধ্যাপক জেতারিও বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এবং তাঁর গুরু জেতারি---উভয়েই বাঙালী ছিলেন। জেতারীর অপর ছাত্র শান্তরক্ষিত নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষও ছিলেন। চন্দ্র গোমিন্ অপর একজন বৌদ্ধপণ্ডিত। তারও বহু গ্রন্থ রয়েছে। তিনিও নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন, সে আরো বহুশত বৎসর পূর্বে।

বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত এবং পালি---উভয় ভাষায়ই রচিত হয়েছে। কোন কোন গ্রন্থ হয়তো সংস্কৃতে রচিত, পরে পালিতে অনূদিত। পক্ষান্তরে, পালিতে রচিত, পরে সংস্কৃতায়িতও হয়েছে। গল্পময়, বা কাহিনীপ্রধান গ্রন্থগুলো, হয়তো, পালিতেই প্রণীত হয়ে সংস্কৃতে অনূদিত হয়েছে, যেহেতু, সর্বসাধারণের মধ্যে,

১. চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন্‌থ সাং যখন নালান্দায় যান, তখন বাংলার ব্রাহ্মণ বংশীয় শীলভদ্র এই মহাবিহারের প্রধান আচার্য ও অধ্যক্ষ ছিলেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কৃত বাং, ই; প্রাচীন যুগ, ২৯১ পৃঃ ৭-৯ পং

২. বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১

বক্তৃতা প্রভৃতির প্রয়োজন পালি বা প্রাকৃতের মাধ্যমে যতটা জনপ্রিয়তা লাভ হয় সংস্কৃতে তা হওয়া কঠিন। অপর দিকে, তন্ত্রপ্রধান বা মন্ত্রাদিপ্রধান গ্রন্থগুলো মাত্র সংস্কৃতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদেরও ন্যায়দর্শন বা তর্কবিদ্যা আছে। পূর্বে যে হৈতুক বিদ্যার প্রতি কটাক্ষের কথা উল্লিখিত হয়েছে (মাকৃত জানকে) তা' বিতণ্ডাত্মক লোকায়তিক হেতুবিদ্যা বিষয়েই প্রযোজ্য। অন্যথা, বৌদ্ধন্যায় থাকতে পারে না। বৈশেষিক দর্শনের মত বৌদ্ধদর্শনেও, যদিও প্রত্যক্ষ এবং অনুমান—এই দুটি প্রমাণ স্বীকৃত, তথাপি তার মাধ্যমে বৌদ্ধদর্শনেও অনেক ধুরন্ধর পণ্ডিত, পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছাড়ছেন। আর্য সংস্কৃতিতে কঠিন যুক্তি-জালের মাধ্যমে তত্ত্বের যাচাই করা, প্রতিপাদন করা, নির্ধারণ করার সার্বত্রিক ব্যবহার থাকায়, জৈন এবং বৌদ্ধরাও সে পথ গ্রহণ করতে ভোলেন নি। বিশেষত সভায় বাদানুবাদের প্রচলন থাকায় দর্শন তত্ত্বের, বিশেষ করে, ন্যায়তত্ত্বের বহু আলোচনাই ব্যাপকাকারে হয়েছে। বৌদ্ধন্যায়ের গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ হচ্ছে---

দিঙ্ নাগের ন্যায়প্রবেশঃ, ধর্মকীর্তির ন্যায়বিন্দুঃ, প্রমাণবার্তিকম্, প্রমাণবিনি-শ্চয়ঃ, এবং বাদন্যায়ঃ; নাগার্জুনের উপায়হৃদয়ম্; রত্নকীর্তির অপোহসিদ্ধিঃ, এবং ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিঃ; রত্নাকর শান্তির অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থনম; বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিঃ; শান্ত রক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহঃ প্রভৃতি।

ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থের রচয়িতা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেক গ্রন্থও একেবারেই দুর্লভ হয়ে গিয়েছে। যেগুলো বিশেষভাবে আলোচিত হত তন্মধ্যে, সংস্কৃত গ্রন্থের অশ্বঘোষের নান্দিমুখাবদানম্; আর্যশূরের জাতকমালা বা কাব্যকুসুমাঞ্জলি; ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা; চন্দ্রকীর্তির মধ্যমকবৃত্তিঃ (বিনয়সূত্র); চন্দ্রগোমীর শিষ্যলেখধর্মঃ কাব্য, জয়দেব সম্পাদিত শিক্ষা সমুচ্চয়ঃ (৭ম খৃষ্টাব্দ); রামানন্দতনয় অমৃতানন্দকৃত ছন্দোহমৃতলতা; দীপঙ্কর প্রণীত পিণ্ডপাত্রাবদানকথা; ধর্মগুপ্ত রচিত রামাঙ্ক নাটিকা (?); নাগার্জুনের ধর্মসংগ্রহ: (ডঃ রাইট্-এর তালিকায় এ গ্রন্থের নাম সপ্তাভিধানোত্তর); পণ্ডিত অশোকের সামান্য দূষণদৃকপ্রসারিতা; মঞ্জুশ্রী রচিত পাপপরিমোচনম্; রাজা প্রতাপমল্ল কৃত বৃষ্টি-চিন্তামণি; লোকেশ্বরকৃত উৎপাতলক্ষণম্; বজ্রদত্তের লোকেশ্বরশতকম্; কাশ্মীরীয় সর্বজ্ঞমিত্রকৃত পারমেশ্বরতন্ত্রম্; এছাড়া, অবদান গ্রন্থগুলোর মধ্যে —

অশোকাবদানমালা, কঠিনাবদানম্, কপিচন্দ্রাবদানম্, কপিশাবদানম্, দ্বাবিংশত্যব-দানকথা, পিণ্ডপাত্রাবদানম্, ভদ্রকল্পাবদানম্, মণিচূড়াবদানম্, শৃগালজাতকাবদানকথা, সুগতাবদানম্, সুচন্দ্রাবদানম্, সুবর্ণাবদানম্ এবং স্বাতাবদানম্ প্রভৃতি;

অপরিমিতায়ুর্ধারণীসূত্রম্, মহাযানসূত্রম, মেঘসূত্রম্, পঞ্চরক্ষামহাযানসূত্রম্ প্রার্থনামহাযানসূত্রম্ ;

কারণ্ডব্যূহঃ, গণ্ডব্যূহঃ, অবলোকিতেশ্বরগুণকারণ্ডব্যূহঃ, সুখাবতীব্যূহঃ (মহাযান সূত্রবিশেষ),

বসুধরাব্রতম্ (ব্রতাবদানমালার), উপষদাব্রতম্, অমোঘপাশলোকেশ্বরপূজা, ভীমসেনপূজা, মঞ্জুঘোষপূজাবিধিঃ,

ধারণীঃ, ধারণী সংগ্রহঃ, প্রত্যঙ্গিরাধারণী, ভীমসেনধারণী, মহাপ্রত্যাঙ্গিরাধারণী, বসুধারণী বা বসুধারা ধারণী,

আর্যতারাভট্টারিকা-নামাষ্টোত্তরশত-স্তোত্রম্, তারা-স্রগ্ধরাস্তোত্রম, বুদ্ধগীতস্তোত্রম্ বজ্রমহাকালস্তোত্রম,

করুণ পুণ্ডরিকম্ (মহাযানসূত্র), সদ্ধর্ম পুণ্ডরিকম্,

আদিযোগসমাধিঃ, সমাধিরাজঃ (মহাযানসূত্র),

গুহ্য-সমাজঃ (পূর্বার্দ্ধ এবং পরার্দ্ধ),

নামসঙ্গীতিঃ, পরমার্থনামসঙ্গীতিঃ,

সর্বদুর্গতি পরিশোধনম্, (১ম্ এবং ২য় অংশ)

সুবর্ণপ্রভাসঃ, মহাবস্তু, জাতকমালা,

সপ্তশতিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা ; লোকেশ্বর পারাজিকা,

চৈত্যপুঙ্গলম্ (রাজা ইন্দ্রপৃষ্ঠ এবং বসুবন্ধুর উপাখ্যান)

বুদ্ধচরিতম্ (কাব্য), ললিতবিস্তরঃ, ভদ্রচরীপ্রণিধানম্,

স্বয়ম্ভুপুরানম্ বৃহৎস্বয়ম্ভুপুরাণম্, গোরক্ষসংহিতা, গোরক্ষপুরাণম্—প্রভৃতি অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ। উল্লিখিত গ্রন্থগুলো সবই সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় বৌদ্ধদেরও বহু তন্ত্র গ্রন্থ আছে। সে সমস্তও সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। যেমন –

১। প্রমোদমহাযুগ, ২। পরমার্থসেবা, ৩। পিণ্ডীক্রম, ৪। সম্পুটোদ্ভব, ৫। হেবজ্র, ৬। বুদ্ধকপাল, ৭। সম্বরতন্ত্র বা সম্বরোদয়, ৮। বারাহীতন্ত্র বা বারাহীকল্প, ৯। যোগাম্বরতন্ত্র, ১০। ডাকিনীজাল, ১১। শুক্লযমারি, ১২। কৃষ্ণযমারী, ১৩। পীতযমারি, ১৪। রক্তযমারি, ১৫। শ্যামযমারি, ১৬। ক্রিয়াসংগ্রহ, ১৭। ক্রিয়াবন্ধ, ১৮। ক্রিয়াসাগর, ১৯। ক্রিয়াকল্পদ্রুম, ২০। ক্রিয়ার্ণব, ২১। অভিধানোত্তর, ২২। ক্রিয়াসমুচ্চয়, ২৩। সাধনমালা, ২৪। সাধনসমুচ্চয়, ২৫। সাধনসংগ্রহ, ২৬।

সাধনরত্ন, ২৭। সাধন পরীক্ষা, ২৮। সাধনকল্পলতা, ২৯। তত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধি, ৩০। জ্ঞানসিদ্ধি, ৩১। গুহ্যসিদ্ধি, ৩২। উদ্যান, ৩৩। নাগার্জুন, ৩৪। যোগপীঠ, ৩৫। পীঠাবতার, ৩৬। কালবীর বা চণ্ডরোষণ, ৩৭। বজ্রবীর, ৩৮। বজ্রসত্ত্ব, ৩৯। মরীচি, ৪০। তারা, ৪১। বজ্রসংঘ, ৪২। বজ্রধাতু, ৪৩। বিমলপ্রভা, ৪৪। মণিকর্ণিকা, ৪৫। ত্রৈলোক্যবিজয়, ৪৬। সম্পুট, ৪৭। কর্মকালিকা, ৪৮। কুরুকুল, ৪৯। ভূত ডামর, ৫০। কালচক্র, ৫১। যোগিনী, ৫২। যোগিনী সঞ্চারণ, ৫৩। যোগিনীজাল, ৫৪। যোগাম্বরপীঠ, ৫৫। যোগিনীপীঠ, ৫৬। উড্ডামর, ৫৭। বসুন্ধরা সাধন, ৫৮। নৈরাত্ম্য, ৫৯। ডাকার্ণব, ৬০। ক্রিয়াসার, ৬১। যমান্তক, ৬২। মঞ্জুশ্রী, ৬৩। তন্ত্র সমুচ্চয়, ৬৪। ক্রিয়াবসন্ত, ৬৫। হয়গ্রীব, ৬৬। সঙ্কীর্ণ, ৬৭। নামসঙ্গীতি, ৬৮। অমৃত কর্ণিকানামসঙ্গীতি, ৬৯। গূঢোৎপাদ নামসঙ্গীতি, ৭০। মায়াজাল, ৭১। জ্ঞানোদয়, ৭২। বসন্ততিলক, ৭৩। নিষ্পন্নযোগাম্বর এবং ৭৪। মহাকালতন্ত্র প্রভৃতি।

উল্লিখিত বৌদ্ধ তন্ত্রগুলোর অধিকাংশই চীনা এবং তিব্বতীয় এবং জাপানী ভাষায় অনূদিত হয়ে তত্তদ্দেশে প্রচারিত হয়েছে। তিব্বতে তন্ত্রেরনাম ঋগ্যুগ। ঋগ্যুগ ৮৭ খণ্ডে বিভক্ত। ঋগ্যুগে মোট ২৬৪০ খানি তন্ত্র বিভিন্ন নামে সন্নিবদ্ধ আছে। বিদেশী ভাষায় অনূদিত তন্ত্র বাংলাদেশে পঠিত-পাঠিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল মনে হয়। তবে, বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল বলে তন্ত্রশাস্ত্রগুলো সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে- নিঃসন্দেহে বলা চলে যেহেতু, বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের গুহ্য ক্রিয়া-কাণ্ড, উপদেশ, স্তব, কবচ, মন্ত্র এবং ষট্কর্মের প্রক্রিয়া ও পূজাবিধি ইহাতে বর্ণিত হয়েছে। সিংহলে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার এবং বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রচলন ভারতীয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার অনন্য দৃষ্টান্ত। স্থবির মহেন্দ্র এবং সংঘমিত্রা সম্রাট অশোকের কালে যে সাংস্কৃতিক সফরে সিংহলে গিয়েছিলেন তার অনবচ্ছিন্ন বন্ধন এখনও বর্তমান। বৌদ্ধকৃষ্টির বদৌলতেই বাংলাদেশের সাথে সিংহলের নৈকট্য ঘনিষ্ঠতর হয়েছে।

বৌদ্ধতন্ত্র, ধারণী, পূজা এবং স্তোত্রের গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় বৌদ্ধগ্রন্থই পালি ভাষায়ও প্রণীত বা অনূদিত হয়েছে। যার মধ্যে অধিকতর আলোচিত গ্রন্থ--

১। ত্রিপিটক (সূত্তপিটক, বিনয়পিটক এবং অভিধম্মপিটক), ২। বিশুদ্ধি-মাগ্গ, ৩। দীপবংস, ৪। মহাবংস, ৫। মলিন্দপঞ্হ, ৬। থেরগাহা, ৭। ধম্মপদ, ৮। সূত্তপিটকের শাখা দীগ্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায় সংযুক্তনিকায়, ৯। চরিয়াপিটক এবং ১০। জাতকমালা-প্রভৃতি।

দণ্ডীকৃত কাব্যাদর্শে শূদ্রক প্রণীত মৃচ্ছকটিকের অনুরূপ—"লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি" ইত্যাদি শ্লোকটি দেখে এবং ভামহের গ্রন্থে কাব্যাদর্শের উদ্ধৃতি রয়েছে মনে করে ঝলকীকার আচার্য বামন, মম্মটকৃত কাব্যপ্রকাশের টীকা-গ্রন্থের উপক্রমণিকায় দণ্ডীকে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বলে নিরূপণ করেছেন।[১] গ্রন্থ পর্যালোচনার পদ্ধতিতে সাহিত্যতত্ত্ব গ্রন্থের গ্রন্থকাররূপে আমরা দণ্ডীকেই প্রাচীনতম মনে করি। দণ্ডী, অগ্নিপুরাণ থেকেই সরাসরি কাব্যলক্ষণ, এবং ভাষাবিন্যাস-নিয়ম, রীতি-- প্রভৃতি উদ্ধৃতিরূপে গ্রহণ করে স্বীয় কাব্যাদর্শের অঙ্গীভূত করায়, এবং অন্যকোন সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ না করায় উল্লিখিত ধারণা সমর্থিত হয়। দণ্ডীর গ্রন্থেই যখন গৌড়ী প্রাকৃত ভাষার কথা রয়েছে[২] তখন পূর্ব-প্রাকৃত বলে যেটাকে বহুজন উল্লেখ করে থাকেন---তার আরো নির্ভরযোগ্য—'গৌড়ী প্রাকৃত' নাম এবং অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। তৎকালীন বাংলাদেশে সংস্কৃতের পাশাপাশি গৌড়ী প্রাকৃতভাষা তো বটেই, হয়তো আরো কোন আঞ্চলিক ভাষাও থেকে থাকবে। সে আঞ্চলিক ভাষা একাধিকও থাকার সম্ভাবনাই বেশী। যদিও তার কোন গ্রন্থসাক্ষ্য বা শিলালেখাদির সাক্ষ্য পাওয়া যায় নি। আর, পালি ভাষা অবশ্যই পাটলী পুত্রাঞ্চলের প্রাকৃত। অথবা বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রাকৃত-ই পালি।

পাটলী শব্দ, চলতি কথায় 'পালি' হয়ে যাওয়া তেমন বিচিত্র নয়। সম্ভবত সেখানে পাটলী শব্দ স্থানীয় ব্যবহারে 'পালি' হয়েই গিয়েছিল। তার জন্য গ্রীসিয়ান লেখকের লেখায়ও pali হওয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। পাটলীপুত্র লিখতে palibothra পদের ব্যবহার হয়েছে। বুদ্ধের ধর্ম-প্রচারের প্রাথমিক এবং প্রধান কর্মকেন্দ্র—কপিলবাস্তু, বুদ্ধগয়া, বারানসী এবং কুশীনগরের[৩] পরিসীমা জুড়েই হয়তো, পাটলীপুত্রীয় চলতি প্রাকৃত বা পালি ছিল সর্বজনবোধ্য সহজ ভাষা। পালি ভাষা প্রাকৃতাতিরিক্ত নয় বলেই সমান বর্ণমালাদ্বারা লেখা হওয়া সত্ত্বেও পৃথক্ উল্লেখ কোন প্রাচীন ভাষা-বিষয়ক গ্রন্থেও নেই। পাণিনীয় শিক্ষা গ্রন্থেও বর্ণমালা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে---

১. এ সম্বন্ধে তৃতীয় খৃষ্টাব্দীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য

২. মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ। সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদিযন্ময়ম্ ।।১
শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী। যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্ ।।২
আভীরাদীগিরঃ কাব্যেষ্বপভ্রংশ ইতি স্মৃতাঃ। শাস্ত্রেষু সংস্কৃতাদন্যদপভ্রংশতয়োদিতম্ ।।৩ দণ্ডীর কাব্যাদর্শ।

৩. বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের চারটি প্রধান কর্মকেন্দ্র—১। কপিলবাস্তু, ২। বুদ্ধগয়া, ৩। বারানসী এবং ৪। কুশীনগর। ঈশানচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'জাতক' ১ম খণ্ডের ভূমিকা।

শম্ভুমতে—অর্থাৎ মাহেশ্বর ব্যাকরণের মতে তেষট্টি অথবা চৌষট্টিটি বর্ণ মাত্রই নির্দ্ধারিত হয়েছে, যাহা সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়।[১] পালি ভাষাও কিন্তু এই বর্ণমালা দ্বারাই লিখিত হয়। বেদ থেকে শুরু করে যাবতীয় আর্য ভাষার গ্রন্থই আর্য বর্ণমালাদ্বারা (আমাদের বাংলা ভাষার বর্ণমালা) লেখা এবং লিখিতও হয়ে চলছে বেদের কাল থেকেই। বৈদিক যুগে লেখা ছিল না বা আর্যরা লিখতে জানত না, অথবা অনেক পরবর্তীকালে জেনেছে- ইত্যাকার ধারণার বশবর্তী হয়ে, অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত সে রকম মন্তব্যের মাধ্যমে সাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, ও সব কথা-বার্তা। শত শত নয়, হাজারে হাজারে শ্লোকে বা পংক্তিতে গ্রথিত হাজার হাজার গ্রন্থের যাবতীয় আনুক্রমিক নিয়মাবলী, কেবল মুখে মুখেই ছিল এ কথা—বাতুলতা মাত্র।

ভাষা প্রসঙ্গে উপস্থিত সাহিত্যতত্ত্ব বা অলঙ্কার শাস্ত্রের গ্রন্থের ধারায়, অধিকাংশ গ্রন্থকারই অবঙ্গীয়। আচার্য মহিম ভট্ট (ব্যক্তিবিবেক-কার) বাঙালী হলেও, সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে ব্যক্তিবিবেক গ্রন্থ তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। অথচ, বাংলাদেশে সাহিত্যতত্ত্বের চর্চা যে যথেষ্ট ছিল তা, সুবিদিত। সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের ধারাও আঞ্চলিকতা বর্জিত। অগ্নিপুরাণকে মূল হিসাবে গ্রহণ করে, দণ্ডী থেকে শুরু করে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর জগন্নাথরাজ (রসগঙ্গাধর) পর্যন্ত যাবতীয় গ্রন্থকারের গ্রন্থই বাঙালী সমাজে কম-বেশী আলোচ্য বিষয়। সংস্কৃতের প্রাবল্যযুগে দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, ভামহের কাব্যালঙ্কার, আচার্য বামনের কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি, ভট্ট উদ্ভটের ভামহ বিবরণ, আনন্দবর্দ্ধনের ধন্যালোক, রুদ্রটের কাব্যালঙ্কার, কবিরাজ রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা, ভট্টমুকুলের অভিধাবৃত্তিমাতৃকা, ইন্দুরাজের কাব্যালঙ্কার-সারসংগ্রহ গ্রন্থের লঘুবৃত্তি ভট্টনায়কের হৃদয়দর্পণ, ধনঞ্জয়ের দশরূপক, ধনিকের কাব্যনির্ণয়, ভট্ট তৌতের কাব্যকৌতুক, ভট্ট কুন্তকের বক্রোক্তি, অভিনবগুপ্তের ধন্যালোকলোচন, আচার্য মহিম ভট্টের ব্যক্তিবেক, ক্ষেমেন্দ্রের কবিকণ্ঠাভরণ এবং ঔচিত্যবিচারচর্চা, ভোজদেবের সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, মম্মটের কাব্যপ্রকাশ, রুদ্রটের শৃঙ্গারতিলক, রুয্যকের অলঙ্কারসর্বস্ব, বাগ্ভটের (১ম) বাগ্ভটালঙ্কার, হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসন, বাগ্ভটের (২য়) কাব্যানুশাসন, পীযূষবর্ষের চন্দ্রালোক, বিদ্যাধরের একাবলী, বিদ্যানাথের প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ, সিংহভূপালের রসার্ণবসুধাকর, ভানুদত্তের রসতরঙ্গিণী এবং রসমঞ্জরী, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ, কবি কর্ণপূরের অলঙ্কার কৌস্তুভ অপ্পয়দীক্ষিতের চিত্রমীমাংসা, এবং জগন্নাথরাজের রসগঙ্গাধর—প্রভৃতি গ্রন্থই বাংলাদেশে আলোচ্যগ্রন্থরূপে পাওয়া যায়। কোন কোন অঞ্চলে কোন কোন

১. ত্রিষষ্টিঃ চতুঃষষ্টির্বা বর্ণাঃ শম্ভুমতে স্থিতাঃ।
সংস্কৃতে প্রাকৃতে চাপি স্বয়ং প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবা॥ পাণিনীয় শিক্ষা।

গ্রন্থের আদর এবং কদর বেশী থাকতে পারে, কিন্তু, অপর গ্রন্থের বিষয়েও উদাসীনতা থাকার উপায় নেই। কেননা, কাব্যের স্বরূপবোধক লক্ষণের ভিত্তিতে, কেহ বা 'ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্নপদাবলী'-বাদী, কেহ বা যথোপযুক্তশব্দার্থবাদী, কেহ বা রসবাদী, কেহ রীতিবাদী, ধ্বনিবাদী, বক্রোক্তিবাদী প্রভৃতিরূপে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হওয়ায় স্ব স্ব পক্ষাশ্রিত গ্রন্থের পক্ষপাতী হয়েও সভা-সমিতিতে প্রত্যক্ষ বিচার-আচার, বাদানুবাদের প্রচলন থাকায়, বিপক্ষাশ্রিত গ্রন্থগুলোরও উপেক্ষা করার সুযোগ থাকতে পারে না। তবে, দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, আনন্দবর্দ্ধনে ধ্বন্যালোক, মম্মটের কাব্যপ্রকাশ যতটা সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা' অন্যগ্রন্থগুলো পারে নি। আবার, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের প্রচারের পরে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে কাব্যাদর্শ-কাব্যপ্রকাশের আলাপ-আলোচনাও কমে যায়। মম্মটের কাব্যপ্রকাশ এবং বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের তুলনায়, দণ্ডীর কাব্যাদর্শ কিছুটা সংক্ষিপ্ত হলেও কোন কোন বিষয়ে দণ্ডীর বিস্তার-বিশেষত্ব, কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণের যৌথ সম্ভারের কাছেও নগন্য নয়।

সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক একান্ত পরিশীলিত জ্ঞান সুপ্রাচীন গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় কিন্তু তা অর্জনে উপায় কি? কালানুক্রমিক অনুশীলনের ধারায় অগ্নিপুরাণ থেকেই প্রথমটায় অধ্যয়ন-অধ্যাপনা পরিচালিত হয়ে থাকবে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দণ্ডীর কাব্যাদর্শের উদ্ভবে তারই জনপ্রিয়তা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা, যেহেতু সাহিত্যতত্ত্ব বা অলঙ্কারাদির অধ্যেতৃবর্গ, অগ্নিপুরাণের চেয়ে একক সাহিত্যতত্ত্বের গ্রন্থ—কাব্যাদর্শকেই বেশী পছন্দ করে থাকবে। খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভামহের কাব্যালঙ্কার গ্রন্থের সৃষ্টিতে কেহ কেহ আকৃষ্ট হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বাতিল করা চলে না। অষ্টম শতক খৃষ্টীয়াব্দে আচার্য বামনও, কাব্যালঙ্কারসূত্র সবৃত্তি প্রণয়ন করে নতুন উপহার হাজির করেছিলেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ভট্ট উদ্ভট ভামহবিবরণ গ্রন্থ লিখে ভামহের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিলেন। আনন্দবর্দ্ধনও খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক। তবে, ধ্বনিকে কাব্যাত্মারূপে ঘোষণাদ্বারা এক নতুন মত ও পথ উপস্থাপনে সমাজে বিতর্কিত ব্যক্তিত্বরূপে জনপ্রিয়তা মনে হয়, বেশী পেয়েছিল। রুদ্রটের উদ্ভবও খৃষ্টীয় নবম শতকে। কিন্তু তার গ্রন্থ জৈন সম্প্রদায়ের কাছে বেশী উপাদেয় হয়েছিল মাত্র। কবিরাজ রাজশেখরও সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর কাব্যমীমাংসা গ্রন্থদ্বারা। তার সত্যিকার আবির্ভাব-কাল নিয়ে মতভেদ আছে। আচার্য শঙ্কর 'কাব্যমীমাংসাকার' বলে উল্লেখ করেছেন[১] এবং অভিনন্দ বা গৌড়াভিনন্দের

১. 'কাব্যমীমাংসাকার' Quoted by Cankara, oxf 135.
Catalogus catalogorum, by Theodor Aufrecht

একটি শ্লোকেও (সদুক্তিকর্ণামৃতে পরিগৃহীত) রাজশেখরকে সমসাময়িক বলা হয়েছে[১] পক্ষান্তরে, কান্যকুব্জরাজ মহেন্দ্র পালের ৯০৩ এবং ৯০৭ খৃষ্টীয় দু'খানা শিলালিপিতেই পিতা দুর্দুক এবং মাতা শীলবতীর তনয় শিক্ষাগুরু রাজশেখরের মাত্র ৪ খানা নাট্যসাহিত্যের উল্লেখ দেখা যায়। আবার, আনন্দ বর্দ্ধনের ধ্বন্যালোকে অভিনন্দের কাদম্বরীকথাসার গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেখা যায়। সুতরাং, কাব্যমীমাংসা-কার রাজশেখর ধ্বন্যালোকের সময়ের পরে আসতে পারে না। ফলে উল্লিখিত শিলালেখে বিধৃত রাজশেখর এবং কাব্যমীমাংসাকার রাজশেখর দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি। কবিরাজ রাজশেখর হয় আনন্দ বর্দ্ধনের পূর্বের, নয়তো সমসাময়িক। তাঁর কাব্য-মীমাংসা বহু সমাদৃত গ্রন্থ। ভট্ট মুকুল ধ্বনিবাদের বিরোধিতা করে অভিধাবৃত্তি-মাতৃকা লিখে থাকলেও খুব জনপ্রিয় হতে পারেন নি। ইনি, আনন্দ বর্দ্ধনের কিঞ্চিৎ পরবর্তী। পূর্বোল্লিখিত ইন্দ্ররাজ থেকে অভিনবগুপ্ত পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ৩০/৪০ বছরের বেশী হবে না। এরই মধ্যে মোট সাতজন গ্রন্থকারকে পাওয়া যায়। সুতরাং ধারণা করা যায় যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতেই সাহিত্যতত্ত্বালোচনা অনেক প্রবলভাবে চলেছিল। খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর মম্মটের পূর্বেকার মহিমভট্টের পর ক্ষেমেন্দ্র নতুন করে আকর্ষণীয় অবদান যুগিয়েছেন। তাঁর পরে ভোজরাজের সরস্বতী কণ্ঠাভরণও সর্বত্র আলোচিত গ্রন্থ। মম্মটের কাব্য প্রকাশ অত্যন্ত উচুদরের গ্রন্থ। তার সৃষ্টিতে একমাত্র দণ্ডীর কাব্যাদর্শই স্বীয় প্রতিষ্ঠায় টিকে থাকতে পেরেছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের রুদ্রভট্ট বা দ্বাদশ শতকের রুয্যক ও প্রথম বাগভট তেমন কোন জনপ্রিয়তা না পেলেও হেমচন্দ্র শতাব্দীর বিশেষত্ব কেবল বজায় রাখেন নি, বরং উন্নীত করেছেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হেমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় সাহিত্যতত্ত্বের গ্রন্থ— কাব্যানুশাসনও সুধীসমাদৃত সন্দেহ নেই। হেমচন্দ্রও বোধহয় বাঙালী ছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় বাগভট, পীযূষবর্ষ, বিদ্যাধর এবং বিদ্যানাথ, কোন উন্নত অবদান দিতে পারেন নি। চতুর্দশ শতকের সিংহ ভূপাল এবং ভানুদত্তও তদ্রূপ। এর পরবর্তী বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণ দ্বারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন বটে। মম্মটের কাব্যপ্রকাশের তুলনায়ও সাহিত্যদর্পণের পরিপাটী উন্নত মানতেই হবে। তবে, দণ্ডীর কাব্যাদর্শ যেমন অগ্নিপুরাণের কাছে ঋণী, তেমন বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণও তৎপূর্ববর্তী অধিকাংশ গ্রন্থের, বিশেষ করে, কাব্যাদর্শ এবং কাব্য-প্রকাশের কাছে ঋণী। কাব্যপ্রকাশের অসংখ্য তথ্য এবং প্রতিপাদনের পদ্ধতি সাহিত্যদর্পণে হুবহু গৃহীত হয়েছে।

১. অভিনন্দ খৃষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীর।

সুপ্রাচীনকালে সংস্কৃত ছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং আঞ্চলিক ভাষা যে ছিল সেই প্রসঙ্গে উপস্থিত সাহিত্যতত্ত্ব গ্রন্থের ধারাটি উপরের আলোচনায় স্থান পেয়েছে, কিন্তু পাণিনির পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থের ক্রমধারায় সর্ববর্মাচার্যের কলাপ ব্যাকরণেরই সংস্থাপন করতে হয়। কলাপ ব্যাকরণের প্রচলন বাংলাদেশে খুবই বেশী ছিল। হয়তো, বা অন্যান্য ব্যাকরণের প্রচলনের পরেও কলাপ ব্যাকরণের প্রবাহ এদেশে কমে নি। পাণিনি ব্যাকরণে লৌকিক-বৈদিক উভয় অংশই আছে। কলাপ ব্যাকরণে তা নেই। কিন্তু অতি সোজা সরল পন্থায় বর্ণমালা থেকে শুরু করে সন্ধি-শব্দ-কারক-সমাস-তদ্ধিত-আখ্যাত এবং কৃৎ এমনভাবে সাজান হয়েছে যে প্রায় প্রাথমিক বিদ্যার্থিদের কাল থেকেই কলাপ ব্যাকরণ শিক্ষা দেয়া যায়। সম্ভবত, কালানুসারেও পাণিনির চেয়ে খুব বেশীকাল পরবর্তী ছিলেন না সর্ববর্মাচার্য। গ্রন্থকার সর্ববর্মাচার্য কোথাকার লোক ছিলেন, এবং কোন্‌ কালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা' যদিও এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি, তবে তিনি যে খুব প্রাচীন কালের সে অনুমানের কারণ আছে। আমাদের দেশের পঠন-পাঠনের ধারায় বিষয়বস্তু প্রতিপাদনে গ্রন্থের সারবত্তা-বিষয়ে যত গভীর অনুশীলন হয়ে আসছে, ঐতিহাসিক পটভূমিকার প্রতি তত নজর দেয়া হয় নি। কিন্তু বৈদেশিক সংস্কৃত বেত্তাদের মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের গবেষণা অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে হয়েছে। ওয়েষ্টার গার্ড, ম্যাক্‌ডোনাল, কীথ, স্মিথ, উইণ্টার্নিজ, থিয়োডোর অফ্রেস্‌ প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিত জনের মতামত আলোচনা করে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছেন "সে যাই হোক, মহাভাষ্যে 'কালাপ' শব্দের পর্যালোচনায় পতঞ্জলি খাদ্যায়নকেই কলাপের গ্রন্থকাররূপে নির্দেশ করেছেন।"[১]

"কাতন্ত্র ব্যাকরণ (কলাপ ব্যাকরণের নামান্তর) থেকে প্রাচীন গ্রন্থকারদের উদ্ধৃতি যেমন বররুচির চিত্রকূটী টীকা এবং কাতন্ত্র ধাতু পাঠ (প্রায়ই ওয়েষ্টার গার্ড কর্তৃক আলোচিত) অন্যান্য আধুনিক ব্যাকরণের চেয়ে পূর্বকালীনতার পর্যাপ্ত প্রমাণ।"[২]

১. Patanjali, however, in his interpretation of the word Kalapa in the Mahabhashya, would have it to mean the sage Khadyayana (Kalapina Khadayana grahanam jnapakam) as the author of Kalapakam.

২. Quotations from the Katantra by earlier authors such as the Chitrakuti tika of Vararuchi and the Katantra dhatunatha (often consulted by Westergaard) are sufficient to prove its priority to all modern grammers.

"দুর্গসিংহের নামসহকৃত পরিচিত বৃত্তি দুর্গসিংহেরই প্রণীত যাঁকে দুর্গগুপ্ত নামে 'কামধেনু' গ্রন্থে বোপদেব উল্লেখ করেছেন। তিনি একজন বৈদ্য ছিলেন।[১]

বোপদেব একজন খ্যাতনামা বৈয়াকরণ। তিনি পরবর্তীকালের ব্যক্তি হলেও তার স্বীকৃতি দ্বারা অনেকের সংশয় দূর হয় কিন্তু তিনি দুর্গগুপ্ত বলেছেন এটা দুর্বোধ্য। দুর্গসিংহ যাঁকে বোপদেব দুর্গগুপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন, তিনিও বোপদেবের কাছেও পুরাতন প্রামাণিক বৈয়াকরণ। এই দুর্গসিংহই কলাপ ব্যাকরণের বৃত্তি এবং টীকা, অর্থাৎ সূত্রের সংক্ষিপ্ততর ব্যাখ্যা এবং সেই ব্যাখ্যার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। মহামুনি পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তাঁর মহাভাষ্যে 'কালাপ' শব্দের পর্যালোচনায় 'খাদ্যায়নকে কলাপকার বা কাতন্ত্র ব্যাকরণের প্রণেতা হিসাবে নির্দেশ করেছেন—মনে করা হয়। কলাপের সূত্রকার সর্ববর্মাচার্য। সুতরাং পতঞ্জলির খাদ্যায়নের কর্তৃত্বাধীন কলাপ ভিন্ন ব্যাকরণরূপে প্রতীত হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে সম্পূর্ণ কলাপসূত্র তো সর্ববর্মাচার্যের রচনা নয় বটেই। কাত্যায়ন রচনা করেছেন কলাপের কৃৎসূত্র। কৃৎসূত্রেরও বৃত্তি করেছেন ঐ দুর্গসিংহই। বৃত্তির প্রারম্ভেই দুর্গ বলেছেন—' বৃক্ষপ্রভৃতি শব্দের ন্যায় কৃদন্ত শব্দগুলো রূঢ় শব্দ, এজন্যই কৃতী আচার্য (সর্ববর্মা) কৃৎশব্দের নিরূপণ করেন নি। অব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদের ব্যুৎপত্তির উদ্দেশ্যে তা' কাত্যায়ন কর্তৃক করা হয়েছে।[২] কাত্যায়ন অষ্টাধ্যায়ীরও বৃত্তিসূত্র করেছেন, কলাপেরও কৃৎসূত্র করেছেন। সংস্কারমুক্তচিত্তে গ্রন্থের পরিপূর্ণায়নই তার মহৎ কাজ, সুতরাং কৎসূত্র দ্বারা কাত্যায়ন কর্তৃক পরিপূরণ কলাপ ব্যাকরণকেও কাত্যায়নের পূর্বকালীন বলে প্রতিপন্ন করে।

কাত্যায়নের-ই অপর নাম খাদ্যায়ন কিনা-তাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, অথবা সুচির ব্যবহারে বর্ণ ব্যত্যাস, কোন স্থানবিশেষিত রীতিসিদ্ধ কি না তা'ও বলা যায় না। খাদ্যায়ন পদের লক্ষ্য কাত্যায়ন-ই মনে হয়। নামটা খাদ্যায়ন ছিলও বলা যায় না কারণ উল্লিখিত দুর্গের উক্তি। দীর্ঘকালের ব্যবধানে অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থি ঘটে যায় নানা

---

১. The scholium Known under the name of Durga Sinha vritti is the work of Durga Sinha, a vaidya, who is quoted in the Kamadhenu of vopadeva by the name of Durgagupta

Descriptive catalogue of Sans. Mass. part I, grammer, in the Library of Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

২. "বৃক্ষাদিবদমী রূঢ়াঃ কৃতিনা ন কৃতাঃ কৃতঃ।
কাত্যায়নেন তে সৃষ্টা বিবুদ্ধি প্রতিবুদ্ধয়ে ॥ কলাপ, কদ্‌বৃত্তি, (কৃতের প্রথম)।

কারণে। তার অপসারণও এক জটিল ব্যাপার। এ রকম এক গ্রন্থি সৃষ্ট হয়েছে বররুচি আর কাত্যায়নকে নিয়ে। পরবর্তী আলোচনায় সে গ্রন্থির অপসারণের চেষ্টা করা হয়েছে। বররুচি, কাত্যায়নের চেয়েও আগেকার লোক। তাঁর অনেক গ্রন্থ। সব গ্রন্থই গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র ভারতে সে সব গ্রন্থ যথেষ্ট আকর্ষণীয়রূপে আলোচিত হয়ে আসছে। সেই খৃষ্টপূর্ব কাল থেকে শুরু করে খৃষ্টীয় বিংশ-শতাব্দীতেও বররুচির অন্তত ১৮/২০ খানা গ্রন্থ, উন্নত স্তরের অধ্যয়নেচ্ছুদের কাছে আলোচ্য বটে। যথা—

'একাক্ষর কোষ'---আকারে ক্ষুদ্র হলেও, প্রামাণিক অভিধান। কারকচক্র, 'কারিকা', 'দশগণকারিকা', 'প্রয়োগবিবেক', 'শব্দলক্ষণ' এবং 'সমাসপটল'— বিখ্যাত বৈয়াকরণ গ্রন্থ। পরবর্তীকালে জগদীশ তর্কালঙ্কার-প্রমুখ বহু পণ্ডিত জন যে শাব্দবোধ-বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তার মূল নিহিত আছে বররুচির 'কাবকচক্র' এবং 'প্রয়োগবিবেকের' মধ্যে। 'ফুল্লসূত্র' এবং 'পুষ্পসূত্র' নামক গ্রন্থদ্বয়ও মূল্যবান্ শাব্দিক গ্রন্থ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও বররুচির জ্ঞানের স্বরস প্রকাশিত হয়েছে - 'যোগশত' গ্রন্থে। কাব্যের ধারায়—'রাক্ষস কাব্য', 'বররুচি বাক্য-কাব্য' উল্লেখযোগ্য। তত্ত্ববিষয়ে পর্যালোচনাত্মক গ্রন্থ হচ্ছে—'বাদতরঙ্গিণী'। শব্দের পুং-স্ত্রী ক্লীবত্বাদি সংস্কার জ্ঞাপক গ্রন্থ-- লিঙ্গবিশেষবিধি'। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর একখানা বৃত্তি গ্রন্থও (বররুচিবৃত্তি) পাওয়া যায়। বররুচির 'বার্তিক সূত্র' নামে ২খানা মাত্র পাণ্ডুলিপি গ্রন্থ---গুস্তব অপার্টের তালিকায় উল্লিখিত হয়েছে --সে সম্বন্ধে আলোচনা পরে প্রাপ্তব্য।

কত প্রাচীন গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের নাম পর্যন্তও যে কালের অতলে তলিয়ে গিয়েছে তা' ভাবলে কেবল জগত এবং জাগতিক বিষয়-বস্তুর নশ্বরতা-ই মানসিকতা নষ্ট করে ফেলে। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে (কামসূত্র) উল্লিখিত এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও বৈয়াকরণিকরূপে প্রসংশিত 'গোনর্দ্দ' ছিলেন এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থকার। মল্লিনাথের (কোলাচল) টীকায় গোনর্দের কামশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। উল্লিখিত কামশাস্ত্রে দেখা যায়-গোনর্দের 'ভার্যাধিকারিকাধিকরণ' গ্রন্থের উল্লেখ। উভয় গ্রন্থই যে একদা সমাদৃত ছিল— তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। 'নীতিসার' প্রণেতা কামন্দক পতঞ্জলিকে 'গোণর্দ্দীয়' বলে নির্দেশ করেছেন। গৌণর্দ তাই পতঞ্জলির পূর্ব পিতৃপুরুষ।

কাত্যায়ন এবং বররুচি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন সত্য কিন্তু তা' যুক্তিসহ নহে। শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ কখনও রীতিসিদ্ধ ক্রমধারার

আলোচনা ব্যতিরেকে পরিস্ফুট হয় না,— একারণেই অনেক তথ্য, হয়তো, অস্পষ্টতার আবর্তে ঢুকে পড়ে। অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির সৃষ্টি, কালে কালে হয়তো, অঙ্গ স্খলনাদি ঘটে যাওয়ায়, তা' পরিপূরণের জন্য কাত্যায়নের বার্তিক সূত্রের রচনা। তারও বহুকাল পরে, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি, উল্লিখিত বার্তিক সূত্র সহ অষ্টাধ্যায়ীর মহাভাষ্য করেছেন। অষ্টাধ্যায়ীর প্রসঙ্গে বার্তিককার রূপে কাত্যায়নকেই উল্লেখ করা হয়েছে। কাত্যায়নের 'ভ্রাজশ্লোক' গ্রন্থ থেকেও মহাভাষ্যে উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। বার্তিককার কে ছিলেন—সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশনে মহাভাষ্যের চেয়ে, কোন উপযুক্ততর গ্রন্থ যুক্তিতে কেহ দাঁড় করাতে পারেন না। কাত্যয়নের গ্রন্থপরিপূর্ণায়নের অভ্যাস কলাপ সূত্রের বেলায়ও দেখা গিয়েছে। সর্ববর্মাচার্য কলাপসূত্র করে থাকলেও কৃৎঅংশ না থাকা ছিল তার অপূর্ণতা। কাত্যায়ন সেখানেও কৃৎসূত্র রচনা করে কলাপ বা কাতন্ত্র ব্যাকরণকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং কালে কালে অবক্ষয়িত পাণিনিকেও পূর্ণ করেছেন বার্ত্তিক সূত্র দিয়ে। কাত্যায়নের আরও অনেক গ্রন্থ আছে যা বৈদিক সাহিত্যের ক্রমধারায় প্রামাণ্য স্মৃতিরূপে গণ্য হয়, যেমন --শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যকারিকা--- প্রভৃতি। চিরকাল যে লোকে অষ্টাধ্যায়ীকে (মহাভাষ্য প্রণীত হওয়ার পর থেকে) 'ত্রিমুনি' ব্যাকরণ বলে থাকে, মুনিত্রয়কে (পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলি) স্মরণ করে পাণিনি-ব্যাকরণ আলোচনা করে, তার মধ্যে বররুচিকে কেউ কোন কালে স্থান দেন নি। সুতরাং নিষ্কর্ষ করা চলে---কাত্যায়ন এবং বররুচি ভিন্ন ব্যক্তিদ্বয়। এঁদের মধ্যে কাত্যায়নের তুলনায় বররুচি আগেকার লোক। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের টীকা 'ত্রিভাষ্যরত্নে' বররুচির উল্লেখ থাকা দ্বারা, তাঁর প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়, এবং কাত্যায়নের চেয়ে পূর্বকালের সন্দেহ নেই। গুস্তব অপার্ট সাহেবের তালিকায় যে একখানি মাত্র গ্রন্থ (oppert. 4201) বররুচির পুষ্পিকা সমেত 'অষ্টাধ্যায়িবৃত্তি'রূপে পাওয়া গিয়েছে, তার সাক্ষ্যে পূর্বাপর প্রসিদ্ধ অতগুলো প্রমাণ নষ্ট হতে পারে না। উক্ত পুষ্পিকার অন্তর্ভাবেরও বহু কারণ থাকতে পারে। তা' ছাড়া কাত্যায়ন যে প্রাকৃতমঞ্জরী লিখেছেন, তা' বররুচির, প্রাকৃতপ্রকাশের, টীকা গ্রন্থই বটে। কাত্যায়নের প্রাকৃত মঞ্জরীই উভয়ের নির্ভরযোগ্য ভেদক।

নাম ভেদের মাধ্যমে ব্যক্তিভেদের কিংবা ব্যক্তিনিশ্চয়ের বিভ্রান্তির প্রসঙ্গ থাকলে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সে সম্বন্ধে কত সতর্ক ছিলেন এবং কি সুন্দর সমাধান করেছেন তার একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। ন্যায় দর্শনের প্রণেতা গোতম, তাঁর অপর নাম— অক্ষপাদ বা অক্ষচরণ ইহা বহুস্থলে পাওয়া যায়। ন্যায় দর্শনের ভাষ্যকারের নাম বাৎস্যায়ন। কিন্তু মল্লিনাথের (কোলাচল মল্লিনাথ) টীকার ন্যায় একটি প্রামাণ্য

টীকায়[১] দেখা যায়---"অক্ষচরণ-পক্ষিলৌ সূত্রভাষ্য কারৌ।" অর্থ—অক্ষচরণ এবং পক্ষিল, যথাক্রমে সূত্রকার এবং ভাষ্যকার। এখন ভাষ্যকাররূপে বাৎস্যায়ন এবং পক্ষিল---এই দু'টি নাম এসে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে দেখে, বিখ্যাত জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্র সূরি তাঁর অভিধান চিন্তামণি গ্রন্থে 'বাৎস্যায়ন' শব্দের অপর পর্যায়গুলো তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে,----বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, কৌটিল্য, চণকাত্মজ (চাণক্য), দ্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত এবং অঙ্গুল—এই আটটি নাম চাণক্যের।[২] আর এই চাণক্যই যে, নন্দরাজের অধিকারভুক্ত যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র, সমগ্র ভূভাগ এবং শাস্ত্র (ন্যায় শাস্ত্র) উদ্ধার করেছিলেন সে কথা তাঁর (চাণক্যের) বিখ্যাত 'অর্থ-শাস্ত্রের' শেষ অংশে তিনিই বলে গিয়েছেন "শস্ত্র, শাস্ত্র, এবং নন্দরাজের কবলিত রাজ্য, অসহনশীলতায় যে ব্যক্তি উদ্ধার করেছে, তাহাকর্তৃক-ই এই শাস্ত্র (অর্থশাস্ত্র) প্রণীত হল।"[৩] বররুচি এবং কাত্যায়ন অভিন্ন হলে অভেদ-জ্ঞাপক কথাও পাওয়া যেত। ব্যক্তিদ্বয় ভিন্ন বলে যা নামদ্বয়ের সাহায্যে পাই তাতে বিভ্রান্তির কিছু নেই।

কাত্যায়নের বহু গ্রন্থ। শ্রৌতসূত্র, কাত্যায়ন গৃহ্যকারিকা, গৃহ্যপরিশিষ্ট, ত্রিকণ্ডিকাসূত্র, অষ্টাধ্যায়ী-বার্তিকসূত্র, কলাপ কৃৎসূত্র, শ্রাদ্ধকল্পসূত্র, পশুবন্ধসূত্র, প্রতিহারসূত্র, ভাষিকসূত্র, ভ্রাজশ্লোকাঃ, শিক্ষাসূত্র, শুল্কসূত্র, স্নানবিধিসূত্র— প্রভৃতি। ইহার প্রচলন ছিল সার্বত্রিক। বাংলাদেশে ইহার প্রচলন ছিল ঠিকই, তবে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ধারণা কেবল বার্তিকসূত্র এবং কৃৎসূত্র সম্বন্ধেই সুদীর্ঘকালের প্রচলনের মাধ্যমে জানা যায়। কাত্যায়নের 'প্রাকৃত মঞ্জরী,' বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ'-এর টীকাগ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয়ই প্রাকৃতভাষার গ্রন্থরূপে প্রাপ্ত সর্বাদিম গ্রন্থ এবং টীকা। বররুচি কাত্যায়নের কত আগেকার, তা' বলা যায় না। প্রাকৃত ভাষা, সুপ্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতের পাশা-পাশি চলতে থাকলেও, দেশভেদে তার ভেদজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য সহ সর্বসাধারণের মধ্যে কথ্যভাষারূপেই তার প্রচলন ছিল, বোধহয়, ব্যাপক। গ্রন্থীয় ভাষারূপে তার কৌলিন্য থাকলেও ছিল নিম্নমানের। তাই হয়তো, তা' দ্বারা গ্রন্থসৃষ্টি কমই হয়েছে। তবে, প্রাকৃত ভাষায়ও ছন্দোবদ্ধ লেখার প্রচলন ছিল --তা' প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থের মাধ্যমেই প্রতিপন্ন হয়। প্রাকৃত ভাষার শব্দগুলোও তৎসম, তদ্ভব এবং দেশী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল সে কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে, সাহিত্যতত্ত্ব

১. বরদরাজের তার্কিকরক্ষার মল্লিনাথকৃত টীকা—নিষ্কণ্টিকা।

২. বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্য শ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ।। হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি।

৩. যেন শাস্ত্রঞ্চ শস্ত্রঞ্চ নন্দরাজগতাচভূঃ।
অমর্ষেণোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদংকৃতম্।। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র।।

বিষয়ক পূর্বোক্ত অগ্নিপুরাণের প্রমাণে প্রাকৃত ভাষায় সাহিত্য থাকারও আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য, বেদাঙ্গ সাহিত্য এবং উপবেদীয় সাহিত্যগুলোর মত সযত্ন লালন যে প্রাকৃত ভাষা পায় নি তা' অনুমান করা চলে।

কাত্যায়নের পরেই স্থান পেতে পারে বাৎস্যায়ন বা চাণক্য। বাৎস্যায়নের বিভিন্ন নাম, পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এক বাৎস্যায়ন কামসূত্রকাররূপে প্রসিদ্ধি-প্রাপ্ত। বাৎস্যায়ন, কামসূত্রেই চারায়ণের উল্লেখ করেছেন গুরুরূপে, আর তাঁরও গুরুর নাম বলেছেন অগ্নিবেশ। এই অগ্নিবেশ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কোশলরাজ প্রসেনজিতের সভাসদ ছিলেন। অতিদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হলেও বোধ হয়, সম্ভবরূপে গৃহীত হতে পারে না যে অগ্নিবেশের শিষ্য-চারায়ণের শিষ্য বাৎস্যায়ন আর নন্দরাজত্বের উচ্ছেদপূর্বক মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠাতা বাৎস্যায়ন একই ব্যক্তি। একই বাৎস্যায়ন নামে, নাতিদীর্ঘ ব্যবধানে দু'জন গ্রন্থকারকে মেনে নিতে হয়। এক বাৎস্যগোত্রে এরকম দু'ব্যক্তি থাকা অসম্ভব ব্যাপার নয়। বাৎস্যায়ন নাম গোত্রমূলক। চাণক্য-বাৎস্যায়নের গ্রন্থ— ন্যায়ভাষ্য, অর্থশাস্ত্র (এবং অভিন্ন ব্যক্তি হলে বাৎস্যায়ন-কামসূত্রও) এবং পুরুষমুদ্রিকলক্ষণ। প্রচলিত হওয়ার পর থেকেই যে এসব গ্রন্থ বাংলাদেশে প্রসারিত হয়েছিল — তাতে সন্দেহ নেই। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলেই বাংলাদেশের কিয়দংশ যে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়েছিল— তা অনেকেই মানেন। চিরকাল-ই বাঙালীরা প্রখর যুক্তিবাদী। এখনও ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়ন-ভাষ্য এদেশে বহুল প্রচারিত। তা'ছাড়া চাণক্যের অর্থশাস্ত্র তো বিশ্বের আরও অনেক জায়গায় রাজনীতিবিশারদেরও আলোচ্য গ্রন্থ।

এর পরে মহামুনি পতঞ্জলিকেই নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। তিনি কাত্যায়নের বার্তিকসহ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর এক বৃহৎ ভাষ্য মহাভাষ্য/ফণিভাষ্য রচনা করেছেন। শাস্ত্রচর্চার ক্রমধারায় পঠন-পাঠনে বহু ঐতিহ্য বিমূর্ত হয়ে ওঠে। অষ্টাধ্যায়ীর প্রণেতা পাণিনি হলেও বিসংবাদিত স্থলে কাত্যায়নের গুরুত্ব বেশী, এবং পতঞ্জলির গুরুত্ব তাঁদের উভয়ের চেয়েও বেশী—চির স্বীকৃত ("পাণিনিকাত্যায়নভাষ্যকারাণাম্ উত্তরোত্তরং প্রামাণ্যম্")। মহাভাষ্যের অপর নাম--ফণিভাষ্য। এই মহাভাষ্য বা ফণিভাষ্য এবং 'সাঙ্খ্যপ্রবচনসূত্র'ই পতঞ্জলির প্রধান গ্রন্থ। প্রাচীন বৈদিক ছন্দের 'ছন্দোবিচিতি' নামক গ্রন্থও পতঞ্জলির রচনা বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। পতঞ্জলির গ্রন্থও তৎকালীন ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, সুতরাং বাংলাদেশেও যে অনতিকালের মধ্যে তা' এসে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এখন পর্যন্তও, ফণিভাষ্য বা মহাভাষ্য মহাবিদ্যালয়গুলোতে পড়ান হয়।

এই পতঞ্জলির মহাভাষ্যেই, পাণিনির "অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে" সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনখানা আখ্যায়িকা-কাব্যের উল্লেখ আছে– বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা এবং ভৈমরথী। পতঞ্জলির পূর্ববর্তী বার্তিককার-কাত্যায়ন, এক্ষেত্রে 'গ্রন্থ' কথার প্রসঙ্গে কেবল—'আখ্যায়িকা'—লিখেছেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়—পতঞ্জলির এবং কাত্যায়নেরও পূর্বে আখ্যায়িকা-প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। বাসবদত্তা সম্ভবত খুব উচুদরের আখ্যায়িকাই ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতকের কবি বাণভট্ট তাঁর আখ্যায়িকা—হর্ষচরিতে বাসবদত্তার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন—"পাণ্ডবদের শক্তি কর্ণগোচর হওয়ার পরে কুরুপক্ষীয়গণের ন্যায়, বাসবদত্তার গৌরব কর্ণ-গোচর হওয়ায় অন্য কবিদের দর্প চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।[১]

লক্ষ্য করা দরকার যে, পতঞ্জলি উল্লিখিত বাসবদত্তার গ্রন্থকারের উল্লেখ করেন নি। বাণভট্টও না। সুতরাং পতঞ্জলি এবং বাণভট্টের উক্তি-লক্ষ্য এক কিনা—নিশ্চয় করা যায় না। তাছাড়া পাণিনির আগেও আখ্যায়িকা ছিল। বৌদ্ধ বসুবন্ধুর এক বাসবদত্তা নামে গ্রন্থ আছে? সেগ্রন্থ আলাদা। পতঞ্জলির উল্লেখের মাধ্যমেই ভিন্নতা প্রমাণিত হয়। বৌদ্ধ বসুবন্ধু অনেক পরবর্তী লোক। তাঁর বাসবদত্তা-গ্রন্থও কথাসাহিত্য—প্রণয়োপাখ্যান। পতঞ্জলি কর্তৃক উল্লিখিত বাসবদত্তার কবি যদি সুবন্ধু হয়, তবে, সুবন্ধুকেও পতঞ্জলির সময়ের অনেক আগেকার বলে মানতে হবে, নয়তো বাসবদত্তা নামক আখ্যায়িকার প্রণেতা অপর সুবন্ধুকে মানতে হবে। দিঙ্নাগের সময়েও কি কেহ সুবন্ধু সত্যিই ছিলেন?

আরো একটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য যে,—ও তিনখানাই আখ্যায়িকা। আখ্যায়িকা গ্রন্থে অন্য কবি বা কবিদের উক্তি—শ্লোক-বৃত্ত, মাঝে মাঝে সন্নিবেশিত করতে হয়।[২] সে নিয়ম, এই বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা এবং ভৈমরথী গ্রন্থেও অনুসৃত হয়ে থাকবে। অন্য কবি এবং কাব্য না থাকলে—তা আখ্যায়িকা হয় কি করে? সুতরাং কাত্যায়ন কেন, পাণিনির কালে বা তৎপূর্বকালে তেমন সাহিত্য প্রচলিত ছিল - মানতেই হয়। অন্যথা, পাণিনির সূত্রের (পূর্বোল্লিখিত) আশয় ব্যক্ত করতে কাত্যায়নও 'আখ্যায়িকা' উল্লেখ করতেন না, বা পতঞ্জলিও সে আখ্যায়িকার নাম ধরা দৃষ্টান্ত দিতেন না। এই আখ্যায়িকা-ত্রয়ের বর্তমানে আর সন্ধান পাওয়া যায় না। এই শতাব্দীর G. Buhler সাহেবের তালিকায় মাত্র B. 2. and 106 ক্রমিক নম্বরে দু'খানা বাসবদত্তার

১. কবীনাম গলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।
শক্ত্যেব পাণ্ডুপুত্রানাং গতয়া কর্ণগোচরম। হর্ষচরিত-বাণভট্ট প্রণীত।

২ 'তস্যামন্যকবীনাঞ্চ বৃত্তং পদ্যং কৃচিৎ কৃদিৎ'--সাহিত্য দর্পণ।

সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সে তো এতকাল বাদের কথা। তৎকালে নিশ্চয়ই তা' যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে ছাপাখানা প্রবর্তিত হয়েছে মাত্র দু'শ বছর। তার আগে ছিল হাতে লিখে গ্রন্থ বিস্তারের ব্যবস্থা। অধ্যাপনা ছিল ব্রাহ্মণদের অন্যতম বৃত্তি বা জীবিকা। উপনয়নদাতা গুরু পণ্ডিত অবশ্যই টোল বা চতুষ্পাঠী পরিচালনা করতেন শিষ্য-ছাত্রদের পড়াবার প্রয়োজনে। গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে তাঁদের। কখনও অধ্যাপক স্বয়ং কখনও বা ছাত্র-শিষ্য, কোথাও বা আবার উপযুক্ত ভৃতিভুক্ পেশাদার লেখক গ্রন্থ নকল করতেন। দেশের সর্বত্র ছড়ানো পাঠাগারে, টোলে, চতুষ্পাঠীতে অথবা ব্যক্তিগত বাড়িঘরে ও রকম লিপির ছিল প্রবাহ। ফলে, উপযুক্ত গ্রন্থগুলো অতিক্রত স্থান হতে স্থানান্তরে প্রসার লাভ করত। গ্রন্থ নকল করাও ছিল একপ্রকার লোকের পেশা। তাঁরা নিজের ঘরে বসেই নিয়মিত বা ফাঁকে ফাঁকে লিখে দু'পয়সা রোজগার করত। ভোজপাতায়, তালপাতায়, অগ্রত্বকে, তুলটকাগজে, বা এরকম অন্য কোন পত্রে-ফলকে লেখা হত শহরে, বন্দরে, গ্রামে, গঞ্জে সর্বত্র। রাজা-মহারাজা, প্রভাবশালী-পয়সাওয়ালা লোকদের অধিকাংশেরই ঝোঁক ছিল নিজের নিজের মত করে গ্রন্থাগার রক্ষা করা। তাই বর্তমানের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না গ্রন্থ প্রচার প্রসারের ধারা। ব্রাহ্মণেতর জাতি-শ্রেণীর মধ্যেও অধ্যাপনার প্রচলন ছিল। তবে, ব্রাহ্মণদের মত অত ব্যাপক নয়।

সনাতন ধর্মে আর্যশাস্ত্রে সামাজিক চাতুর্বর্ণ্য এবং প্রত্যেক জাতি-শ্রেণীর প্রত্যেকের জীবনে অনুক্রমে, ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বাণপ্রস্থ-যত্যাশ্রমের ব্যবস্থাপনা-মূলক ধর্মীয় সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রতিপাদক সুপ্রাচীন ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে যাবতীয় বৈদিক সাহিত্য—স্মৃতি-সংহিতা, বেদাঙ্গ-প্রভৃতির সাথে কিছু কিছু সাহিত্যগ্রন্থও পতঞ্জলির কাল পর্যন্ত পাওয়া গেল—যার সম্বন্ধে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত এবং সেগুলোর যুক্তিগ্রাহ্য কালিক বিন্যাস এ পর্যন্ত করা হয়েছে। দর্শন-তত্ত্বের অনুবর্তিতায় প্রকৃতি-পুরুষবাদী, সেশ্বরপ্রকৃতিবাদী, ষট্‌পদার্থবাদী, সপ্তপদার্থ-বাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, কর্মমীমাংসাবাদী প্রভৃতি এবং উপাস্যদেবতা-অনুসারে, শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব, নারায়ণীয়, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ভেদে চলমান বহুমুখী আর্য সংস্কৃতির মধ্যে খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দী-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অভ্যুত্থিত যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবৈদিক ধর্ম মতাদর্শের ধারাদ্বয়ের সম্প্রচার-সম্প্রসারে যে ভারতীয় কৃষ্টির বহুমুখী স্বরূপ গড়ে উঠেছিল, আর্যায়িত বঙ্গদেশেও তা-ই লক্ষণীয়।

আর্য সংস্কৃতির সাথে সাংস্কৃতিক একাত্ম হয়ে প্রকাশশীল সুপ্রাচীন বঙ্গদেশীয়রা সুপ্রাচীন সভ্যজাতি। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায়ও দুর্লক্ষ্য আর্যেতর গোষ্ঠী-সংমিশ্রণ এবং ভাষায় গুটিকতক শব্দের অস্তিত্বের প্রামাণ্যে, দূর থেকে সুদূর অতীতে আর্যেতরত্বের অনুমান—কোন সাংস্কৃতিক পরিচিতিভেদ প্রমাণ করে না। চিরকাল বুদ্ধিমান বাঙালী একাত্ম হয়ে আর্য সংস্কৃতিতে অবদানের আদান-প্রদান, গ্রহণ-প্রত্যর্পণের পরম্পরায় খৃষ্টপূর্বকালিক পূর্বালোচিত সাংস্কৃতিক বিকাশে সমান অংশীদার ছিল। খৃষ্টীয়কালে সাংস্কৃতিক উপচয় ঘটেছে আরও নানাভাবে, কালানুক্রমিক উপচয়-অপচয়ের অবশ্যম্ভাবী বিবর্তনবশে। তবে, খৃষ্টকালের আরম্ভ-ক্ষণেও বহুমুখী আর্যধারা এবং জৈনধারা ও বৌদ্ধধারা-ই মাত্র প্রধান সাংস্কৃতিক ধারা-রূপে পাওয়া যায়।

মহাকবি ভাস—তিনি কখন, কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন—তা এখনো অনির্ণীত। তিনি যে একজন সুপ্রাচীন কবি—তা একপ্রকার সর্ববাদীর সমর্থন পেয়েছে। কত প্রাচীন, তা ঠিক হয় নি। তাঁর, গ্রন্থ যা পাওয়া গিয়েছে সব-ই নাট্য কাব্য। স্থাপনার পূর্বেকার নাটকীয় উপাঙ্গে কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় যা কালিদাস প্রভৃতির নাটকে অন্য রকম। সেসবের মাধ্যমে অনেকে ভাসকে খৃষ্ট পূর্ব অনেক শতাব্দী আগেকার বলে অনুমান করেন। আবার তার বিপরীত মতবাদও পাওয়া যায়। সে যা-ই হোক, ভাস একজন প্রখ্যাত নাট্যসাহিত্য-কর্তা। ভরতের নাট্যশাস্ত্র পাওয়া গিয়েছে এবং তিনি পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলেই মনে হয়, সুতরাং বহুপ্রাচীন তা ঠিক। কিন্তু তত প্রাচীন কোন নাট্যসাহিত্য এ পর্যন্ত মেলে নি। নাট্যশাস্ত্র, নাট্যসাহিত্য-বিষয়ক তত্ত্ব-গ্রন্থ। নাট্যসাহিত্যে-ই নাট্যশাস্ত্রীয় তত্ত্ব অভিরূপায়িত হয়। সুতরাং নাট্যসাহিত্য-ব্যতিরেকে নাট্যশাস্ত্র নিষ্ফল। সে হিসাবে সুপ্রাচীনকালেও ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ধারায় রূপক বা অভিনেয় সাহিত্য ছিল এ অনুমান করা যায়। কিন্তু ভাসের নাটকে যে সব উপাঙ্গ সন্নিবেশিত হয়েছে, নান্দীকে নাটকের অঙ্গ করা হয় নি, তাতে ভাসের অবস্থান ভরতেরও পূর্বকালে—বলতে শোনা যায়। যেহেতু, ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুসারেই তো পরবর্তী সব নাট্যসাহিত্য দেখা যায়। তথাপি ভাসের প্রখ্যাত নাটক—স্বপ্নবাসবদত্তা-ই তাঁর কালের প্রাচীনত্বের শেষ সীমা নির্দেশ করে। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন এবং পত্নী বাসবদত্তার বিরহ-মিলন-ই স্বপ্নবাসবদত্তার কাহিনী। উদয়ন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। প্রবাদ-প্রসিদ্ধি আছে—মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিত, কৌশাম্বীরাজ উদয়ন[১] এবং

১. কৌশাম্বীর রাজা উদয়নকেই বৎসরাজ বলা হয়। কৌশাম্বী এলাহাবাদের নিকটবর্তী যমুনা-তীরস্থ প্রাচীন নগর। ইহা বর্তমানে কোশম নামক গ্রামে পরিণত হয়েছে। স্বপ্নবাসবদত্তা এবং রত্নাবলী নাটকে এই উদয়নই নায়ক এবং তার পত্নী বাসবদত্তা নায়িকা। এই উদয়ন

গৌতমবুদ্ধ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতএব, উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী-মূলক গ্রন্থ তার পরেই রচিত হয়ে থাকবে। বাল্মীকির রামায়ণমূলক, ব্যাসের মহাভারত-মূলক, এবং সম্ভবত গুণাঢ্যের বৃহৎকথা-মূলক মোট ১৩ খানা নাট্যসাহিত্য একত্রিতাবস্থায়, মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর সম্পাদকতায় ভাসের নাট্যসাহিত্য রূপে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। বহু বিদ্বজ্জনের এক বিবাদক্ষেত্ররূপেই তা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

মহাকবি বাণভট্টের কালেও ভাসের নাটকাবলী সুপ্রসিদ্ধ ছিল। বাণভট্ট পরিষ্কার লিখেছেন—সূত্রধারের মাধ্যমে আরম্ভ করার অভিনব পন্থায় এবং সঠিক সন্নিবেশিত পতাকা সমন্বিত বহুভূমিক বিভিন্ন মনোরম নাট্যসাহিত্য লিখেই ভাস দুর্লভ কবি-যশের অধিকারী হয়েছিলেন। নাটকগুলো, এবং তার বৈশিষ্ট্যে ভাস মহাকবি বলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে-ই সুখ্যাত না থাকলে বাণভট্ট তা লিখতে পারেন না।[১]

তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রতিমানাটক এবং স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকই সমধিক প্রসিদ্ধ। অপরাপর নাটকগুলো হচ্ছে—অভিষেক পঞ্চরাত্র, বালচরিত, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ এবং অভিমার; মধ্যমব্যাযোগ, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার এবং দূতকাব্য-ব্যাযোগ চারখানা; উরুভঙ্গ—অঙ্ক এবং চারুদত্ত--প্রকরণ।

কালের দীর্ঘ ব্যবধানে কত যে গ্রন্থ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, কত গ্রন্থকারের নামটি পর্যন্ত জনসমাজে হারিয়ে গিয়েছে, একান্ত বিরল হয়েছে—তা তো মিথ্যাকথা নয়। পূর্বোক্ত নাট্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে,—পাণিনির কালেও 'নটসূত্র' ছিল অন্তত দু'খানা। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর দু'টি সূত্রে--("পাবাশর্য শিলালিভ্যাং ভিক্ষু-নটসূত্রয়োঃ"। "কর্মন্দ-কৃশাশ্বাদিভিঃ" ৪-৩-১১০-১১১) প্রকাশ যে তখন, পারাশর্য এবং কমন্দের দু'খানা 'ভিক্ষুসূত্র' এবং শিলালি ও কৃশাশ্বের দু'প্রস্ত 'নটসূত্র,' ছিল। এখানে--পারাশর্য যে বেদব্যাস তাতে সন্দেহ নেই। ভরতের নাট্যশাস্ত্র, শিলালি কৃশাশ্বের নাট্যশাস্ত্রদ্বয়ের অস্তিত্ব ন্যাট্যসাহিত্যেরও অস্তিত্ব-অনুমানে সহায়ক। শিলালি, কর্মন্দ এবং কৃশাশ্বের গ্রন্থ এখন কোথাও আছে কিনা-কে জানে। কেবল পারাশর্যের (বেদব্যাসের) বহু গ্রন্থ সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকায় ভিক্ষুসূত্রও বেঁচে আছে।

গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় চন্দনকাষ্ঠের এক অপরূপসুন্দর মূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন। ঈশান ঘোষ অনূদিত 'জাতক', ১ম খণ্ড।

১. সূত্রধার কৃতারম্ভৈ র্নাটকৈ র্বহু ভূমিকৈঃ।
সপতাকৈ র্যশোলেভে ভাসো দেবকুলৈরিব ॥ বাণের হর্ষচরিত ॥

মল্লসেন-রচিত 'উদয়নকাব্য' থাকলেও, তা কবেকার গ্রন্থ তা' জানা যায় না, সুতরাং সে রকম কোন গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে স্বপ্নবাসবদত্তা-প্রণয়ন করার অনুমানও একান্তই হাল্কা হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, উদয়নপত্নী বাসবদত্তার মিথ্যা অগ্নিদাহের কাহিনী রচনা করে প্রধান মন্ত্রীর সুকৌশল-ব্যবস্থাপনায় বিপত্নীকরূপে প্রতিপন্ন উদয়নের সহিত রাজা দর্শকের ভগ্নী—পদ্মাবতীর বিবাহ ঘটানোর মধ্যদিয়ে যে সুচতুর রাজনৈতিক শক্তি-বৃদ্ধির খবর স্বপ্নবাসবদত্তায় অভিরূপায়িত হয়েছে, অন্যকোন গ্রন্থে না পাওয়া গেলে, সমসাময়িক বা অনতিকাল পরের নাট্যসাহিত্যকারের পক্ষেই তা' নাট্যসাহিত্যে তুলে ধরা সম্ভব হয়। সে সব চিন্তা করলে ভাস খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-৬ষ্ঠ শতাব্দীরও হতে পারেন--ধারণা মন থেকে একদম সরে যায় না।

ভাসের প্রত্যেক নাট্যসাহিত্যেই সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে কালিদাস, হর্ষচরিতে বাণভট্ট, কাব্যমীমাংসায় রাজশেখর ভাসের উল্লেখ করেছেন। প্রসন্নরাঘব ও সরস্বতীকণ্ঠাভরণ প্রভৃতি গ্রন্থে ভাসের সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে।

ভাস এবং চাণক্য - এঁদের পৌর্বাপর্য সম্বন্ধেও নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যাবে না। অর্থশাস্ত্রে ভাসের প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ–নাটকের উক্তি বিশেষের ঠিক উদ্ধৃতি না হলেও প্রতিধ্বনি রয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস। সে হিসাবে কৌটিল্যের বা চাণক্যের পূর্বেই ভাসের কালিক বিন্যাস হতে পারতো কিন্তু ভাস-সমস্যাটাও ইতিহাসে, কালিদাস-কণিষ্ক-বিক্রমাদিত্য-অশ্বঘোষ প্রভৃতির সমস্যার ন্যায় অনির্দ্ধারিত আলোচ্য বিষয়রূপে এখনো রয়ে গিয়েছে। উল্টা ধারণাও সম্ভব। এক এক দল পণ্ডিত এক এক রকম যুক্তিজালের বিস্তার করে ভিন্ন ভিন্ন মতের-ই কেবল সৃষ্টি করে চলছেন। তাই বিসংবাদিত বিষয়রূপে রেখেও সাহিত্য-প্রধান আলোচনায় লিপ্ত হওয়ার প্রাথমিকভাবে বিন্যাসই করা হয়েছে এখানে।

কালিদাসের কাল নিয়েও উল্লিখিত অস্পষ্টতা-এড়ান যায় না। এ সম্বন্ধে ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন---"কালিদাসের কাল সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা বিভ্রান্তিকর প্রশ্নগুলির অন্যতম। এবং পণ্ডিতগণের মতামত—তাহা যত দক্ষতার সহিতই উদ্ভাবিত হউক না কেন--আমাদের কোনরূপ সুনিশ্চিত উত্তর প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। দুঃখের বিষয় ভারত তাঁহার শ্রেষ্ঠতম কবি ও নাট্যকারের ইতিহাস সংরক্ষণ করে নাই। লোক পরম্পরা কালিদাসের নামকে ঘিরিয়া কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিয়াছে এবং এতদিন পরে উপকথার বর্ণাঢ্যতার মধ্য হইতে ঐতিহাসিক তথ্য পৃথক করিয়া

নওয়া প্রায় অসম্ভব। পরম্পরাগত মতবাদে কালিদাস বিক্রম সংবতের সমসাময়িক, এই সংবতের প্রারম্ভিব বর্ষ খৃঃ পূঃ ৫৭। এই মতবাদের প্রধান সমর্থকদের মধ্যে আছেন স্বর্গীয় স্যার উইলিয়ম জোনস্, ডঃ পিটারসন্, অধ্যক্ষ এস. রায় ও শ্রী আই. আর. বালসুব্রাহ্মণ্যম্।"[১] অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই মতাদর্শের বিরোধিতাও করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের বক্তব্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই (খৃঃ ৩৮০-৪১৫) বিক্রমাদিত্য। অন্য কোন বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব ছিল না—ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে দীর্ঘ বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে সংক্ষেপে বলা চলে যে, গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেরও বিক্রমাদিত্য উপাধি দেখা যায় বটে, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছামত অন্য উপাধিও ব্যবহার করেছেন। গুপ্তদের মুদ্রার সাক্ষ্যে দেখা যায়—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কখনো শ্রীবিক্রম কখনো সিংহবিক্রম, অজিতবিক্রম বা বিক্রমাদিত্য উপাধি ব্যবহার করেছেন।[২] তা'ছাড়া, খৃষ্টীয় প্রথম শতকের (মতান্তরে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) রাজা হালের (সাতবাহন বা শালিবাহন) গাথা সপ্তশতী গ্রন্থের ৪৬৪ নং গাথায় প্রাচীন বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ রয়েছে।[৩] কেবল উল্লেখ নয়, বিক্রমাদিত্যেব দানশীলতারও উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং গাথাসপ্তশতীতে উল্লিখিত, খৃষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দ থেকে বিক্রম সংবৎ নামক কালের প্রবর্তক বিক্রমাদিত্যের কালকেই কালিদাসের কালবলে ধবে নেয়া হল। প্রসঙ্গত বলা চলে যে, কালিদাস নামক কোন জ্যোতির্বিদের লেখা জ্যোতির্বিদাভরণ নামক গ্রন্থে যে কালিদাস সম্বন্ধে উজ্জয়িনী-রাজের এক মিত্র—প্রভৃতি মনগড়া আখ্যান দেখা যায় তা' একান্তই অবাস্তব। "ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র"-নামক গ্রন্থে শঙ্কর কালকৃষ্ণ দীক্ষিত এ বিষয়টিকে পরিষ্কার করে উপস্থাপন করেছেন।[৪] বাংলাদেশে চিরকাল জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনুশীলন বেশী থাকায় উক্ত 'জ্যোতির্বিদাভরণ'--গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিভ্রান্তিও কিছু যে ঢুকেছে—তা' অসম্ভব না। বাস্তবে, উল্লিখিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের সহিত কালিদাসেব কুমাবসম্ভবের কোন সম্পর্কই নেই। অধিকন্তু, খৃষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দ থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে যে বিক্রমসংবৎ আজ পর্যন্ত বার্ষিক পঞ্জিকাগুলোতেও নির্দ্বিধায় ব্যবহার চলে আসছে, কালিদাস-বিক্রমাদিত্যের কিংবদন্তি-মূলক সেই বিক্রমাদিত্যই বিক্রমসংবতের প্রবর্তক এবং কালিদাসের সাথে তাঁর-ই সম্পর্কমূলক ঐতিহ্য বিশ্বাস করা চলে।

১. গৌরীনাথ শাস্ত্রীর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৭৭, এর পাদটীকা।

২. জন এলন সম্পাদিত গুপ্তমুদ্রা

৩. সংবাহণসুহরসতোসিএণ দেন্তেণ তুই করে লক্খং। চলনেন বিক্কমাইচ্চ চরিঅমণু সিক্খিঅং তিস্সা।

৪. পৃঃ ৪৭৬

ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীর গ্রন্থ থেকে প্রদত্ত উদ্ধৃতির মধ্যে যে বিভ্রান্তির সূচনা আছে তা' মহাকবির জন্মসূত্র সম্বন্ধে স্থানিক এবং কালিক বিভ্রান্তির দু'টি ক্ষেত্রেই এ যাবৎ চলে এসেছে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কালিক বিভ্রান্তি নিরশনযোগ্য বলেই মনে হয়। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার অন্যতম অলঙ্কাররূপে মহাকবির স্বীকৃতিতে কোন মতভেদ নেই কিন্তু বিক্রমাদিত্য কে ছিলেন এবং কবে ছিলেন সে সম্বন্ধে সংশয় এসে মহাকবির প্রকৃত কাল সম্বন্ধেও সংশয় সৃষ্টি করেছে। গুপ্ত সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেরও বিক্রাদিত্য বিরুদ বা উপাধি থাকলেও তার পূর্বে মালব বিক্রমাদিত্যের অনুকরণেই যে সে উপাধি গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) গ্রহণ করেছিলেন তা' মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। মান্দাসোরে প্রাপ্ত প্রথম কুমারগুপ্তের আমলের শিলালিপিতে মালবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা থেকে ৪৯৩ বছর অতীতে পৌষ শুক্লপক্ষীয় ১৩ সংখ্যক তিথি শিলালিপির কাল নির্ণীত থাকা দ্বারা[১] পরিষ্কার হয়ে যায় যে মালবরাজ বিক্রমাদিত্য প্রথম কুমারগুপ্তের আমলের এ শিলালেখ তৈরির চারশ' তেরানব্বই বছর আগেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। সুতরাং প্রথম কুমার গুপ্তের পরবর্তী দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত কখনও বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করে থাকলেও তা' দ্বারা মহাকবি কালিদাসকে এনে যুক্ত করা চলে না। 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' এর ১২শ খণ্ডে ৩২০ পৃষ্ঠায় উক্ত শিলালেখ মুদ্রিত হয়েছে। জ্যোতির্বিদাভরণ নামক এক গ্রন্থে যে গ্রন্থকার কালিদাস উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমের ঘনিষ্ট বন্ধু (২২শ অধ্যায় ১৯শ শ্লোক) তিনি রঘুবংশ প্রভৃতি তিনখানা কাব্যের প্রণেতা (২০শ শ্লোক) এবং গত কলিযুগ সংবৎ ৩০৬৮ (বি. সং ২৪) এর বৈশাখ মাসে এ পুস্তকের (জ্যোতির্বিদাভরণ) আরম্ভ এবং কার্তিক মাসে সমাপ্তি (২২শ শ্লোক) প্রভৃতি লিখেছেন তার মধ্যে সর্বত্র সঙ্গতি নেই। মালবরাজ বিক্রমকে কলিযুগ সংবৎ ৩০৬৮ (বি. সং ২৪) অব্দে দেখাবার বহু প্রচেষ্টা এ গ্রন্থে করা হয়েছে যার মধ্যে পূর্বাপর চলতি প্রবাদ অনুসারে নবরত্ন সভাও এ সময়ের ব্যক্তির নাম সহযোগে দাঁড় করান হয়েছে। এ গড়মিল ধরা পড়ে ও গ্রন্থের অয়নাংশ আনয়নের পদ্ধতির[২] মধ্যে শকাব্দ ব্যবহার দ্বারা। উল্লিখিত শিলালেখ অনুসারে বিক্রমাব্দ যা' পাওয়া যায় তার সাথে সঙ্গতিশীল ২৪ বিক্রামাব্দে যে গ্রন্থের রচনা হয় তাতে শকাব্দের নামটিও ব্যবহৃত হতে পারে না। কারণ বিক্রমাব্দের (মালব) শুরু ৫৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে এবং শকাব্দের শুরু ৭৮/৭৯ খৃষ্টীয়াব্দে। সুতরাং এ গ্রন্থের এবং 'ধন্বন্তরিক্ষপনকামরসিংহ শঙ্কুঃ' ইত্যাদি প্রাবাদিক শ্লোকের যোজনার অনুবলে বরাহ মিহিরকে মালব

১. মালবানাং গণস্থিত্যা যাতে শতচতুষ্টয়ে। ত্রিনবত্যধিকেঽব্দানামৃ(মৃ) তৌ সেব্য ঘনস্তনে। সহস্য মাস শুক্লস্য প্রশস্তেঽহ্নি ত্রয়োদশে।

২. শাকঃ শরাম্ভোধিযুগান্বিতো হৃতো মানং খতর্কৈরয়নাংশকাঃ স্মৃতাঃ। ১/১৮

বিক্রমের রাজসভার নবরত্নের অন্যতম দাড় করা দ্বারা মহাকবি কালিদাসের কালকেও দেখাবার চেষ্টা নিষ্ফল। মহাকবি কালিদাস অবশ্যই খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর ছিলেন এবং মালববিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে আরোহণের কাল থেকে বিক্রম সংবৎ (মালব) ধরা হয়, তার আরম্ভ খৃষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দই বটে।

মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থগুলো হচ্ছে মহাকাব্য দু'খানা রঘুবংশ এবং কুমার সম্ভব; প্রধান নাট্যসাহিত্য তিনখানা—অভিজ্ঞানশকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র এবং বিক্রমোর্বশী; কুন্তেশ্বরদৌত্য নামক একখানা নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায় ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্যবিচারচর্চায়। খণ্ডকাব্য একখানা—মেঘদূত। এ ছাড়াও অনেকগুলো গ্রন্থ মহাকবির রচনা বলে পাওয়া যায়, যেমন—অম্বাস্তব, ঋতুসংহার, কালীস্তোত্র, কাব্য নাটকালঙ্কার, ঘটকর্পরকাব্য (?), চণ্ডিকাদণ্ডকস্তোত্র, দুর্ঘটকাব্য, নলোদয়, নবরত্ন মালা (?), পুষ্পবাণবিলাস, রাক্ষসকাব্য, লঘুস্তব, বিদ্বদ্বিনোদকাব্য, বৃন্দাবনকাব্য, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারসার, শ্যামলাদণ্ডক, শ্রুতবোধ এবং সেতুবন্ধ।

মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থে ভাস, সৌমিল্ল এবং কবিপুত্র নামক তিনজন সাহিত্যিকের উল্লেখ আছে। সৌমিল্ল এবং কবিপুত্রের কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব জানা যায় না। মেঘদূতে--দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপম্' উক্তিদ্বারা যদি বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্নাগকে লক্ষ্য করা হয়ে থাকে তবে দিঙ্নাগের কালও কালিদাসের (মহাকবি) কালেই গ্রহণীয়। দিঙনাগের বৌদ্ধন্যায়ের গ্রন্থের দু'খানার সন্ধান পাওয়া যায়—প্রমাণসমুচ্চয় এবং ন্যায়প্রকাশ।

মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থগুলো বাংলাদেশেও চির সমাদৃত। গ্রন্থ সূত্রেই হোক বা যে কোন সূত্রে হোক কালিদাস বাঙালী সুধীসমাজে চির আদৃত।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী

সুপ্রাচীন বৈদিক কাল থেকে খৃষ্টীয় অব্দের আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত একটি অখণ্ড কাল রূপে গ্রহণ করে আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে এমন দূর অতীতের ঘটনাও পড়েছে যেগুলোর সম্বন্ধে কোন প্রকার অব্দ মাপা সময় ব্যবহার করা চলে না। আমরা যতগুলো অব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করি তার মধ্যে কেবল কলির গতাব্দ বা সংক্ষেপে কল্যব্দটাই বড় যা' খৃষ্টকালের আরম্ভের বহু পূর্ব থেকে চলমান আছে। তা ছাড়া, বীর-নির্বাণাব্দ, বুদ্ধাব্দ বা বুদ্ধ-নির্বাণাব্দও খৃষ্টকাল আরম্ভ হওয়ার কয়েকশ' বছর পূর্ব থেকে প্রসিদ্ধ আছে এবং যথাক্রমে, জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে তার অনুসরণ করাও হয়। তবু দৈনন্দিন বৎসর-মাস-দিন-তারিখের ব্যবহারে তার কোন অনুসরণ নেই। ফলে সেগুলো কেবল বার্ষিক পঞ্জিকায় যথাস্থানে লিখিত হয়ে পূর্বাপর সঙ্গতিশীল পরিসংখ্যানের বিষয় হয়ে আছে। বীর-নির্বাণাব্দ বা বুদ্ধাব্দের আলাদা কোন মাস ব্যবস্থাই নেই। মহাপুরাণের-উপপুরাণের কাল থেকে, মহাভারতের কাল থেকে অথবা তার চেয়েও বহু পূর্বের রামায়ণের কাল থেকে যে সৌরমাস বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় প্রভৃতি নামে প্রচলিত তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চান্দ্র-পদ্ধতির দিন-তারিখ নিয়েই ব্যবহারিক হিসাব চলে এসেছে। এ হিসাবের দৃষ্টান্ত বাল্মীকির রামায়ণেও আছে, বেদব্যাসের মহাভারতেও আছে। শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের জন্য যে বনবাসে গিয়েছিলেন তা'র আরম্ভ দিন থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত চান্দ্র দিন-মাস-বছরের হিসাবে গণিত হয়েছিল। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যে বনবাসের বৃত্তান্ত বেদব্যাসের মহাভারতে আছে তাতে এক বছর (ত্রয়োদশ বছরটি) অজ্ঞাত বাস সমেত বার বছরের বনবাস মোটের উপর তের বছরের ব্যাপার। তার সমাপ্তির হিসাবও চান্দ্র দিন-মাস-বছরের হিসাবে করা হয়েছিল। তখন অব্দ-ব্যবহারটা কি রকম ছিল - বলা যায় না। কলিকালের প্রারম্ভ থেকে যেভাবে প্রত্যেক বছর এক-একটি করে সংখ্যা বাড়িয়ে অব্দ সংখ্যা ধরা হচ্ছে, প্রত্যেক বছরের পঞ্জিকায় পরিবেশিত হচ্ছে সেভাবে, কলিকালের পূর্বেও কোন এক ধরনের অব্দ গণনা হয়তো ছিল কিন্তু তার হদিস পাওয়া কঠিন। কলিকালের আরম্ভ থেকে যে একটানা অব্দগুলো চলে যাচ্ছে তার সংখ্যায়িত হিসাব আছে। সেটাও বর্তমানে বহু লোকের প্রায় অজানা বা অব্যবহৃত। বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ 'টীকাসর্বস্ব' এর সমাপনী পুষ্পিকায় যেভাবে শকাব্দ ১০৮১ এবং কলিযুগ সংবৎ ৪২৬০ লিখেছেন সেভাবে অন্যত্রও ব্যবহার হয়েছে। এই কলিযুগ

সংবৎটা বর্তমানে ব্যবহৃত দীর্ঘতম কাল গণনা। এর পরই বুদ্ধাব্দ ধরা চলে। বর্তমান বাংলা সনে (১৩৯৩ সাল) বুদ্ধাব্দ হয় ২৫২৯/৩০ আর, সংবৎ বা বিক্রমসংবৎ হয় ২০৪৩/৪৪। এ দু'টি অব্দ গণনাও খৃষ্টপূর্ব কালে আরম্ভ হয়েছিল। তথাপি খৃষ্টাব্দের সাহায্যেই বর্তমানে সারা পৃথিবীতে গণনার প্রচলন হয়েছে। খৃষ্টকালের আগেরটা খৃষ্ট-পূর্বাব্দ বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। সে অনুসারে খৃষ্ট-পূর্বকালিক বিষয়গুলো পৌর্বাপর্য ক্রমে আগের-পবের বিবেচনায় ক্রমিক স্থাপন করেই অনুধাবন করতে হয়। কালকে চিহ্নিত করতে বস্তুগুলো ব্যবহার করা ছাড়া এক্ষেত্রে উপায় নেই। খৃষ্টকালের মধ্যেকার বিষয় যথাসম্ভব, শতাব্দী চিহ্নিত করে আলোচনা করা চলতে পারে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের সাংস্কৃতিক অবস্থায় তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। পূর্ব শতকের ন্যায় এ শতকেও প্রধান তিনটি সাংস্কৃতিক ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে, অতি প্রাচীন আর্য ধারায় কোন বিশেষ উদ্যম-উন্মাদনা নেই এবং জৈন-ধারার অবস্থাও সে রকমই। তবে, এ দুটি ধারার স্বয়ম্ভরতার তেমন কোন হানি দেখা যায় না। কিন্তু পূর্ব উল্লিখিত সাম্রাজ্য শক্তিদ্বারা প্রবর্দ্ধিত বৌদ্ধধর্মের উদ্যম এখানেও যথেষ্ট বেশী। বিশেষত, কুষাণরাজ কণিষ্কের[১] পৃষ্ঠপোষকতায় অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরসন কল্পে চতুর্থ মহাসঙ্গীতিতে ব্যর্থপ্রচেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মহা মহা বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের নৈষ্ঠিক সেবা-প্রচেষ্টায় সাংস্কৃতিক বিকাশে লক্ষণীয় অগ্রগতি, অতিমাত্রা-ই সাধিত হয়েছিল।

উপবের আলোচনা কণিষ্কেব কালের সহিত সংশ্লিষ্ট। কণিষ্কের কাল নিয়েও ঐতিহাসিক বৈমত্য ঘুচে যায় নি। কতক বেত্তার যা' মত, তা' অন্যেরা গ্রহণ করেন না, আবার তাঁদের মতও অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। এভাবে এদেশের তথা প্রতীচ্যের প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণের যাবতীয় মত সর্ববাদী সম্মতির অভাবে এক অনির্ধারিত অপর্যবসিত সিদ্ধান্তেবই সৃষ্টি করে চলছে। তথাপি অধ্যাপক ফার্গুসন, ওল্ডেনবার্গ, টমাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং র‍্যাপসন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের পন্থানুগত হয়ে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ৭৮ খৃষ্টাব্দ হতেই কণিষ্কের কাল ধরা যায়। তাই, ওই সময়ের কয়েকজন

১. "অধ্যাপক ফার্গুসন, ওল্ডেনবার্গ, টমাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, র‍্যাপসন প্রমুখের মতে কণিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সূচিত শকাব্দ প্রবর্তন করেন।' গৌরীনাথ শাস্ত্রিকৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৬৪, পাদটীকা।

চিন্তানায়ককেও কণিষ্কের রাজসভাব সদস্যরূপেই গ্রহণ করা চলে যাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট গ্রন্থকার বৌদ্ধ অশ্বঘোষ এবং নাগার্জুন, বসুমিত্র ও কুমারলাত বিশেষ উল্লেখের পাত্র।

অশ্বঘোষের গ্রন্থগুলো হচ্ছে— ১। বুদ্ধচরিত ২। সৌন্দরনন্দ, ৩। গণ্ডী-স্তোত্রগাথা, ৪। সূত্রালঙ্কার (উইন্‌টার্নিজের মতে এই গ্রন্থখানা সমসাময়িক কুমার লাতের রচনা এবং গ্রন্থের নামও কল্পনামণ্ডিতিকা বা কল্পনালঙ্কৃতিকা), ৫। শারিপুত্র প্রকরণ (অন্যতম রূপক বা নাট্য সাহিত্য), এবং ৬। মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র। এই সব গ্রন্থ এক সময় যে বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তা বোধহয় সত্য।

উল্লেখযোগ্য অপর গ্রন্থকার নাগার্জুন। তাঁকে সিদ্ধ নাগার্জুনও বলা হয়। তিনিও কুষাণরাজ কণিষ্কের অন্যতম সভাসদ ছিলেন। কণিষ্কের যা ধর্মমত ও বৌদ্ধ মত, নাগার্জুনেরও তা-ই। চিকিৎসাশাস্ত্রে নাগার্জুনের তুলনা প্রায়ই চলে না। তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্র, বোধহয় তন্ত্র এবং আয়ুর্বেদ—উভয় ভিত্তিকই ছিল। কুষাণ- রাজধানী পুরুষপুর বা বর্তমান পেশওয়ার এর অধিবাসী হলেও, সারা বৌদ্ধজগতেই নাগার্জুনের বিশেষত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে ১। কক্ষপূট বা নাগার্জন কক্ষপূট, ২। কৌতুহলচিন্তামণি, ৩। যোগরত্নমালা, এবং ৪। নাগার্জুনীয়োষধাবলী-ই প্রধান। নাগার্জুনকক্ষপূট কখনো সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নি। তা তিনি সর্বদা আপন কক্ষে কক্ষেই রেখে চলতেন। অন্যান্য গ্রন্থ সমাজে প্রচারিত ছিল। পূর্বোল্লিখিত বৌদ্ধ তন্ত্রগুলোর মধ্যেও নাগার্জুন-প্রণীত তন্ত্র রয়েছে। তিনি মহাপণ্ডিত বৌদ্ধ সাধক ছিলেন—সন্দেহ নেই। এঁর সম্বন্ধেও নানা ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি আছে।

খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর এক বিখ্যাত গ্রন্থকার গুণাঢ্য। তাঁর 'বৃহৎকথা' নামক গ্রন্থখানা সর্বত্র সুবিদিত সমাদৃত—সন্দেহ নেই। বিশেষত প্রাকৃত ভাষাজ বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে সে গ্রন্থ মাতৃভাষার আকড় বললেও অত্যুক্তি হয় না। সে গ্রন্থখানা যদিও পাওয়া যায় না, কেবল, সম্ভবত খৃষ্টীয় ৮ম্-৯ম্ শতাব্দীতে বুদ্ধ স্বামী রচিত শ্লোকসংগ্রহ, খৃষ্টীয় একাদশ শতকের ক্ষেমেন্দ্র কর্তৃক প্রণীত—বৃহৎ কথামঞ্জরী এবং এই একাদশ শতাব্দীরই সোমদেব প্রণীত কথাসরিৎসাগর নামক গ্রন্থত্রয়ে বৃহৎকথার বিষয়বস্তু আংশিকভাবে রয়েছে। বর্তমানে মূলগ্রন্থ না পাওয়া

গেলেও, গ্রন্থের অস্তিত্বকালের নামকরা গ্রন্থকারদের প্রশংসা-বাক্যের মাধ্যমেই বুঝা যায় যে—বৃহৎকথা কত বড় উপাদেয় গ্রন্থ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মহাকবি বাণভট্ট হর্ষচরিতের মধ্যে বলেছেন—"হরের লীলা যেমন সততই গৌরীর প্রসাদনে তাৎ-পর্যায়িত এবং কন্দর্পরসোদ্ভাবক, সেরকম ভাষার (গৌরী) প্রসাদনে সুপ্রযুক্ত কন্দর্পোদ্ভাবন দক্ষ 'বৃহৎকথা' কার না বিস্ময় সৃষ্টি করে।"[১]

গুণাঢ্যের কাল নিয়েও মতান্তর আছে। ওয়েবার সাহেব লিখেছেন[২] —গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথার' কাল খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী। কিন্তু ডঃ গোপাল ভাণ্ডারকর, সে কাল মনে করেন সাত বাহনের সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১ম্ বা ২য় শতাব্দী।[৩] এবং 'কাব্যমালা' গ্রন্থের সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ এবং পাণ্ডুরঙ্গ পরব তাঁর কাল নির্ধারণ করেছেন খৃষ্টীয় ১ম্ শতাব্দী। ওয়েবার সাহেবের মতের বিরোধিতা করে উল্লিখিত 'কাব্যমালা' গ্রন্থের সম্পাদক আরও যে মন্তব্য করেছেন তা'ও তুলে ধরেছেন জি. এইচ. ওঝা—

"এবং কাব্যমালা গ্রন্থের সম্পাদক স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ এবং পাণ্ডুরঙ্গ পরব উহার খৃষ্টীয় ১ম্ শতাব্দীতে প্রণয়ন হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কেবল সেটুকুই নয় কিন্তু ওয়েবার সাহেবের সিদ্ধান্তিত উক্ত সময় সম্বন্ধে লিখেছেন যে---"ওয়েবার পণ্ডিত 'হিষ্ট্রি অফ সংস্কৃত লিটালেচার' নামক পুস্তকে গুণাঢ্যের কালও খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী এবং 'দশকুমার চরিতে'র রচয়িতা আচার্য দণ্ডীরও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হওয়া স্বীকার করেছেন। কিন্তু আচার্য দণ্ডী, কাব্যাদর্শ গ্রন্থে 'পৈশাচী ভাষায় প্রণীত বৃহৎকথা এক অদ্ভুত গ্রন্থ বলে কথিত হয়'—উক্তির মধ্যেকার 'প্রাহুঃ' পদদ্বারা, বৃহৎকথা'র সুপ্রাচীনত্ব-ই প্রকাশ করেছেন। উল্লিখিত কারণে দণ্ডী এবং গুণাঢ্য-উভয়েই ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ছিলেন বলে ওয়েবার সাহেবের উক্তি কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল,— ত'র ধারণা করা চলে না। অথবা, ইয়োরোপীয় বিদ্বানদের প্রায়শঃই এই স্বভাব যে ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং উহার রচয়িতাকে যতদূর সম্ভব আধুনিক করা যায়, সে চেষ্টা করেন এবং উহার

১. সমুদ্দীপিতকন্দর্পা কৃত গৌরীপ্রসাদনা।
হরলীলেব নোকস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা।। বাণভট্টকৃত হর্ষচরিত।

২. Weber, A. The Histoy of Indian Literature.

৩. বম্বে নির্ণয়সাগরপ্রেসে মুদ্রিত 'কথাসরিৎসাগর', ৩য় সংস্করণ।

প্রাচীনতা প্রমাণ করার গ্রন্থাংশকে প্রক্ষিপ্ত বলে নিজ মতের পরিপোষক যুক্তিকে যথার্থরূপে ঘোষণা করেন।"[১]

সে যাই হোক্, গুণাঢ্য অতিপ্রাচীন গ্রন্থকার এবং বাস্তবিকই তিনি গুণে আঢ্য ছিলেন। তাঁহার অসামান্য রচনা 'বৃহৎকথা' পরবর্তী বহু সাহিত্যের উৎসরূপে স্বীকৃত। এ গ্রন্থ যে একদা বাংলাদেশেও বিশেষ সমাদৃত ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, প্রাকৃত ভাষার পথধরেই ধীরে ধীরে বিবর্তিত বাংলাভাষা, অত বড় উৎসগ্রন্থের অবদান লাভ করে নি—মনে করা চলে না।

ভাস এবং গুণাঢ্যের পৌর্বাপর্যও আলোচনার বিষয় হতে বাধ্য। পূর্বোল্লিখিত ভাসের নাটকাবলীর মধ্যে স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, চারুদত্ত এবং অবিমারকে'র কাহিনীর উৎস গুণাঢ্যের বৃহৎকথা বলে অনেকে মনে করেন। যদি তা' সত্যি হয় তবে কালবৈষম্য মানতে হয়। কিন্তু বিচার্য বিষয় হল—বৎসরাজ উদয়ন এবং তাঁর পত্নী বাসবদত্তার প্রেম-প্রীতির কথা কেবল লোকমুখে প্রচলনের মাধ্যমে দীর্ঘ শত শত বৎসর চলে এসে বৃহৎকথায় স্থান পেয়েছে - ভাবতে যাওয়া কি অতিকল্পনা হয় না? ভাসের নাটকগুলো এবং বৃহৎকথা উভয়ে কোন সাধারণ উৎস থেকে উপাখ্যানাংশ পেতে পারে এবং বৈপরীত্যে গুণাঢ্যের এবং ভাসের কাহিনী সংগ্রহের সমান দুরধিগম্যতা অবশ্যই স্বীকার্য। ভাস যদি সুপ্রাচীন হয়েই থাকেন তো, তাঁর পক্ষেই বৎসরাজ উদয়নের কাহিনী জানা বা ইতিবৃত্ত লাভ করা

ঔর কাব্যমালাকে বিদ্বান সম্পাদক স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পং দুর্গাপ্রসাদ ঔর পাণ্ডুরঙ্গ পরব নে উসকা ঈ. স. কী পহিলী শতাব্দী মে বানানা বতলায়া হৈ ইতনা হীনহি, কিন্তু বেবর কে মানে হুএ উসকে সময় কে বিষয় মে লিখা হৈ কি "বেবর পণ্ডিত 'হিস্টরী অব্ সংস্কৃত লিটরেচর' নামক পুস্তক মে গুণাঢ্যকা ঈ. স. কী ছটী শতাব্দী মে হোনা বতলাতা হৈ ঔর দশকুমার চরিত কে রচয়িতা আচার্য্য দণ্ডীকা ভী ছটী শতাব্দী মে হোনা স্বীকার করতা হৈ। কিন্তু আচার্য্য দণ্ডী কাব্যাদর্শমে 'ভূতভাষাময়ীঃ প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহ-কথাং' মে 'প্রাহুঃ' পদ সে বৃহৎকথাকা আপনে সে বহুত প্রাচীন হোনা প্রকট করতা হৈ। ইস্‌লিয়ে দণ্ডী ঔর গুণাঢ্য দোনে ছটী শতাব্দী মে হুএ ঐসা বেবর পণ্ডিত নে কিস্ আধার পর মানা য়হ মালুম নহী হোতা। অথবা প্রায়: য়ুরোপীঅন বিদ্বানো কা যহ স্বভাব হী হৈ কি ভারত বর্ষকে প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং উনকো রচয়িতাও কো অর্বাচীন সিদ্ধ করনে কা জহা তক হো সকে বে যত্ন করতে হৈ ঔর উনকা প্রাচীনত্ব সিদ্ধ করনেকা দৃঢ় প্রমাণ মিল ভী জাবে তো উসকো 'প্রক্ষিপ্ত' কহ কর অপনেকো জো অনুকূল হো উসীকো আগে করতে হৈ।। ভারতীয় লিপিমালা, পৃঃ ১৬৮-৬৯, পাদটীকা

সহজতর। তা থেকেও অসংখ্য সংগৃহীত আখ্যান-ভাগের সংশ্লিষ্ট অংশ গুণাঢ্যের সংগ্রহে স্থান পাওয়া একান্ত বিচিত্র নয়।

গুণাঢ্যের পরেই আলোচ্য হয় রাজা হাল। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—গাথাসপ্তশতী গাথাকোষ। 'গাথাসপ্তশতী'র শেষ অংশে লিখিত আছে—রাজা সাতবাহন ছিলেন কুন্তলদেশের রাজা। তাঁর রাজধানীর নাম প্রতিষ্ঠানপুর বা প্রতিষ্ঠান নগর (পৈঠানপুর)। তাঁর পিতাব নাম ছিল শতকর্ণ। দ্বিপিকর্ণও তাঁর একটি উপনাম ছিল। তাঁর পুত্র (সাতবাহন) 'হাল'প্রভৃতি উপনামদ্বারা পরিচায়িত হতেন। প্রাচীন শিলালিপিতেও আন্ধ্র (আন্ধ্রভৃত্য) বংশ উপলক্ষ্যে সাতবাহন নামের ব্যবহার পাওয়া যায়। "নানাঘাটলেখ" নামে পরিচিতি প্রসিদ্ধ শিলালিপিতে পাওয়া যায় উক্ত বংশের মূল পুরুষ—'সিমুক'কেও সাতবাহন বলা হত। ২২৫ খৃষ্টাব্দ বা তার অনতি আগে-পাছে উক্ত বংশীয় রাজত্বের অবসান হয়েছিল। হালেব 'গাথাসপ্তশতী' প্রাকৃত ভাষার ৭০০ (সাতশত) আর্যাদ্বারা গ্রথিত আদিরসাত্মক সাহিত্য। মহাকবি বাণভট্ট এ গ্রন্থের উল্লেখ কবেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন 'গাথাকোষ' নামদিয়ে। অনেকেই এই দু'খানা গ্রন্থকে একখানা রূপে প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক ওয়েবার মহাকবি বাণভট্ট কর্তৃক উল্লিখিত গ্রন্থখানাকে হালের গাথাসপ্তশতী বলে মানতে চা'ন নি। তাঁর মতে ও গ্রন্থ অত-প্রাচীন নয়।[১] কিন্তু জি. এইচ. ওঝা লিখেছেন[২] —"হম উক্ত বিদ্বানকে ইস কথনসে সর্ব্বথা সহমত নহী হো সকতে ক্যোকি বাণভট্ট সাতবাহনকে জিস্ সুভাষিতরূপী উজ্জলরত্নোকে কোশ (সংগ্রহ, খজানে) কী প্রশংসা করতা হৈ (অবিনাশিনমগ্রাম্য মকরোৎ সাতবাহনঃ। বিশুদ্ধ জাতি ভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ ॥ ১৩) বহ গাথাসপ্তশতী হী হৈ, জিসমে সুভাষিরূপী রত্নকা হী সংগ্রহ হৈ। যহ কোঈ প্রমাণ নহী কি প্রা. বেবর নে উসে গাথাসপ্তশতী নহী মানা ইস্ লিয়ে বহ উসসে ভিন্ন পুস্তক হোনা চাহিয়ে।"[৩]

অর্থ আমি উক্ত বিদ্বানের এ কথার সহিত সর্বরকমে একমত হতে পারি না কারণ, সাতবাহনের সুভাষিতরূপ উজ্জ্বল রত্নের যে কোশকাব্যের প্রশংসা বাণভট্ট করেছেন (অবিনাশিন মগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ। বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥) তা প্রকৃতই গাথাসপ্তশতী যার মধ্যে সুভাষিতরূপ রত্নের সংগ্রহই

১. The History of Indian Literature, by Weber A.

২. ভারতীয় লিপিমালা, গৌরীশঙ্কর হীরাচান্দ ওঝা, পৃঃ ১৬৮।

৩. অবিনাশিনম গ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥ গাথাসপ্তশতী

রয়েছে। এটা কোন প্রমাণ নহে যে ওয়েবার সাহেব উহা গাথাসপ্তশতী বলে মানেন নি বলেই তা ভিন্ন গ্রন্থ হয়ে যাবে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অপর এক সার্থক গ্রন্থ বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র। অমর শক্তি-নামক এক রাজার পুত্রদিগকে নীতিশিক্ষা দেয়ার ব্যপদেশে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করে গ্রন্থকার নিজেই শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিত হয়েছে। কবুতর, মূষিক, হরিণ, শৃগাল, ব্যাধ, কচ্ছপ প্রভৃতিব উপকথার মাধ্যমে নীতি-শিক্ষা দেওয়ার এমন সুন্দর গ্রন্থ আর দেখা যায় না। শুক্রের নীতিশাস্ত্র, বৃহস্পতির নীতিশাস্ত্র, বাহুদণ্ডিপুত্রের নীতিশাস্ত্র এবং বিশালাক্ষের নীতিশাস্ত্র ছিল কৌটিল্যের বা চাণক্যের আদর্শ উপজীব্যগ্রন্থ। ওসব সুপ্রাচীন নীতিশাস্ত্রের অবলম্বনে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থশতকে চাণক্য যে অপূর্ব 'অর্থশাস্ত্র' প্রণয়ন করেছিলেন, সে সব নীতিশাস্ত্রের উপরে ভিত্তি করেই বিষ্ণুশর্মার এ পঞ্চতন্ত্র প্রণীত হয়েছে-সন্দেহ নেই। তবে, উল্লিখিত পশু-পাখীর উপকথার মধ্যদিয়ে উপস্থাপিত ক্ষেত্রে কোন্ নীতিটি প্রযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় তা' এ গ্রন্থে এত সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ নীতিটিকে সংক্ষিপ্ত একটি-দুটি শ্লোকে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মূলনীতি শাস্ত্র না পড়েও যেন তার প্রয়োগকুশলতা লাভ করা চলে। এ গ্রন্থের রচনাকাল নিয়েও নানা মতভেদ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের মধ্যে 'রাধা' শব্দটির বা রাধিকা শব্দটির অস্তিত্বে অধ্যাপক ওয়েবার প্রমুখ অনেকে ইহার রচনা কাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী স্থির করেছেন। কিন্তু কচ্ছ-প্রদেশের অন্ধগ্রামে প্রাপ্ত শক সংবৎ ৫২ অব্দে (খৃঃ ১৩০) উৎকীর্ণ মহাক্ষত্রপ রুদ্র-দামনের শিলালেখের মধ্যকার 'রাধা-কৃষ্ণ' কথা দ্বারা যে ওই পঞ্চম খৃষ্টীয়শতকী মতবাদ টিকতে পারে না—তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। 'প্রবন্ধচিন্তামণি' প্রণেতা মেরুতুঙ্গও, শেষটায় ঐ পঞ্চম শতাব্দীই স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু হার্টেল সাহেব বলেছেন—খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পহ্লবী ও সিরিয়াক ভাষায়, অষ্টম শতাব্দীতে আরবী ভাষায়, একাদশ শতাব্দীতে হিব্রুভাষায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্প্যানিশ্ ভাষায় এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরাজী ভাষায় এ গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইরাণে এবং সিরিয়ায় যে গ্রন্থের খ্যাতি পৌঁছে গিয়েছিল, যার জন্য সেখানকার রাজকীয় উদ্যোগে পঞ্চতন্ত্রের পহ্লবী ভাষায় অনুবাদ হয়, তা' বেশ কয়েক শতাব্দীর বহুলপ্রচারের ফলেই সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস। দুঃখের বিষয়—গ্রন্থের মধ্যে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না যে, গ্রন্থটির সত্যিকার রচনা কাল ধরা চলে। গ্রন্থখানা আর্য সনাতনপন্থী—সন্দেহ নেই। লেখকেব নাম এবং প্রারম্ভই তা' প্রমাণ করে। তবে, বৌদ্ধ আদর্শও, অবিরোধের ফলে গ্রন্থমধ্যে অভিন্নাপায়িত

হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে গ্রন্থ ৫ খানা —মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ এবং অপরীক্ষিত কারক।

এছাড়া, বসুমিত্র, কুমারলাত, মাতৃচেতা-প্রভৃতি অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থগুলো এই শতাব্দীর বিশেষ সাংস্কৃতিক অবদান। অনেকে অশ্বঘোষেরই প্রচ্ছন্ন নাম মাতৃচেতা মনে করেন। অবশ্য, এসম্বন্ধে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ একাই প্রচ্ছন্ননামবাদীদের অগ্রগণ্য। চৈনিক পণ্ডিত ইৎসিংএর মতে মাতৃচেতার রচিত চতুঃশতকস্তোত্র, চতুঃপঞ্চাশতিকনামস্তোত্র এবং মহারাজ-কণিকলেখ। গ্রন্থগুলো যে খুব বেশী প্রচলিত ছিল-এমন মনে হয় না। তবে, বৌদ্ধ সংস্কৃতির গ্রন্থ হিসাবে বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচারিত থাকার কথা অবিশ্বাস করা যায় না। তৎসূত্রে বঙ্গদেশেও ইহার সম্প্রচার হয়ে থাকবে।

সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে, ক্রিয়ামূলক এবং ক্রিয়া বা কর্মাত্মক। ক্রিয়াটি শারীরিক অথবা মানসিকও হতে পারে। যে প্রকারই হোক ক্রিয়ার কালটি চলে গেলে তা' অতীত হয়ে যায়। থাকতে পারে তার স্মৃতি আর সুফল বা কুফল। স্মৃতি অনুভূতি-মূলক জ্ঞান যা' কেবল অনুভূবিতারই হতে পারে। শাব্দিক উপায়ে অনুভূতি এবং স্মৃতি বা স্মরণাত্মক জ্ঞানকে সঞ্চারিত করা যায় স্থানিক বা কালিক দূরদূরান্তরে। শব্দার্থমূলক জ্ঞান লিপিময় সঙ্কেত অবলম্বনে পাঠক হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। এভাবেই দূর অতীতের প্রকৃত সাংস্কৃতিক রূপ আমরা কেবল পুঁথিপত্রের মাধ্যমে ধারণায় আনতে পারি। সে প্রয়োজনেই তৎকালীন বই-পুস্তকের এবং তার সম্ভাব্য অনুশীলনের মধ্যদিয়ে তৎকালীন দেশবাসীকে জানতে প্রয়াস পেতে হয়। পুরাতন ব্যবহার্য বস্তু অপেক্ষা পুরাতন (প্রত্ন) গ্রন্থের ইঙ্গিত অনেক স্পষ্ট।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক, মনে হয়, খানিকটা স্তিমিত সময়। এ সময়ে ধর্ম বা সামাজিক অবস্থার কোন বৃহত্তর পরিবর্তনাদি লক্ষ্য করা যায় না। সনাতন আর্যসমাজে তো "যথাপূর্বং তথাপরং" পদ্ধতিতে কোন হেরফের ঘটেছিল বলে মনে হয় না। বরং বৌদ্ধ সমাজের দাপট-ই লক্ষণীয় রূপে সনাতনপন্থীদের উদ্যম-উৎসাহের পরিপন্থী ছিল। অবশ্য, বোধায়ন[১] নামক এক সাহিত্যিকের লেখা 'ভগবদজ্জুকীয়' নামের দু'অঙ্কের প্রহসন খানা মনে হয় এই শতকেই প্রণীত হয়েছিল। ইহাতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তাতে মনে করা যায় যে, পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের গুহ্য সমাজের মধ্যে যে সমস্ত অসামাজিক ভাবধারা প্রকট হয়েছিল, তার আরম্ভ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বা তার আগেও অবশ্যই ঘটেছিল। অন্যথা, উক্ত প্রহসনে ভগবান্-নামে উপস্থাপ্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং অজ্জুকানাম্নী গণিকার সম্পর্ক সংপৃক্ত ব্যঙ্গকথা, কোন ক্রমেই প্রহসন-রূপকে স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না। মহারাজ কণিষ্কের ব্যবস্থাপনাধীন চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরষণে তেমন কোন সফলতা আনতে না পারায় বিভিন্ন ভেদে ভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্ব স্ব পন্থায় পরিচালিত হতে থাকেন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রধানত, দু'ভাগে বিভক্ত হীনযান এবং মহাযান। হীনযান শাখার মধ্যে দু'টিভাগ – সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক। মহাযান শাখারও আবার শাখা দুটি – মাধ্যমিক এবং যোগাচার। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিঙ উক্ত হীনযান এবং মহাযানদের পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন এভাবে যে, যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় বোধিসত্ত্বগণের পূজা করেন না, মহাযানসূত্র নিয়মিত অধ্যয়ন করেন না—অনুসরণ করেন না তাঁরাই হীনযান-পন্থী। পক্ষান্তরে, উহা যাঁরা করেন তাঁরাই মহাযান-পন্থী। যদিও এই ভেদ-জ্ঞাপক কথা অত্যন্ত স্থূল কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বে বাহ্য প্রত্যক্ষত্ববাদ, বাহ্যানুমেয়ত্ববাদ, সর্বাস্তিত্ববাদ এবং সর্বশূন্যতাবাদ—প্রভৃতিই হচ্ছে যথার্থ সম্প্রদায়-ভেদক বিবিধ মতবাদ। সে সবের অবলম্বনে বৌদ্ধ সম্প্রদায় অন্তত ১৮ শাখা-উপশাখায় উপবিভক্ত[১] হয়ে স্ব স্ব আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। এ সব শাখা-প্রশাখার মধ্যে অন্তর্বিরোধ থাকলেও তা' ছিল মূলত বৌদ্ধ আদর্শভিত্তিক এবং বেদের প্রামাণ্যের অস্বীকৃতিমূলকই বটে।

১. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, (গৌরীনাথ শাস্ত্রী) ১২০ পৃঃ।

লক্ষ্য করার বিষয় যে চারজন মহাপণ্ডিতকে উল্লিখিত বৌদ্ধ চতুঃসম্প্রাদায়ের প্রধান প্রবক্তারূপে পাওনা যায় তাঁরা সকলেই মহারাজ কণিষ্কের পরম শ্রদ্ধেয় সভাসদ ছিলেন। সৌত্রান্তিক নামক হীনযান শাখার প্রধান প্রবক্তারূপে পাওয়া যায় কুমার লাতকে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক'এর অঙ্গ ,সুত্তপিটক'কে প্রধান উপজীব্য গ্রন্থ স্বীকার করে ধর্মানুমোদিত রীতি-নীতিব অনুসরণ দ্বারাই, বোধ হয়, সৌত্রান্তিক আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছিল। অভিধম্মপিটক-এবং বিনয়পিটকের প্রাধান্য এঁদের কাছে বোধহয়, ছিল না। সংস্কৃত এবং পালি -- উভয় ভাষায়ই সৌত্রান্তিকদের গ্রন্থও রচিত হয়েছিল, কিন্তু তা' এখন একেবারে দুর্লভ হয়ে গিয়েছে বলেই ধারণা হয়।

হীনযানী অপর সম্প্রদায় — বৈভাষিক। তাঁবও প্রধান প্রবক্তা বসুমিত্র কণিষ্কের সভাসদ ছিলেন। অভিধম্মপিটকেব প্রাধান্য বৈভাষিকদেব নিকট প্রকট। যেহেতু, জানা যায় যে, বসুমিত্রেব নেতৃত্বাধীন পাঁচশত 'অর্হৎ' অভিধম্মপিটকেব ভাষ্য—. মহাবিভাষ সংকলন করেছিলেন। সম্ভবত, কণিষ্ক-আহুত মহাসঙ্গীতির পরেই মহাবিভাষ সংকলন সাধিত হয়েছিল। বৈভাষিক মতের অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে উদানবগ্গ, ধম্মপদ, একোত্তরাগম—প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্য গ্রন্থ।

মহাযানী শাখার অন্তর্গত মাধ্যমিক মতের প্রধান প্রবক্তারূপে পাই নাগার্জুনকে। নাগার্জুন যে একজন অসাধারণ বৌদ্ধ সাধক এবং পণ্ডিত তা' পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই সংস্কৃতভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত কত যে বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তার সঠিক তালিকা করাও এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মাধ্যমিক শাখায় তৎপ্রণীত প্রধান প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে -- শতসাহস্রিকী প্রজ্ঞাপারমিতা, মাধ্যমিক কারিকা, যুক্তি-ষষ্ঠিকা, শূন্যতাসপ্ততি, প্রতীত্যসমুৎপাদহৃদয়, মহাযানবিংশক এবং বিগ্রহব্যাবর্তনী। নাগার্জুনেব সাক্ষাৎ শিষ্য আর্যদেবও এই শতাব্দীতেই মহাযানী মাধ্যমিক শাখার এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'চতুশ্শতক' প্রণয়ন করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর চিত্তবিশুদ্ধি-প্রকরণ, হস্তবালপ্রকরণ এবং লঙ্কাবতারসূত্র' এর ভাষ্য আছে।

মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অপর শাখার নাম যোগাচার। অশ্বঘোষের 'মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' যোগাচার সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উপজীব্য গ্রন্থ। অভিধম্মপিঠক এবং বিনয়পিটকের অনুগামিতায় যোগাচারপন্থীদেরও বহুগ্রন্থ আছে। যেমন সংস্কৃতে তেমন পালিতে, তিব্বতী ভাষায়, চীনা ভাষায়, মূল রচনা এবং অনুবাদের এক বিশাল গ্রন্থধারা যোগাচারীদের বিশেষ সৃষ্টি।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী যাবৎ সারা ভারতবর্ষে ধর্মীয় সামাজিক ধারায় আর্য-সনাতনীদের মধ্যে যেমন, বেদভেদ-শ্রেণীভেদ-উপাস্যদেবতাভেদ-দর্শনতত্ত্বীয় ভেদ প্রভৃতির বশে অসংখ্য ভেদ ছিল, জৈন ধারায়ও শ্বেতাম্বর-- দিগম্বর রূপ মৌলিক দুই ভেদ এবং গোদাস-প্রবর্তিত ধারায় তাম্রলিপ্তিকা প্রভৃতি চারভেদ ছিল; অনুরূপভাবে, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রধান চারটি ভেদ অবলম্বনে উল্লিখিত ১৮টি ভেদ ছিল। তৎকালীন বাঙালীর ধর্মীয় সংস্কৃতিতে এ রকম ভেদ হয় সামগ্রিক নতুবা আংশিক ছিল বলে ধরে নেয়া যায়।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের সামাজিক পরিবেশও কোনদিক থেকেই তেমন কোন পরিবর্তনধর্মী নয়। পূর্বাপর চলমান আর্য-সনাতন ধারা এবং জৈন-বৌদ্ধ ধারার সাংস্কৃতিক চিত্রই লক্ষণীয়। বাঙালীদের মধ্যে নতুন কোন আলোড়নমূলক চিন্তা-চেতনার আভাস পাওয়া যায় না কোন গ্রন্থেই। তবে, জৈনদের তুলনায় বৌদ্ধদের কিছু প্রাবল্য এখানেও চোখে পড়ে। গুপ্তরাজগণের আদি শ্রীগুপ্ত যে মৃগস্থাপন স্তূপের নিকট একটি মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎ সিং লিখেছেন, তাদ্বারা শ্রীগুপ্তের আর্য-সনাতন ধর্মের অনুসারিতাই বুঝা যায়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের "এক খানি বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মৃগস্থাপনস্তূপ বরেন্দ্রে অবস্থিত ছিল।"—অনুমান সত্য হলে, বরেন্দ্রে বৌদ্ধস্তূপ তো আগেথেকেই ছিল স্বীকার করতে হয়। বাস্তবেও, জৈনদের ন্যায় বৌদ্ধরাও বাংলার অনেক স্থানে নিজেদের অবস্থান খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই কায়েম করেছিল —ধারণা করা যায়। মগধপ্রতিষ্ঠ মৌর্য এবং পরবর্তী শুঙ্গ-কাণ্ব বংশের রাজাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আধিপত্য বাংলাদেশে যে ছিল তা' প্রায় সকল ঐতিহাসিক মেনে নিয়েছেন। গুপ্তরাজগণের আদি পুরুষও সম্ভবত, মগধেই রাজত্ব করেছেন। রাজত্ব কালের স্বল্পতার জন্যেই হোক্ বা উল্লেখযোগ্য ঘটনার অভাবেই হোক্ শ্রীগুপ্ত এবং তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ গুপ্তের রাজত্বের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বিশেষ কোন উত্থান-পতন ফলক ঘটনার অভাবেই বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে বাধা পড়ার মত কোন ঘটনা চোখে পড়ে না। বৌদ্ধ হীনযানপন্থী বৈভাষিক মতবাদী ধর্মপ্রচারক ভদন্তের নাম জানা গেলেও তাঁর কোন বিশেষ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। অপর এক ভদন্ত ছিলেন জ্যোতির্বিদ। তিনি সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক থেকে ভিন্ন ব্যক্তি। বরাহ মিহির এই ভদন্তের উল্লেখ করেছেন এবং 'জগচ্চন্দ্রিকা' নামক টীকায় ভট্টোৎপল এই ভদন্তকে নির্দেশ করেছেন সত্যাচার্য বলে। সত্যাচার্য ভদন্তের দু'খানা জ্যোতিঃশাস্ত্রীয়— বৃহজ্জাতক এবং হোরাশাস্ত্র গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান আকড় গ্রন্থ রূপে পরিচিত। এছাড়া, রাজা শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নামক নাটক এ শতাব্দীর বিশেষ গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হতে পারে। তাঁর অপর গ্রন্থ 'পদ্মপ্রাভৃতক' নামক একখানা ভান (নাট্য সাহিত্যবিশেষ)। শূদ্রকের কাল নিয়েও মতভেদ যথেষ্টই আছে। তবে, মহাকবি কালিদাস কিন্তু ভাস, সৌমিল্ল এবং কবিপুত্র নামক তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের উল্লেখ করলেও শূদ্রকের উল্লেখ করেন নি।

তা' দ্বারা কালিদাসের পরবর্তী বলে অনুমান করা চলে। অপর, শূদ্রকের পুত্র ঈশ্বরসেনা অন্ধ্রদিগকে পরাজিত করে ২৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে চেদিকাল (কলচুরি সংবৎ) প্রবর্তন করেন। ডঃ ফ্লিটের এই মত গ্রহণ যোগ্য বলেই বিবেচিত হয়। দণ্ডীর কাব্যাদর্শের "লিম্পতীব তমোহঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনংনভঃ। অসৎপুরুষ সেবেব দৃষ্টিৰ্ব্বিফলতাং গতা।।" শ্লোকটি দ্বারা একসময় শূদ্রক ও দণ্ডীর পৌর্বাপর্য নির্দেশিত হয়েছে, বক্তব্য ছিল মৃচ্ছকটিক থেকে কাব্যাদর্শে ওটি গৃহীত। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত ভাসের নাটকাবলী আবিষ্কৃত হওয়ায় সে ক্রম পরিত্যক্ত হয়েছে যেহেতু, উল্লিখিত শ্লোকটি ভাসের 'চারুদত্ত' এবং 'বালচরিত' গ্রন্থদ্বয়েও পাওয়া যায়। যদিও নাটকে স্বকীয়া নায়িকা ছাড়াও পরকীয়া (পরের বিবাহিতা বা অবিবাহিতা---দু'প্রকার), বা সাধারণী নায়িকা হতে কোন বাধা নেই, তথাপি চারুদত্ত নামক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে নায়ক দাড় করে বসন্তসেনা নাম্নী গণিকার সাথে প্রণয়মূলক 'মৃচ্ছকটিক' যে তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ---তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। রাজা শূদ্রক যে দেশের-ই হন না কেন, মৃচ্ছকটিক নাটক বাংলাদেশে বহু সমাদৃত, বর্তমানের পাঠ্যতালিকায়ও অন্তর্ভুক্ত আছে।

পূর্বে লিখিত ঝলকীকার আচার্য বামনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা আছে। মৃচ্ছকটিকের শ্লোক বলে যে, ইত্যাদি শ্লোকটিকে মনেকরা হয় তা' মহাকবি ভাসের উক্ত নাট্যসাহিত্য দু'খানায় পাওয়া দ্বারা সংশয় জাগে যে মৃচ্ছকটিকে যদি উক্ত শ্লোক ভাসের গ্রন্থ থেকে আহৃত হয়ে থাকে তবে তার সাহায্যে দণ্ডীর কাল শূদ্রকের পরে নিয়ে আসার যুক্তি নেই। কেননা, বহু পূর্ববর্তী ভাসের গ্রন্থ থেকে দণ্ডীও তা' নিতে পারেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন[১]— "বার বার পড়ে সুনিপুণ ভাবে দশকুমার চরিত আলোচনা করে দণ্ডীকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মনে করতে কোন অসুবিধা-মূলক কুণ্ঠা বোধ করি না।' যদিও মহাকবি ভাসের কাল সঠিক নির্ণীত হয় নি তথাপি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মহাকবি বাণভট্টের উক্তিতে 'লেভে'— পরোক্ষার ক্রিয়াপদের সাহায্যে বহু পূর্বেকার বলেই ধারণা হয়। তদনুসারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান সঙ্গত মনে করা চলে।

কিন্তু দণ্ডীর কাব্যাদর্শে 'ভূতভাষাময়ীং প্রাহুঃ' ইত্যাদি শ্লোকের সাহায্যে 'বৃহৎকথা'র উল্লেখ থাকায় গুণাঢ্যের কাল দণ্ডীর পূর্বে অবশ্যই ধর্তব্য। তবে প্রবর সেন এবং সেতুবন্ধ কাব্যের সম্বন্ধ-সংপৃক্ত করে মহামহোপাধ্যায় কিছু বলেন নি।[১]

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এ অঞ্চলে কোন গ্রন্থ প্রণীত বলে সঠিক পাওয়া যায় না।

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩২ সাল।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী

খৃষ্টীয় চতুথ শতাব্দীও সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয়। এ শতাব্দীতেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তেমন কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। ঘটেছে অবশ্যই, কিন্তু ধারাবাহিক ঐতিহাসিক তথ্যেরও স্বল্পতা সাংস্কৃতিক আলোচনাকে প্রায় অচল করে তুলেছে। আর্য বৈদিক ধারায় সাগ্নিক এবং নিরগ্নিকের শ্রেণীদ্বয় তো সুপ্রাচীন। বেদের বৈতানিক বিধি-মূলক সংস্কারভাগী সাগ্নিকদেরও উপবিভাগ রয়েছে। ইহারা নিত্যাগ্নিহোত্রীদের অন্তর্গত। এঁদের নিত্যকর্মের মধ্যে অগ্নিহোত্র-হোম অবশ্য কর্তব্য প্রধান কর্ম। ইহারা নিজের যজ্ঞাগ্নি নির্বাপণ করে না। সমিধ-প্রক্ষেপের মাধ্যমে তা' অনবচ্ছিন্নভাবে জ্বালিয়ে রাখে। স্থানান্তরে যেতে হলে অগ্নিপাত্র নিয়েই যেত। সারাজীবন ওই ভাবে অগ্নিসংরক্ষণ, দৈনন্দিন সাগ্নিক-কৃত্য সম্পাদন প্রভৃতি তাঁদের অপরিহার্য। মারা গেলে ওই সংরক্ষিত অগ্নিদ্বারাই তাঁদের শব-সংকার সাধিত হয়। এই সম্প্রদায়ের দাহান্ত থেকে অশৌচ ব্যবস্থা। এঁদেরও আবার, আবসথিক এবং নিরাবসথিক রূপে দুটি সম্প্রদায়ভেদ আছে। আবসথ—অর্থ আবাস, এখানে—অগ্ন্যাগার। অগ্ন্যাগারেই যাঁরা নিয়ত থাকার অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন, মলমূত্রোৎসর্গ, স্নান প্রভৃতি অপরিহার্য প্রয়োজনে বাইরে যেতেন, আর অন্য সর্বদা অগ্ন্যাগারেই কাল কাটাতেন তাঁরাই আবসথিক। শেষ জীবনে যেমন ছিলেন লক্ষণ সেনের মহাধর্মাধিকৃত পণ্ডিত হলায়ুধ। তিনি শেষ জীবনে আবসথিকব্রত গ্রহণ করেও অনেক বছর বেঁচে ছিলেন। অন্যরা নিরাবসথিক। নিরগ্নিকদের মধ্যে সম্প্রদায়ের তো আর শেষ নেই। বেদের বিভিন্ন সূক্তের মাধ্যমে প্রকাশ্য বিভিন্ন দেব-দেবী-মূলক—শৈব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্য-বৈষ্ণব-নারায়ণীয়-ঐন্দ্র-ব্রাহ্ম-প্রভৃতি সম্প্রদায় তো স্ব স্ব পথে নিজ নিজ পারমার্থিকতার জন্য চেষ্টিত ছিলেনই। এঁদের মধ্যে গৃহী ও সন্ন্যাসী-উভয় শ্রেণীই ছিল তান্ত্রিক শাখার মধ্যেও বিভিন্ন দেব-দেবী মূলক সম্প্রদায় ভেদতো আছেই, তদুপরি পূর্বোল্লিখিত ত্রিবিধ তন্ত্রাচারের অনুগত নানা সম্প্রদায় ছিল পরস্পর অবিরোধে সর্বত্র। বৈদিক-তান্ত্রিক-পৌরাণিক পদ্ধতির অনুসরণে বিবিধ দেব-দেবীর উপাসনামূলক অসংখ্যভাগে বিভক্ত আর্যাচারী সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অবৈদিক ধর্ম-সম্প্রদায়দ্বয়---জৈন এবং বৌদ্ধ, নিজ নিজ পন্থানুগত হয়ে বিস্তর ছিল। জৈনদের শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর নামক দু'টি সম্প্রদায়। শ্বেতাম্বররা গৃহী এবং দিগম্বররা মুমুক্ষু নির্গ্রন্থ। বৌদ্ধদের সৌত্রান্তিক বৈভাষিক মাধ্যমিক যোগাচার সম্প্রদায় চতুষ্টয় এবং তাঁদের অষ্টাদশ প্রকার সম্প্রদায় ছাড়াও, লোকায়তিক,

বার্হস্পত্য, পূরণকাশ্যপী, বিভিন্ন তীর্থিক প্রভৃতি বাইরের শ্রেণী তো ছিলই। প্রত্যেক শ্রেণী বা গোষ্ঠী আপন আপন আধ্যাত্মিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চলত—সন্দেহ নেই। এঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের তেমন কোন খবর পাওয়া না গেলেও, অন্তত জৈন-বৌদ্ধে, বৌদ্ধ-সনাতনে, বাদানুবাদ মূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তবে, কেবল সভা-সমিতিতে সীমাবদ্ধ ছিল। কর্মফলবিশ্বাসী এবং পুনর্জন্মবিশ্বাসী, উক্ত (লোকায়তিক-চার্বাক্‌ সম্প্রদায় বাদে) যাবতীয় সম্প্রদায়ই আপন আপন ভাবে ভাবিত-অনুপ্রাণিত ছিল সন্দেহ নেই। বহু আগে থেকে চলমান এসব সম্প্রদায় চতুর্থ খৃষ্টীয় শতকেও যথোপযুক্ত তৎপর ছিল। যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রবক্তা মৈত্রেয়নাথকে অনেকে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে থাকেন। তিনি কবেকার লোক ছিলেন তা জানা যায় না, তবে তাঁর "অভিসময়ালঙ্কার-কারিকা" গ্রন্থের এই শতাব্দীতেই কোন সময় চীনা ভাষায় অনুবাদ হওয়া দ্বারা যোগাচারীদের কিছু বিশেষ উদ্যম-উৎসাহের আভাস পাওয়া যায়। মৈত্রেয়নাথের মতবাদে উদ্বুদ্ধ আর্য অসঙ্গও কয়েকখানা বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। তার "যোগাচারভূমিশাস্ত্র" অবশ্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পূর্বে উল্লিখিত ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের যে বহুমুখী প্রসার সূচিত হয় তা' সমাজে যথার্থই প্রচলিত ছিল। অন্যথা শিক্ষণীয় কলাবিদ্যার মধ্যে তা' গণিতই হত না। উহার প্রত্যেকটিই বিশেষ বিদ্যা যা' নিম্নতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সর্ব-উন্নত প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত অধ্যয়নীয়-অধ্যাপনীয়-প্রশিক্ষণীয় বিভাগরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। তর্কুকর্ম নামে বয়ন শিল্পের উল্লেখ রয়েছে। তার মাধ্যমে বস্ত্রাদি-বয়ন যে কত উন্নতমানের ছিল, অনুমান করা যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মাধ্যমে। অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ অধ্যায়ে কৌটিল্য বলেছেন—মধুরা (বর্তমান মথুরা) অপরান্ত, কলিঙ্গের পশ্চিম ভাগ, কাশী, বঙ্গ, বৎস এবং মহিষ (বর্তমান মাহিষ্মতি) স্থানে তৈরি তুলার সূতা উৎকৃষ্ট এবং বঙ্গকে (বঙ্গে) তৈরি দুকূল (সূক্ষ্ম বস্ত্র) শুভ্র ও মসৃণ। সুতরাং বুঝা যায় বঙ্গের সংস্কৃতি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেও উন্নতই ছিল এবং কেবল তর্কুকর্ম (টাকুর কাজে) নহে বরং কলাবিদ্যার অপর ৬৩ বিভাগেই সমান উন্নতি হয়েছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি অগ্রসর জাতির প্রেক্ষা গ্রহণ করেই প্রতিক্ষেত্রে নিরূপণ করা সঙ্গত। গ্রন্থের সৃষ্টি এবং পঠন-পাঠন উন্নত জীবনযাত্রার ইঙ্গিতই বহন করে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর সাংস্কৃতিক বিষয় সম্বন্ধেও কোন নতুনত্বের বক্তব্য নেই। পূর্বাপর গতানুগতিক ভাবধারায় সমাজ চলতেছিল তার আপন আপন পথে। কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তন অনেক হয়েছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তারে বাংলাদেশও তার অন্তর্গত হয়েই চলছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—"সমতট প্রথমে করদরাজ্য হইলেও ক্রমে উহা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সমস্ত বাংলাদেশই পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশমাত্র ছিল। উত্তর বঙ্গে এই যুগের কয়েকখানিক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশের এই অংশ পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি নামক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং গুপ্ত সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত এক শাসনকর্তার অধীনে ছিল।"[১]

রাজনৈতিক এই পরিবর্তন সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে সন্দেহ নেই। তবে, আগের দিনের রাজাদের একই রকম রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি না হলেও' ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার উপর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না করার রীতি-ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রজা-অসন্তোষ, প্রজা বিদ্রোহের ভীতি তাঁদেরও ছিল। তাঁদের কালে চলতি বিভিন্ন পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে, প্রজা-অসন্তোষের ফলে রাজাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার কাহিনী তাঁদের প্রভাবিত করে থাকবে। তা' থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেই হোক্ বা বিভিন্ন অর্থশাস্ত্র বা রাজনীতির গ্রন্থের তাৎপর্য অনুসরণ করেই হোক্-- আগাগোড়া ধর্মীয় সহিষ্ণুতা রাজকীয় ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায়। গুপ্ত সম্রাটদেরও সে রকম চিন্তা-চেতনা থাকারই কথা। তাই, বাংলাদেশে প্রচলিত সনাতন আর্যপন্থীদের বিবিধ শ্রেণী-উপশ্রেণী, জৈন এবং বৌদ্ধ শ্রেণী---সবাই ধর্মীয় স্বাধীনতায় স্ব-স্ব পন্থায় জীবন-জীবিকায় নিরুদ্বিগ্ন ছিল মনে করতে কোন অসুবিধা নেই। সনাতন আর্যপন্থীদের নিজস্ব পূর্বোল্লিখিত অসংখ্য বৈদিক সাহিত্য, স্মৃতি-সংহিতা, মহাপুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, খিলহরিবংশ প্রভৃতির সাথে সাথে জৈন এবং বৌদ্ধদের মধ্যে প্রণীত সাম্প্রদায়িক তথা অসাম্প্রদায়িক গ্রন্থ চিকিৎসা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির নতুন শাস্ত্র, এবং অন্যান্য বহু জ্ঞানচর্চার অবলম্বন ছিল। সনাতনী আর্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, ভাস্কর্যের যে পরাকাষ্ঠা দেবতা-প্রতিমা তৈরির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তার নির্দেশক গ্রন্থ

১. বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩৫ পৃঃ ৩য় অনুচ্ছেদ।

হিসাবে বেদব্যাসের 'বৃহৎ-সংহিতা, 'অগ্নিপুরাণ' প্রভৃতির ন্যায় জৈনদের প্রতিমা-লক্ষণের এবং বৌদ্ধদেরও প্রতিমা-লক্ষণের নির্দেশক শাস্ত্র থাকার কথা। সে সকল গ্রন্থের অনুশীলন ব্যতিরেকে সার্থক ভাস্কর্য হতে পারে না। সে সবের চর্চাও যে পঞ্চম খৃষ্টীয় শতকে অথবা তার বহু আগে থেকেই এদেশেও ছিল —তা অনুমান করা যায় বিভিন্ন প্রস্তর মূর্তি —ব্রোঞ্জ মূর্তির ভাস্কর্য অনুশীলন করে। সে অনুসারে গুপ্তযুগ, পালযুগ, সেনযুগ পরিব্যাপ্ত করে যে নিখুঁত এবং নিপুণ ভাস্কর্যের নানা আলামত দেশের সর্বত্র ছড়ান পাওয়া গিয়েছে, তা' দ্বারা ভাস্কর্য-বিদ্যার, এবং তন্নির্দেশক শাস্ত্রগ্রন্থের চর্চা যে বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল—তা বিশ্বাস করা যায়।

সাংস্কৃতিক অবদানে--গ্রন্থোৎপত্তি বিষয়ে প্রবর সেন, বসুবন্ধু অসঙ্গ, বসুবন্ধু, আর্যভট্ট, উদ্যোতকর প্রভৃতির নাম করা চলে। সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দৃঢ় অনুগামী বসুবন্ধু অসঙ্গ, সাংখ্যদর্শনের বিরোধিতা করে 'অভিধর্মকোষ' এবং 'পরমার্থসপ্ততি' রচনা করেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক তাকাসুকু ৪২০ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার কাল নির্ণয় করেন এবং য়োগীহারা নামক অপর পণ্ডিত করেছেন ৩৯০-৪৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তিনি (বসুবন্ধু-অসঙ্গ) পরবর্তী জীবনে মহাযান মত গ্রহণ করেছিলেন বলে ধারণা করা যায়, যেহেতু, পরবর্তী গ্রন্থ 'বিজ্ঞপ্তি মাত্রতাসিদ্ধি' মহাযান শাখার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

উদ্যোতকর -গৌতমের ন্যায় দর্শনের বাৎস্যায়নভাষ্যের বার্তিক নামক অতি সমীচীন টীকা--উদ্যোতকরের অসামান্য রচনা। উদ্যোতকরের কাল নিয়ে যে বিসংবাদ, তা' যদিও এখন পর্যন্ত মেটে নি, তথাপি, তাঁর কাল নির্ধারণ কোন মতেই খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরে আর চলেই না। সুবন্ধু রচিত বাসবদত্তার "ন্যায়স্থিতিমিবোদ্যোত কর স্বরূপাং" উক্তির মাধ্যমে পরিষ্কার প্রতিপন্ন হয় যে, উদ্যোতকর উক্ত বাসবদত্তারও আগেকার লোক। এখানে যে, উদ্যোতকর কর্তৃক পরিষ্কৃত-প্রতিষ্ঠাপিত ন্যায় মতেরই উল্লেখ করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সে হিসাবে, উদ্যোতকরের কাল অনেক পূর্বেও হতে পারে। কারণ, পতঞ্জলির মহা-ভাষ্যে উল্লিখিত আখ্যায়িকা—বাসবদত্তা, সুবন্ধুর রচনা হলে, তেমন পিছান আবশ্যক। আর, গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের নামসাম্য ধরে, অপর সুবন্ধুর অপর বাসবদত্তা আখ্যায়িকা মানলেও তা' বাণভট্টের কালেও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বলেই মানতে হয়।[২] উদ্যোতকর

২. কারণ, বাণভট্টের হর্ষচরিতে বাসবদত্তার প্রশংসা আছে এই বলে যে,—
কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।
শক্ত্যেব পাণ্ডুপুত্রাণাং গতয়া কর্ণগোচরম্ ॥

একজন ভরদ্বাজগোত্রীয় কাশ্মীরবাসী বাঙালী ব্রাহ্মণ। তাঁর ন্যায়বার্তিক বাঙালীদের অতিপ্রচীনকালেই ন্যায়দর্শনে (সুতরাং বৈশেষিক প্রভৃতি অন্যান্য দর্শনেও) প্রাগ্রসরতার এক অসামান্য দলিল। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তিও, 'ন্যায়-বিন্দু' গ্রন্থে উদ্যোতকরের কথার প্রতিবাদ করেছেন। ধর্মকীর্তি যে বৌদ্ধ সুবন্ধুর মতাবলম্বী, তা বাচস্পতি মিশ্রের 'তাৎপর্য' টীকার পংক্তি অনুধাবন করলেই বুঝা যায়। উদ্যোতকর ভারদ্বাজ আমাদের বাঙলীদের এক গৌরবের ব্যক্তি-সন্দেহ নেই।

প্রবরসেন : রাজতরঙ্গিণীতে অঞ্জনার পুত্র বলে প্রবরসেনের পরিচিতি পাওয়া যায়। মহাকবি বাণভট্টও প্রবরসেনকে খ্যাতিমান সাহিত্যিক বলে উল্লেখ করেছেন। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে প্রাকৃত ভাষার গ্রন্থের নিদর্শন রূপে 'সেতুবন্ধ' প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। এই সেতুবন্ধ কাব্যই প্রবরসেনের অনবদ্য সৃষ্টি। প্রাকৃত ভাষার পদ্যেই শ্রীরামের জীবনচরিত একাব্যে বর্ণিত হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষের মতে কালিদাসকেও সেতুবন্ধের কবি বলা হয়েছে বটে কিন্তু উল্লিখিত বাণভট্ট ও দণ্ডীর উক্তির প্রামাণ্যেই তা' খণ্ডিত হয়। রাজতরঙ্গিণী তো সাক্ষাৎ ঐতিহাসিক প্রামাণ্য গ্রন্থ-ই।

শ্রীরামচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে বাল্মীকির রামায়ণ-ই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তা' ঠিক, কিন্তু পূর্বোক্ত সংস্কৃতাতিরিক্ত ভাষার অস্তিত্বের আলোচনায় এবং জনশিক্ষা-মূলক বহু বৌদ্ধ সাহিত্যের গ্রন্থের ভাষা পালি (মাগধী প্রাকৃতভেদ) হওয়ার পরোক্ষ নির্দেশের প্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কার প্রতিপন্ন যে, জনসাধারণের চলতি ভাষা বা ব্যবহারিক ভাষা ছিল প্রাকৃত এবং দেশী। প্রাকৃত ভাষার জনপ্রিয়তার জন্যই এই 'সেতুবন্ধ' কাব্যও যে সমধিক জনপ্রিয় ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলাদেশে বা গৌড়ে যে গৌড়ী প্রাকৃতের সংবাদ দণ্ডীর কাব্যাদর্শে পাওয়া গেল, যাকে অনেকে পূর্বী প্রাকৃত নামে চালাচ্ছেন, তা' প্রাকৃত শ্রেণীরই ভাষা এবং সর্বরকম প্রাকৃতই প্রাকৃত ভাষা-ভাষীদের বোধগম্য ছিল।

সেতুবন্ধ কাব্যেরও অনেক টীকার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে, কুলনাথের টীকা, রামদাস প্রণীত টীকা এব শ্রীকৃষ্ণ প্রণীত টীকা-ই প্রচলিত ছিল বেশী। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতেও দুর্গাদাশ-তনয় স্বরস্বতীকণ্ঠারভণ উপাধিপ্রাপ্ত—শিবনারায়ণ দাস, সেতুসরণী নামে সেতুবন্ধ কাব্যের এক সংস্কৃতানুবাদ প্রণয়ন করেছেন। বাংলাদেশে সেতুবন্ধ কাব্যের যে ভূরি প্রচলন ছিল—বাঙালী শিবনারায়ণ দাসের অনুবাদ-ই তার প্রমাণ। তবে, সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা তেমন পরিপুষ্টি প্রাপ্ত না হওয়ার কারণেই হয়তো, অথবা ভাষার কৌলিন্যের পক্ষপাতিত্বেই,

সংস্কৃতে অনুবাদ-গ্রন্থ তিনি করেছেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকেও সংস্কৃত ভাষা বাংলাদেশে অত্যন্ত ব্যাপক অনুশীলিত হয়েছে।

এখানে একটি বিষয়ের অবতারণা হয়তো, নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শিবনারায়ণ দাস প্রমুখ বিদ্বজ্জনের সংস্কৃতে গ্রন্থ প্রণয়ন বা অনুবাদ প্রভৃতির প্রবণতায় অনেকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপতার আভাস পান এবং পাঁচকথা বলতেও দ্বিধা করেন না। বিশেষত চতুর্দশ খৃষ্টীয় শতক থেকেই যখন বাংলাভাষায় গ্রন্থ প্রণীত হতে আরম্ভ করেছিল বলে অনুমান করা যায় এবং পঞ্চদশ শতক খৃষ্টাব্দে কত মনসামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য তৈরিও হয়েছে, তখন সপ্তদশ শতাব্দে 'সেতুবন্ধের' অনুবাদ সংস্কৃতে করা যেন ওই বিরূপতারই ফল। এই প্রকার অহেতুক দোষারোপের মূলে এক ভ্রান্ত তত্ত্বেরও আবিষ্কার হয়েছে। অথচ, কেউ তলিয়ে দেখে না যে, ওই শ্লোকটা পদ্মপুরাণে সত্যিই আছে কিনা ? এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় ফনিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় লিখেছেন—"ব্রাহ্মণদিগকে তিরস্কার করিবার জন্য আধুনিক অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকও এইরূপ একটি অমূলক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥" কিন্তু উহা কোন্ গ্রন্থের বচন, ইহা আমরা জানি না। পদ্মপুরাণে ঐরূপ বচন নাই। পরন্তু, পদ্মপুরাণে দেশ ভাষা দ্বারাই পুরাণ ব্যাখ্যার বিধি আছে। তদনুসারেই প্রাচীন শাস্ত্রব্যবস্থা ও ব্যবহার বুঝিতে হইবে। পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড ৭০তম অধ্যায় (বঙ্গবাসী সং ৬৭৯ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য॥"[১]

কোন গ্রন্থে থেকে থাকলে উপরে লিখিত উদ্ধৃতির মধ্যেকার ওই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। পদ্মপুরাণে বরং উল্টা কথাই রয়েছে। অনেক গ্রন্থের আবৃত্তি বা আবৃত্তি-শ্রবণ পুণ্যজনক বলে শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। সে সব পুণ্য-গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই প্রণীত। তার অনুবাদাত্মক গ্রন্থ, বিষয়বস্তু জানবার প্রয়োজনে, বোধগম্য করার প্রয়োজনে পড়তে বিধান দেয়াই হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রপাঠ-শ্রবণ যেখানে, উল্লিখিত পুণ্যজনক কাজ বলে গ্রহণ করবে সেখানে গ্রন্থ যে ভাষায় যেমনটা আছে তা-ই যথানিয়ম আবৃত্তি করবে বা শোনবে। অন্যথা, শাস্ত্র শ্রবণের সেই ফল—পুণ্য হবে না,—ইহা যে শ্লোকের পূর্বার্ধে বলা হয়েছে যে,—"ন দেশভাষারচিতং গ্রন্থং শ্রুত্বা ফলং লভেৎ", সেই শ্লোকের অপর অর্দ্ধেই আছে—"ব্যাখ্যা যা কাপি কাকুৎস্থ পুরাণস্য হিতা হি সা।" অর্থ হে কাকুৎস্থ (শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করা হয়েছে)

১. 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ' হতে প্রকাশিত ন্যায়দর্শন, ২য় সংস্করণ, ভূমিকার "দেশভাষায় পুরাণ ব্যাখ্যা" শিরোনামীয় অংশের শেষে পাদটীকা :

যে কোন প্রকার ব্যাখ্যাই দেশভাষায়ও হিতকর। এর পরবর্তী শ্লোকে পুনরায় পরিষ্কার করে বলেছে—"আবৃত্তির বেলায় পুরাণে যেমনটা আছে তেমনই পড়বে—আবৃত্তি করবে—পাঠ করবে এবং দেশভেদ অনুসারে নির্বিশেষে যে কোন ভাষায় ইচ্ছা, ব্যাখ্যা করবে।"[১] যেখানে আবৃত্তি ব্যবস্থিত সেখানে মূল বাদ দিয়ে অনুবাদ আবৃত্তির ব্যবস্থা কোন ধর্মেই নেই। সুতরাং অহৈতুক অপবাদ দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা, যা' কোন কোন মহা মহা পণ্ডিত জনের গ্রন্থেও যে চার-পাঁচবার লক্ষ্য করা যায় তা' গ্রন্থের অসৌষ্ঠবই বটে। পুরাণে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার দৃষ্টান্তও আছে।

আর্যভট্ট: খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, **আর্যাষ্টশত** বা আর্যসিদ্ধান্ত নামক যে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের গ্রন্থ লিখেছেন, তা' সত্যিকার অর্থেই অতি উচুমানের। খৃষ্টীয় ৪৯৯ অব্দে তা' প্রণীত। স্বকৃত গ্রন্থের 'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' নামক টীকা এবং 'দশগীতিসূত্র'ও তিনি প্রণয়ন করেছেন। ভারতীয় জ্যোতিষে গণিত এবং ফলিত—উভয় ধারাই সুপ্রচীন কাল থেকে চলমান। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ বিষয়ে আর্যভট্টের গ্রন্থদ্বয় সর্বত্র সর্বদা সমাদৃত। বাংলাদেশ সুপ্রাচীন কাল থেকেই তন্ত্র-জ্যোতিষ-আয়ুর্বেদের চর্চায় অত্যন্ত অধিসক্ত। সুতরাং আর্যভট্টের সিদ্ধান্ত গ্রন্থদ্বয় যে এদেশে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্তও অবিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত হয়ে আসছে তা' কোন বিচিত্র ঘটনা নয়। প্রসঙ্গত অপর পক্ষও আলোচ্য। আর্যভট্ট নামে আরও একজন পাওয়া যাবে তিনি ২য় বলে পরিচায়নীয়। প্রথম আর্যভট্ট ছিলেন বরাহ মিহিরেরও উপজীব্য। আর্যাষ্টশত বা আর্যসিদ্ধান্ত গণিত জ্যোতিষের একদিকে একান্ত নতুন মত ও পথের উদ্ভাবন করেছে। সৌরমণ্ডলের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে গণনার ধারায়ও ফল যা' হয়, প্রথম আর্যভট্টের গণিত ফল যদিও তার একান্ত সমান তথাপি যেহেতু তা' বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিত নয় সেহেতু তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ যেন কম ছিল। প্রথম আর্যভট্টের সিদ্ধান্তে পৃথিবী স্থির কিন্তু সূর্য ভ্রমণরত। অথচ, অন্যান্য গ্রন্থে প্রকৃত পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতি যথার্থরূপে প্রতিপন্ন। যা' হোক্, প্রথম আর্যভট্ট গণনার বহুমুখী পদ্ধতি উদ্ভাবন করে মহাশূন্যে পরিভ্রমণরত গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতির যে কোন এক নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে প্রত্যেকটার আপেক্ষিক অবস্থা গণনাদ্বারা উপস্থাপনের সূক্ষ্ম আঙ্কিক ধীমত্তার পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু খগোল-জ্ঞানে তা' যথার্থ নয় বলেই অনাদৃত হয়েছে। অঙ্কে স্থানিক মান এমন এক জটিল পদ্ধতিতে আর্যাষ্টশত বা আর্যসিদ্ধান্তে গ্রহণ করা হয়েছে

১. পুরাণস্থং পঠেদ্‌গ্রন্থং ব্যাখ্যয়েচ্চাবিচারয়ন্।
যয়া কয়াপি বা স্বাম ভাষয়া দেশভেদতঃ॥ পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড

যা' ফলাদেশে সক্ষম বা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা এবং শূন্য (C) এর স্থানিক নিয়ত মানের সুন্দরতম পদ্ধতি প্রসিদ্ধি-প্রাপ্ত হয়ে উক্ত জটিল পদ্ধতিকে একেবারে অতীতে নিয়ে গিয়েছে। কেবল নিদর্শনরূপে তা' গ্রন্থ আকারে আছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড় এবং বঙ্গে যতটা রাজনৈতিক উত্থান-পতনধর্মী সংঘাতের সংবাদ জানা যায়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাওয়া যায় না। পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক পরিবেশের তেমন কোন পরিবর্তন ছিল না বা কোন বিশেষ উন্মাদনাও লক্ষ্য করা যায় না। সমাজে পদস্থ, পদমর্যাদাহীন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহর-নগর-বন্দর-গ্রাম-গঞ্জের অধিবাসী, পার্বত্য-আরণ্য-কোল-ভিল-মুণ্ডা-কুকী-নাগা-আরব-চাকমা-খৈয়াং-তিপরা প্রভৃতি বহুধা বিভক্ত জাতি-শ্রেণী ছিল। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চতুর্বর্ণের আর্য সামাজিক পদ্ধতিতে প্রথমোক্ত ত্রিবর্ণের সংখ্যাধিক্য না থাকলেও সামাজিক প্রাধান্য ছিলই। চতুর্থ বর্ণের মধ্যে পরিগণিত অসংখ্য জাতি-উপজাতির গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় ছিল না। কামার, কুমার, তাঁতী, জোলা, ডোম, মেথর, মুচি, প্রভৃতি পুরুষানুক্রমিক শ্রেণী-পেশাজীবীরা, আপন আপন বৃত্তি-নির্ভর জীবিকা-অর্জনে ব্যাপৃত থেকে সমাজের যাবতীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশটার স্বনর্ভিরতা সৃষ্টি করেছিল —সন্দেহ নেই। দেবমাতৃক[১] বঙ্গভূমির কৃষীবল, চিরকাল-ই প্রকৃতির নিয়ম-তন্ত্রের অনুসারী হয়ে উপযুক্ত স্থানে এবং কালে কৃষিকার্য করত এবং উৎপন্ন ফসল হাটে-বাজারে-শহরে-বন্দরে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করত। ইহাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাহা 'ইতি' বলে শাস্ত্রে অভিহিত অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি-শলভ (শস্যনাশক পঙ্গপাল জাতীয় কীট)-মূষিক এবং খগ (অতিক্ষুদ্রকায় এক প্রকার শস্যনাশক পাখী)—অন্যরাজা বা রাজাগণ কর্তৃক বলপূর্বক অধিকার প্রতিষ্ঠা[২]। তা' ছাড়া প্লাবণ, মহামারী প্রভৃতির দরুণ, অনেক সময়, ঠিকমত কৃষিকাজ না করা কিংবা উঠতি ফসল নষ্ট হওয়া-- প্রভৃতি কারণে দেশে অভাব লেগে যেত, এবং কিছুদিন জনসাধারণের বেশ কষ্টেই কাটাতে হত। রোগ ব্যাধির প্রকোপে চিকিৎসার প্রয়োজনে একমাত্র বৈদ্য বা কবিরাজ-ই ছিল প্রধান অবলম্বন। যদিও তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রোগ-নিরাময়ের বিধি-ব্যবস্থাও একেবারে কম ছিল না। মন্ত্রশক্তির উপরে অগাধ বিশ্বাস ছিল আপামর জনসাধারণের যেন মজ্জাগত। কি ধনী, কি নির্ধন, কিবা রাজা, কিবা

১. দেশো নদ্যম্বু বৃষ্ট্যম্বুপালিতঃ কৃষিজীবিতঃ। স্যান্নদীমাতৃকো দেবমাতৃকশ্চ যথাক্রমম্।

২. অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ। অত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ইতয়ঃ স্মৃতাঃ।।
এই 'ইতি' চিরকাল শস্যের উপদ্রবরূপে স্বীকৃত।

প্রজা —সকলেরই আস্তিক্য-মূলক দৈবীশক্তির প্রতি বিশ্বাস থাকাব ফলে বিজ্ঞ-অজ্ঞ উভয় শ্রেণীর পেশাদার ওঝা-বৈদ্যের অভাব ছিল না। নদী-নালা-হাওড়-খাল-বিলময় দেশটির প্রায় সর্বত্রই সর্পদংশনেব উপদ্রব চিরকাল থাকায় এবং তৎসম্বন্ধে কার্যকর ঔষধ-পত্রের তেমন কোন সংস্থান না থাকায় (এখনো কিন্তু এই বিষয়েব যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য ঔষধ পত্র নেই) গাকড়িয়া সম্প্রদায় ছিল এই ব্যাপারে শেষ ভরসার স্থল। সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক, শুনা যায় যে তাদের মধ্যে দু'পাঁচজন সত্যিকার অর্থেই সর্পদষ্ট রোগী সুস্থ করতে পারত। গরুড়পুবাণ— পদ্মপুরাণের বিষহরীর উপাখ্যান এই ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে নিরুপায়ের উপায় হিসাবে গণ্য হয়েছে। বিষহরী মনসার পূজাদ্বারা সর্পভয়, কুব্জিকাতন্ত্র প্রভৃতিতে উপস্থাপিত বিবিধ বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী শীতলার পূজাদ্বারা তাঁর প্রকোপ, কালীপূজার মাধ্যমে কলেরা (তৎকালীন নাম ওলাউঠা) রোগের প্রাদুর্ভাব, ষষ্ঠীতন্ত্রানুসারে রক্তমাদ্রী-ষষ্ঠী-ডাঙ্কুর-জলকুমার প্রভৃতির সেবা-পূজাব মাধ্যমে বহুবিধ স্ত্রীরোগ, পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নের (শিবপূজা-চণ্ডীপাঠ-দুর্গামন্ত্রজপ-মধুসূদনমন্ত্রজপ— তুলসীদান) সাহায্যে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত নানাবিধ বিপদ্-বিপর্যয় উপশমিত করার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। কেহ কেহ যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের অন্যতম মঙ্গল কাব্যের প্রণেতা বিজয়-গুপ্তকেই মনসাপূজার প্রবর্তকরূপে বলতেও দ্বিধা করে না, তাদের কথা স্বতন্ত্র। বিভিন্ন মহাপুবাণ-উপপুরাণ এবং বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করলে আর ওরকম কথা বলা সম্ভব হত না। মনসার পূজা আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। পেশাদার হোক বা সখের দলপতি হোক, বিজয়গুপ্ত ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য গাইয়ে-কবি। তাই সুন্দর করে এক পাঁচালি লিখে তার রয়হানি বা রয়ানি গানের মাধ্যমে মান-যশ পেয়েছেন প্রচুর। মনসামঙ্গল যে গেয় পাঁচালি তা' উহার বন্দনা-ধ্যায় পড়লেই পরিষ্কার বুঝা যায়। নারায়ণ দাস, বৌদ্ধ (বা বৈদ্য) জগন্নাথ, রায়-বিনোদ প্রভৃতি পরবর্তী অনেকে স্থানিক প্রভাব-প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন ঐ মনসার পাঁচালি রচনা করেই। কেবল হরিদত্তের বিরুদ্ধে বিজয়গুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ পেয়েছে—"প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত"--কথার মাধ্যমেই। হরিদত্তের নামটা যে কানা হরিদত্ত নয়, শুধু হরিদত্ত, তাও বিজয়গুপ্তের কথায়ই পাওয়া যায়---"হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত পাইল কালে।" এই পংক্তিতেই বুঝা যায় যে হরিদত্ত বিজয় গুপ্তের চেয়ে বহু আগেকার লোক ছিলেন, কালে---দীর্ঘকালের ব্যবধানে তাঁর গীত লোপ পেয়েছে। সুতরাং বিজয়গুপ্তই যাঁকে অনেক প্রাচীন গীতিকার বলে স্বীকার করেছেন, তাকেও যদি মনসাপূজার অথবা রয়ানি গানের প্রবর্তক বলা হত তা'ও ঠিক হত না। কেন না, বাংলায় গীতি-পাঁচালি সৃষ্টির আগেও তো গান বা গীতি রচিত বা গীত হয়েছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের গীতগোবিন্দ

গানের-ই বই। তা' সুর-তাল-লয়-যোগে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে যে গীত হত, তা তার উপরকার রাগ-রাগিণী এবং তাল নির্দেশের সাহায্যেও বুঝা যায়। বাংলা ভাষা সৃষ্টির পূর্বকালে সংস্কৃত ভাষা সবার পক্ষে সমান উপযোগী না থাকলেও প্রাকৃত ভাষা-ভাষীরা তা' বুঝতে পারত। প্রাকৃত ভাষার বিভিন্নতা আঞ্চলিক ফল, তৎসত্ত্বেও একপ্রকার প্রাকৃতভাষী অন্যস্থানের প্রাকৃত বুঝতে পারত। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যগুলো মঞ্চস্থ হয়ে দর্শক-শ্রোতা-সাধারণের কাছে অনুপযোগী হত না। তা'হলে ওগুলোর রচনাও অন্যরকম হত। সেই সুদূর খৃষ্টপূর্বকালের ভাসের নাটকাবলী, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক—সবটাতেই প্রাকৃত-সংস্কৃত—উভয়বিধ ভাষার সমাবেশ রয়েছে। নাট্যকর, বাদ্যকর, সজ্জাকর, কাঁসারী, শাঁখারী, বারুজীবী, পাটীকর, ভুঞ্জমালী, পরামাণিক, রজকদাস, মালাকর কুম্ভকার, ভাস্কর, স্থপতি, সূতার, চর্মকার,—প্রভৃতি অসংখ্য বৃত্তিভোগী—শ্রেণীপেশা-জীবীরা স্বস্বকাজে নিয়োজিত থেকে বাংলার সামাজিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। চারুশিল্প-কারুশিল্প, শিক্ষামূলক বৃত্তি, গুরুত্ব-পৌরোহিত্য, অধ্যাপনা, পেশাদার লেখক, ধনিক-বণিক, দোকানদার, খনক, গণক, ইত্যাদি কোন কিছুরই অভাব বাঙালীদের মধ্যে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে কেউ দেখাতে পারে না। আস্তিক্য ছিল একরকম মজ্জা-মাংসে জড়ান। অনাস্তিক্য বা নাস্তিক্য তাঁরা কোন কালেই পছন্দ করে নি, যার প্রকাশ দেখা গিয়েছে মহাবীর জৈনের প্রতি অনাদর-অনীহার মধ্যদিয়ে। আজীবিক বা জ্যোতির্যীর প্রতি বৌদ্ধ-ধর্মের অনাস্থা থাকা সত্ত্বেও সনাতন পন্থীদের মধ্যে এবং জৈনদের মধ্যে জ্যোতিষ-চর্চা প্রবল ছিল। ইষ্ট এবং পূর্তকর্ম বলে যা আজও সমাজে চলতি আছে, তা' সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে চলমান। ইষ্ট, পূর্ত শব্দদ্বয়ও বাংলা ভাষায়, তথা তৎ-পূর্ববর্তী প্রাকৃত ভাষায় তৎসম রূপেই প্রচলিত। ইষ্ট—দেবালয়, মন্দির, মঠ, আশ্রম, পান্থশালা, অতিথিশালা, মানমন্দির, নাট্যালয়, হর্ম্য-প্রসাদ প্রভৃতি।[১] আর পূর্ত খাল-নালা-পুকুর-দীঘি-রাস্তা-ঘাট-বাঁধ- মাঠ- ময়দান- আরাম- উদ্যান- নর্দমা-পয়:প্রণালী-কূপ-ইন্দারা প্রভৃতি।[১] কমবেশী এসবের ব্যবস্থা অতি প্রাচীন কাল থেকেই এদেশে চালু ছিল। সুতরাং এসমস্ত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের পত্তন-সংস্কার-পুনঃসংস্কার ইত্যাদিও ছিল অপরিহার্য। এমন এক চমকপ্রদ সামাজিক সুপরিবেশের মধ্যে অনেক মল্ল-বীর-যোদ্ধা-সৈনিক-সেনানীরাও যেমন ছিল, তেমন আবার রাজনৈতিক ধুরন্ধরও ছিল। অনেক জ্ঞানী মহাজন জন্মেছে, সমাজে যথোপযুক্ত অবদান রেখেছে, কিন্তু কালের দীর্ঘ ব্যবধানে এখন তাঁদেরে ঠিকমত নির্ণয় করা—নির্দেশ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সকলেই গ্রন্থ পাথরের ফলকে লিখে যান নি, বা তা' সকলে

১. ইষ্ট এবং পূর্ত শব্দের সংজ্ঞা-সংজ্ঞীগত কিছু পার্থক্যও পাওয়া যায়।

করতে পারেও না। আমরাও যেমন আজ (ইং ১৯৮৬/২৯শে নবেম্বর) নেহাৎ অস্থায়ী কাগজের উপর লিখে চলছি, তৎকালীন গ্রন্থকার-লেখকদের অধিকাংশই এরকম অস্থায়ী পত্রের উপর মসীময় অক্ষর লিপির সাহায্যেই গ্রন্থ রচনা করেছেন বা আদর্শগ্রন্থ থেকে নকল করেছেন। তন্মধ্যে পরম্পরাগত হয়ে যে কয়খানা আমাদের কাল পর্যন্তও এসে পড়েছে, কেবল সে কয়খানারই তো খবর আমরা জানি। অথচ, কালের অতলে তলিয়ে যাওয়া অসংখ্য পুঁথিপত্তরে যে প্রাচীন বাঙালীর জীবনালেখ্য ছিল—তা না মানাই অস্বাভাবিক। অনুকরণপ্রিয় বাঙালীরা অনুকরণে যেমন ছিল ওস্তাদ, তেমন আবার, অনুকৃতিলব্ধ বিষয়কে রপ্তকরে আত্মস্থকরে আত্মিক করে নিতেও ছিল সুদক্ষ। আর্যায়ণ যদি মানতেই হয়, তবু তো' খৃষ্টপূর্ব দেড়হাজার বছর আগে মানলেও,—সাড়েতিন হাজার বছরের কথা। আর, উল্লিখিত মহাভারত পর্যন্ত কালানুক্রমের পরিপ্রেক্ষা গ্রহণ করলে (অবশ্যই একদিন তা করতে হবে) সে তো আরও অনেক আগেকার হয়ে দাড়ায়। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে একটানা আর্য সংকৃতির হাজারো বৈশিষ্ট্য বাঙালীসমাজে বিমূর্ত-ই ছিল এবং আছে ও থাকবে। অনার্যাচার বাঙালীদের কখনও ছিলও না, আর্যবিচ্ছিন্নতাবাদীরা শত চেষ্টাকরেও তা' লক্ষ জোড়া তালি দিয়ে সঠিক দাড় করাতে পারেন নি বা পারবেনও না। অসংখ্য সনাতনী তন্ত্রশাস্ত্র এবং বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্র থেকেই ঝাড়-ফুঁক্-বাণ-টোনা-তুক্-তাক্ ছড়িয়েছে। কোন বিদেশ থেকে তা' আমদানী নয়। সংস্কৃতির মূল উৎস থেকেই ওসমস্ত নির্গত-আগত-উদ্গত।

এই শতাব্দীর সবচেয়ে' আগে উল্লেখযোগ্য বিদ্বান্ অধ্যাপক গ্রন্থকার চন্দ্রগোমিন। কেহ কেহ ইঁহাকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলেন। ইনি বরেন্দ্রে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্প-কলা বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি আচার্য অশোক নামক এক বৌদ্ধ পণ্ডিতের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। প্রাচীন কালে যেসব বাঙালী বাংলার বাইরেও বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন, ইনি তাঁদের অন্যতম। তিনি নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য-পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পাণিনি ব্যাকরণের সূত্রাশ্রয়ে এক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন, যাহা সম্ভবত, চান্দ্রব্যাকরণ নামে পরিচিত। কবিকল্পদ্রুম গ্রন্থে বোপদেব যে আটজন আদি শাব্দিকের নামে এক জয়ধ্বনি দিয়ে গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলেন, তার মধ্যেও এক চন্দ্র আছেন। তবে, সেই চন্দ্র এই চন্দ্রগোমিন কিনা—নিশ্চিত করে বলা চলে না। বাংলাদেশে এই চান্দ্র-ব্যাকরণ যদিও পাণিনি ও কলাপের ন্যায় ব্যাপক আলোচিত হয় নি, তথাপি চন্দ্রগোমিনের ব্যাকরণও সুপরিচিত। অবশ্য ইহা মৌলিক ব্যাকরণ নয়।

চান্দ্রব্যাকরণ বাদেও তাঁর অপরাপর গ্রন্থ হল—পারায়ণ এবং লিঙ্গকারিকা বা লিঙ্গানুশাসন। ক্ষীরস্বামী, পুরুষোত্তমদেব, উজ্জ্বলদত্ত প্রভৃতি চন্দ্রগোমিনের গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

বরাহ মিহির : এই শতাব্দীর সাংস্কৃতিক বিকাশের গ্রন্থোৎপত্তির ধারায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন বরাহ মিহির। তাঁর পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে, হিসাবমত ৫০৬ খৃষ্টাব্দকে অবলম্বন করেই গণিতসিদ্ধান্ত নিরূপিত হওয়ায়, উহাই তাঁর কালনির্ধারণরূপে গণ্য হয়। তাঁর গ্রন্থ অনেক—১। আরুঢ়জাতক, ২। কালচক্র ৩। ক্রিয়াকৈরবচন্দ্রিকা, ৪। জলার্গলা, ৫। জাতক কলানিধি, ৬। জাতক সরসী, ৭। জাতক সার/লঘুজাতক, ৮। দৈবজ্ঞবল্লভা, ৯। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১০। প্রশ্ন-চন্দ্রিকা, ১১। প্রমাদলক্ষণ, ১২। বৃহজ্জাতক/হোরাসার, ১৩। বৃহৎসংহিতা, ১৪। বৃহদ্‌যাত্রা, ১৫। ময়ূরচিত্রক, ১৬। মুহূর্তগ্রন্থ, ১৭। যোগযাত্রা, ১৮। বট কলিকা, ১৯। সারাবলী এবং ২০। বরাহমিহিরীয় জ্যোতিষ।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দশকের পর থেকে আজ পর্যন্ত সকল জ্যোতি-ষীদের কাছে বরাহমিহির অতি প্রামাণিক জ্যোতির্বিদ্। তাঁর গ্রন্থ সারা ভারতে অত্যন্ত আদরে-আগ্রহে চিরদিন অধীত হয়ে আসছে। জ্যোতিষ-তন্ত্রের লীলাস্থলী বাংলাদেশে বরাহমিহিরের যাবতীয় গ্রন্থই সম্যক্ অনুশীলিত হয়ে আসছে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

অন্যান্য লেখকদের মধ্যে জৈন সিদ্ধসেন দিবাকরের নাম উল্লেখ্য। তিনি দিগম্বর সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত দার্শনিক। জৈন ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর ন্যায়াবতার এবং সন্মতিতর্কসূত্র অত্যন্ত উচু মানের গ্রন্থ। অপর গ্রন্থ তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে'র ভাষ্য। শ্বেতাম্বর জৈনাচার্য বাদিদেবসূরির প্রমাণনয়তত্ত্বালোক, কুমার নন্দির—কুমার-নন্দিকারিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কুমার নন্দি বাঙালী ছিলেন। বরাহমিহিরেরপুত্র পৃথুযশার 'হোরাষট্‌পঞ্চাশিকা' গ্রন্থখানাও ফলিত জ্যোতির্ব্যবসায়ীদের নিত্যপ্রয়ো-জনীয় প্রামাণিক গ্রন্থ। উল্লিখিত সিদ্ধসেনদিবাকর এবং পৃথুযশা বাঙালী ছিলেন না ঠিক, কিন্তু বাদিদেব সূরি, কুমার নন্দি, বাঙালী ছিলেন। সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে জ্যোতিষের মূল্যবান্ গ্রন্থ অতিদ্রুত যে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, যার মাধ্যমে বরাহমিহির এবং তাঁর পুত্র পৃথুযশার অনুসারী জ্যোতিষী বাঙালীদের মধ্যেও এই শতাব্দীতেই গড়ে উঠেছিল তা কোন প্রকার অতিকল্পনা নয়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী

সপ্তম খৃষ্টীয় শতক সবদিক থেকেই উজ্জ্বল। এ শতাব্দীতে আমরা যেমন দুজন উল্লেখযোগ্য চীনা পরিব্রাজক পেয়েছি, তেমন ঐতিহাসিক সাহিত্যিক বাণভট্ট প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থকার পেয়েছি, যাঁদের অতুলনীয় অনেক গ্রন্থ সারা ভারত বর্ষেরই সাংস্কৃতিক বিশেষ অবদান রূপে গণ্য হয় এবং যাঁদের কেবল সংস্কৃত ভাষার নয়, প্রাকৃত ভাষারও অন্তত এক একখানা উচ্চমানের গ্রন্থ আমাদের শিক্ষাঙ্গণে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন--বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট, ভট্টনারায়ণ, কুমারিল ভট্ট, দণ্ডী, ব্রহ্মগুপ্ত, ভামহ, ভর্তৃহরি, ভবভূতি হর্ষবর্দ্ধন, গুণপ্রভসূরি, রবিষেণ, মহেন্দ্রবিক্রম, অনঙ্গহর্ষ মাত্রদেবী, ধর্মকীর্তি, স্থিরমতি, ধর্মপাল, জিনেন্দ্রবুদ্ধি, ভর্তৃমেণ্ঠ, মানতুঙ্গ, পুষ্পদন্ত (?) জয়াদিত্য-বামন প্রভৃতি। বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য-সমৃদ্ধ এই শতাব্দীই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বাঙালীর জাগরণের যুগ বলে গণ্য হয়।

বাণভট্ট : অনন্যসুলভ কবিত্বের অধিকারী মহাকবি বাণভট্ট, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম পাদের লোক। তিনি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। থানেশ্বরের (প্রাচীন নাম স্থান্বীশ্বর) মৌখরী বংশীয় রাজা প্রভাকর বর্দ্ধনের কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষবর্দ্ধন, দিগ্বিজয়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৬০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪২/৪৩ বৎসর তা পরিচালনা করেন। মহাকবি বাণভট্ট এই সময়ের শ্রেষ্ঠ কবিত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন--কাদম্বরী (কথা সাহিত্য) এবং হর্ষচরিত (আখ্যায়িকা) গ্রন্থ দু'খানিতে। যদিও 'পার্ব্বতী পরিণয়' এবং 'মুকুট তাড়িতক' নামক দু'খানা নাটক এবং 'চণ্ডীশতক' নামক একখানা প্রশস্তিকাব্যও তিনি লিখেছেন, তথাপি কাদম্বরী এবং হর্ষচরিত, তুলনায় অনেক উঁচুদরের—প্রমাণিত হয়েছে। সর্বশেষ গ্রন্থই বোধ হয়, কাদম্বরী সেহেতু, এ গ্রন্থের সমাপন তিনি করে যেতে পারেন নি। তিনি কেবল পূর্বভাগ পর্যন্ত-লেখা শেষে করে-ছিলেন। সুযোগ্য পুত্র ভূষণভট্ট, পিতার আরব্ধ কার্য—কাদম্বরীর দ্বিতীয় ভাগ বা শেষভাগ রচনা করে সমাপন করেন। বিশেষত্ব এই যে, পিতা যেভাবে শব্দালঙ্কার-অর্থালঙ্কারের নিয়ত যুগপৎ সমাবেশে সমুজ্বল, প্রসাদ-মাধুর্য-গুণে হৃদয়গ্রাহী করে লেখনী-গোমুখের বাণীবিন্যাস-নির্ঝরিণী প্রবাহিত করেছিলেন, পুত্রও তাঁর সম্পূর্ণ সমতা রক্ষা করে কাদম্বরীকে সমাপনী পর্যন্ত এগিয়ে নিয়েছেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিদ বিখ্যাত ওয়েবার সাহেব কাদম্বরী সম্পর্কে লিখেছেন—"এ যেন কোন

ভারতীয় গভীর বনানী, প্রবেশ করতে সর্বদাই শঙ্কা---একটু অসতর্কতায় না জানি কোন ভয়ঙ্কর শ্বাপদের সম্মুখীন হতে হয়।" এই কাদম্বরীতেই বাণ তাঁর পিতৃকুলের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বাৎস্যায়ন বংশীয় চিত্রভানুর পুত্র। পিতামহ অর্থপতি এবং প্রপিতামহের নাম কুবের। কুবেরকে স্বয়ং ব্রহ্মার সাথে উপমা দিয়ে বলেছেন, তিনি গুপ্ত বংশীয় অনেকের কাছেই পরম পূজনীয় ছিলেন। পিতামহ অর্থপতি ছিলেন মৌখরীরাজদের গুরুজন এবং মহাপণ্ডিত--অধ্যাপক। এক পর্যায়ে এর অধ্যাপনার বর্ণনায় লিখেছেন[১]—"যাঁর বাড়ীতে অনবরত শ্রবণে খাঁচায় আবদ্ধ শুক-সারীগুলি পর্যন্ত এমন শিক্ষিত হয়েছিল যে তাদের কাছে শঙ্কিত হয়েই ছাত্রগণ যজুর্বেদ এবং সামবেদ আবৃত্তি করত।" হর্ষচরিতেও বিন্ধ্যাটবীস্থিত দিবাকর-মিত্রের বৌদ্ধ আশ্রমের বর্ণনায়ও তিনি এরকম কথাই লিখেছেন—"তত্রত্য পেচকগুলি পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণহেতু বোধিসত্ত্ব-জাতক-সমূহ জপকরা শিখে-ছিল।"[২] সাহিত্যে অতিশয়োক্তি তো দোষ নয়, অলঙ্কার। তা তো থাকবেই। কিন্তু অতিশয়োক্তির অন্তর্গত বস্তুসত্তাটাও অসাধারণই মনে করতে হবে।

কথা সাহিত্যের শ্রেণীতে বর্তমানে যতগুলো গ্রন্থ দেখা যায়, যেমন ১। বর রুচির চারুমতী' (এ কোন্ বররুচি, তাও বলা যায় না। দায়ে পড়েই প্রাচীন বর-রুচি ব্যতিরেকেও অন্তত, একজন অতিরিক্ত মানতে হয়): প্রাচীন বররুচি কর্তৃক বার্তিকে উল্লেখিত এবং মহাভাষ্যে পতঞ্জলি কর্তৃক ২। বাসবদত্তা, ৩। সুমনোত্তরা এবং ৪। ভৈমরথী নামে নির্দেশিত কথাত্রয়; পুরুষোত্তম দেবের (?) হরিহারাবলীতে উল্লিখিত রামিল এবং সোমিল-উভয় কর্তৃক প্রণীত, ৫। শূদ্রক কথা; গুণাঢ্যের ৬। বৃহৎকথা (পৈশাচী প্রাকৃতে প্রণীত); ধনপাল কর্তৃত প্রণীত নমি (১১শ শতক খৃষ্টীয়াব্দ) কর্তৃক কাব্যালঙ্কারে উল্লিখিত ৭। তিলকমঞ্জরী. তিলক মঞ্জরীতে উল্লিখিত রুদ্র কর্তৃক প্রণীত ৮। ত্রৈলোক্যসুন্দরী; শ্রীপালিতের ৯। তরঙ্গবতী প্রভৃতি; তন্মধ্যে গুণাঢ্যের বৃহৎকথা যে বাণভট্টের কাদম্বরী-কথার আদর্শ উদ্দীপক তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৃহৎকথা গ্রন্থের উল্লেখ করে বাণভট্টই বলেছেন এমন গ্রন্থ কারই বা বিস্ময় উৎপাদন না করে? সুতরাং গুণাঢ্যের বৃহৎ-কথা দ্বারা বিস্মিত বাণভট্ট আর এক মহাবিস্ময় কাদম্বরী প্রণয়নে ব্রতী হয়েছিলেন। কাদম্বরীর বিষয়বস্তু অতি উজ্জ্বল। বিদিশার রাজা-শূদ্রককে অবলম্বন করেই যদিও কাদম্বরী গ্রন্থ আরব্ধ. তথাপি এক চণ্ডালকন্যকার উপহৃত পঞ্জরাবদ্ধ এক আশ্চর্য

---

১. জগুর্গৃহেষ্বভ্যস্ত সমস্ত বাঙ্ময়ৈঃ, সসারিকৈঃ পঞ্জরবর্তিভিঃ শুকৈঃ।
নিগৃহ্যমানা বটবঃ পদে পদে যজূংষি সামানি চযসা শঙ্কিতাঃ।। কাদম্বরী।

২. শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত 'জাতক' প্রথম খণ্ড উপক্রমণিকা পৃষ্ঠা পরিচিতি ৮/.

শুকপাখীকর্তৃক ভাষিত চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের অতিদীর্ঘ কাহিনীই গ্রন্থের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে কত স্থানের বর্ণনা, কত পার্শ্ব-আখ্যান-উপাখ্যান, উপদেশ, বিরহ-মিলন, রোমাঞ্চ যে স্থান পেয়েছে তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। ভাষার চাতুর্য, ভাবের গাম্ভীর্য, কথা-কাহিনীর সুশ্লেষ সঙ্গতি, অলঙ্কার-বিন্যাসের সুরুচি সৌষ্ঠব, পলে পলে উত্থাপিত আশা-অন্তরালিত কথা-চিত্রাবলীর আবেষ্টনীতে কখন যে আত্মভোলা হয়ে যায়, তা' খেয়াল রাখতেও পারেনা পাঠক। দিনের পর দিন এভাবে নিবিষ্ট থেকেও কোন শ্রান্তি-ক্লান্তি-বোধ ছাড়া-ই পাঠক, যেন শেষ হয়ে যাওয়ার ফুরিয়ে যাওয়ার মধ্যদিয়ে আর এক কাদম্বরী-বিরহব্যথা অন্তরে অনুভব করেন। এমন সৃষ্টি কাদম্বরী। গ্রন্থের নায়িকা কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের প্রিয়া, আর, পাঠকের কাছে প্রিয়ার লাবণ্যে লালিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় কথা কাদম্বরী।

বাণভট্টের অপর ঐতিহাসিক সাহিত্য হর্ষচরিত। ঐতিহাসিক সাহিত্যরূপে যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মহানামন-রচিত মহাবংশ, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের এই বাণভট্টের হর্ষচরিত, খৃষ্টীয় দশম শতকের বাক্‌পতিরাজের গৌড়বহ (প্রাকৃত ভাষায়), একাদশ খৃষ্টীয় শতকে পদ্মগুপ্ত পরিমল রচিত নবসাহসাঙ্কচরিত, বিল্হণের বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, দ্বাদশ শতক খৃষ্টীয়াব্দে সোমেশ্বরদত্তের কীর্তিকৌমুদী, হেমচন্দ্রের কুমারপালচরিত সন্ধ্যাকর নন্দির রামচরিত প্রভৃতি। তন্মধ্যে হর্ষচরিত গদ্যে রচিত আখ্যায়িকা। ইহা এক বিশাল গ্রন্থ। প্রথমে থানেশ্বরের রাজা, পরবর্তী কালে সম্রাট্ শ্রীহর্ষদেবের বা হর্ষবর্দ্ধনের বহুব্যাপী-জীবনী অবলম্বনে রচিত বিধায় ঘটনাবহুলও বটে। ইহাতে ঐতিহাসিক ঘটনা কাব্যিক পরিবেশনায় কিভাবে ঠাঁই পেয়েছে তার একটি অংশ তুলে ধরছি—

"রাজসভাকক্ষে সমাসীন হয়ে শ্রীহর্ষ, অতিব্যস্ত প্রবেশপরায়ণ কুন্তলকে লক্ষ্য করলেন। অবলীলাক্রমে মালবসৈন্য পরাজিত করলেও অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধন, গৌড়াধিপের (শশাঙ্ক) মিথ্যা উপচারে বিশ্বাস স্থাপন করত একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় শশাঙ্কের ভবনে গিয়ে নিহত হয়েছে—তার কাছ থেকে শুনতে পেলেন।

শুনেই সে মহাতেজস্বী একেবারে জ্বলে উঠল, গৌড়েশ্বরকে লক্ষ্য করে অনেক তিরস্কারও করল। অনতিবিলম্বে গৌড়াধিপতির উদ্দেশ্যে অভিযান করার অভিপ্রায় দেখে, তাঁর পিতারও বন্ধুস্থানীয় সেনাপতি সিংহনাদ, হর্ষকে সাবধান করে কিছু গুরুত্ব-পূর্ণ কথা বলেছিল। তাতে উৎসাহিত হয়ে ভারতবর্ষ জয় করার প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত

করেছিল সে। রাতটা কেটে গেলেই অসংখ্য গজবাহিনীর অধিকর্তা স্কন্দগুপ্তকে ডেকে আনল। সে ছিল অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ, তাই, মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা কবার জন্য বহু অনুরোধ জ্ঞাপন করে মন্ত্রণা গোপন না থাকলে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—অনর্থের বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরল—

'মন্ত্রগুপ্তি নষ্ট হলে যে বহুপ্রকার অনর্থ ঘটে তা' প্রভুও শুনে থাকবেন, যথা পিঞ্জরাবদ্ধ সারিকাকর্তৃক শ্রুত মন্ত্রণা প্রকাশিত হওয়ায় পদ্মাবতীর নাগবংশীয় বাজা নাগসেনেব বিনাশ সংঘটিত হয়েছিল; রাজকীয় গোপন পরামর্শ একটা শুকপাখী শুনতে পাওয়ার ফলে শ্রাবস্তীর রাজা শ্রুতবর্মাব রাজ্য নষ্ট হয়েছিল; মৃত্তিকাবতীর রাজা স্বর্ণচূড় স্বপ্নের ঘোবে প্রলাপ করায় মন্ত্রণা ফস্কে যাওয়াব ফলে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলে; চূড়া-মধ্যে প্রতিবিম্বিত গোপন পত্রের পাঠ পড়ে' স্বর্ণ-চামর ব্যজনবতা পবিচারিকা-ই শেষ পর্যন্ত, যবনেশ্বরের যমের কার্য সমাধা করে-ছিল; মথুবার রাজা বৃহদ্রথ অত্যন্ত ধনগৃধ্নু ছিল বলে অন্ধকার বজনীতে ভূপ্রোথিত ধনবত্ন উত্তোলন করাব কালে, উদাতাস্ত্র বিদূরথেব সৈনিকের হাতে মাবা পড়ল; কৃত্রিম হাতীব মধ্যে লুকিয়ে থাকা মহাসেনের সৈনিকরা বন্যহাতীর বিচরণবনে ভ্রমণপ্রিয় বৎসবাজকে হত্যা করেছিল; অগ্নিমিত্রেব পুত্র সুমিত্র ছিল অত্যন্ত গান-বাজনা প্রিয়। গান-বাজনাব দলেব বেশে প্রচ্ছন্ন শত্রুর মধ্যে নিশ্চিন্তে অবস্থান করার কালে মিত্রদেব কর্তৃক ছিন্নশিব হয়ে সে মাবা পড়ল; অশ্মকেব বাজা শবভ ছিল বীণা-বাদ্যপ্রিয়। বীণাব বাঁটেব মধ্যে তববাবি লুকিয়ে বেখে বীণাবাদকের বেশে উপস্থিত শত্রুবা বাজা শবভেব শিরচ্ছেদ করেছিল; সেনাপতি অনার্য পুষ্পমিত্র (পুষ্যমিত্র-শুঙ্গ) সেনানিবাস দেখাবাব ছলে নিয়ে নির্বোধ মৌর্যরাজ বৃহদ্রথকে পিষে মেরেছিল; আশ্চর্যবিষযেব প্রতি অত্যন্ত কৌতূহল পরায়ণ চণ্ডীপতীকে উপস্থিত যবননির্মিত কোন 'নভোযানে' কবে' কোথায় যেন নিয়ে গেল; (অরক্ষিতভাবে বিচরণ শীল) শিশুনাব রাজ কাকবর্ণের নগবোপকণ্ঠে তববারিব আঘাতে শিরচ্ছেদ ঘটেছিল; দেবভূতিনাম্নী দাসীকন্যার সহায়তায় রাণীর বেশে সজ্জিত অমাত্য বসুদেব, অত্যন্ত স্ত্রীসঙ্গ পরায়ণ কামুক শুঙ্গরাজকে নিহত করেছিল; অসুব-বিববরূপে অভিহিত গিরি-সুবঙ্গে ভ্রমণ বিলাসী মগধরাজকে, মেকলাধিপতির মন্ত্রিরা, অসংখ্য রমণীর নূপুরনিক্কণে আকৃষ্ট করে গোধনগিরির সুবঙ্গপথে মেকলবাজ্যেব মধ্যে নিয়ে গেল; মহাবাজ প্রদ্যোতেব অন্ত্যজ পুনর্ভব পুত্র কুমারসেন, মহাকালেব উৎসবে মহামাংস বিক্রয়ের কথাবার্তায় একেবারে মসগুল হয়েছিল বলে, তালজঙ্ঘের হাতে নিহত হয়েছিল। ইত্যাদি মোট ২৭টি মন্ত্রণা ফস্কে যাওয়ার বিষময় পরিণতির উপস্থাপন রয়েছে হর্ষচরিতে। এ ঘটনাগুলো সবই সংঘটিতও বটে ঐতিহাসিকও বটে।

তৎকালীন বা তৎপূর্বকালীন ওসব রাজ্যের এবং রাজাদের সম্বন্ধে আমরা অবহিত নই বলে, অনেকটায় কেমন যেন লাগে। মৌর্য বৃহদ্রথ ও অগ্নিমিত্র-তনয় দেবমিত্রাদির ঘটনা জানা বলে আর ঐ 'কেমন' লাগে না। ঐতিহাসিক হলেও তো কাব্য, তাতে অতিরঞ্জন বা পক্ষপাতাদির দোষ থাকবেই তো। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যেতে পারে 'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকায়।

উল্লিখিত অর্থপতির অধ্যাপনার এবং দিবাকর মিত্রের আশ্রমের বর্ণনার মাধ্যমে আর্য সনাতন ধারা এবং বৌদ্ধ ধারার শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাবল্য, অন্যনিরপেক্ষরূপে যুগপৎ প্রবাহিত হওয়ার খবরে, জৈনধর্মের কিঞ্চিৎ স্তৈমিত্যই যেন ধরা পড়ে। তথাপি, পরস্পর প্রতিস্পর্দ্ধী প্রধান প্রধান তিনটি ধর্মমত যে স্ব স্ব অনুসারীদের মধ্যে প্রবলভাবে আলোচিত অনুশীলিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও উপগুপ্তের আমল থেকে প্রধান রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্মের দীপ্তি তখনও অত্যন্ত প্রখর। সম্রাট্‌ হর্ষবর্দ্ধন ব্রাহ্মণ্যবাদী বা সনাতন-পন্থী হলেও বৌদ্ধ, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বেশী ছিলেন। সম্রাট হয়েও হর্ষবর্দ্ধণ স্বনামে তিনখানা নাট্যসাহিত্য প্রচারিত করেছেন ১। নাগানন্দ, ২। প্রিয়দর্শিকা (নাটিকা), এবং ৩। রত্নাবলী। তিনখানা নাট্যসাহিত্যই বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাতিশয্যের নিদর্শন। যেমন সনাতন পন্থী মহপণ্ডিত বাণভট্ট শ্রীহর্ষের সভাসদ, তেমন দিবাকরমিত্র বা দিবাকর মাতঙ্গ বৌদ্ধ পণ্ডিত হলেও হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনও একটি বৌদ্ধ সঙ্গীতির ব্যবস্থাপনা করেছিলেন। সেটি বোধহয় ৬ষ্ঠ বৌদ্ধ সঙ্গীতি। অর্থের বিনিময়ে নিয়োজিত গ্রন্থকারের সাহায্যে প্রণীত গ্রন্থে অর্থদাতা গ্রন্থকার হওয়ার দৃষ্টান্ত, বোধহয়, হর্ষবর্দ্ধনই প্রথম। কাব্যপ্রকাশে মম্মট পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে হর্ষবর্দ্ধনের গ্রন্থের প্রণেতা ধাবক নামক কোন পণ্ডিত।

এই সময়ে ময়ূরভট্ট নামেও একজন গ্রন্থকার ছিলেন। সম্পর্কে তিনি ছিলেন বাণভট্টের জামাতা (?) তাঁর গ্রন্থ যদিও আর্যামুক্তামালা (খণ্ড কাব্য) এবং সূর্যশতক (স্তব), তথাপি তিনি যে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গ্রন্থকাররূপে পরিচিত ছিলেন তার আভাস পাওয়া যায়– ত্রিলোচন দাস কবীন্দ্র, রাজশেখর (কাব্যমীমাংসা), ক্ষেমেন্দ্র, মম্মট, গণরত্নমহোদধি, ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থে উল্লেখের মাধ্যমে। শুনা যায় যে তিনি দুরারোগ্য কোন ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্বয়ংকৃত স্তবে দিনকরের স্তুতি করতে করতে রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

সপ্তম খৃষ্টীয় শতকের আর এক কৃতী সাহিত্যিক ভট্টনারায়ণ। ইনি মাত্র একখানা 'বেণী সংহার' নামক নাটক রচনা করেই প্রসিদ্ধি পেয়েছেন। স্ত্রী

চরিত্রবর্জিত বীর এবং রৌদ্ররসের প্রাধান্যে বিরচিত এই নাটকখানা অত্যন্ত আলোড়ন জনক। দুর্যোধনের রাজসভায় দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণে ক্ষুব্ধ ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের তপ্ত বক্ষশোণিতে দ্রৌপদীর বেণী বেধেঁ প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা আর তার সার্থকভাবে পূর্ণকরার ঘটনা-ই বেণীসংহার নাটকের প্রধান কাহিনী। কেশাকর্ষণ থেকে দীর্ঘ চৌদ্দটি বছর দ্রৌপদীর সেই দোদুল্যমান আলুলায়িত বেণী আর বাধাঁ হচ্ছিল না। নারীর অমর্যাদার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ধ্বংস, এ নাটকে সার্থক এবং সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। কবিকণ্ঠাভরণ, ঔচিত্যবিচারচর্চা, সুবৃত্ততিলক, গণরত্নমহোদধি এবং সরস্বতীকণ্ঠাভরণ প্রভৃতিতে ভট্টনারায়ণের সশ্রদ্ধ উল্লেখ রয়েছে। ভট্টনারায়ণ একজন বাঙালী পণ্ডিত।

কুমারিল ভট্ট : সপ্তম খৃস্টীয় শতকেই, মনে হয়, কুমারিল ভট্টের অভ্যুদয়। তিনি আসামের কামরূপ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলে ধারণা হয়। জৈমিনির পূর্বমীমংসা দর্শনের এক উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় প্রবর্তক ছিলেন ভট্ট কুমারিল।

এঁর কিছু কাল আগে 'গুরু' আখ্যায় পরিচিত প্রভাকরও এক সম্প্রদায় প্রবর্তকরূপে অভ্যুদিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত মীমাংসক সম্প্রদায়কে গুরু সম্প্রদায় বা প্রাভাকর সম্প্রদায় বলা হয়। প্রভাকরের 'বৃহৎমীমাংসা-সূত্রভাষ্য' এবং সম্ভবত, 'ন্যায়বিবেক' নামক গ্রন্থদ্বয়ের অবলম্বনেই প্রাভাকর সম্প্রদায়ের গ্রন্থ এবং সম্প্রদায়ের বিস্তার ঘটে। তাতে প্রভাকরের শিষ্য-ছাত্র শালিকনাথ, পরবর্তীদের মধ্যে বিশেষ ভূমিকার অধিকারী ছিলেন। শালিকনাথ তাঁর গুরুর (প্রভাকরের) পন্থানুগত হয়ে বৃহৎমীমাংসা-সূত্রভাষ্যের টীকা—ঋজুবিমলা, ন্যায়রত্ন এবং প্রকরণ-পঞ্চিকা, আর, শবরভাষ্যের টীকা ছাড়াও, বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যের ব্যাখ্যা নামক পাঁচখানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন এবং তাঁর পঠন-পাঠনের ধারার প্রবর্তন করেছিলেন বটে কিন্তু প্রভাকরের ধারা বা গুরুর ধারা, সমাজে যতটা আকর্ষণ জুগিয়েছে, তাঁরচেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণ যোগাতে পেরেছে ভট্ট কুমারিলের ধারা। এই জন্য, যদিও, পৌর্বাপর্য অনুসারে গুরুধারা বা প্রাভাকর-ধারা প্রথম, তথাপি পরবর্তী বা দ্বিতীয় কুমারস্বামীর বা কুমারিল ভট্টের ধারাই সামাজিক অবদানের পরিপ্রেক্ষায় উন্নততর ছিল।

মীমাংসা দর্শনের সৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্বেই কিঞ্চিৎ আলোচিত হয়েছে। বেদব্যাসের সাক্ষাৎ শিষ্য জৈমিনি মীমাংসা বা কর্মমীমাংসা (পূর্বমীমাংসা) দর্শনের প্রণেতা। তাঁর প্রণীত ধর্মসূত্র-ই মীমাংসা দর্শনের মূল। এই মূলের উপর বহু টীকা-ভাষ্য তৈরি হয়েছে। যেমন,—প্রভাকর গুরুকৃত বৃহতী টীকা, বিশ্বনাথের শিষ্য প্রভাকরকৃত

শাস্ত্রদীপিকা টীকা, রাঘবানন্দ সরস্বতীকৃত মীমাংসাসূত্রদীধিতি বা ন্যায়াবলী দীধিত টীকা, রাজচূড়ামণি কৃত তন্ত্রচূড়ামণি টীকা, রামকৃষ্ণকৃত প্রকাশিকা টীকা, রামচন্দ্রতনয় বৈদ্যনাথকৃত ন্যায়বিন্দু টীকা, ন্যায়রত্নকৃত টীকা, বল্লভাচার্যকৃত টীকা, যদুপতিকৃত টীকা এবং শবরস্বামিকৃত ভাষ্য, যা শাবরভাষ্য নামে পরিচিত বৃহৎ ব্যাখ্যা।

মীমাংসা দর্শনের প্রাপ্ত টীকা টিপ্পনী-ভাষ্যের মধ্যে শাবরভাষ্যই সর্বপ্রাচীন। কুমারিলের তন্ত্রবার্তিক এই শাবরভাষ্যের উপরেই প্রণীত। শাবরভাষ্যের প্রণয়ন-কাল নিয়েও মতভেদের অভাব নেই। অধ্যাপক জ্যাকোবি এবং ডঃ কীথের খৃষ্টকালের মধ্যেকার মতবাদ কেউ সমর্থন করে না। খৃষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দী হচ্ছে শাবরভাষ্যের প্রণয়ন কাল। তার ৮/৯ শত বছর পরের রচনা হলেও কুমারিলের 'তন্ত্রবার্তিক' অতি প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত সমীচীন গ্রন্থ। এই তন্ত্রবার্তিকীয় মতবাদ অনুসারেই ভট্ট কুমারিল বৌদ্ধদের সহিত প্রত্যক্ষ বাদানুবাদবিচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভট্ট কুমারিলের গ্রন্থগুলো হচ্ছে---

১। আশ্বলায়ন গ্রন্থকারিকা ব্যাখ্যা, ২। মানবশ্রৌতসূত্র-টীকা, ৩। মীমাংসা-তন্ত্র-বার্তিক, ৪। মীমাংসা-শ্লোকবার্তিক, ৫। লঘুবার্তিক, ৬। টুপ্‌টীকা, এবং ৭। বৃহৎটীকা প্রভৃতি।

জৈমিনিসূত্রের টীকাকারদের মধ্যে, শাস্ত্রদীপিকাকার বিশ্বনাথ, মীমাংসাসূত্র দীধিতিকার রাঘবানন্দ সরস্বতী, প্রকাশিকাকার রামকৃষ্ণ, ন্যাবিন্দুকার বৈদ্যনাথ বাঙালী ছিলেন, মনে হয় না। মীমাংসা শাস্ত্রের পঠন-পাঠন বাংলাদেশে খুবই বেশী ছিল। তবে, প্রভাকরের সম্প্রদায়ের চেয়ে কুমারিলের অনুসারীর সংখ্যাই ছিল বেশী। লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত হলায়ুধের উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়---তৎকালে (হলায়ুধের কালে) বেদ-আবৃত্তিমূলক পাঠাভ্যাসের প্রবণতা, রাঢ়ীয় এবং বরেন্দ্রীদের মধ্যে অনেকখানি কমে গিয়েছিল কারণ, উক্ত সম্প্রদায়দ্বয় বিচারমূলক মীমাংসা শাস্ত্রের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েছিল।[১] এই ঝোঁক যে কুমারিল ভট্টের প্রতি অর্থাৎ তাঁর মতাদর্শী গ্রন্থের প্রতি তাতে সন্দেহ নেই। তা' ছাড়া, দেখা গিয়েছে আবৃত্তিমূলক বেদ-পাঠ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত বাদানুবাদের সময় কাজে আসে না। তা' কেবল বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডেই বেশী উপযোগী। তাই, সমাজের প্রয়োজনে, আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে উক্ত রাঢ়ী এবং বরেন্দ্রীরা দর্শন শাস্ত্রের দিকে অধিক আকৃষ্ট

১. পণ্ডিত হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব'

হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের এই দুই শ্রেণী অনেক প্রাগ্রসর ভূমিকায় সমাজের কাজে তথা ব্যক্তিগত উপযোগ সৃষ্টিতে লেগে গিয়েছিল, মনে হয়।

দণ্ডী

অলঙ্কারশাস্ত্র বা সাহিত্যতত্ত্ব-শাস্ত্রের প্রকরণ-গ্রন্থকাররূপে দণ্ডকেই আদিম মনে করা হয়। যদিও দণ্ডীর কাব্যাদর্শের মধ্যে বহু উক্তি অগ্নিপুরাণ থেকে সরাসরি গৃহীত হওয়ায় অগ্নিপুরাণ-ই এ সম্বন্ধে উৎসগ্রন্থ এবং আকড় গ্রন্থ। তথাপি, পুরাণের নিজস্ব ভঙ্গীতে বহু বিষয়ের সমন্বয়মূলক এবং বাস্তবেও অন্যতম মহাপুরাণ অগ্নিপুরাণ, অসংখ্য বিষয়ের একত্র সঙ্কলনাত্মক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাই, শুধু সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ের গ্রন্থকাররূপে দণ্ডী-ই পথপ্রদর্শক। অনেকের মতে ভামহ (কাব্যালঙ্কার) দণ্ডীর পূর্বসূরি। কিন্তু সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। বরং ভামহের গ্রন্থেই দণ্ডীর উক্তির অনুবর্তিতাও দেখা যায়। দণ্ডীর কাল নিয়ে যথেষ্ট মতান্তর আছে। দশকুমারচরিত সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন[১]—"অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে দশকুমার চরিত পড়ে' ইহাকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর বলতে আমি কোন সঙ্কোচ বোধ করি না। কিন্তু মুস্কিলটা ঘটিয়েছেন তাঁরা, যাঁরা বাসবদত্তা কাব্যকে সুবন্ধুর রচিত এবং সুবন্ধুকে খামখা টানাটানি করে খৃষ্টকালের মধ্যে এনে ফেলেছেন।" অথচ পতঞ্জলির ফণিভাষ্যে বা মহাভাষ্যে পাণিনির "অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে" সূত্রের কাত্যায়ন কৃত বার্তিকে উল্লিখিত 'আখ্যায়িকা' কথার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে যে নামধরা—বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা, ভৈমরথী-নামক তিন খানা আখ্যায়িকার উল্লেখ রয়েছে, সে কথা যে তাঁরা জানতো না, অহেতুক টানাটানি করেছে, তা' না বলে পারা যায়? পতঞ্জলির উল্লিখিত 'বাসবদত্তা'র গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নেই। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর বাণভট্টের উল্লেখেও কেবল 'বাসবদত্তা' নামক আখ্যায়িকাই রয়েছে, গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নেই। সে কারণে খৃষ্টকালের কোন স্থানে সুবন্ধুকে বাসবদত্তার রচয়িতা মানতে গেলে---পতঞ্জলি-উল্লিখিত বাসবদত্তার অন্য কোন এক রচয়িতা মানতে হয় এবং বাসবদত্তা নামক আখ্যায়িকাও অন্তত দু'খানা মানতে হয়। কিন্তু, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম দিকের গ্রন্থকার, মহা মনীষী বাণভট্ট তাহ'লে দু'খানা বাসবদত্তা'র কথা কি উল্লেখ করেছেন? ঠিক একই রকম মুস্কিল ঘটেছে সেতুবন্ধ নামক প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা প্রবরসেনকে নিয়ে। কাশ্মীররাজ প্রবরসেন এবং সেতুবন্ধ কাব্যের রচয়িতা প্রবরসেনকে এক এবং অভিন্ন মনে করেই এসব ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে।

১. পূর্ব নির্দেশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ।

যা' হোক, এখন পর্যন্ত দেশীয় রীতিতে ওসব প্রাচীন সাহিত্যের উপযুক্ত ঐতিহাসিক গবেষণা হয় নি। তাই, অনির্বাবিতভাবেই এখন পর্যন্ত আলোচনা করতে হচ্ছে। দণ্ডীকে কোন ক্রমেই সপ্তম শতাব্দীর পরে আর নেয়া চলে না। সম্ভবত ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিন্যস্ত করে, উল্লিখিত কালিক ঝামেলা আপাতত এড়ান যায়। তবে, দণ্ডীকে আমরা প্রথম সাহিত্যতত্ত্বের গ্রন্থকার বললেও তাঁর পূর্বে যে আরো ও-রকম শাস্ত্র ছিল তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। দণ্ডী নিজেই বলেছেন পূর্বশাস্ত্রগুলো সংগ্রহ করে, তার প্রয়োগগুলো লক্ষ্য করে, যথাসামর্থ্য এই কাব্য-লক্ষণ করা হল।[১] এই দণ্ডীর কাছ থেকেই জানা গিয়েছে যে গৌড়ী প্রাকৃত নামে একটি প্রাকৃত ভাষা ছিল।[২] পরবর্তীকালে ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে যে ৬ প্রকার রীতির কথা আছে,[৩] তা' অনেক পূর্ব থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল তন্মধ্য থেকে কেবল বৈদর্ভী এবং গৌড়ী রীতি দু'টিই দণ্ডী বর্ণনা করেছেন, কারণ এ দু'প্রকার রীতির পার্থক্য সুস্পষ্ট।

দণ্ডীর সুখ্যাত গ্রন্থ তিনখানা কাব্যাদর্শ, দশকুমারচরিত এবং ছন্দোবিচিতি চিরকাল বাংলাদেশের সুধীসমাজে অত্যন্ত আদরের সহিত আলোচিত। তবে, মম্মটের কাব্যপ্রকাশ এবং বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণই ক্রমে ক্রমে কাব্যাদর্শের স্থান দখল করে নিয়েছে।

ব্রহ্মগুপ্ত

ইনি নিজেই বলেছেন যে, চাপবংশীয় ব্যাঘ্রমুখ নামক রাজার নির্দেশনায় তিনি গ্রন্থ লিখেছেন। এঁর পিতার নাম জিষ্ণু। এঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত (জ্যোতিষ)। অপর গ্রন্থ দু'খানা খণ্ডখাদ্য এবং পৈতামহীভাষ্য।

ভর্তৃহরি

ভর্তৃহরি এবং ভট্টি সম্ভবত এক ব্যক্তি। ইহার ভেদক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও আলাদা করে দেখার প্রবণতা, কতক ব্যক্তির মধ্যে প্রকট। প্রায় দেড় হাজার বছর পর্যন্ত হাজার হাজার অনুলেখকের লেখায় কোথাও ভট্টি, বা হরি, অথবা ভট্টিহরি, ভট্টস্বামী, ভর্তৃস্বামী, স্বামিভট্ট, হরিভট্ট—

১. পূর্ব্ব শাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রয়োগানুপলভ্য চ।
যথাসামর্থ্যমস্মাভিঃ ক্রিয়তে কাব্যলক্ষণম্॥ দণ্ডীকৃত কাব্যাদর্শ।

২. পর্ব্বেই Reference দেয়া হয়েছে।

৩. বৈদর্ভী চাথ পাঞ্চালী গোড়ীয়াবন্তিকা তথা।
লাটিয়া মাগধী চেতি ষোঢ়া রীতির্নিগদ্যতে"॥ ভোজপ্রবন্ধ।

নাম পাওয়া যায় বটে কিন্তু তার সম্ভাবা কারণও তো ভাবতে হয়। তা' যারা ব্যক্তিভেদ কল্পনা ঠিক কি? ভাষানিষ্ণাত ব্যক্তিও ভর্তৃহরির গ্রন্থগুলো সাগ্রহে পড়ে থাকেন। ব্যাকরণের প্রাথমিক পাঠ-গ্রহণের কালেও ভট্টিকাব্য পড়তে হয়। কাব্যের মাধ্যমে ব্যাকরণ শিক্ষা দেয়ার উপযোগী এমন সুন্দর গ্রন্থ আর কেহ প্রণয়ন করেছেন বলে জানা যায় না। ইঁহার গ্রন্থ অনেক—পতঞ্জলির মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা—মহাভাষ্যদীপিকা, মহাভাষ্যত্রিপদিব্যাখ্যান, বাক্যপদীয় এবং ভট্টিকাব্য—চির সমাদৃত। একমাত্র ভট্টিকাব্য গ্রন্থখানাই গ্রন্থকারকে কাব্যিক এবং বৈয়াকরণিক—উভয়রূপে প্রমাণ করতে যথেষ্ট। এ কাব্যখানার বহু টীকা টিপ্পনী প্রণীত হয়ে গ্রন্থজগতে উহাকে এক মর্যাদান্বিত আসন দিয়েছে। মাধবীয়ধাতু বৃত্তিতে ভট্টিকাব্যের শঙ্করাচার্যকৃত টীকার উদ্ধৃতি আছে। এছাড়া, সুপদ্মব্যাকরণপন্থী কন্দর্পশর্মার বৈজয়ন্তী; কুমুদানন্দের সুবোধিনী, জয়মঙ্গলের জয়মঙ্গলা, সংক্ষিপ্তসারপন্থী নারায়ণ বিদ্যাবিনোদনের ভট্টিবোধিনী, কলাপব্যাকরণানুসারী শ্রীকণ্ঠ-তনয় পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরকৃত কলাপদীপিকা, মুগ্ধবোধানুসারী ভরতসেনকৃত মুগ্ধবোধিনী, মল্লীনাথকৃত টীকা, সুপদ্মপন্থী রামচন্দ্রের ব্যাখ্যানন্দা, রামচন্দ্রবাচস্পতির সুবোধিনী, বিদ্যাবিনোদ কৃত ভট্টিচন্দ্রিকা প্রভৃতি ইহার প্রসিদ্ধ টীকা। রামায়ণের কাহিনীর অবলম্বনে, মোট ২২ সর্গে প্রণীত ভট্টিকাব্য গ্রন্থখানা বাংলাদেশের বিভিন্ন সারস্বত সম্প্রদায়ের প্রায় মুখে মুখেই রয়েছে।

ভবভূতি

ভবভূতিও সপ্তম খৃষ্টীয় শতকের শেষ অংশেই, মনে হয়, ছিলেন। তিনিও উত্তররামচরিত, মহাবীরচরিত এবং মালতীমাধব নামক তিনখানা নাটক রচনা করে মহাকবির মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন। এঁর পিতার নাম নীলকণ্ঠ এবং মায়ের নাম জাতুকর্ণী। পিতামহ ছিলেন ভট্ট গোপাল। এঁরা পদ্মপুরের অধিবাসী। ক্ষেমেন্দ্রের সরস্বতীকণ্ঠাভরণে, ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতিতে এঁর উক্তির উদ্ধৃতি আছে। ইনি বাক্‌পতিরাজের সমসাময়িক। বাক্‌পতিরাজ ছিলেন ভোজদেব বা ভোজরাজের পিতামহ।

এসব নাটকই এদেশে প্রসিদ্ধ। মালতীমাধবের কাপালিক অঘোরঘণ্টের এবং কপালকুণ্ডলার কাহিনীই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের উৎস। উত্তররাম চরিতের অদৃশ্য সীতার উপস্থাপনদ্বারা কবি নাট্যকৌশলের এক অপূর্ব নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। অনেকে সে অংশকে 'ছায়াসীতা' নাম দিয়ে চালাচ্ছেন কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, সীতার কোন ছায়া সেখানে ছিল না। বরং অদৃশ্যরূপে

কায়াই সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের হঠাৎ অঙ্গস্পৃষ্ট হয়, যা'দ্বারা স্পর্শলব্ধ প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে (ত্বাচ্‌প্রত্যক্ষ) তিনি চমকিত হয়েছিলেন এবং তজ্জন্যই অনুসন্ধিৎসু রাম সেখানে দর্শক-শ্রোতার এক মূর্ত উপভোগ্য নায়ক। গ্রন্থকার, বোধহয়, কাণ্যকুব্জরাজ যশোবর্মনের সভাকবি ছিলেন। উক্ত যশোবর্মন ৭৩৬ খৃঃ এবং তার কিছু আগে-পাছে ছিলেন বলে জানা যায়। সে হিসাবে ভবভূতি খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের কিয়ৎকাল পর্যন্ত ছিলেন সন্দেহ নেই।

বৌদ্ধ ধর্মকীর্তির গ্রন্থ—ন্যায়বিন্দু, স্থিরমতির গ্রন্থ—বসুবন্ধু-প্রণীত 'ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তি'র ভাষ্য, ধর্মপালের বিংশতিকাবিজ্ঞপ্তির ভাষ্য; জিনেন্দ্রবুদ্ধির কাশিকাবৃত্তিবিবরণপঞ্জিকা অথবা কাশিকাবৃত্তিন্যাস (পাণিনি ব্যাকরণীয়); ভর্তৃমেণ্ঠ (ইঁহাকে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের মাতৃগুপ্তের সমসাময়িকও বলা হয়) কর্তৃক প্রণীত হয়গ্রীববধ কাব্য/মহাকাব্য; মানতুঙ্গ রচিত ভক্তামরস্তোত্র ঋষভের (জৈন সন্ত) প্রশংসাত্মক; পুষ্পদন্তের মহিম্নঃস্তব এবং রাঘবপাণ্ডবীয়ের টীকা; জয়াদিত্য ও বামনের যৌথ গ্রন্থ কর্তৃত্বাধীন উক্ত জিনেন্দ্রবুদ্ধি যে গ্রন্থের ন্যাস নামে টীকা করেছেন—সেই কাশিকাবৃত্তি প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

রবিষেণ

ইনি একজন জৈন গ্রন্থকার। এই শতাব্দীতেই তিনি একখানা পুরাণ প্রণয়ন করেছেন—নাম পদ্মপুরাণ। এই পুরাণ সাধারণত প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভের গৌরবগাথা নিয়েই লিখিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পূর্বে সনাতনী আর্যদের মহাপুরাণ-উপপুরাণগুলোর একটি তালিকা দেয়া হয়েছে, যাতে নারদীয় মহাপুরাণের অনুসারে নামগুলো উল্লিখিত। তন্মধ্যে দ্বিতীয় মহাপুরাণের নামও পদ্মপুরাণ। এই পুরাণের সাথে রবিষেণকৃত পদ্মপুরাণের কোনই সম্পর্ক নেই। নামৈক্যে ইহাতে বিভ্রান্তি ঘটা অসম্ভব নয়। জৈন-বৌদ্ধদের বহু গ্রন্থই তত্তৎ ধর্মমতাদর্শের পশ্চাৎপটে আর্য পুরাণের সমান নামে পাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার যে, সনাতন আর্যধারার পুরাণগুলোর (মহা এবং উপ—উভয়) আদৌ কোন রচয়িতা নেই। সঙ্কলক বা সম্পাদকরূপে বেদব্যাসের নামেই সেগুলো প্রচলিত হয়ে আছে। খৃষ্টীয় নবম শতকে এরকম আরো জৈন পুরাণ প্রণেতা পাওয়া যাবে, যা' একান্ত পক্ষেই জৈনদের, আর্যসনাতনীদের নয়।

অমরসিংহ

অমরকোষ নামে পরিচিত অতি উপাদেয় অভিধান এঁর রচনা। ইনি বোধ হয় কায়স্থ শ্রেণীর লোক, তবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এঁর পুত্রের নামের সাথে দৈশিক বিশেষণ এবং কায়স্থ লিখিত আছে। অমরকোষ অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং এঁর বহু টীকা প্রণীত হয়েছে। আচার্য শ্রীধর ভট্টও অন্যতম টীকাকার। অমরকোষের চল্লিশটিরও বেশী টীকার বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়। বন্দ্যঘটী সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব নামক টীকায় বহু বাংলা দেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অমরসিংহের পুত্রের নাম লক্ষ্মণ মাথুর কায়স্থ। তিনি একজন উল্লেখযোগ্য চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর দু'খানা আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ—লক্ষ্মণোৎসব এবং বৈদ্যসর্বস্ব। অমরকোষ প্রাসঙ্গিক ভাবে একবার উল্লিখিতও হয়েছে। এ গ্রন্থের অন্যান্য কথা গ্রন্থের শেষ অংশে বিবিধ অভিধান গ্রন্থের প্রসঙ্গে পাওয়া যাবে। ডঃ গুস্তব অপার্ট অমরসিংকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর (খৃঃ) বলেছেন।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারায় গ্রন্থোৎপত্তি বিষয়ে অথবা সামাজিক উন্নতির বিষয়ে ঐতিহাসিক পটভূমিকা যেমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছে তেমন আমাদের আলোচ্য শতাব্দীও মুখ্য বিষয়ে বেশ কিছু উপাদান উপস্থাপন করে। বিভিন্ন সূত্রে কতিপয় গ্রন্থকার সম্বন্ধে জানা যায় যাঁদের গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষেই বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত করেছিল। ধর্মপালের শাসনাধীন বৃহত্তর সাম্রাজ্যে কান্যকুব্জ, মিথিলা প্রভৃতি উন্নততর অঞ্চল বাঙালীদের কাছেও অভিন্ন সাম্রাজ্যের সম্বন্ধ-সূত্রে অধিকতর ঘনিষ্টতায় আবদ্ধ ছিল।[১] তাই, অনেক দূর-দূরান্তের উপাদেয় গ্রন্থের সংস্পর্শও এখানে অনুমান করতে হয়।

সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের উল্লিখিত অসংখ্য গ্রন্থের প্রয়োজন অনুসারী আলোচনা, এবং জৈন-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিদ্রুত প্রণীত অসংখ্য গ্রন্থের অনুশীলন তো বাঁধা পায় নি। অধিকন্তু দর্শনশাস্ত্রের, বিশেষ করে, কর্মমীমাংসা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নির্ভরতা বেড়ে যাওয়ায় ইতিপূর্বে অনেকাংশে স্তিমিত আর্য-সনাতনী ধারা বেশকিছু সজীবতা লাভ করেছিল। বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায় থাকলেও সংখ্যাধিক হিন্দু-আর্য-সনাতনীরা মনে হয়, কিছু উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বেশী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা-ই থাক, এ সময়ের কতিপয় গ্রন্থকারের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁদ্বারা গর্ব করাও চলে।

অষ্টম শতক খৃষ্টীয়াব্দে সাংস্কৃতিক গ্রন্থোৎপত্তি বিষয়ে, ১। দুর্গসিংহ, ২। বাক্‌পতিরাজ, ৩। শান্তরক্ষিত ৪। বজ্রদত্ত, ৫। মুরারি, ৬। বিশাখদত্ত, ৭। অভয়নন্দী, ৮। সর্বজ্ঞমিত্র, ৯। জিনসেন, ১০। ভট্ট উদ্ভট, ১১। দামোদর গুপ্ত, ১২। আচার্য বামন, ১৩। বুদ্ধস্বামী, প্রভৃতি গ্রন্থকারদের রচনা-ই প্রধানত পাওয়া যায়।

১। **দুর্গসিংহ :** এর গ্রন্থ যদিও দু'খানা, তথাপি, সর্ববর্মাচার্যকৃত কাতন্ত্রসূত্রের এবং কাত্যায়নকৃত কাতন্ত্রকৃৎসূত্রের সমগ্র বৃত্তি, (কাতন্ত্রসূত্রবৃত্তি) অত্যন্ত ব্যাপক আলোচিত গ্রন্থ বলেই তাঁর প্রসিদ্ধি বেশী। বাংলাদেশের বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের

১. বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, ৬২—৬৩ পৃঃ।

মধ্যে অধিকাংশই কালাপী, সুতবাং দুর্গসিংহের কাতন্ত্রবৃত্তি বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রসার প্রাপ্ত গ্রন্থ। তা' ছাড়া. ঐ কাতন্ত্র সূত্র-বৃত্তির টীকাও করেছেন দুর্গসিংহ। পরিভাষা সূত্রেরও বৃত্তি প্রণয়ন করেছেন তিনি।

২। **বাক্‌পতিরাজ:** এঁর গ্রন্থ গৌরবহ। যদিও তা' কনৌজরাজ যশোবর্মণের বিজয় প্রশস্তিমূলক তথাপি তা' প্রাকৃত ভাষায় প্রণীত এবং গৌড়রাজের বধবিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি থাকায় পড়তে কোন বাঙালীরই বিরক্তির উদ্রেক করে না।

৩। **শান্তরক্ষিত:** ইনি একজন বৌদ্ধ দার্শনিক। তাঁর তত্ত্বসংগ্রহ এবং বাদন্যায়টীকা অতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধন্যায়ের গ্রন্থ। বাংলাদেশে ইহা কেবল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়, সুধীসমাজের মধ্যেই আদৃত গ্রন্থ। বোধ হয় তিনি একজন বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তবে, এঁর সম্বন্ধে অনেক মতভেদ বিদ্যমান। ইনি নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন এবং তিব্বতেও সাংস্কৃতিক মহৎ কাজ করেছেন বলে প্রকাশ।

৪। **বজ্রদত্ত:** একজন বৌদ্ধ গ্রন্থকাব। তাঁর 'লোকেশ্বর শতক' বিখ্যাত স্তোত্র গ্রন্থ। জানা যায় যে, তিনি ঐ স্বরচিত স্তোত্রের সাহায্যে প্রার্থনা করে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্ত হয়েছিলেন।

৫। **মুরারি:** তাঁর গ্রন্থ, অনর্ঘবাঘব নামক নাটক। নাটকখানা যে সমাজে অত্যন্ত আদৃত ছিল, তাব প্রমাণ তার অনেকগুলো টীকা। বিক্রমীয় টীকা, ত্রিপুরারি শাস্ত্রিকৃত টীকা, ধনেশ্বর কবির যশোদর্পণিকা টীকা, নরচন্দ্র সূরির টীকা. রুচিপতির টীকা, বিষ্ণুপণ্ডিতের তাৎপর্যদীপিকা টীকা, হরদত্তের টীকা, হরিহরের টীকা প্রভৃতির অনেকগুলোই মনে হয়, বাঙালী পণ্ডিতের রচনা।

৬। **বিশাখদত্ত:** পৃথুর পুত্র, বটেশ্বরদত্তের পৌত্র বিশাখ-দত্তের একখানা মাত্র নাটক মুদ্রারাক্ষস, কবিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। চাণক্য কূট কৌশলে নন্দবংশের রাজসিংহাসনে আধরূঢ় মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে নিরাপদ করবার জন্য নন্দবংশের মন্ত্রী রাক্ষসকে করায়ত্ত করে কিভাবে চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রীর পদে বসিয়েছিলেন তার কূট রাজনৈতিক চালিয়াতি, নাট্যরসে উপভোগ্যরূপে উপস্থাপনই বিশাখদত্তের কৃতিত্ব। তদুপরি, নাটকটি স্ত্রীচরিত্রবিহীন। নাট্যরসামোদের হাল্কা বিষয় না থাকা সত্ত্বেও দর্শক-শ্রোতা-পাঠক সকলেই একান্ত নিবিষ্ট হয়ে অবলীলা-ক্রমে সমাপ্তি পর্যন্ত ধৈর্য ধরে উপভোগ করতে পারেন। সে আকর্ষণ সৃষ্টিতে বিশাখদত্ত কৃতী।

৭। **অভয় নন্দী :** জিনেন্দ্রব্যাকরণের ভাষ্যই মাত্র তাঁর সুখ্যাত গ্রন্থ। জিনেন্দ্রব্যাকরণ উত্তর বাংলায় অনুশীলিত হত। বাংলার অন্যত্র প্রসার কম ছিল।

৮। **সর্ব্বজ্ঞ মিত্র :** সর্ব্বজ্ঞমিত্রও একজন বৌদ্ধ লেখক। তাঁর রচনা 'স্রগ্ধরা-স্তোত্র' নামে বৌদ্ধশক্তি তারার একটি বৃহৎ স্তোত্র অতি প্রসিদ্ধ। যেহেতু স্রগ্ধরা নামক ছন্দে উহা গ্রথিত, তাই ওরকম নাম দেয়া হয়েছে। স্রগ্ধরার ৩৭টি শ্লোকে স্তোত্রটি প্রণীত।

৯। **জিনসেন :** ইনি একজন জৈন গ্রন্থকার। তাঁর বৃহৎগ্রন্থ—হরিবংশ পুরাণ। জৈনতত্ত্ব পশ্চাৎপটে রেখে মহাভারতের পরিশিষ্ট খিল হরিবংশের কাহিনীময় গ্রন্থ। আর্য সনাতনী ধারার গ্রন্থ অবলম্বনে প্রতিপাদ্য বিষয়ের অন্যথা-করণের প্রয়াস জিনসেনের হরিবংশ পুরাণে সবচেয়ে বেশী প্রকটিত। মনে রাখা দরকার—মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে গণ্য খিল হরিবংশ এবং এই জিনসেনের হরিবংশ সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রন্থ।

১০। **ভট্ট উদ্ভট :** ভট্ট উদ্ভট কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের (৭৭৯-৮১৩ খৃঃ) রাজসভায় ছিলেন। উদ্ভট সাহিত্যিকতার জন্যই, পরবর্তীকালে এঁর নামও উদ্ভট হয়েছিল কিনা, সঠিক বলা যায় না। আমার মনে হয় তা-ই। অন্যথা, আর দশজনের মত শৈশবে পিতা নাম রাখলেন উদ্ভট, ছেলেও উদ্ভট চিন্তার হয়ে গেল—এটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়। 'উদ্ভট শ্লোকাবলী' নামে এঁর রচনা বলে একখানা গ্রন্থ, কেবল কাশ্মীরে নয়, বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতবর্ষে ঘরে ঘরে পঠিত। গ্রন্থখানার উদ্ভট চিন্তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—পুরীধামে (উড়িষ্যা) বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের জগন্নাথ মূর্তি (শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রা-মূর্তিত্রয়ের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিকে-ই জগন্নাথ বলা হয়) কাঠের নির্মিত। অন্য সব প্রাচীন দেব-দেবীর মূর্তিগুলো হয় পাথরে, বা ব্রোঞ্জে, বা অন্য কোন মূল্যবান্ ধাতুদ্রব্যে নির্মিত। কোন এক ভক্তের মাথায় প্রশ্ন জাগল—জগন্নাথের মূর্তিখানা কাঠের কেন? প্রশ্ন শুনেই উদ্ভট উত্তর দিলেন—

একা ভার্যা প্রকৃত মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া,
পুত্রোহ প্যেকো ভুবনবিদিতো মন্মথো দুর্ণিবারঃ।
শেষঃ শয্যা সদনমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহ চরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥

অর্থ—[জগন্নাথের] এক স্ত্রী বাস্তবিকই মুখরা (সরস্বতী), অপর স্ত্রীটি হয়েছে চঞ্চলা (লক্ষ্মী), একটি ছেলেও স্বীয় গুণে বিশ্ববিখ্যাত বেপরোয়া (মন্মথ), [বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হওয়া সত্ত্বেও] শেষ নাগের শয্যা, তা'ও সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে, অগত্যা গরুড় পাখীর পীঠে চড়ে বেড়াতে হয়,—এই সব, নিজ সংসারের কাণ্ড-কেত্তন ভাবতে ভাবতে মুরারি একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছেন।

এই শ্লোকের সাহিত্যিক খোঁচাটা বুঝতে পারলে—কল্পনাটি যে উদ্ভট তা অবশ্যই মানতে হবে। অপর গ্রন্থখানার নাম অলঙ্কার/উদ্ভটালঙ্কার। এই গ্রন্থখানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে—ইন্দুরাজ ইহার একটি সমীচীন টীকাও করেছেন। আনন্দবর্দ্ধন, অভিনব গুপ্ত, রায় মুকুট, মম্মট প্রভৃতি ইহা থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন।

১১। **দামোদর গুপ্ত :** ইনি জয়াপীড়ের কবি বলেই প্রসিদ্ধ। তাঁর 'কুট্টনীমত' গ্রন্থখানা, অসচ্চরিত্রা নারীর পুরুষ ঠকাবার নানা সুচতুরতায় পূর্ণ বলে রসিকদের অত্যন্ত উপভোগ্য। সর্বভারতে প্রসিদ্ধ এই গ্রন্থের প্রচলন বাঙালীদের মধ্যেও কম ছিল না।

১২। **বামন/বামনাচার্য/বামন কবি :** কাশ্মীরবাজ জয়াপীড়ের অন্যতম মন্ত্রী। তাঁর গ্রন্থগুলো হচ্ছে - অবিশ্রান্তবিদ্যাধর ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কারসূত্র এবং বৃত্তিনামক তার টীকা। অনেকের মতে কাশিকাবৃত্তির অংশও। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, বামনের উক্তির মধ্যে এক 'পঞ্জিকা' গ্রন্থের উল্লেখ আছে। মহা-বৈয়াকরণ বামন, যে পঞ্জিকা নামক ব্যাকরণের উল্লেখ করেছেন তা' যদি কাতন্ত্র-বৃত্তি-পঞ্জিকা হয় (অবশ্য তা-ই হওয়ার একান্ত সম্ভাবনা) তবে কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা বা সংক্ষেপে পঞ্জিকা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীরও আগেকার গ্রন্থ হয়ে দাঁড়ায়। জিনপ্রবোধ সূরি নামক জৈন বৈয়াকরণিকও (জন্ম ১২২৯ খৃঃ, মৃত্যু ১২৮৭ খৃঃ) ত্রিলোচন দাসের এই কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকার পঞ্জিকাদুর্গপদপ্রবোধ নামক এক টীকা প্রণয়ন করেছিলেন। ত্রিলোচনদাস কবীন্দ্রের পৈত্রিক নিবাস বরিশাল জিলার সদরমহকুমাধীন গৌরনদী থানা-এলাকার বিখ্যাত 'ফুল্লশ্রী' গ্রাম। জিন-প্রবোধ সূরির উক্ত উপটীকার মূল্যবান্ খবরটি দিয়েছেন - বিখ্যাত জার্মান সংস্কৃতবিদ পণ্ডিত থিয়োডোর অফ্রেস্/ঔফ্রেক্ট্।

১৩। **বুদ্ধস্বামী :** ইনি ঠিক অষ্টম খৃষ্টীয় শতক না নবম শতকের লোক, তার সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। গুণাঢ্যের বৃহৎকথার বিষয়বস্তু অবলম্বনে 'শ্লোকসংগ্রহ' নামক গ্রন্থ লিখেছিলেন। অন্তত বৌদ্ধ-জগতে তার আদর ছিল। সে হিসাবেই বাংলাদেশে ইহার তৎকালীন কদর অবিশ্বাস্য নয়। গুণাঢ্যের বৃহৎকথার সম্ভবত

অনুবাদ 'শ্লোক সংগ্রহ।' ইহাতে ২৮টি অধ্যায়ে ৪৫৩৯টি শ্লোক পাওয়া গিয়েছে বলে ডঃ কীথ বলেছেন। আলোচ্য খৃষ্টীয় শতকে উল্লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থকার এবং গ্রন্থবাদেও অনেক গ্রন্থকারের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁদের গ্রন্থগুলো সমাজে, বিশেষ করে সনাতনী আর্য সমাজে, বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বহুতর প্রমাণ প্রয়োগের পরে মোটামুটি স্বীকৃত হয়েছে যে আচার্য শঙ্কর ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করে, ৮২০ খৃষ্টাব্দে, মাত্র ৩২ বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেছেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষ তের বছর এবং নবম শতাব্দীর প্রথম কুড়িটি বছর এমন-ই এক মহান ব্যক্তিত্বের বহু ব্যাপক জীবনকাল, যাঁর স্মরণীয় প্রভাব পড়েছিল সারা ভারতের সনাতনী আর্য, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি যাবতীয় জনতার উপর। তাঁর কর্মময় জীবন যদিও ষোড়শ বর্ষ বয়স থেকে অর্থাৎ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর তৃতীয় বৎসর থেকেই জানা যায়, তথাপি তাঁর আবির্ভাব থেকে তিরোভাব পর্যন্ত সম্পূর্ণ বত্রিশটি বছরই, সমাজ-সচেতনদেব দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি ভারতের দাক্ষিণাত্যে জন্ম-গ্রহণ করে থাকলেও, তাঁর গুরু পরম্পরা সম্ভবত, গৌড়েব গৌববের সহিত সংশ্লিষ্ট বলেই বাঙালীদের তা' আলোচ্য। শঙ্করাচার্য সাক্ষাৎ গোবিন্দাচার্যের শিষ্য। এই গোবিন্দাচার্য এবং তাঁর গুরু—গৌড়পাদ'ও বোধ হয় গৌড়ের-ই লোক। গৌড়-পাদের গুরু সুখপ্রকাশ মুনি, তাঁর গুরু চিৎসুখমুনি, এবং তাঁর গুরু—গৌড়েশ্বরাচার্য জ্ঞানোত্তমও গৌড়দেশের অধিবাসী ছিলেন বলেই তো মনে হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ বছরটিতে অর্থাৎ ৮০০ খৃষ্টাব্দে শঙ্করাচার্যের বয়স হয়েছিল মাত্র ১৩ বছর। তিনি আর নিজের বয়সের কম বয়সীকে গুরুত্বে বরণ করেন নি। সুতরাং গোবিন্দাচার্য তখন অবশ্যই, কমপক্ষে প্রৌঢ়। সে হিসাবে, ৭৬৫-৭০ খৃষ্টাব্দেও যদি গোবিন্দাচার্যের জন্ম ধরা যায়, তো তাঁর গুরু গৌড়পাদ, যদি বৃদ্ধও হয়ে না থাকেন তবুও ৭৫৫-৬০ অব্দে তাঁর কর্মজীবন—গুরুত্ব, অধ্যাপনা প্রভৃতি ভাবতে হয়। সুখপ্রকাশ মুনি গৌড়পাদের গুরু। তাঁর কাল (অর্থাৎ ছাত্রাধ্যাপনা-শিষ্যপ্রশিক্ষণের) আরও আগে অবশ্য কল্পনীয়। মাত্র ১০ বছর করে আগেকার ধরলেও সুখপ্রকাশ মুনি ৭৪৫ খৃষ্টীয়, এবং তাঁরও গুরু—চিৎসুখ মুনির কাল ৭৩৫ খৃঃ, এবং তাঁর গুরু—গৌড়েশ্বরাচার্যের কাল ৭২৫ খৃষ্টীয় বছরের আগেই ধরতে হয়।

শঙ্করাচার্যের পরমগুরু চিৎসুখমুনির গ্রন্থখানার আসল নাম—প্রত্যক্তত্ত্ব দীপিকা। সংক্ষেপে উহাকে তত্ত্বদীপিকা বা চিৎসুখীও বলা হত। এই চিৎসুখী-গ্রন্থের যিনি টীকা করেছেন তাঁর নাম—প্রত্যক্‌স্বরূপ মুনি, এবং তাঁরও গুরুর নাম—প্রত্যক্-প্রকাশ মুনি। এছাড়া, উক্ত চিৎসুখী বা প্রত্যক্তত্ত্বদীপিকা গ্রন্থের যে 'মানসনয়ন-প্রসাদনী' নামক টীকাটি রয়েছে, যার পূর্ণনামটির স্থলে বিখ্যাত প্রাবন্ধিক দীনেশ

চন্দ্র ভট্টাচার্য শুধু 'নয়নপ্রসাদনী' নামে উল্লেখ করেছেন,[১] সে টীকার প্রণেতার নাম প্রত্যক্স্বরূপ মুনি। অল্পেই অনুধাবন করা চলে যে,—এই 'প্রত্যক্তত্ত্ব'টির উদ্ভাবক গৌড়েশ্বরাচার্য এবং উদ্গাতা চিৎসুখ মুনি। প্রত্যক্তত্ত্বটির মর্ম হচ্ছে নিবৃত্তি-অভিমুখীনতা। প্রবৃত্তি-অভিমুখীনতায় জগদাসক্তি—সংসার হয় আর, নিবৃত্তি-অভিমুখীনতায় বা প্রত্যকতত্ত্বাভিমুখীনতায় জগতের প্রতি বৈরাগ্য এবং মুক্তিলাভ হয়। 'প্রত্যক্' পদগুলো, অবশ্যই এখানে একটি গোষ্ঠীর সম্পর্ক উপস্থাপিত করে। তা'তে, শিষ্য পরম্পরার স্বরূপটি হয় নিম্নরূপ—

গৌড়েশ্বরাচার্য/জ্ঞানোত্তম[২]
|
চিৎসুখ মুনি
|
সুখপ্রকাশ মুনি — প্রত্যকপ্রকাশ মুনি

সুখপ্রকাশ মুনি
|
গৌড়পাদ
|
গোবিন্দাচার্য
|
শঙ্করাচার্য ৭৮৮-৮২০ খৃঃ জীবনকাল।

প্রত্যকপ্রকাশ মুনি
|
প্রত্যক্স্বরূপ মুনি

পক্ষান্তরে—প্রত্যক্প্রকাশকে সাক্ষাৎ চিৎসুখ মুনির শিষ্য না বলে যদি সুখপ্রকাশের ধারার কোন পরবর্তী প্রশিষ্যের বলে ধরা হয় (তাতেও সাংস্কৃতিক নাম প্রত্যক্শব্দ যুক্ত করে দেয়া চলে) তা' হ'লেও এঁদের কালিক বিন্যাস সহজসাধ্য হয় না। কেননা, স্বয়ং চিৎসুখমুনি কর্তৃক উল্লিখিত গ্রন্থকারদিগকে তাঁর (চিৎসুখের) আগেকার বলে বিন্যাস করতে গেলেও ঝামেলা এড়ান যায় না। চিৎসুখমনি নিজেই না কি উক্ত প্রত্যক্তত্ত্বদীপিকায়—উদ্যোতকর কুমারিল, পদ্মপাদ, বল্লভাচার্য, বাচস্পতি, শালিকনাথ, উদয়ন, সুরেশ্বরচার্য, এবং বাগীশ্বরের উল্লেখ করেছেন[৩](?) তা ছাড়া, চিৎসুখমুনি আনন্দবোধকৃত ন্যায়মকরন্দ' গ্রন্থের একটি টীকাও করেছেন। সুতরাং আনন্দবোধও চিৎসুখমুনীর হয় আগেকার, নয়তো,

১. বাঙালীর সারস্বত অবদান, অবতরণিকা, পৃঃ ৯ এবং ১৬।

২. Catalogus Catalogorum (by Theodor Aufrecht) থেকে পরম্পরা আহৃত।

৩. এ ঘটনাটি অবশ্যই অন্যরকম। 'আগের দিনের বহু পুঁথিতে মূল গ্রন্থের সাথে টীকা টিপ্পনী কখনো প্রায় এক নাগারে লেখা পাওয়া যায়। তন্মূলক কোন গড়মিল এখানে অবশ্যই পাওয়া যেতে পারে।

সমকালীন, মানতেই হবে। অথচ, এতসব প্রাচীন প্রাচীন বাঙালী মনীষীদিগকে উপেক্ষা করে সাংস্কৃতিক বিকাশের আলোচনা করা তো সঙ্গত বলে মনে হয় না। কিন্তু বাঙালীর সারস্বত অবদান গ্রন্থে দীনেশ ভট্টাচার্য তো উদয়নের কালের ঊর্ধতন সীমা ১০৫০ খৃষ্টাব্দ বলে এবং তাঁকেই "নব্যন্যায়ের ইতিহাসে উদয়নাচার্যই আদি-পুরুষ" বলে যে ঝামেলা উপস্থাপন করেছেন তা' যে কেহ একটু লক্ষ্য করলেই ধরতে পারেন। এই গুরুতর প্রশ্নের কাল নির্ধারণী আলোচনার অংশটি স্রেফ বাদদিয়ে তৎস্থলে তাঁর নিজের বিন্যাসের ক্রমটি মাত্র বলেছেন কিন্তু তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য Ganganatha Jha Research Institute Journal II গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর-ই প্রবন্ধান্তরের বরাত দিয়েছেন। যে গ্রন্থ নব্যন্যায়ে বাঙালীর অবদান বিষয়ে, নব্যন্যায়ের আদি পুরুষ, তাঁর মতে, উদয়নাচার্য, সে গ্রন্থ তাঁর ৪০ বছরের পরিশ্রমের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ বলে তিনিই বলেছেন, সেই গ্রন্থের অপরিহার্য কালত বিন্যাসের যুক্তির অংশটি অন্যত্র থাকবে কেন? মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ. ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ অনুবাদ করেছেন। তার দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় "ভাষ্যকার ও বার্তিককার সম্বন্ধে নানা মতে বক্তব্য" শিরোনামীয় অংশে দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্রের 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' রচনার কাল পরিষ্কার করে লিখেছেন—"তাই বাচস্পতিমিশ্র নিজমতানুসারে বিচারপূর্বক 'বস্বঙ্ক বসু বৎসরে' অর্থাৎ ৮৯৮ বৈক্রম সংবতে (৮৪১ খৃ:) 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' রচনা করেন।" বাচস্পতিমিশ্র আচার্য শঙ্করের (৭৮৮- ৮২০ খৃঃ) কিঞ্চিৎ পরবর্তী তো বটেই, কারণ, ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করাচার্যকৃত শারীরক মীমাংসাভাষ্যের উপরে শারীরকভাষ্য-বিভাগ (ভামতী) টীকা করেছেন বাচস্পতিমিশ্র। কিঞ্চিৎ অগ্র-পশ্চাদ্বর্তী হলেও ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরভট্টকে প্রোক্ত দীনেশ ভট্টাচার্যও বাচস্পতিমিশ্রের সমসাময়িক বলে স্বীকার করেছেন। বিক্রম সংবতের স্থলে শকাব্দ ধরে ধপ্ করে ১২৫ বছরের তলে ফেলে দেয়ার দীনেশ ভট্টাচার্যীয় প্রচেষ্টার কারণ পরবর্তী গবেষকরাই অনুসন্ধান করবেন।

শ্রীধর ভট্টের ন্যায়কন্দলীর কাল তর্কাম্বরাঙ্ক (৯০৬)-ই ঠিক এবং তা' বৈক্রম-সংবত (৮৪৯ খৃ:)। গৌড়েশ্বরার্য থেকে গৌবিন্দাচার্য পর্যন্ত অবশ্যই শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী, অতএব খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যে গণ্য হতে পারে। আনন্দবোধ পরম-হংস-এঁর গ্রন্থ—১। ন্যায়দীপাবলী, ২। ন্যায়দীপাবলীর টীকা ৩। ন্যায়মকরন্দ, এবং ৪। ন্যায়াপদেশ মকরন্দ। আনন্দবোধ পরমহংস গৌড়ের লোক ছিলেন কি না — বলা যায় না। মনে হয়, তাই ছিলেন। গৌড় এবং বঙ্গের মধ্যে তখন বোধহয় ঐক্যাওছিল।

প্রত্যক্তত্ত্বের উদ্ভাবক গৌড়েশ্বরাচার্যের কোন গ্রন্থের হদিস দেয়া গেল না। চিৎসুখ মুনির গ্রন্থ---১। আনন্দনবোধকৃত 'ন্যায়মকন্দ'-এর টীকা, ২। প্রত্যক্তত্ত্বদীপিকা/তত্ত্বদীপিকা/চিৎসুখী, ৩। বিষ্ণুপুরাণ-টীকা, ৪। ষড়্দর্শনসংগ্রহ গ্রন্থের বৃত্তি, ৫। ব্রহ্মস্তুতি।

সুখপ্রকাশ মুনির গ্রন্থ—১। তত্ত্বপ্রক্রিয়াব্যাখ্যা, ২। ন্যায়দীপাবলী তাৎপর্য-টীকা, ৩। ন্যায়মকরন্দবিবেচনী, ৪। প্রত্যক্তত্ত্বদীপিকা-টীকা এবং ৫। ভাবদ্যোতনিকা।

গৌড়পাদ আচার্যের গ্রন্থ :—১। অদ্বৈতপ্রকরণ, ২। অনুগীতা-ভাষ্য, ৩। অলাতশান্তিপ্রকরণ, ৪। আগমশাস্ত্র/মাণ্ডুক্যোপনিষৎকারিকা, ৫। উত্তরগীতাভাষ্য, ৬। দেবীমাহাত্ম্যের (চণ্ডীর) টীকা চিদানন্দকেলিবিলাস, ৭। নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদের ভাষ্য, ৮। বৈতথ্যপ্রকরণ, এবং ৯। সাংখ্য-কারিকা-ভাষ্য।

পদ্মপাদের (শঙ্করাচার্যের শিষ্য থেকে ভিন্ন) গ্রন্থ -- পদ্মপাদরহস্য।

শালীকনাথ—ইনি মীমাংসক প্রভাকরের শিষ্য ছিলেন। সম্ভবত, ভট্টকুমারিলের সমসাময়িক, নয়তো অল্পকিছু পরবর্তী। তাঁর গ্রন্থ—১। নয়রত্ন, ২। প্রকরণপঞ্জিকা ৩। প্রশস্তপাদ-ভাষ্য-ব্যাখ্যা এবং ৪। শবরভাষ্যের টীকা। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা চলে যে, শালিকনাথ মিশ্র সম্বন্ধে বিখ্যাত catalogus catalogorum গ্রন্থে যে, "pupil of prabhakra Guru He is quoted by citsukha in Manasanayanaprasadani, oxf 245b" লিখিত হয়েছে তা ঠিক নয়। কারণ, মানসনয়নপ্রসাদনী, চিৎসুখীর অন্যতর টীকা, এবং তার গ্রন্থকার প্রত্যক্স্বরূপ। এ দৃষ্টান্তটি দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে—Theodor Aufrecht কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন-তালিকায় প্রাপ্ত গ্রন্থ-গ্রন্থকারদের বিন্যাসে, কদাচিৎ তিনি তালিকানির্ভর হয়ে থাকবেন, যেমন এখানেও oxf. 245b. তাঁর তালিকাকরণের উৎসরূপে পাওয়া যায়। এভাবে, 'চিৎসুখ মুনি সম্বন্ধেও যে লিখেছেন "He quotes udayana, uddyotakara, Kumarila, padmapada, Vallabba (lilavati), vacaspati, Calikanatba, Surecvara and the author of the Manamanohara" তা'ও সঙ্গতি হীন বটে। তাঁর উক্তির মধ্যেকার উদয়ন, বল্লভ, বাচস্পতি, এবং সুরেশ্বর সঙ্গতিতে আনতে পারা অসম্ভব ব্যাপার। ইহাও হয়তো, ভিত্তিতালিকায় নির্ভরশীলতার ফল।

পিতা-পুত্রের পরম্পরার মত গুরু-শিষ্যের পরম্পরায় যদি সময়ের ব্যবধান কমিয়েও ধরা হয়, এমনকি, 'খলে কপোত ন্যায়ে' যদি গৌড়েশ্বরাচার্য পর্যন্ত পাঁচ-জনকে একেবারে শঙ্করাচার্যের কালের (৭৮৮—৮২০ খৃঃ) বলেও গণ্য করা হয়, তা' হলেও শ্রীযুক্ত দীনেশ ভট্টাচার্যের "চিৎসুখাচার্য (প্রায় ১২৫০ খ্রীঃ) প্রভৃতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু গ্রন্থকার…"উক্তি[১] সঙ্গত হয় কিভাবে?

কবি মাঘ: তিনি ছিলেন দত্তক সর্বাশ্রয়ের পুত্র। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—'শিশু-পালবধ' বিংশতি সর্গাত্মক মহাকাব্য অতি উচ্চমানের গ্রন্থ। অলঙ্কারশাস্ত্রে, ব্যাক-রণে, ছন্দে—সর্বত্র অনন্যত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে গ্রন্থখানা রচিত। অদ্যাবধি উহা সাহিত্যসেবীদের পরম আদরের গ্রন্থ। প্রবাদ আছে—"মহাকবি কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগাম্ভীর্য, নৈষদের পদলালিত্য, কিন্তু মাঘকাব্যে উক্ত ত্রিবিধ গুণই সমানভাবে অবস্থিত।"[২] এ গ্রন্থ চিরকাল-ই বাঙালীদের আলোচিত এবং বর্তমানেও পাঠ্যতালিকায় সর্বত্রই রয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্য বলতে মূল গ্রন্থ এবং তার ব্যাখ্যানাত্মক গ্রন্থ উভয়ই গ্রাহ্য। মূল গ্রন্থের তুলনায় ব্যাখ্যা-গ্রন্থের গুরুত্ব কম নহে। কোথাও বা ব্যাখ্যা-গ্রন্থের গুরুত্ব বেশীও দেখা যায়। বলাবল সূত্রের মধ্যে একটি ধরা হয়েছে 'পাণিনি কাত্যায়ন-ভাষ্যকারাণামুত্তরোত্তরং প্রামাণ্যম্'। পাণিনি মূলঅষ্টাধ্যায়ীর প্রণেতা। তা, কালে কালে অবক্ষয়িত হয়ে এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছিল যে ফাঁকে ফাঁকে অপ্রাপ্ত ক্ষয়িত অংশের পরিপূরণ করতে মহামুনি কাত্যায়ন বার্তিক সূত্র প্রণয়ন করেন। উক্ত পাণিনির মূল সূত্র এবং কাত্যয়নের বার্তিক সূত্র একসঙ্গে গ্রহণ করে মহামুনি পতঞ্জলি[৩] মহাভাষ্য প্রণয়ন করেছেন। এই মহাভাষ্যের সহিত বিরোধে পাণিনির এবং কাত্যায়নের উভয়ের প্রামাণ্য গৌণ। অনুরূপ, বার্তিকের সহিতমূল অষ্টাধ্যায়ীর বিরোধে বার্তিকের প্রামাণ্য স্বীকার্য। সুতরাং প্রতিপন্ন হয় যে, মূল গ্রন্থের তুলনায় ব্যাখ্যাত্মক গ্রন্থের গৌরব কম নহে কেননা, সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বত্র যে ধারার ব্যাখ্যা চলে আসছে তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যা স্বীয় প্রাধান্য বজায় রেখেছে। উক্ত মহাভাষ্য পড়ার বেলায় কেহই অষ্টাধ্যায়ী-সূত্র এবং বার্তিক গ্রন্থদ্বয় নিয়ে বসেন না, কারণ তার যতটা দরকার তা' ওই মহাভাষ্যের সাহায্যেই চলতে পারে। বেদব্যাসের চতুঃসূত্র বললে বেদান্তশাস্ত্রে যে চারটি সূত্র নির্দিষ্ট তা' হচ্ছে—১। জন্মাদ্যস্য যতঃ,

১. বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, অবতরণিকা, পৃঃ ১২, অনু ২.'।

২. উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থ গৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ।

২। অন্বয়াৎ, ৩। ইতরতঃ, এবং ৪। চার্থে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্র চারটির ব্যাখ্যা শত শত পৃষ্ঠাব্যাপী। যে কোন একটি সমীচীন ব্যাখ্যা, হাজারো বিষয়াবলীর উদ্‌ঘাটন, বিশ্লেষণ, নিরশন করে স্বকীয় বিভায় দীপ্যমান। তাই—মহাভাষ্য, ভাষ্য, টীকা, পঞ্জী, টিপ্পনী, পত্রিকা (পাতড়া) প্রভৃতি সমান গুরুত্বে গ্রহণ করে গ্রন্থের বিস্তার-ধারায় উপস্থাপনীয়। ব্যাখ্যাতব্য বিষয়ের সহিত স্বকীয় উক্তিও ব্যাখ্যাত হয় মহাভাষ্যে। ব্যাখ্যাতব্য বিষয়েব বৃহৎ ব্যাখ্যা ভাষ্য। টীকা প্রভৃতি অনুরূপ নিয়মে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। বর্তমান কালের বাংলায় টীকা - টিপ্পনী যে ধারায় ব্যবহৃত তেমন সংক্ষিপ্ততম ধারায় সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ নেই।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী বাঙালীর ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল কাল। রাজনৈতিক দিক থেকেও যেমন, পর পর ধর্মপাল-দেবপাল-প্রথম শূরপাল-প্রথম বিগ্রহপাল-নারায়ণপাল এবং রাজ্যপালের শাসনাধীনে, প্রায় সমান আদর্শমূলক রাষ্ট্রীয়-ধর্মীয়-সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে কেটেছে, আভ্যন্তরিক রাষ্ট্রীয় কোন্দল বা বৈদেশিক আক্রমণের যা কিছু ঘটনা তার কোনটা-ই তেমন কোন বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে নি, ঠিক তেমন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও, অনেক বিষয়েই চিন্তা-চেতনায় বাঙলী-স্বাতন্ত্রা এবং উন্নতি সাধিত হয়েছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটেছে লিপিতে।

বৌদ্ধদের সুপ্রাচীন 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থের মধ্যে ৬৪ প্রকার লিপির একটি তালিকা আছে। তার মধ্যেকার অধিকাংশ লিপির নমুনা-সংগ্রহও এখন আর সম্ভব বলে মনে হয় না। তালিকাটি এই —

১। ব্রাহ্মী, ২। খরোষ্ঠী, ৩। পুষ্করসারী, ৪। অঙ্গলিপি, ৫। বঙ্গলিপি, ৬। মগধলিপি, ৭। মাঙ্গল্যলিপি, ৮। মনুষ্যলিপি, ৯। অঙ্গুলীয়লিপি, ১০। শকারি লিপি, ১১। ব্রহ্মবল্লীলিপি, ১২। দ্রাবিড়লিপি, ১৩। কনারিলিপি, ১৪। দক্ষিণলিপি, ১৫। উগ্রলিপি, ১৬। সংখ্যালিপি, ১৭। অনুলোমলিপি, ১৮। উর্দ্ধধনুলিপি, ১৯। দরদ লিপি, ২০। খাস্যলিপি, ২১। চীনলিপি, ২২। হূণলিপি, ২৩। মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপি, ২৪। পুষ্পলিপি, ২৫। দেবলিপি, ২৬। নাগলিপি, ২৭। যক্ষলিপি, ২৮। গন্ধর্বলিপি, ২৯। কিন্নরলিপি, ৩০। মহোরগলিপি, ৩১। অসুর লিপি, ৩২। গরুড়লিপি, ৩৩। মৃগচক্রলিপি, ৩৪। চক্রলিপি, ৩৫। বায়ুমরুলিপি, ৩৬। ভৌমদেবলিপি, ৩৭। অন্তরীক্ষদেবলিপি, ৩৮। উত্তরকুরুদ্বীপলিপি ৩৯। অপরগৌড়াদিলিপি, ৪০। পূর্ববিদেহলিপি, ৪১। উৎক্ষেপলিপি, ৩২। নিক্ষেপলিপি, ৪৩। বিক্ষেপলিপি, ৪৪। প্রক্ষেপলিপি, ৪৫। সাগরলিপি, ৪৬। বজ্রলিপি, ৪৭। লেখপ্রতিলেখলিপি, ৪৮। অনুদ্রুতলিপি, ৪৯। শাস্ত্রাবর্তলিপি, ৫০। গণাবর্তলিপি, ৫১। উৎক্ষেপাবর্তলিপি, ৫২। বিক্ষেপাবর্তলিপি ৫৩। পাদলিখিতলিপি, ৫৪। দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিখিতলিপি ৫৫। দশোত্তরপদসন্ধিলিখিতলিপি, ৫৬। অধ্যাহারিণী লিপি, ৫৭। সর্বরুৎসংগ্রহণীলিপি, ৫৮। বিদ্যানুলোমলিপি, ৫৯। বিমিশ্রিতলিপি, ৬০। ঋষিতপস্তপ্তলিপি, ৬১। ধরণীপ্রেক্ষণালিপি, ৬২। সর্বৌষধনিষ্যন্দলিপি, ৬৩। সর্বসার সংগ্রহণীলিপি, এবং ৬৪। সর্বভূতরুদ্গ্রহণীলিপি।

ললিতবিস্তর গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ের এই লিপি-তালিকায় ৫ম লিপিটি—বঙ্গলিপি। এই গ্রন্থ কোন্ সময় প্রণীত হয়েছিল, তা সঠিক জানা যায় না, তবে, ৩০৮ খৃষ্টাব্দে ইহা চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তা'ছাড়া ললিতবিস্তর গ্রন্থখানা গৌতমবুদ্ধের জীবনলীলা বিষয়ক গ্রন্থ বলে ইহা বৈপুল্যসূত্রের অন্তঃপাতী বিনয়-বিষয়ক, সন্দেহ নেই। বুদ্ধদের স্বয়ং উপালিকে 'বিনয়ধর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধেব মহাপবিনির্বাণের অল্পকালের মধ্যেই হর্যঙ্কবংশীয় অজাতশত্রুর আহ্বানে (অজাতশত্রুর রাজকীয় সহায়তায় মহাকাশ্যপের আনুষ্ঠানিক আহ্বানে) সপ্তপর্ণী গুহায় যে প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির অধিবেশন্ হয় তাতেই বিনয়ধর উপালি এবং অন্যান্য অনেকে উপস্থিত থেকে বিনয় সংগ্রহের অর্থাৎ গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ করেছিলেন। ধারণা করা যায় — প্রথমের হয়তো, চলতি প্রাকৃতে—পালিতে সংগৃহীত তথ্য অবলম্বন করে সংস্কৃত 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। চীনা ভাষায় অনুবাদের বহুপূর্বে যে প্রণীত হয়েছিল তাতে তো আর সন্দেহের কারণ দেখি না। হয়তো খৃষ্টপূর্ব ২য়-৩য় শতাব্দীতেই তা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অত পূর্বকালেব গ্রন্থে 'বঙ্গলিপি' শব্দটি বিভিন্নলিপির তালিকায় থাকাদ্বারা নিঃসংশয়ে ধরে নেয়া যায় যে, কোন এক প্রকার লিপি বাঙালীদেব আদ্যিকালেই ছিল। আমাদের হাতে তার কোন নমুনা না আসায় তা' বোধগম্য হচ্ছে না মাত্র।

নবম খৃষ্টীয় শতকের প্রারম্ভেই আমরা পাই আচার্য শঙ্করকে। ইনি এক অসাধারণ পুরুষ। তাঁর সাংস্কৃতিক অবদান আর্য সনাতনপন্থীদের কাছে একান্ত স্মরণীয়। তাঁর বিশাল কর্ম জীবন এ স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে আলোচনা করা যায় না। ভট্টকুমারিল যে বৌদ্ধদেব সহিত প্রত্যক্ষ বাদানুবাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আচার্য শঙ্কর সে অভি-যানের পূর্ণ সাফল্য বিধান করেছেন। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের বেদান্তের প্রবক্তা। বাদরায়ণ বেদব্যাসের এক 'ব্রহ্মসূত্র' অবলম্বন করেই বেদান্ত দর্শনেব সৃষ্টি। যদিও উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বই ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে, তথাপি ব্রহ্মসূত্র-ই এ ক্ষেত্রে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রণীত প্রথম গ্রন্থ। এই ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করেই বহুধা বিভক্ত বৈদান্তিক ধারা প্রবাহিত-প্রসারিত হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত আচার্য শঙ্করের গুরু পরম্পরার মধ্যথেকেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রসার। চিৎসুখী, গৌড়পাদ-কারিকা প্রভৃতির পরে আচার্য শঙ্করের 'শারীরক ভাষ্যই' মতবাদটি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা এবং কচ্ছ-সুরাট-গুজরাট থেকে আসাম, সমগ্র ভারতে শঙ্করাচার্যের অবদান সাংস্কৃতিক উজ্জীবন বলে গণ্য হয়। যোশীমঠ, শৃঙ্গেরীমঠ প্রভৃতির মাধ্যমে বৈদান্তিক (শুদ্ধাদ্বৈত) মতের শিক্ষা-দীক্ষা-বিদ্যাচর্চার যে অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গিয়েছেন, আজও রামকৃষ্ণমিশন প্রভৃতি অনবদ্য বহু

প্রতিষ্ঠান তাঁর সেই বৈদান্তিক মতাদর্শকেই নিজেদের আদর্শরূপে গ্রহণ করে সমাজের হিতসাধনে ব্রতী আছেন। আচার্য শংকরকে না জেনে, তাঁর জীবন চর্চা-মত-পথ না বুঝে, তাঁর প্রায় ৩ শত গ্রন্থের মধ্যেকার একখানা বিশেষ মর্যাদার গ্রন্থের গুরুত্বও উপলব্ধি করতে না পেরে, অনেকে নেহাৎ গায়ে পড়েও তাঁর পূত চরিত্রে মসীলেপনের অপপ্রয়াসে মেতে ওঠেন। একবার ব্যাসগিরি, আরেকবার ব্যাসতীর্থ, পুনর্বার ব্যাসদেব, তারপরে আবার ব্যাসাচার্য নামে স্বকপোল-কল্পিত খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর অখ্যাত-অজ্ঞাত বিদ্বিষ্টের 'শঙ্করবিজয়' নামক এক তুচ্ছ গ্রন্থের অবলম্বনেও দু'কথা বাড়িয়ে বলতে দ্বিধা করেন না। তপস্যানিরতা পার্বতীকে পরীক্ষা করার জন্য প্রচ্ছন্ন অতিথির বেশে উপস্থিত স্বয়ং শিব সখীদের কাছ থেকে পার্বতীর তপস্যার কারণ জেনে যখন শিবের নিন্দায় মেতে উঠেছিলেন তখন, বিরক্ত পার্বতী যে কথা বলেছিলেন—"ওরে সখি, নিষেধ কর, ওই অতিথি—ব্রাহ্মণ আরো যেন কি বলতে চা'ন, ওর ওষ্ঠাধর পুনরায় স্ফুরিত হচ্ছে। মহান্ জনের যাঁরা নিন্দা করেন, কেবল তাঁরা-ই ন'ন, তা' যারা শোনে তারাও পাপের ভাগী হয়।"[১]

আচার্য্য শঙ্করের বহু স্তোত্রসমেত প্রায় তিনশত গ্রন্থ অদ্যাবধি সমাজে প্রচলিত আছে। তারমধ্যে— ১। অথর্ববেদান্তর্গতোপনিষদ্‌ভাষ্য' ২। অজ্ঞানবোধিনী, ৩। অষ্টাঙ্গযোগ, ৪। ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ভাষ্য, ৫। উত্তরগীতাব্যাখ্যা, ৬। ঐতরেয়োপনিষদ্‌ভাষ্য, ৭। কাঠকোপনিষদ্‌ভাষ্য, ৮। কেনোপনিষদ্‌ভাষ্য, ৯। কৈবল্যোপনিষদভাষ্য ১০। কৌশিতকোপনিষদ্‌ভাষ্য, ১১। গোপাল তাপনীয়োপনিদ্‌ভাষ্য, ১২। গৌরপাদীয়-ভাষ্য, ১৩। চতুর্দশমতবিবেক, ১৪। চতুর্বিধসঞ্চয়োদ্ভেদ, ১৫। ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্য, ১৬। জ্ঞানগীতা, ১৭। তত্ত্বসংগ্রহ, ১৮। তত্ত্বসার, ১৯। তন্ত্রসার, ২০। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য, ২১। ত্রিপুর্য্যুপনিষৎ, ২২। দশরত্নাভিধান, ২৩। দশাবতার-মূর্তিস্তোত্র, ২৪। দৃগ্‌দৃশ্যপ্রকরণ, ২৫। দেবীপঞ্চরাত্র, ২৬। মহাবাক্যানি, ২৭। দ্বাদশমহাবাক্যসিদ্ধান্তনিরূপণ, ২৮। নারায়ণোপনিষদ্‌ভাষ্য, ২৯। নৃসিংহতা-পনীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য, ৩০। পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া, ৩১। পাষণ্ডমুখচপেটিকা, ৩২। প্রশ্নোত্তররত্নমালা, ৩৩। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ভাষ্য, ৩৪। ব্রহ্মগীতাটীকা, ৩৫। ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্য/শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩৬। ভগবদ্‌গীতাভাষ্য, ৩৭। ভট্টীকাব্যটীকা, ৩৮। ভৃগুবল্ল্যপনিষদ্‌ভাষ্য, ৩৯। মহাকারণপ্রকরণ, ৪০। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্‌ভাষ্য,

১. নিবার্য্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ
পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোহপভাষতে,
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ ॥ মহাকবি কালিদাসের কুমার সম্ভব।

৪১। মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য, ৪২। মৈত্রায়ণ্যুপনিষদ্ভাষ্য, ৪৩। যোগরত্নাবলী, ৪৪। ললিতত্রিশতীভাষ্য, ৪৫। বেদান্তবিবেকচূড়ামণি, ৪৬। বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, ৪৭। বৃদ্ধব্রাহ্মণোপনিষদ্ভাষ্য, ৪৮। বেদসারশিবসহস্রনাম, ৪৯। বেদান্ততত্ত্ববোধ, ৫০। বেদান্তসিদ্ধান্তদীপিকা, ৫১। বৈরাগ্যশতক, ৫২। শরভহৃদয়, ৫৩। শাস্ত্রদর্পণ, ৫৪। শিবকেশাদিপাদান্তবর্ণন, ৫৫। শিবগীতাব্যাখ্যা, ৫৬। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্য, ৫৭। সংক্ষেপ শারীরকভাষ্য, ৫৮। সন্ন্যাসগ্রহণপদ্ধতি, ৫৯। স্বাত্মানন্দপ্রকাশ, ৬০। হরিহরস্তোত্র-প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থই অনন্যত্বের নিদর্শন।

আচার্য্য শঙ্করের তিনজন শিষ্যই উল্লেখযোগ্য সমাজসেবক এবং গ্রন্থকার - সুরেশ্বরাচার্য, সচ্চিদানন্দ এবং পদ্মপাদ। সুরেশ্বরাচার্যের অপরনাম—বিশ্বরূপ, সাধারণে। মণ্ডনমিশ্র নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর গ্রন্থগুলো—১। কাশীমোক্ষনির্ণয়, ২। তৈত্তিরীয়শ্রুতিবার্তিক, ৩। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ৪। পঞ্চীকরণবার্তিক, ৫। বৃহদারণ্যোপনিষদ্বার্তিক, ৬। ব্রহ্মসিদ্ধি, ৭। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যবার্তিক, ৮। ভাবনাবিবেক, ৯। মানসোল্লাস স্তোত্রবার্তিক/দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রবার্তিক, ১০। লঘুবার্তিক, ১১। বার্তিক সার।

সচ্চিদানন্দ স্বামী অথবা সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর—'স্বাত্মনিরূপণব্যাখ্যা' গ্রন্থখানাই প্রসিদ্ধ।

পদ্মপাদ/পাদপদ্ম-এঁর গ্রন্থত্রয়—আত্মানাত্মবিবেক পঞ্চপাদিকা এবং প্রপঞ্চসার। সমাজে যুগান্তকারী সারবত্তার জন্যই আচার্যশঙ্করের গ্রন্থগুলো এবং তাঁব শিষ্যদের গ্রন্থগুলো বেদান্তের ধারায় সুধীসমাজের সকলের কাছেই বিশেষ আলোচনার স্থল।

শ্বেতাম্বর জৈন দার্শনিক হরিভদ্র—ইনি দিঙ্নাগের ন্যায়প্রবেশ গ্রন্থের ভাষ্য, যোগদৃষ্টিসমুচ্চয়, যোগবিন্দু, ধর্মবিন্দু, ষড়্দর্শনসমুচ্চয় এবং লোকতত্ত্বনির্ণয় নামক গ্রন্থগুলোর প্রণেতা। তাঁর সব গ্রন্থই সারবান্।

অমৃতচন্দ্র : ইনি নবম শতকের লোক, তবে মাঘ কবির আগেকারও অনেকে বলেন। তাঁর তত্ত্বার্থসার এবং পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায় গ্রন্থ দু'খানা প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত। এ দু'খানাও শ্বেতাম্বর জৈনদর্শনের গ্রন্থ।

জিনসেন ও গুণভদ্র সূরি : উভয়ে একখানা 'আদিপুরাণ' নাম দিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থখানার দুটিভাগ—আদিপুরাণ ও উত্তরপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। বলার অপেক্ষা রাখে না-যে ইহা সনাতনীদের সর্বাধিক আলোচ্য—পুরাণ গ্রন্থের অনুকরণ মাত্র। ইহার নামের জন্যও বিভ্রান্তি ঘটতে পারে।

বৌদ্ধ শিবস্বামী : ইনি কাশ্মীরের রাজা অবন্তীবর্মার সভাপণ্ডিত ছিলেন—জানা যায়। অবদানশতকের কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত 'কপ্‌ফণাভ্যুদয়' গ্রন্থখানা বৌদ্ধ-সমাজে প্রচলিত ছিল।

সোনানন্দ নাথ : প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন শাখার প্রতিষ্ঠাতা—ত্র্যম্বকের ১৯শ অধস্তন বংশধর সোমনাথানন্দ, অভিনব গুপ্তের প্রপিতামহ। তাঁর শৈবদর্শনের (প্রত্যভিজ্ঞা) গ্রন্থ—শিবদৃষ্টি, যথেষ্ট উপাদেয়।

রত্নাকর বিদ্যাধিপতি— দুর্গদত্তের বংশোদ্ভব অমৃতভানুর পুত্র। কাশ্মীরাধিপতি অবন্তীবর্মণের রাজসভায় ছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলো—ধ্বনিগাথাপঞ্জিকা, বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা, এবং 'হরবিজয়' নামক এক বিশাল মহাকাব্য।

আনন্দবর্দ্ধন : কাশ্মীর রাজ অবন্তীবর্মার (৮৫৪-৮৮৩ খৃঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপ্রাপ্ত সাহিত্যতত্ত্বশাস্ত্রের গ্রন্থ—'ধ্বন্যালোক' ছাড়াও, বিষমবাণলীলা, অর্জুনচরিত, দেবীশতক এবং দীনাক্রন্দস্তোত্র, সুধীসমাজে খুবই আদরণীয়।

ভট্ট মুকুলও একজন সাহিত্যতাত্ত্বিক। তাঁর গ্রন্থ—অভিধাবৃত্তিমাতৃকা, মোটামুটি ভাল সাহিত্যতত্ত্বের গ্রন্থ। ইনিও অবশ্য, কাশ্মীরীয়। এঁর পিতার নাম কল্লট। ইনি আনন্দবর্দ্ধনের কিঞ্চিৎ পরবর্তী ছিলেন।

ভট্ট জয়ন্ত বা **জয়ন্ত স্বামী**। ইনি অভিনন্দের পিতা, কান্ত'র পুত্র এবং কল্যাণস্বামীর পৌত্র। গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থ—আশ্বলায়ন কারিকা, **স্বরাঙ্কুশ** এবং আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য— বিমলোদয়মালা। সব ক'খানা গ্রন্থই ধর্মশাস্ত্রীয়।

অভিনন্দ বা গৌড়াভিনন্দ : ইনি নিজ বংশলতায় অনেকের নাম লিখেছেন যথা —

শক্তি (গৌড়ের অধিবাসী)
|
মিত্র
|
শক্তিস্বামী (কর্কোটক বংশীয় রাজা মুক্তাপীড়ের মন্ত্রী)
|
কল্যাণস্বামী
|
কান্ত
|
ভট্টজয়ন্ত
|
অভিনন্দ

ইঁহার গ্রন্থ ২ খানা—কাদম্বরীকথাসার এবং যোগবাশিষ্ঠসার। কাদম্বরী (ভট্টবাণের) অতিবিশাল কথাকাব্য। বর্তমান এবং জন্মান্তরীয় জীবনী অবলম্বনে কাদম্বরী এবং চন্দ্রাপীড়ের আর, সমান্তরাল ভাবে মহাশ্বেতা এবং কপিঞ্জলের কাহিনী এমনভাবে উপস্থাপিত যে তার সারমর্ম উদ্‌ঘাটন অতি দুষ্কর। তা' সহজবোধ্য করার জন্য অভিনন্দের উক্ত কাদম্বরীকথাসার, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসাবে বিদ্যার্থী সমাজে বিশেষ আদরণীয় ছিল।

ঠিক সমচিন্তাচালিত হয়েই তিনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মত অতি কঠিন গ্রন্থেরও সারসঙ্কলনাত্মক গ্রন্থ করে কেবল গৌড়ে—বঙ্গদেশে নয়, সারাভারতে মর্যাদা পেয়েছেন।

অভিনন্দের গ্রন্থে অত্যাতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ শক্তি গৌড়ের অধিবাসী হওয়ায় অনবচ্ছিন্ন অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ পর্যন্ত সেই স্থানিক পরিচিতি অত্যন্ত গৌরবের সহিত প্রদত্ত হওয়াদ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়--গৌড়-বঙ্গ প্রাচীন কালেও কত উন্নত মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল।

রাজশেখর : পিতা দুর্দুক এবং মাতা শীলবতীর তনয় এই রাজশেখর কান্যকুব্জাধিপতি মহেন্দ্রপালের শিক্ষক ছিলেন। মহেন্দ্রপালের দু'খানা শিলালিপিতেই (খৃঃ ৯০৩ এবং ৯০৭) গুরু রাজশেখরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। শিলালেখ দু'খানার রচয়িতা তিনি কি না, জানা যায় না। তাঁর চারখানা নাট্য সাহিত্যই পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কর্পূরমঞ্জরী, সট্টকশ্রেণীর এবং অপর তিনখানা নাটক। উপরি নির্দেশিত শিলালিপিতে রাজশেখরের ৬ খানা গ্রন্থের উল্লেখ আছে কিন্তু অপর ২ খানা গ্রন্থের হদিস্ পাওয়া যায় না। অপর নাটক ৩ খানা--প্রচণ্ডপাণ্ডব অথবা বালভারত, বালরামায়ণ, এবং বিদ্ধশালভঞ্জিকা।

প্রসঙ্গত রাজশেখর সমস্যা—একাধিক রাজশেখর বিভিন্ন কালে ছিলেন বলে নানা সূত্রে সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের প্রত্যেকের কাল এবং প্রণীত বিভিন্ন গ্রন্থেরও সঠিক নির্ণয় এখন পর্যন্ত হয় নি; অথচ পরিচিতির বিশেষ প্রতিপাদন ব্যতিরেকেই প্রাবন্ধিকগণ শুধু রাজশেখরের অমুক গ্রন্থ---তমুক গ্রন্থ বলে উল্লেখ করে চলছেন। কোন্ রাজশেখর কি কি গ্রন্থ লিখেছেন, কবে এবং কোথায় ছিলেন--তা'ও যে একান্ত উপেক্ষণীয় নয়, সেটা না ভেবে ওরকম লেখার মাধ্যমে যে ঐতিহাসিক পটভূমিকা ঝাপসা হয়ে যায় তা' পরিষ্কার করবে কে? শৌদ্ধোদনি নামক এক গ্রন্থকার 'অলঙ্কারসূত্র' নামক এক গ্রন্থ লিখেছিলেন। কেশবমিশ্রনামক এক টীকাকার মাণিক্যচন্দ্র নামক কোন রাজার অনুরোধে উক্ত অলঙ্কারসূত্রের এক টীকা করেছেন, টীকাটির নাম অলঙ্কারশেখর। এই গ্রন্থে এক রাজশেখরের উল্লেখ আছে। অথচ সে শৌদ্ধোদনি-ই বা কবেকার এবং কেশবমিশ্র কেন, তাঁর পৃষ্ঠপোষক—মাণিক্যচন্দ্রও কোথাকার বা কবেকার—জানা যায় না। আচার্য শঙ্কর 'কাব্যমীমাংসাকার' বলে উল্লেখ করেছেন, এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাব্য মীমাংসাকার

রাজশেখর বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে ১২শত বছর আগেকার বলেছেন।[১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ এই বিংশ শতাব্দীর রচনা। অভিনন্দ বা গৌড়াভিনন্দের যে শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে উত্তোলিত হয়েছে, তাতে রাজশেখর এবং অপরাজিত রক্ষিতকে তাঁর (অভিনন্দের) সমসাময়িক বলা হয়েছে। "বাঙালীর সারস্বত অবদান" গ্রন্থে দীনেশ ভট্টাচার্য, শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী-টীকার পঞ্জীপ্রবন্ধ নামক উপটীকার গ্রন্থকারকে শুধু 'রাজশেখর' বলে উল্লেখ করেছেন। Theodor Aufrecht সাহেবের গ্রন্থে উক্ত পঞ্জীপ্রবন্ধ বা পঞ্জীকারের পুরা নাম দেয়া হয়েছে—রাজশেখর সূরি, একজন জৈন। সুধাকলশ-এঁর গুরু রাজশেরের পুরা নাম—রাজশেখর মলধারিগচ্ছমণ্ডন। তিনি প্রবন্ধকোষ নামক একখানা গ্রন্থ লিখেছেন। ছাত্র সুধাকলসের কালদ্বারা রচনায় কাল অনুমেয়। সুধাকলস ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে সঙ্গীতোপনিষৎ, এবং ১৩৫০ খৃঃ সঙ্গীতোপনিষৎসার নামক গ্রন্থদ্বয় লিখেছেন। সুতরাং সমাধান করা যায়—শঙ্করার্যের কালের প্রায় শতবৎসর পরের এক রাজশেখর যিনি মহেন্দ্রপালের গুরু ছিলেন। রাজশেখর মলধারিগচ্ছমণ্ডলের 'কাব্যমীমাংসা' নেই এবং কেশবমিশ্রকৃত—অলঙ্কারশেখর নামক টীকায় উল্লিখিত আলঙ্কারিক রাজশেখরের কোন গ্রন্থাদির হদিস্ প্রত্যক্ষত পাওয়া না গেলেও 'কাব্যমীমাংসাকার' পদে আচার্য শঙ্কর আলঙ্কারিক রাজশেখরকেই সম্ভবত, উদ্দেশ করেছেন যাঁর সম্বন্ধে উক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় দেখি' বলে প্রত্যক্ষত গ্রন্থদৃষ্টে লিখেছেন, তিনিই কাব্যমীমাংসাকার রাজশেখর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী বা তার পূর্বেরও হতে পারেন, যার জন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন—'এখন থেকে ১২ শত বৎসর পূর্বে।' অতএব কাব্যমীমাংসাকার রাজশেখর। নাট্যকার রাজশেখর, পঞ্জী-প্রবন্ধকার রাজশেখর, প্রবন্ধকোষকার রাজশেখর-চারজনের কাল যথাক্রমে ৮ম শতাব্দী, ৯ম শতাব্দী ১০ম শতাব্দী এবং ১৩/১৪শ শতাব্দী খৃষ্টকাল।

অপরাজিত রক্ষিত: ইনি কান্যকুব্জাধিপতি মহেন্দ্র পালের গুরু— নাট্যকার রাজশেখরের সমসাময়িক। ইহা নাট্যকার রাজশেখর কর্পূরমঞ্জরী নামক সট্টকশ্রেণীর নাট্যসাহিত্যের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। অপরাজিতের গ্রন্থ একখানা—মৃগাঙ্কলেখকথা। কথাসাহিত্যের মধ্যে এ গ্রন্থখানাও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

পূর্বোল্লিখিত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশের বহু গবেষিত এবং বাচস্পতিমিশ্রের 'ন্যায়সূচী' গ্রন্থে প্রাপ্ত রচনা-কাল ধরেই দার্শনিক গ্রন্থোৎপত্তিতে ন্যায়-বৈশেষিক ধারার নিম্নলিখিত গ্রন্থকারদিগকে এই নবম শতাব্দীতেই বিন্যাস করা প্রয়োজন।

১. সবুজপত্র, কলিকাতা, এবং প্রবাসী, ১৩৩৩

বাচস্পতিমিশ্র : ইনি দার্শনিক বাচস্পতিমিশ্র বলেই প্রসিদ্ধ। এঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহারাজ 'নৃগ'। এঁর গুরুর নাম—মার্তণ্ডতিলক স্বামী।[১] ষড়্দর্শনরূপে পরিচিত আস্তিক্য দর্শনের প্রত্যেক দর্শনেই এঁর গুরুত্বপূর্ণ টীকা রয়েছে। সংস্কারমুক্ত চিত্তে প্রতিদর্শনের মতাদর্শকে উর্ধে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা তাঁর টীকাগুলোর অনন্য বৈশিষ্ট্য যদিও, ২/৪ স্থলে শেষপর্যন্ত 'তাৎপর্য টীকার' (ন্যায়বার্তিকের উপরে প্রণীত) বরাত দেয়াদ্বারা তাঁর স্বরস ন্যায়দর্শনেই ছিল বলে অনুমান করা যায়, তথাপি, তাঁর অসাধারণ প্রতিভার দার্শনিক যুক্তি জাল প্রতিটি দর্শনকেই মহনীয় করে তুলেছে। তাঁর গ্রন্থগুলো—বেদান্তে ১। তত্ত্ববিন্দু, ২। ব্রহ্মসিদ্ধিটীকা—তত্ত্বসমীক্ষা, ৩। ব্রহ্মতত্ত্বসংহিতোদ্দীপিনী, ৪। শারীরকভাষ্যবিভাগ বা ভামতীটীকা, ৫। বেদান্ততত্ত্ব-কৌমুদী এবং ৬। বাচস্পত্যবেদান্ত; যোগদর্শনে, ৭। তত্ত্বশারদী বা তত্ত্ববৈশারদী, ৮। যোগসূত্রভাষ্যব্যাখ্যা; মীমাংসাদর্শনে, ৯। বিধিবিবেকটীকা-ন্যায়কণিকা, বৈশেষিকদর্শনে, ১০। ন্যায়রত্নটীকা; ন্যায়দর্শনে, ১১। ন্যায়দর্শন-তাৎপর্যটীকা, ১২। ন্যায়সূচীনিবন্ধ (বস্বঙ্কবসুবৎসরে ৮৯৮ বৈক্রমসংবৎ = ৮৪১ খৃঃ): সাঙ্খ্যদর্শনে, ১৩। যুক্তিদীপিকা, ১৪। সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী—প্রভৃতি। প্রত্যেকখানাই আকর-গ্রন্থরূপে প্রসিদ্ধ।

উল্লিখিত দার্শনিক বাচস্পতিমিশ্রও উদয়নাচার্যের গুরু। মনে হয়, ইনি ছিলেন প্রথম গুরু। পরবর্তী গুরুর নাম—শ্রীবৎসাচার্য। বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যের একটি টীকা শ্রীবৎসাচার্য প্রণয়ন করেছেন। টীকাটির নাম লীলাবতী।[২]

ব্যোমশিবাচার্য : তাঁর গ্রন্থের নাম ব্যোমবতী, ইহাও প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা। ইনি বোধহয়, শ্রীধরভট্টের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ছিলেন।

শ্রীধরভট্ট ঃ ইনি মনে হয়, বৌদ্ধ জ্ঞানশ্রীর কিঞ্চিৎপরবর্তী এবং রত্নকীর্তিরও পরবর্তী, কিন্তু উদয়নাচার্যের সমসাময়িক বা কিছু পূর্ববর্তীও হতে পারেন। তাম্র-লিপ্তের (দক্ষিণ রাঢ়া) অন্তর্গত ভূরিসৃষ্টি গ্রামের শ্রীধর ভট্ট মহাপণ্ডিত এবং বৃহস্পতির পৌত্র ও বলদেবের পুত্র স্বনামধন্য বাঙালী। এঁর কালনিরূপণ বিষয়ক আলোচনা

১. মার্তণ্ডতিলক স্বামি-কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যও খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর গ্রন্থ। এ গ্রন্থ তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। জি. বুলার এঁর সম্পাদিত ক্যাটালগে ৪নং এবং ৭৪ নম্বরে এ গ্রন্থ গৃহীত হয়েছে।

২. শ্রীবৎসের এই লীলাবতী টীকাই সম্ভত চিৎসুখী সম্বন্ধে উল্লিখিত বিভ্রান্তির কারণ, বল্লভাচার্যের টীকাটির নামও লীলাবতী। নামের সাহায্যে শ্রীবৎসের স্থলেও বল্লভাচার্য হয়েছে কিনা?

পূর্বে করা হয়েছে। তাঁর বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থ ন্যায়কন্দলী। ইহার রচনাকাল ৯১৩ বৈক্রমসম্বৎ = ৮৫৭ খৃঃ—ইহাও পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এঁর গ্রন্থ ন্যায়কন্দলী, অদ্বয়সিদ্ধি (বেদান্ত), তত্ত্বসংবাদিনী এবং তত্ত্বপ্রবোধ (মীমাংসাদর্শন) ছাড়াও অমরকোষ-টীকা। শ্রীধরভট্টের প্রসঙ্গে আমরা তৎকালীন বাংলাদেশে যে রকম উন্নত শিক্ষা-দীক্ষার এবং অন্যবিষয়ের সমুন্নত সংস্কৃতির খবর জানতে পারি, তা' আমাদের অবশ্যই গৌরব উদ্রেক করে। তিনি যদিও, পূর্বোল্লিখিত রাঢ়ী শ্রেণীর ৫৬টি আদিনিবাস গ্রামের অন্যতম ভূরিসৃষ্টি গ্রামের অধিবাসী রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। তথাপি তাঁর আভাসে আমরা অন্যান্য স্থানের বিদ্যাচর্চার প্রাবল্য এবং উন্নত সংস্কৃতির ধারণা করতে পারি। বরেন্দ্রীরা শিক্ষা-দীক্ষায় কোন অংশেই হীন ছিলেন না। সুতরাং তাঁদের বসতি অঞ্চলেও অনুরূপ শিক্ষোৎকর্ষ যে গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বৌদ্ধ জ্ঞানশ্রী ছিলেন রত্নকীর্তির গুরু। রত্নকীর্তিও একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। জ্ঞানশ্রীর গ্রন্থ ক্ষণভঙ্গাধ্যায় এবং রত্নকীর্তির গ্রন্থদ্বয়—অপোহসিদ্ধি এবং ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি, উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ ন্যায়ের গ্রন্থ। ইহা অন্যান্য স্থানের মত বাংলাদেশেও প্রচুর আলোচিত হয়েছে।

উদয়নাচার্য : স্বনামধন্য দার্শনিক। অন্যান্য যাবতীয় দর্শন শাস্ত্রে এঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বিশেষ স্বরস ছিল—বুঝা যায়। প্রশস্তপাদভাষ্যের উপর 'কিরণাবলী' টীকা, বৈশেষিক দর্শনেই নিবন্ধ—লক্ষণাবলী, ন্যায়দর্শনের প্রকরণ—লক্ষণমালা, দার্শনিক বাচস্পতিমিশ্রকৃত ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকার উপরে—ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধি, ন্যায়পরিশিষ্ট, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, আত্মতত্ত্ববিবেক-প্রকরণ, এবং বোধসিদ্ধি প্রভৃতি। তৎকালে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা-মূলক বাদানুবাদের প্রচলন থাকায়, প্রতিস্পর্দ্ধীর সহিত প্রত্যক্ষ শাস্ত্রীয় সংঘর্ষ হত। নৈষধীয়চরিতকার শ্রীহর্ষের পিতা শ্রীহীর, উদয়নের প্রতিস্পর্দ্ধী ছিলেন। তাঁর সাথে প্রত্যক্ষ বিচারে উদয়ন জয়ী হয়েছিলেন বলে নৈষধচরিতের চাণ্ডুপণ্ডিতকৃত টীকায় উল্লিখিত হয়েছে।

জীমূতবাহন : ইনি বাংলার এক মুখোজ্জ্বলকারী স্মার্ত। সব ক'খানা গ্রন্থই সমাজে খুব আদরণীয় এবং অনুসরণীয় হয়ে আজ পর্যন্ত চলছে। এঁর আপস্তম্বস্মৃতিটীকা এবং তীর্থ্যর্কপ্রকাশানুক্রমণিকা অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যবহার্য হলেও কালবিবেক এবং ধর্মরত্ন দায়ভাগ খুবই উচুমানের ধর্মশাস্ত্রীয় নিবন্ধ। দায়ভাগ উত্তরাধিকার বিষয়ক নির্ভুল সমাধান দেয়ার জন্য এখনও সমাজে পৃথক্ গ্রন্থরূপে অনুসৃত

হচ্ছে। প্রকাশ স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের অন্যান্য স্মৃতিতত্ত্বের গ্রন্থগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেও 'দায়তত্ত্ব' গ্রন্থখানা জীমূতবাহনের প্রোক্ত দায়ভাগের তুল্য মর্যাদা পায় নি। দায়ভাগ গ্রন্থে জীমূতবাহন যে সকল গ্রন্থ থেকে প্রমাণ-প্রয়োগ গ্রহণ করেছেন তা নিম্নরূপ -

১। নারদস্মৃতি, ২। মানবীয়স্মৃতি (মনুসংহিতা), ৩। বৃহস্পতিসংহিতা, ৪। দেবলস্মৃতি, ৫। হারীত সংহিতা (ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক), ৬। শঙ্খ-লিখিতস্মৃতি, ৭। গৌতম সংহিতা, ৮। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ৯। গৌতমস্মৃতি, ১০। বৌধায়ন স্মৃতি, ১১। নিবন্ধ (স্মৃতিবিষয়ক), ১২। বিষ্ণুসংহিতা, ১৩। শ্রুতি, ১৪। বশিষ্ঠসংহিতা, ১৫। কাত্যায়নস্মৃতি, ১৬। ব্যাসসংহিতা, ১৭। যমসংহিতা, ১৮। উশনঃসংহিতা, ১৯। পৈঠীনসি-সংহিতা, ২০। ভৃগু-স্মৃতি, ২১। বৃদ্ধ কাত্যায়নের স্মৃতি, ২২। বৃদ্ধ শাতাতপের স্মৃতি, ২৩। আপস্তম্বস্মৃতি, ২৪। শ্রীকরমিশ্রের মত, ২৫। বিশ্বরূপের মত, ২৬। জিতেন্দ্রিয়ের মত, ২৭। বালকের মত, ২৮। প্রজাপতিস্মৃতি, ২৯। বৃহন্মনুস্মৃতি, ৩০। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৩১। দানধর্ম (নিবন্ধ), ৩২। পরাশর-স্মৃতি, ৩৩। গোবিন্দরাজকৃত মনুটীকা, ৩৪। ভোজদেবের মত, এবং ৩৫। বৃহদযাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি।

জীমূতবাহনের দায়ভাগে উল্লিখিত ধর্মশাস্ত্রের নিবন্ধকার —শ্রীকরমিশ্র, বিশ্বরূপ, জিতেন্দ্রিয়, এবং বালক, বাঙালী ধর্মশাস্ত্রকারদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীকর এবং শ্রীকরমিশ্র-উভয়নামে উল্লিখিত এই ধর্মশাস্ত্রকারের [শ্রীকরীয় ধর্মশাস্ত্র] বাদেও 'অলঙ্কারতিলক' নামক গ্রন্থের খবর পাওয়া যায়। বিশ্বরূপের গ্রন্থের নাম, বোধহয়, 'বিশ্বরূপনিবন্ধ'। তিনি যে খুব জনমান্য ধর্মশাস্ত্রকার ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, কেননা, হেমাদ্রি, শূলপাণি, স্মার্ত মৈথিল বাচস্পতিমিশ্র, অল্লাড়নাথ রঘুনন্দন, কমলাকর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রকার রূপে এঁর উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত বিশ্বরূপনিবন্ধ ছাড়াও, বিশ্বরূপসমুচ্চয় এবং যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি-টীকা নামে তাঁর গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। জিতেন্দ্রিয়ের গ্রন্থের নামাদি জানা যায় না, তবে তিনিও যে একজন নামজাদা স্মার্ত গ্রন্থকার ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, অন্যথা জীমূত-বাহন তার মতের উদ্ধৃতি দিতেন না। স্মার্ত বালকেরও কোন গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। •এসব প্রাচীন বাঙালী পণ্ডিতগণ সমাজ-মান্য শাস্ত্রকার ছিলেন, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, যে তাঁদের সাংস্কৃতিক অবদান রক্ষা করে রাখা গেল না।

যা হোক্, জীমূতবাহনের দায়ভাগ গ্রন্থখানা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা' জানা যায় বা অনুধাবন করা যায় তার টীকা-টিপ্পনীর বাহুল্যে। অচ্যুতশর্মার টীকা, উমা-শঙ্করের টীকা, গঙ্গাধরের টীকা, গঙ্গারামের টীকা, নীলকণ্ঠের টীকা, মহেশ্বরের টীকা, রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের টীকা, রামভদ্রের টীকা, শ্রীনাথের টীকা, সদাশিবের টীকা, হরিদীক্ষিতের টীকা, জয়কৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকৃত 'দায়দীপ' নামক টীকা এবং দায়ভাগ প্রবোধিনী বা ধীরামোদকরী নামক শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার কৃত টীকা—প্রভৃতি গ্রন্থখানার বহুল প্রচার এবং গুরুত্বের অবশ্যই প্রমাণ। টীকাকারগণ সকলেই বাঙালী মহাস্মার্ত নৈয়ায়িক ছিলেন।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী সাংস্কৃতিক অঙ্গনে খুব হতাশার নয়। পালরাজদের এবং তথাকথিত চন্দ্ররাজদের রাজ্যপরিসীমার মধ্যেই প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ ছিল। ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা বৌদ্ধধর্মের তুলনায় অপর দু'টি ধর্মের কম ছিল মেনে নিলেও মোটামুটি সুস্থে সমগ্র সমাজ চলেছিল মনে হয়। তাই, বিগত শতাব্দীর মত না হলেও উল্লেখযোগ্য অনেক গ্রন্থকার এ শতাব্দীতেও বহু গ্রন্থ লিখেছেন। নিম্নে আলোচিত গ্রন্থকারদের গ্রন্থগুলো এ শতাব্দীতে উল্লেখ করা যেতে পারে যা' ক্রমিক সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করে।

দিবাকর বৎস: ইনি অভিনব গুপ্তের অন্যতম গুরু। এঁর গ্রন্থ দু'খানা-বিবেকাঞ্জন, এবং কক্ষ্যামালাস্তোত্র।। **ইন্দুরাজ** বা **প্রতীহার ইন্দুরাজের** গ্রন্থ—উদ্ভটালঙ্কারলঘুবৃত্তি।।

বল্লভদেব: ইনি আনন্দদেবের পুত্র, চন্দ্রাদিত্যের পিতা এবং আনন্দবর্দ্ধনকৃত দেবী-শতকের টীকাকার কয্যটের পিতামহ। মল্লিনাথও এঁর নামোল্লেখ করেছেন। এঁর গ্রন্থগুলোর—সবই টীকা গ্রন্থ। যথা-কুমার সম্ভবের টীকা, মেঘদূতটীকা, রঘুবংশের টীকা-পঞ্জিকা, বক্রোক্তিপঞ্চাশিকার টীকা, শিশুপালবধ বা মাঘ-মহাকাব্যের টীকা এবং সূর্যশতক টীকা।। **ক্ষেমীশ্বর**: ইনি কনৌজরাজ মহীপালের নির্দেশে 'চণ্ডকৌশিক' নামক একটি নাটক প্রণয়ন করেছিলেন। কনৌজরাজ মহীপালের সিংহাসনারোহণ, বোধ হয়; ৯১৪ খৃষ্টাব্দে। চণ্ডকৌশিক নাটকখানা বেশ প্রসিদ্ধ।। **উৎপলদেব** অথবা সংক্ষেপে উৎপল। ইনি উদয়াকরের পুত্র এবং সোমানন্দের শিষ্য এবং লক্ষ্মণ গুপ্তের গুরু ছিলেন। ইনি ৯৩০ খৃষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর অজড়প্রমাতৃসিদ্ধি, ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাসূত্রবিমর্শিনী, পরমেশস্তোত্রাবলী এবং স্পন্দ-প্রদীপিকা দার্শনিক তত্ত্বময় এবং বেশ জনপ্রিয় গ্রন্থ।। **হলায়ুধ**, (লক্ষণ সেনের মহাধর্মাধিকৃত হলায়ুধ অন্য ব্যক্তি) রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের প্রশস্তিবিশিষ্ট কবি-রহস্য নামক এক কাব্য প্রণয়ন করেছিলেন। এ গ্রন্থ খুব চলতি গ্রন্থ নয়।। **ভল্লট**: ইনি 'ভল্লটশতক'নামক একখানা নীতিবিষয়ক গ্রন্থ লিখেছিলেন। ইহা ভল্লট-নীতিশতক নামেও পরিচিত এবং অল্পের মধ্যে নীতিশিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এদেশে ভর্তৃহরির নীতিশতক এবং চাণক্যের নীতিশ্লোকাবলীর পরেই ভল্লটের গ্রন্থ প্রচলিত ছিল।। **ধনঞ্জয়**, মালবের রাজা মুঞ্জের সভাসদ ছিলেন। এঁর পিতার নাম বিষ্ণু। ইনি 'দশরূপক' নামক একখানা অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন যা'

সাহিত্যসেবীদের অত্যন্ত রুচিপ্রদ গ্রন্থ বলেই এতকাল অবিরামে চলছে।। **ত্রিবিক্রম ভট্ট**, 'এঁর দু'খানা চম্পূকাব্য যথা-নলচম্পূ এবং মদালসাচম্পূ অত্র শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য। মদালসাচম্পূ কতটা প্রসিদ্ধি পেয়েছিল--বলা যায় না তবে, নলচম্পূ এদেশে দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যরসিকদের মানসিক খোরাক যুগিয়েছে সন্দেহ নেই।।

জৈন গ্রন্থকারদের মধ্যে জৈন **সিদ্ধর্ষি** ৯০৬ খৃষ্টাব্দে উপমিতিভাবপ্রপঞ্চকথা; দিগম্বর জৈন **সোমদেব** ৯৫৯ খৃঃ যশস্তিলক চম্পূ; এবং জৈন **ধনপাল** ৯৭০ খৃষ্টাব্দে তিলকমঞ্জরী নামক কাব্য প্রণয়ন করেছিলেন। এ গ্রন্থ ক'খানা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, বিশেষত জৈনদের মধ্যে। এ শতাব্দীতেও বাঙালীদের মধ্যে প্রচুর জৈন ছিল, সুতরাং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উল্লিখিত জৈন গ্রন্থ অবদান যুগিয়েছে সন্দেহ নেই।

এই শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন--**অভিনব গুপ্ত, উৎপল ভট্ট এবং কয্যট**। এঁদের মধ্যে অভিনব গুপ্ত কাশ্মীরী চুখলের পুত্র, বরাহগুপ্তের পৌত্র, মনোরথ গুপ্তের ভ্রাতা এবং উৎপলদেবের শিষ্য। ইন্দুরাজ এবং তৌত নামক উপাধ্যায়ও তাঁর অপর গুরুদ্বয়। তিনি আপন গ্রন্থেই এসব পরিচিতির সাথে সোমানন্দের প্রশিষ্য বলেও উল্লেখ করেছেন। অপর দিকে, তিনি ছিলেন ক্ষেমরাজের গুরু। অভিনবগুপ্ত নিজে আবার, প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্ষিণী গ্রন্থে, ভট্টনারায়ণ, দিবাকরবৎসের বিবেকাঞ্জন গ্রন্থ, বিদ্যাপতি, সোমানন্দের 'শিবদৃষ্টিসার' এবং সংক্ষেপবিমর্শাধিরোহ গ্রন্থের-গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'ভৈরবস্তব" এর রচনাকাল ৯৯৩ খৃঃ এবং ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিমর্ষিণী'র রচনাকাল ১০১৫ খৃঃ ধরে, অপরাপর গ্রন্থগুলোর মধ্যে কাল সম্পর্কিত নির্দেশ না থাকলেও এই সময়ের মধ্যেকার রচনা বলে ধরা হয়। গ্রন্থগুলো হচ্ছে ১। ভৈরবস্তব (৯৯৩ খৃঃ,) ২। ভেদবাদন-দারণ, ৩। ভগবদ্গীতার্থসংগ্রহ, ৪। বোধপঞ্চদশিকা, ৫। বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ, ৬। পরাত্রিংশিকাতত্ত্ববিবরণ, ৭। পরমার্থসারটীকা, ৮। পরমার্থসার অথবা আধানকারিকা, ৯। পরমার্থসংগ্রহ. ১০। ধ্বন্যালোকলোচন অথবা কাব্যালোকটীকা, ১১। তন্ত্রালোক, ১২। তন্ত্রসার, ১৩। ঘটকর্পর-কুলকবৃত্তি, এবং ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিমর্ষিণী (১০১৫ খৃঃ) অভিনবগুপ্ত প্রকৃতপক্ষে, ১০ম এবং ১১শ শতাব্দীর গ্রন্থকার।

উৎপলভট্ট অথবা ভট্টোৎপল : ইনিও একজন অসাধারণ ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী। আর্যভট্ট এবং বরাহমিহিরের পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে ইনিই সর্বাধিক

প্রসিদ্ধ। তাঁ'ছাড়া মূলত ইনি কান্যকুব্জের হলেও, মগধের তথা বাংলাদেশের (তৎকালীন) বীরভূম জিলার অধিবাসী বলে মনে করা হয়। কালানুসারী বিন্যাসে ইনি অভিনব গুপ্তের চেয়ে কিছুকাল আগের লোক। বরাহ মিহিরের 'বৃহজ্জাতক' গ্রন্থের বিখ্যাত টীকা জগচচন্দ্রিকা এঁর ৯৬৬ খৃষ্টীয় রচনা। তন্ত্র এবং জ্যোতিষের বিশেষ প্রসারক্ষেত্র বঙ্গে ভট্টোৎপলের যাবতীয় গ্রন্থই ফলিত জ্যোতির্জ্ঞানে সর্বাধিক অবলম্বন ছিল। গ্রন্থগুলো হচ্ছে — ১। অর্গলপ্রশ্ন, ২। উৎপলপরিমল, ৩। বাদরায়ণকৃত প্রশ্ন-জ্যোতিষের গ্রন্থের টীকা—চিন্তামণি, ৪। বরাহমিহিরকৃত বৃহজ্জাতক গ্রন্থের টীকা জগচ্চন্দ্রিকা (৯৬৬ খৃঃ), ৫। জ্ঞানমালা, ৬। প্রশ্নজ্ঞান, ৭। প্রশ্নসপ্ততি, ৮। বৃহৎজ্জাতকশ্লোক-ব্যাখ্যান, ৯। বৃহৎসংহিতা-ভাষ্য, ১০। যোগযাত্রাবিবরণ, ১১। রমল, ১২। লঘুজাতকটীকা-শিষ্যহিতা, ১৩। পৃথুযশার হোরাষট্পঞ্চাশিকা'র টীকা, ১৪। ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ডখাদ্য' গ্রন্থের টীকা' এবং ১৫। ভট্টোৎপলীয়জ্যোতিষ।

কয্যট : উক্ত বল্লভদেবের পৌত্র, চন্দ্রাদিত্যের পুত্র কয্যট, আনন্দবর্দ্ধনের দেবীশতক গ্রন্থের একটি সমীচীন টীকা করেছিলেন। ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রণীত এই টীকা দেবীশতকের বহুল প্রচারে সবিশেষ উৎসাহ যুগিয়েছিল। উহা বিশেষ পাণ্ডিত্যের প্রকাশকও বটে।

শ্রীহর্ষ : দার্শনিক বাচস্পতিমিশ্রের কালনির্ণয় দ্বারা, সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাচস্পতিমিশ্রের ছাত্র উদয়নাচার্যের কাল অনুমিত হতে পারে। তদনুসারেই খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তাঁর সংস্থাপন করা হয়েছে। নৈষধীয়চরিতের অন্যতম টীকাকার চাণ্ডুপণ্ডিতের উক্তিতে জানা যায়—অত্র শ্রীহর্ষের পিতা শ্রীহীরের সাথে উদয়নাচার্যের বিচার-বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছিল। সেই অনুসারে শ্রীহর্ষকে অবশ্যই খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ কালের লোক বলে ধরা হয়। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকে শ্রীহর্ষকে মৈথিল বলেছেন এবং নিজে অভিপ্রেত কালে যাঁকে মিথিলার রাজা হিসাবে পাওয়া সম্ভব তাঁর রাজসভার সাথেই সংশ্লিষ্ট বলেছেন বটে কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, নৈষধীয় চরিতের মধ্যেই তৎপ্রণীত যে অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে একখানা হচ্ছে-'গৌড়োর্বীশ কুলপ্রশস্তি'। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয়, হয় তিনি গৌড়রাজের রাজসভায় ছিলেন নয়তো, প্রশস্তিকারের গৌরবিত পদে বৃত হয়েছিলেন। সে সময় মিথিলাও প্রথম মহীপালের রাজ্যসীমার মধ্যেই ছিল। সুতরাং উক্ত প্রশস্তিখানা যে পাল সাম্রাজ্যের নতুন প্রতিষ্ঠাতা —প্রথম মহীপালের সম্বন্ধে তা বোধ হয়, অলীক—অসঙ্গত কল্পনা নয়। যদিও শ্রীহর্ষের পিতার নামদ্বারা (শ্রীহীর) না পারলেও মাতার নামদ্বারা (মামল্লদেবী)

তাঁকে মৈথিল মনে করা চলতে পারে, তথাপি অন্যপ্রদেশীয় কন্যার অন্যপ্রদেশে বিবাহ হওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তাছাড়া, উল্লিখিত প্রশস্তিদ্বারা অনুমিত তাঁর গৌড়ীয় মর্যাদার অপলাপ করা চলে না। এঁর গ্রন্থগুলো ১। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য (বেদান্ত-প্রকরণ) এবং ২। নৈষধীয়চরিত (মহাকাব্য) তাছাড়াও, নৈষধের চতুর্থসর্গে উল্লিখিত, ৩। স্থৈর্যবিচারণা, পঞ্চম সর্গে উল্লিখিত, ৪। বিজয়প্রশস্তি, নবম সর্গে উল্লিখিত, ৫। অর্ণববর্ণনা, সপ্তদশসর্গে উল্লিখিত, ৬। চণ্ডপ্রশস্তি এবং দ্বাবিংশ সর্গে উল্লিখিত, ৭। নর্সাহসাঙ্কচরিত, এবং সপ্তম সর্গে উল্লিখিত প্রোক্ত, ৮। গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি।

'নৈষধীয় চরিত' একখানা মহাকাব্য। মহাভারতে বর্ণিত রাজা নল এবং পত্নী দময়ন্তীর কাহিনী অবলম্বনে ২২টি সর্গে প্রায় ৩০০০ শ্লোকে এই মহাকাব্য প্রণীত। ইহার শ্লোকগুলো এমন-ই লালিত্যমাখা যে সংস্কৃত না জানলেও উপযুক্ত আবৃত্তি শ্রবণে আগ্রহ হয়। এই গ্রন্থেরও বহু টীকা প্রণীত হয়েছে, যেমন, ১। রাজানক আনন্দকৃত টীকা, ২। ঈশানদেবের টীকা, ৩। গোপীনাথকৃত হর্ষহৃদয় নামক টীকা, ৪। চাণ্ডুপণ্ডিতকৃত টীকা, (১৪৫৬/৫৭ খৃঃ), ৫। চারিত্রবর্দ্ধনকৃত টীকা, ৬। জিনরাজকৃত টীকা, ৭। নরহরি বা নরসিংহকৃত নৈষধীয়প্রকাশ নামক টীকা, ৮। নারায়ণকৃত নৈষধপ্রকাশ টীকা (সংক্ষেপে ইহাকে নারায়ণী টীকা বলা হয়। এটা খুবই সমীচীন সারগর্ভ কিন্তু সংক্ষিপ্ত), ৯। ভগীরথকৃত টীকা, ১০। ভরতসেন কৃত টীকা, ১১। ভবদত্তকৃত টীকা, ১২। মথুরানাথশুক্ল কৃত টীকা, ১৩। কোলাচল মল্লিনাথকৃত---টীকা জীবাতু, ১৪। মহাদেব বিদ্যাবাগীশকৃত টীকা, ১৫। শেষনারায়ণের ছাত্র---রামচন্দ্রশেষকৃত---ভাবদ্যোতনিকা টীকা, ১৬। বংশীবদন শর্মকৃত টীকা, ১৭। বিদ্যারণ্যস্বামিকৃত টীকা, ১৮। মল্লিনাথ কর্তৃক উল্লিখিত বিশেশ্বরাচার্যকৃত পদ-বাক্যার্থপঞ্জিকা নামক টীকা, ১৯। শ্রীদত্তকৃত টীকা, ২০। শ্রীনাথকৃত নৈষধপ্রকাশ নামক টীকা, এবং ২১। সদানন্দকৃত টীকা। নৈষধচরিতের আর একটি টীকার সন্ধান পাওয়া যায়—উদয়নকত। এই উদয়ন, বিখ্যাত ন্যায়াচার্য নন। ইনি গীতগোবিন্দেরও টীকা করেছেন, সুতরাং গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের পরবর্তী কেহ হবেন।[১] অতবড় বিশাল গ্রন্থের এতগুলো টীকা নিঃসন্দেহে গ্রন্থখানার জনপ্রিয়তা এবং গুরুত্ব প্রকাশ করে। টীকাকারদের অনেকেই বাঙালী। গ্রন্থখানা বাংলাদেশের সর্বত্র চির আদৃত।

১. গোবর্দ্ধনাচার্যের অনুজ এবং ছাত্র—উদয়ন হওয়াও অসম্ভব নহে।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী

এ শতাব্দীতে বহু গ্রন্থকার এবং গ্রন্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয়ের গ্রন্থের সম্পর্ক এতদঞ্চলের শিক্ষা-দীক্ষার সহিত বেশী সংশ্লিষ্ট। যেমন—

রাজানক ক্ষেমরাজ: এঁর অনেক গ্রন্থ ১। ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়, ২। নেত্রোদ্যোত, ৩। অভিনবগুপ্তের পরমার্থসারের টীকা, ৪। পরমার্থসংগ্রহবিবৃতি, ৫। ভৈরবানুকরণস্তোত্র, ৬। বর্ণোদয়তন্ত্র, ৭। শিবসূত্রবিমর্ষিনী, ৮। শিবস্তোত্র, ৯। সাম্বপঞ্চাশিকা বিবরণ, ১০। নারায়ণকৃত স্তবচিন্তামণি'র টীকা, ১১। স্তোত্রাবলীবৃত্তি, ১২। স্পন্দনির্ণয়, ১৩। স্পন্দসন্দোহ, ১৪। স্বচ্ছন্দনয়, এবং ১৫। স্বচ্ছন্দোদ্যোত।

ক্ষেমেন্দ্র: ইনি ব্যাসদাস নামে পরিচিত। পিতার নাম প্রকাশেন্দ্র, পিতামহ ছিলেন সিন্ধু। ইনি অভিনবগুপ্ত এবং সোমানন্দের ছাত্র। এঁর সর্বশেষ অধ্যাপকের নাম গঙ্গক। ইনি কাশ্মীররাজ অনন্ত (১০২৯-৬৪ খৃঃ) এবং তাঁর পুত্র কলস এঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন। সুবৃত্ততিলক নামক গ্রন্থে ইনি অনন্তরাজের স্তুতি-গাঁথা লিখেছেন। এঁর পুত্রের নাম সোমেন্দ্র। তিনি রাজপুত্র লক্ষ্মণাদিত্যের গুরু। অপর উল্লেখযোগ্য ছাত্রের নাম উদয়সিংহ। ক্ষেমেন্দ্রের বহু গ্রন্থের মধ্যে মাত্র দশাবতারচরিত্র গ্রন্থখানার রচনা কাল ১০৬১ খৃষ্টাব্দ বলে সঠিক জানা যায়। গ্রন্থগুলোর নাম—১। অমৃততরঙ্গ, ২। অবসরসার, ৩। ঔচিত্যবিচারচর্চা, ৪। কনকজানকী, ৫। কলাবিলাস কাব্য, ৬। কবিকণ্ঠাভরণ, ৭। ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশ, ৮। চতুর্বর্গ সংগ্রহ, ৯। চারুচর্যা, ১০। চিত্রভারত-নাটক, ১১। দর্পদলন, ১২। দশাবতারচরিত্র (১০৬১ খৃঃ) ১৩। দেশোপদেশ, ১৪। দানপারিজাত, ১৫। নীতিকল্পতরু ১৬। নীতিলতা, ১৭। পদ্যকাদম্বরী, ১৮। পবমানপঞ্চাশিকা ১৯। বৃহৎ কথামঞ্জরী, ২০। বৌদ্ধবাদন কল্পলতা (বৌদ্ধ মতবাদের বিশেষত্ব প্রতিপাদক), ২১। মহাভারত মঞ্জরী ২২। মুক্তাবলীকাব্য, ২৩। মুনিমত মীমাংসা, ২৪। রাজাবলী, ২৫। রামায়ণ কথাসার, ২৬। ললিতরত্নমালা, ২৭। লাবণ্যবতী কাব্য, ২৮। বাৎস্যায়ন সূত্রসার, ২৯। বিনয়বল্লী, ৩০। বেতালপঞ্চবিংশতি (বৃহৎকথা মঞ্জরীর অংশবিশেষ হলেও অতি জনপ্রিয় পৃথক গ্রন্থরূপেই প্রচারিত), ৩১। ব্যাসাষ্টক, ৩২। শশিবংশ, ৩৩। সময়মাতৃকা, ৩৪। সুবৃত্ততিলক, এবং ৩৫। সেব্য-সেবকোপদেশ। শুধু বাংলাদেশে কেন, সারা ভারতবর্ষে, জনপ্রিয় এত গ্রন্থ ক্ষেমেন্দ্র-ব্যাসদাস ব্যতিরেকে আর কেহ প্রণয়ন করেছেন বলে জানা যায় না।

কৃষ্ণগিরি : ইনি কৈলাসাচল নামক গুরুর শিষ্য এবং রণোদ্দীপসিংহের ইচ্ছানুসারে ১০১৫ অব্দে, একখানা বেদান্তের প্রকরণ—মোক্ষসিদ্ধি প্রণয়ন করেছেন।

দশবল : ইনি একজন বৌদ্ধ লেখক। ১০১৫ খৃষ্টাব্দে তিথিগাবণিকা নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। অপর গ্রন্থের নাম—দশবলকারিকা। ইহাতে ১০টি গণের বিভিন্ন ধাতুর বর্তমানকালীয় রূপগুলো দিয়ে গ্রন্থখানাকে ব্যাকরণ অধ্যেতৃদের খুবই উপযোগী করা হয়েছে।

দ্যাবিদেব : ইনি মুকুন্দের প্রপৌত্র, অত্রির পৌত্র এবং লক্ষ্মীধরের পত্র, ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে নীতিমঞ্জরী এবং তার টীকা প্রণয়ন করেছেন।

নমি : ইনি একজন শ্বেতাম্বর জৈন পণ্ডিত। এঁর গুরুর নাম শালিভদ্র। ইনি ১০৫৯ খৃষ্টাব্দে রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারের একটি সমীচীন টীকা প্রণয়ন করেছেন (কাব্যালঙ্কার-টীকা)।

বর্দ্ধমান সূরি : ইনি অভয়দেবের শিষ্য ১০৩২ খৃষ্টাব্দে কথাকোষ অথবা শকুনরত্নাবলী প্রণয়ন করেছেন।

বিহ্লণ : ইনি রাজতরঙ্গিণী-কার কহ্লণ এবং মঙ্খের পূর্বেকার গ্রন্থকার। ইনি মুক্তিকলসের প্রপৌত্র, রাজকলসের পৌত্র, জ্যেষ্ঠ কলসের পুত্র, এবং ইষ্টরাম এবং আনন্দের সহোদর। একাদশ শতাব্দীর (খৃষ্টীয়) মাঝামাঝি সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। এঁর পাঁচখানা গ্রন্থই প্রসিদ্ধ ১। কর্ণসুন্দরী (নাটিকা), ২। চৌরিসুরতপঞ্চাশিকা, ৩। বিহ্লণচরিত, ৪। বিক্রমাঙ্কচরিত এবং ৫। বিহ্লণীয় কাব্য।

ভোজরাজ/ভোজদেব : ইনি যে ব্রাহ্মণধনপতিভট্টকে ভূমিদান করেছিলেন তাতে "ইতি।। সংবৎ ১০৭৮ চৈত্র সুদি ১৪ স্বয়মাজ্ঞা মঙ্গলং মহাশ্রীঃ। স্বহস্তোহয়ং শ্রীভোজদেবস্য" লিখিত আছে। বিক্রম সং ১০৭৮ = ১০২২ খৃষ্টাব্দ। পরিষ্কার প্রতিপন্ন হয়—পূর্বোল্লিখিত বাক্‌পতিরাজ ছিলেন ভোজদেবের পিতামহ। প্রসিদ্ধ ধারা নগরের রাজা ভোজদেবের নামে অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়।-সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের ১। আদিত্যপ্রতাপসিদ্ধান্ত; তন্ত্রজ্যোতিষের, ২। রাজমৃগাঙ্ক; আয়ুর্বেদের, ৩। আয়ুর্বেদসর্বস্ব, এবং ৪। বিশ্রান্তবিদ্যাবিনোদ; পৌরাণিক কাব্যের, ৫। চম্পূরামায়ণ; নীতি-শাস্ত্রের, ৬। চাণক্যনীতি: ধর্মশাস্ত্রের, ৭। চারুচর্যা; আইনসংক্রান্ত, ৮। ব্যবহার সমুচ্চয়; অভিধান বিষয়ের, ৯। নামমালিকা; যোগদর্শনবিষয়ে, ১০। যোগসূত্রের বৃত্তি—রাজমার্তণ্ড; অপদেশাদিসাধারণ কাব্যবিষয়ের, ১১। বিদ্যাবিনোদ কাব্য; প্রশ্নবিষয়ক ফলিত জ্যোতিষের, ১২। বিদ্বজ্জনবল্লভ-প্রশ্নজ্ঞান; ব্যাকরণ-সংক্রান্ত, ১৩। শব্দানুশাসন; শৈবাগম বা শৈবদর্শন বিষয়ক, ১৪। তত্ত্বপ্রকাশ, ১৫। শিব-

তত্ত্বরত্নকলিকা ; দুর্গনির্মাণবিষয়ক স্থাপত্যে, ১৬। সমরাঙ্গনসূত্রধার ; সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ে, ১৭। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ; সংগ্রহ-গ্রন্থ বিষয়ে, ১৮। সিদ্ধান্ত (শৈব) সংগ্রহ ; রম্যরচনাসংগ্রহে, ১৯। সুভাষিত প্রবন্ধ, এবং রত্নবিজ্ঞান বিষয়ে, ২০। যুক্তিকল্পতরু।। বিভিন্নবিষয়ে এতগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন, হয়তো, নিয়োজিত উপযুক্ত গ্রন্থকারদের সাহায্যেই করা হয়েছে, তথাপি ভোজদেবের বিদ্যানুরাগ এবং বিদ্বজ্জনপোষণ অবশ্যই আদর্শস্থানীয় ছিল সন্দেহ নেই। তাঁর যাবতীয় গ্রন্থ বাংলাদেশে তথা ভারতের অন্যান্য স্থানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। গ্রন্থের বিষয় নির্বাচনে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা এবং প্রখর দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। উপরে লিখিত ১৬টি বিষয় ছাড়াও অত্যন্ত অপ্রায়িক পশুচিকিৎসাবিষয়ে ২১। শালিহোত্র নামক গ্রন্থ-খানা তার প্রমাণ। পশুচিকিৎসাবিষয়ে সর্বাদিম মুনিবর শালিহোত্রের নামে উক্ত গ্রন্থের নামকরণ দ্বারা সত্যিকার শালিহোত্রীয় পশুচিকিৎসা গ্রন্থের একদফা সম্পাদনা কিনা, তা' বলা যায় না। তা' হলেও উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসার্হ ছিল—বলা যায়।

সর্বদেবসূরি : ইনি একজন জৈন গ্রন্থকার। বৈশেষিক দর্শনে তাঁর প্রমাণমঞ্জরী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি কোন্ সময়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন তা' জানা যায় না, তবে ঐ প্রমাণমঞ্জরী গ্রন্থের ১০৫৭ খৃষ্টীয় অনুলিখিত গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। এই গ্রন্থের অদ্বয়ারণ্যযোগীর এবং বলভদ্রসূরির দু'টি টীকা রয়েছে।

সোমদেব : ইনি শ্রীরামের পুত্র। বিখ্যাত গ্রন্থ---কথাসরিৎসাগর, তাঁর বিখ্যাত রচনা। রচনার কাল গৌরীনাথ শাস্ত্রীর মতে ১০৬৩–৮১খৃ: ।

আচার্য মহিম ভট্ট : ইনি একজন বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত। এঁর ব্যক্তিবিবেক গ্রন্থখানাও খুবই প্রসিদ্ধ সাহিত্যতত্ত্বের গ্রন্থ। অনেকেই এঁকে ব্যক্তিবিবেককার বলেই উল্লেখ করেছেন। এঁর কাল নিয়েও মতভেদ আছে। ঝলকিকার আচার্য বামনের মতে ইনি খৃষ্টীয় দশম শতকের লোক।

বাদিরাজ : এঁর রচনা যশোধরচরিত, রাজা যশোধরের জীবনালেখ্য, প্রশস্তিমূলক।

লোলিম্বরাজ : এঁর অনেক গ্রন্থ। আয়ুর্বেদ-বিষয়ে এঁর গ্রন্থগুলো খুব মূল্যবান। গ্রন্থগুলো--১। চমৎকারচিন্তামণি, ২। রত্নকলাচরিত্র, ৩। বৈদ্যজীবন, ৪। বৈদ্যবিলাস, ৫। বৈদ্যাবতংস, এবং ৬। লোলিম্বরাজীয়ৌষধাবলী। এছাড়া, একখানা কাব্য বা মহাকাব্যও আছে নাম ৭। হরিবিলাস।

দামোদর : এঁর নামের সহিত কেহ কেহ 'মিশ্র' পদবী ব্যবহার করেছেন কিন্তু তার কোন গ্রাহক প্রমাণ পাওয়া যায় না। এঁর একখানা নাটক-ই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

নাম—মহানাটক বা হনুমন্নাটক ১০ অঙ্কে সমাপ্ত এক বিরাট নাট্যসাহিত্য। গ্রন্থখানার বিশেষত্ব—আগা-গোড়া ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে প্রণীত। এ নাটকখানারও, চন্দ্রশেখরকত, নারায়ণকৃত, বলভদ্রমিশ্রকৃত এবং মোহনকৃত চারটি টীকা পাওয়া যায়।

বিল্বমঙ্গল: ইনি লীলাশুক নামে পরিচিত একজন ভক্ত কবি। এঁর ৬খানা মূল গ্রন্থ এবং একটি স্বরচিত গ্রন্থের টীকা পাওয়া যায়। সব ক'খানা-ই কৃষ্ণ ভক্তিমূলক। ১। কৃষ্ণকর্ণামৃত স্তোত্র, ২। কৃষ্ণবালচরিত, ৩। কৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী, ৪। গোবিন্দ স্তোত্র, ৫। বালকৃষ্ণ ক্রীড়াকাব্য, ৬। বিল্বমঙ্গলস্তোত্র, এবং কৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রের টীকা। বিল্বমঙ্গল একজন মহাপণ্ডিত ভক্ত বৈষ্ণব। এঁর গ্রন্থগুলোর অত্যুন্নত সাহিত্য-গুণথাকা সত্ত্বেও অনবদ্য ভক্তির উদ্রেক করে। জানা যায়-শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণাত্যের তীর্থ-ভ্রমণকালে কৃষ্ণকর্ণামৃত স্তোত্রগ্রন্থ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তার একটি সমীচীন টীকাও প্রণয়ন করেছিলেন।

গোবর্দ্ধনাচার্য: এঁর পিতার নাম নীলাম্বর অথবা সঙ্কর্ষণ। ভ্রাতার নাম বলভদ্র এবং শিষ্যের নাম উদয়ন। এঁর গ্রন্থ-আর্যাসপ্তশতী। কবি জয়দেব এঁর উল্লেখ করেছেন।

পদ্মগুপ্ত/পরিমল: এঁর পিতার নাম মৃগাঙ্কগুপ্ত। ইনি বোধ হয়, বাক্‌পতিরাজ এবং সিন্ধুরাজের সভায় ছিলেন। ভোজদেব প্রসঙ্গে তাঁর পিতামহবাক্‌পতিরাজের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সে হিসাবে কালত এঁর বিন্যাস পূর্বেই হওয়া সম্ভব। যা'হোক্-এঁর গ্রন্থের নাম নবসাহসাঙ্কচরিত। গৌরীনাথ শাস্ত্রী এই গ্রন্থের রচনার কাল ১০৫০ খৃঃ লিখেছেন। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত ভোজদেবের দানানুশাসনের[১] কালানুসারে তা' কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না। প্রোক্ত বিশেষ বক্তব্য দেয়ার জন্য এখানে লিখিত হলেও পূর্বেই ধর্তব্য।

সোড্‌ঢল: ইনি একজন গুজরাটী সাহিত্যিক হলেও বিষয়-বস্তুর চমৎকারিত্বে এঁর "উদয়সুন্দরীকথা" এতদ্দেশেও প্রচলিত হয়েছিল। ১০৪০ খৃষ্টীয়াব্দে এ গ্রন্থ প্রণীত।

হরদত্ত: রুদ্রকুমারের পুত্র এবং অগ্নিকুমারের ভ্রাতা হরদত্ত বোধহয়, একজন বাঙালী গ্রন্থকার। সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে নকুলীশ পাশুপতদর্শনের প্রসঙ্গে, এবং মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে এঁর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। ইনি নিজে শিশুপাল-

১. আচার্য বামনকৃত কাব্যপ্রকাশের ভূমিকা (প্রস্তাবনা) পৃঃ ৬ দ্রষ্টব্য।

বধকর্তা মাঘকবির উল্লেখ করেছেন। এঁর অনেক গ্রন্থ ১। অধ্যায়-নব-ভাষ্য, ২। আপস্তম্বসূত্রের টীকা অনাকুলা, ৩। আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রের টীকা—অনাবিলা, ৪। আপস্তম্বের ধর্মসূত্রের টীকা—আবিলা, ৫। চতুর্বেদ-তাৎপর্যসংগ্রহ অথবা শ্রুতি-সূক্তিমালা, ৬। বামনের কাশিকাবৃত্তির টীকা—পদমঞ্জরী, ৭। মন্ত্রপ্রশ্নভাষ্য, ৮। গৌতমের ধর্মসূত্রের টীকা—মিতাক্ষরা ৯। শিবলীলার্ণব, ১০। শিবস্তোত্র, ১১। হরি-হর-তারতম্য, এবং ১২। হরদত্তীয় (ধর্মশাস্ত্রীয়)। এঁর কালনিয়েও মতান্তর আছে। গৌরীনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন[১] "মল্লিনাথ হরদত্তের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আবার হরদত্ত নিজেই মাঘের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।' হাস্যচূড়ামণি গ্রন্থের প্রসঙ্গে তিনিই আবার লিখেছেন "খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বৎসরাজরচিত।"[২] এখন কথা হল—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বৎসরাজ মল্লিনাথেরও উল্লেখ করেছেন। টীকাকার এই মল্লিনাথ কোলাচল মল্লিনাথ ছাড়া অন্য কেহ নয়। সুতরাং দ্বাদশ শতকের বৎসরাজ কর্তৃক উল্লিখিত কোলাচল মল্লিনাথ টীকা করে থাকলে গ্রন্থকার হরদত্ত দ্বাদশ শতকের আগেকার হওয়াই সম্ভব। প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত গ্রন্থকার না হলে এতবড় টীকাকার তার উল্লেখই করতেন না। বৎসরাজ যে মল্লিনাথের (কোলাচল) উল্লেখ করেছন তা' Theodor Aufrecht স্বীকার করেছেন।[৩]

জয়ানক/জয়রাম: পৃথ্বীরাজবিজয়কার জয়ানক বা জয়রাম কাব্যপ্রকাশকার মম্মট, হরবিজয়কার রত্নাকার এবং হরবিজয়ের টীকাকার অলক সম্বন্ধে একটি খণ্ডালোচনা দরকার। কাব্যপ্রকাশকার মম্মট কাশ্মীরীয় ব্রাহ্মণ। তাঁর আবির্ভাব-কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতক বলে প্রায় সর্ববাদি সম্মত-ই হয়ে গিয়েছে। এই মম্মট সম্বন্ধে কাব্যপ্রকাশের টীকা 'নিদর্শনায়' কথিত হয়েছে "...ইত্যাদি শৈবাগমশাস্ত্রের প্রসিদ্ধি অনুসারে, ছত্রিশ প্রকার তত্ত্বদীক্ষার মাধ্যমে সকল প্রকার অজ্ঞানপঙ্ক-স্খালনে প্রতিভাত সত্য-চিদানন্দ-সমুদ্ভাসিত রাজানক বংশতিলক মম্মট নামক দেশবাসী....।"[৪] মম্মট যে কাব্য-প্রকাশ গ্রন্থের 'পরিকর' অলঙ্কার পর্যন্ত মাত্র প্রণয়নের পরেই শিবলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তৎপরবর্তী সমাপ্তি পর্যন্ত অংশের অভিযোজন করেছিলেন অল্লট বা অলক, তা' কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থ সূত্রেই পাওয়া যায়। এই অলক বা অল্লট জয়ানকের পুত্র-রত্নাকর কর্তৃক বিরচিত 'হরবিজয়' কাব্যের টীকাকার। Catalogus Catalogorum গ্রন্থে হরবিজয়ের টীকাকারকে জয়ানকের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে

১/২ গৌরনাথশাস্ত্রীর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, যথাক্রমে ১৫৬ এবং ১৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩. Catalogus Catalogorum, 'কোলাচল মল্লিনাথ' প্রসঙ্গে।

৪. ইতি শিবাগম প্রসিদ্ধ্যা ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বদীক্ষাক্ষপিত সকলমলপটলঃ প্রকটিত সৎস্বরূপচিদানন্দঘনঃ রাজানক কুলতিলকো মম্মটনামা দৈশিকবরঃ।। কাব্যপ্রকাশ টীকা নিদর্শনা।।

গোরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা 'ভারতীয়লিপিমালা'র অবতরণীকায় জয়ানক বা জয়রামকে পৃথ্বীরাজ-বিজয়ের কবি বলে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। সুতরাং অনুমান হয় যে কাব্যপ্রকাশের টীকায় হরবিজয় কাব্যের টীকাকার এবং কাব্যপ্রকাশের পরিকরালঙ্কার থেকে পরবর্তী অংশের গ্রন্থকার সম্বন্ধে টীকাকার আচার্য বামন যে লিখেছেন "এই অল্লটও রাজানক জয়ানকের পুত্র, রত্নাকর কবি-প্রণীত হরবিজয় নামক কাব্যের বিষমপদোদ্যোত, নামক টীকা কর্তা—এউক্তি সঙ্গত এবং অলকের যথার্থ গোত্রীয় নাম—অল্লট। গ্রন্থপরিপূরক অল্লটকে মম্মটের অব্যবহিত পরেই গণ্য করতে হলে, হরবিজয়কারকে তৎপূর্বে এবং জয়ানককেও পূর্বেই ধরতে হয়। অলকের বা অল্লটের অন্য গ্রন্থ অলঙ্কারসর্বস্বের টীকা। এঁদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—অস্বীকার করা যায় না। পৃথ্বীরাজবিজয় এবং হরবিজয় কাব্যদ্বয় ঐতিহাসিক পটভূমিকায় প্রণীত এবং তা' বাংলাদেশে বিশেষ সমাদৃত গ্রন্থ মনে হয়।

মম্মট: এঁর গ্রন্থ তিন খানা ১। কাব্যপ্রকাশ, (সাহিত্যতত্ত্ব), ২। শব্দব্যাপার (ছন্দঃ), এবং সঙ্গীত রত্নমালা (সঙ্গীত শাস্ত্র)। প্রথম উল্লিখিত গ্রন্থখানা-ই যুগান্তকারী গ্রন্থ। গ্রন্থের সারবত্তা থাকলেই সেদিকে বিজ্ঞজনের দৃষ্টি পড়ে, পঠন-পাঠন-টীকা-টিপ্পনী-ভাষ্যাদি প্রণয়ন সবদিকেই তা' মূল্যবান্ বিষয়রূপে গণ্য হয়। বাক্যপ্রকাশ গ্রন্থখানার গুরুত্ব, শুধু তার টীকা ভাষ্যের বাহুল্যদ্বারাও ধারণা করা চলে। প্রাচীন পুঁথি-পুস্তকের বিভিন্ন নিবন্ধনীতে এবং আচার্য বামন-কৃত বালবোধিনী-টীকার ভূমিকাংশে বহু টীকা টিপ্পনীর বৃহৎ তালিকা দেয়া হয়েছে, যাতে অনেকগুলো টীকাব প্রণেতাদের নাম পাওয়া যায় না, অথবা প্রণেতাদের নাম থাকা সত্ত্বেও টীকার কোন বিশেষ নাম নেই, কিংবা উভয়-ই রয়েছে, যেমন--- ১। উদাহরণদর্পণ, ২। কাব্যপ্রকাশোদ্যোত, ৩। কাব্যনৌকা, ৪। বৃহদ্দীপিকা, ৫। কমলাকরকৃত টীকা, ৬। কৃষ্ণদ্বিবেদীর মধুরসা, ৭। কৃষ্ণমিত্রাচার্যকৃত টীকা, ৮। গদাধরকৃত টীকা, ৯। গোপীনাথের সুমনোহরা, ১০। গোবিন্দকৃত কাব্যপ্রদীপ, ১১। চণ্ডীদাস (সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের পিতৃব্য) কৃত টীকা, ১২। জগদীশ তর্কপঞ্চাননকৃত কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ নামক টীকা, ১৩। জনার্দনকৃত শ্লোকদীপিকা, ১৪। জয়ন্তকৃত জয়ন্তী নামক টীকা, ১২৯৩ খৃঃ, ১৫। জয়রাম পঞ্চাননের তিলক টীকা, ১৬। দণ্ডীর (কাব্যাদর্শকার থেকে ভিন্ন) টীকা, ১৭। দেবনাথ তর্কপঞ্চাননের কাব্যকৌমুদী টীকা, ১৮। নরহরীর টীকা, ১৯। নাগরাজকেশবের পদবৃত্তি টীকা, ২০। নারায়ণ কৃত টীকা, ২১। নৃসিংহ ঠক্কুরকৃত টীকা, ২২। পরমানন্দ চক্রবর্তীর বিস্তারিকা টীকা, ২৩। ভানুচন্দ্রের টীকা, ২৪। ভাস্করমিশ্রের সাহিত্যদীপিকা টীকা, ২৫। ভীমসেনের সুধাসাগর টীকা, ২৬। মধুমতী গণেশের কাব্যদর্পণ টীকা, ২৭। মহেশ্বর

ভট্টাচার্যের ভাবার্থচিন্তামণি বা কাব্যপ্রকাশাদর্শ টীকা, ২৮। মাণিক্যচন্দ্রের সঙ্কেত নামক টীকা, ২৯। রত্নকণ্ঠের সারসমুচ্চয় টীকা, ৩০। রত্নেশ্বরকৃত টীকা, ৩১। রত্নপাণি-তনয় রবির মধুমতী টীকা, ৩২। রামকৃষ্ণের ভাবার্থ টীকা. ৩৩। রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতির কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ নামক টীকা, ৩৪। লৌহিত্য ভট্ট গোপালের সাহিত্যচূড়ামণি টীকা. ৩৫। বৎসবর্মণের সারবোধিনী টীকা, ৩৬। বিদ্যাচক্রবর্তীর সম্প্রদায়প্রকাশিনী টীকা, ৩৭। বিদ্যাবণা (?) কৃত টীকা, ৩৮। বেঙ্কটাচলসূরীর সুবোধিনী টীকা, ৩৯। বৈদ্যনাথের উদাহরণচন্দ্রিকা, টীকা৪০। প্রভা অথবা কাব্যপ্রভানামক অপর বৈদ্যনাথের টীকা, ৪১। শিবনারায়ণকৃত টীকা, ৪২। শিবরামকৃত বিষমপদী টীকা. ৪৩। শ্রীধর সান্ধিবিগ্রহিক কৃত কাব্যপ্রকাশবিবেক টীকা, ৪৪। শ্রীবৎসলাঞ্ছনের সারবোধিনী টীকা, ৪৫। সরস্বতীতীর্থ কৃতটীকা, ৪৫। সোমেশ্বরকৃত টীকা, ৪৬। রাজানক আনন্দ কবি কৃত কাব্যপ্রকাশনিদর্শ টীকা, ৪৭। রুচকের কাব্যপ্রকাশসংক্ষেপ নামক টীকা, এবং ৪৮। রামচন্দ্রকৃত কাব্যপ্রকাশ-সার টীকা। শ্রীমদভগবদ্‌গীতা ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের এতগুলো টীকা-ভাষ্যের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। টীকাকারদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙালী পণ্ডিত। তাছাড়া কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থখানা অত্যন্ত জনপ্রিয় সাহিত্যতত্ত্বের গ্রন্থ। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ অনেক ক্ষেত্রেই বাক্যপ্রকাশকে হুবহু অনুসরণ করেছেন।

রামানুজ: ইনি যতিরাজ বলেই খ্যাত। দক্ষিণভারতের তণ্ডিরমণ্ডলের ভূতপূরীতে এঁর আশ্রম ছিল। আচার্য শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের শারীরকভাষ্য যে বৈদান্তিক ধারার বিশেষত্ব প্রচার করে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, ঠিক তেমন না হলেও, প্রায়-ই তার কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এই বৈদান্তিক মতবাদ, প্রধানত রামানুজের শ্রীভাষ্য, রামানুজপদ্ধতি—প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল বলে, রামানুজকেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পুরোধা বলা হয়। ষড়দর্শনের প্রত্যেকটির অবলম্বনেই বাংলাদেশে দার্শনিক শিক্ষা-দীক্ষার বেশ বড় বড় এবং শক্তিশালী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তন্মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত বৈদান্তিক সম্প্রদায় বাদেও, বিশিষ্ট দার্শনিক গোষ্ঠীর কাছে রামানুজের গ্রন্থগুলোও খুব সমাদৃত ছিল। রামানুজের গ্রন্থগুলো হচ্ছে ১। অষ্টাদশ রহস্য, ২। কন্টকোদ্ধার (অথবা বেদান্তকন্টকোদ্ধার), ৩। কূটসন্দোহ, ৪। গদ্য এবং গদ্যত্রয়, ৫। গুণরত্নকোষ, ৬। চক্রোল্লাস, ৭। দেবতাপারায়ণ, ৮। ন্যায়রত্নমালার টীকা—ন্যায়কর'ট, ৯। নারায়ণমন্ত্রার্থ, ১০। নিত্যপদ্ধতি, ১১। নিত্যারাধনবিধি, ১২। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ১৩। ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, ১৪। পঞ্চপটল, ১৫। পঞ্চরাত্ররক্ষা, ১৬। মণিদর্পণ, ১৭। রত্নপ্রদীপ, ১৮। রামপটল, ১৯। রামপদ্ধতি, ২০। রামরহস্য, ২১। বার্তামালা, ২২। বিশিষ্টাদ্বৈত

ভাষ্য, ২৩। বিষ্ণুবিগ্রহ-শংসনস্তোত্র, ২৪। বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, ২৫। বেদান্ততত্ত্বসার, ২৬। বেদান্তদীপ, ২৭। বেদান্তসার, ২৮। বেদার্থসংগ্রহ, ২৯। শ্রীভাষ্য, ৩০। সচ্চরিত্ররক্ষা, ৩১। সচ্চরিত্ররক্ষাসারদীপিকা (টীকা), ৩২। সর্বার্থসিদ্ধি, ৩৩। ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ভাষ্য, ৩৪। প্রশ্নোপনিষদ্‌ব্যাখ্যা, ৩৫। ভগবদ্‌গীতাভাষ্য, ৩৬। মুণ্ডকোপনিষদ্‌ব্যাখ্যা, ৩৭। যোগসূত্রভাষ্য, ৩৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ব্যাখ্যা— প্রভৃতি।

শতানন্দ : এঁর পিতার নাম শঙ্কর এবং মাতার নাম সরস্বতী। এঁর দু'খানা গ্রন্থই সুপ্রসিদ্ধ। চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ ভাস্বতী এবং জ্যোতিষবিষয়ক গ্রন্থ— ভাস্বতীকরণ (১১০০ খৃঃ)।

কহ্লণ : কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থই কহ্লনের অমর কীর্তি। যদিও তিনি একাই রাজতরঙ্গিণী প্রণয়ন করেছেন, তথাপি সে গ্রন্থের সমাপ্তি থেকে পুনবায় শুরু করে কালানুক্রমিক বিবর্দ্ধন ঘটেছে অন্তত তিন দফায়। প্রথম দফায় করেছিলেন জোনরাজ। তারপরে শ্রীবর নামক একজন জৈন-অধ্যায়কে তাঁর (শ্রীবরের) জীবৎকাল পর্যন্ত নিয়ে আসে। সে অংশটির নামও, তাই, জৈন-তরঙ্গিণী। তার পরে আবার, প্রাজ্যভট্ট তাঁর সমকাল পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। তথাপি, কহ্লণকেই রাজতরঙ্গিণীর প্রণেতা বলা হয়।

চক্রপাণিদত্ত : ইনি একজন বিখ্যাত আয়ুর্বেদবিদ্ এবং গ্রন্থকার। গ্রন্থগুলোও চিকিৎসাবিষয়ক। ১। চরকের টীকা—চরকতাৎপর্যদীপিকা, ২। চিকিৎসা-সংগ্রহ, ৩। দ্রব্যগুণসংগ্রহ, ৪। শব্দচন্দ্রিকা (আয়ুর্বেদ-প্রসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ শব্দগুলোর কোষগ্রন্থ) ৫। সর্বসারসংগ্রহ বা চক্রদত্ত। নিশ্চলকর নামক এক ভিষক্ চক্রপাণির দ্রব্যগুণসংগ্রহের একটি টীকা করেছেন।

কৈয়ট : পিতার নাম জৈয়ট এবং অধ্যাপকের নাম মহেশ্বর। ইনি 'মহাভাষ্য-প্রদীপ নামক একখানা গ্রন্থ লিখেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্য আয়ত্ত করতে কৈয়টের প্রদীপ সত্যি সত্যি সহায়ক।

ব্রহ্মদেবপণ্ডিত : ইনি 'করণপ্রকাশ' নামক একখানা জ্যোতির্গণিতের গ্রন্থ লিখেছেন। বঙ্গদেশে চিরকাল নিখুঁত পঞ্জিকাগণনার প্রচলন থাকায় তিথিগণনা বিষয়ে ব্রহ্মদেবপণ্ডিতের গ্রন্থখানা বিশেষ উপযোগী ছিল এবং এখনো কিছু কিছু ব্যবহৃত হচ্ছে।

সন্ধ্যাকরনন্দী : ১০৫৭-১০৮৭ খৃষ্টাব্দের কোন কালে সন্ধ্যাকরনন্দী 'রামচরিতম্' নামক গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেছিলেন। সভঙ্গ অভঙ্গ—উভয় প্রকার শ্লেষের মাধ্যমে কাব্যখানাকে দ্ব্যাশ্রয়-কাব্যরূপে দাড় করেছেন। একদিকে শ্রীরামচন্দ্রের অপরদিকে পালরাজ রামপালের কীর্তির অনবদ্য প্রশস্তি এই রামরচিত কাব্য। ইনি রামপালদেবের পুত্র মদন পালদেবের মন্ত্রী ছিলেন।

ভবদেব ভট্ট : ঐতিহাসিকগণ ভবদেব ভট্টের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ প্রাচীন পুঁথি-পত্রের নিবন্ধনীতে যে 'ভবদেব' নামক প্রাচীন পণ্ডিত-গ্রন্থকারগণ রয়েছেন, তন্মধ্যে মাত্র দু'জনের নাম 'ভবদেবভট্ট' বলে জানা যায়। তার একজন মৈথিল, পিতার নাম কৃষ্ণদেব মিশ্র। অপর ভবদেব ভট্টের গ্রন্থের নাম —সম্বন্ধবিবেক। গ্রন্থকার সমেত এই গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বে। এঁর কোনো পৈত্রিক পরিচিতি পাওয়া যায় না। অপর এক গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়—"ভবদেব মিশ্র" বলে। তাঁরও পিতার নাম কৃষ্ণদেব। তিনি 'পত্তন'-এর অধিবাসী ছিলেন, এবং ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দ তাঁর গ্রন্থ রচনার কাল জানা যায়। যে ভবদেবের নামের সাথে সাংস্কৃতিক উপাধি—"বাল-বলভী-ভুজঙ্গ" পাওয়া যায়, তাঁর গ্রন্থ মাত্র একখানা-প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ। কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি বা দর্শকর্মপদ্ধিতি নামক যে গ্রন্থ পৌরোহিত্যের কাজে পুরোহিত সম্প্রদায়ের নিত্য সহচর, তারমধ্যে ত্রিবেদীয় (সাম-ঋগ-যজুঃ) দশবিধ সংস্কার এবং শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া লিখিত এবং তার গ্রন্থকারের নামের সাথে উল্লিখিত সাংস্কারিক 'বাল-বলভী-ভুজঙ্গ' উপাধিটি নেই। গ্রন্থের প্রারম্ভে-ই "ক্রিয়তে ভবদেবেন কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি:" লিখিত হয়েছে। এখন যদি এই কর্মনুষ্ঠানপদ্ধতিকারকেও ভট্ট উপাধিবিশিষ্ট কল্পনা করে নেয়া হয়, তবুও পূর্বোক্ত রঘুনন্দন কর্তৃক উল্লিখিত গ্রন্থ-সমেত গ্রন্থ দু'খানা — কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি এবং সম্বন্ধবিবেক মাত্র পাওয়া যায়। আর 'বালবলভী-ভুজঙ্গ' উপাধিবিশিষ্ট ভবদেব যদি ভবদেব ভট্ট হ'ন তা' হলে 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ' গ্রন্থখানার যোজনা সম্ভব হয়। এতসব কল্পনা করা, যোগকরে নেয়া প্রভৃতির কোন গ্রাহক প্রমাণ কোন ঐতিহাসিক-ই দেন নি। তা' ছাড়া, ভুবনেশ্বর-মন্দিরলিপিতে উল্লিখিত ভবদেব, সম্ভবত, ভবদেব ভট্ট, তা' হলে, শুধু ঐ মন্দিরলিপিও তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্ব এবং কীর্তির প্রমাণ। রঘুনন্দন কর্তৃক উল্লিখিত সম্বন্ধবিবেক, এবং প্রোক্ত 'প্রায়শ্চিত প্রকরণ' দু'খানাই মাত্র, অবিসংবাদে পাওয়া যায় বলা চলে? 'বালবলভী' ভুজঙ্গ' একটি সাংস্কারিক উপাধি' এর সাহায্যে বুঝা যায়—নবগঠিত বলভীপুরীর শ্রেষ্ঠ। আজকালও যেমন 'দেশিকোত্তম' প্রভৃতি সম্মান-সূচক উপাধি দেয়া হয়, ওটাও তেমন সম্মানসূচক উপাধিই বটে। ভুজঙ্গ শব্দে সর্প বুঝালেও উপমিত সমাস প্রভৃতিতে উত্তরপদরূপে প্রযুক্ত হলে—পুঙ্গ-বৃষভ-কুঞ্জর-সিংহ-শার্দুল-নাগ প্রভৃতি

শব্দ শ্রেষ্ঠার্থের বাচক হয়।[১] 'বাংলার বাঘ' পদে যেমন বাঘ পদটি স্বকীয় অর্থ ত্যাগ করে শ্রেষ্ঠার্থ প্রতিপাদন করে, ঠিক তেমন-ই এখানেও। দেশবাচক শব্দ, দেশীয় অর্থেও প্রযুক্ত হয়। এখানে 'বলভী' শব্দও কোন স্থান বা রাষ্ট্র কিংবা রাজধানী অর্থে রূঢ় এবং বলভীবাসী অর্থে লাক্ষণিক। ভুবনেশ্বরে শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ভবদেব ভট্টের উক্ত উপাধি এখন পর্যন্ত সঠিক ব্যাখ্যাত হয় নি। বলভীপুরী, তা' বলভী নদীর সম্পর্ক-মূলকও হতে পারে। দেবগ্রাম এবং দেওঘর সম্ভবত, একই স্থানের নাম। দেবঘর শব্দের 'ব' অন্তস্থ 'ব' হওয়ায় উহার উচ্চারণ হিন্দিতে এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালিতে—প্রায়ই দেওঘর হয়ে থাকে। সুতরাং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমান[২], হয়তো সঙ্গত-ই। আয়তন বা পরিসর নির্ণয় করতে প্রয়াস বর্জন করলে চলবে না। অন্যথা, বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত লেখ অনুসারে সেখানেই কুত্রাপি বর্মনদের (বিশেষত হরিবর্মার) রাজ্য কল্পনা করলে, তার মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ভুবনেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন কেন? বিক্রমপুর থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হরিবর্মার রাজ্য কল্পনা করা কি চলে? সুতরাং এসব জিজ্ঞাসার উত্তর সঠিক পাওয়া গেলে 'বাল-বলভী-ভুজঙ্গ' উপাধিরও সঙ্গত ব্যাখ্যা হয়ে যাবে।।[৩]

১. স্যুরুত্তর-পদে ব্যাঘ্র-পুঙ্গ বর্ষভ-কুঞ্জরাঃ।
   সিংহ-শার্দুল-নাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ ।।

২. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার-কৃত বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ৭ম সংস্ক, ১১১ পৃঃ অনুচ্ছেদ ৪.

৩. ভারতের বর্তমান কাথিয়াবাড় জেলার সীমানার মধ্যে বলভীপুরী নামক রাজধানী এবং রাজা গুহসেনের নামাঙ্কিত শিলালেখও পাওয়া গিয়েছে। ইন্ডিয়ান এন্টিকোয়ারী-এর ১১শ খণ্ডে, ২৪২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গুজরাটের চালুক্য অর্জুনদেবের সময়ের বেরাবল (বেরত্তল) নামক স্থানের (কাথিয়াবাড়) এক শিলালেখ-মধ্যে "রসুল মহম্মদ সংবৎ ৬৬২ তথা শ্রীনৃপ [বিক্রম সং ১৩২০ তথা শ্রীমদ্বলভী সং ৯৪৫ তথা শ্রীসিংহ সং ১৫১ বর্ষে আষাঢ় বদি ১৩ রবৌ" পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায়। গুপ্ত সংবতের সমকালে বলভী সংবতেরও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলবেরুণীর মত "The era of Balabhi which is identical with the Gupta era, begins according to the corrcet Statement of Alberuni in A.D. 3$\frac{১৯}{২০}$"—লিখেছেন কর্ণেল টড, তাঁর Annals of Rajasthan, vol. I, p. ৪01 প্রভৃতি অনেক স্থানে। এই বলভীর সম্পর্ক-সংপৃক্ত কোন নতুন রাজ্যের নামকরণ 'বালবলভী' হতে না পারার কোন কারণ আছে কি? বলভীর রাজাদের মুদ্রায় তাঁদের প্রতীক নদী-চিহ্ন নির্দিষ্ট, বলেছেন জি. এইচ. ওঝা (তাঁর প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা নামক হিন্দি গ্রন্থের ১৫৩ পৃ. পাদটীকা ৩ দ্রষ্টব্য) সুতরাং ২নং পাদটীপ্পনীতে নির্দেশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমানের কেবল নদীটি যদি জি. এইচ ওঝা-কথিত রাজকীয় প্রতীক মাত্র হয়, তবে দেবগ্রাম বা দেবঘর (দেওঘর), বলভীর নতুন রাজধানী, যেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে ভবদেবভট্টকে চিহ্নিত করে 'বালবলভীভুজঙ্গ'—নব-বলভী-শ্রেষ্ঠ উপাধি, হলেও হতে পারে। তা'হলে ভবদেবের ভুবনেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও সহজে বোধগম্য হয়।

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র : ইনি চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মদেবের সভাকবি ছিলেন এবং কীর্তিবর্মদেবের জন্য 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নামক বিখ্যাত নাটকখানা প্রণয়ন করেছিলেন। চন্দেল্ল রাজ্য মধ্যভারতের বুন্দেল খণ্ডে হলেও, চন্দেল্লরাজ-যশোবর্মা, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি অভিযান করে অঙ্গ, রাঢ়, গৌড়, বঙ্গাল প্রভৃতি স্থানের আংশিক হলেও অধিকার করেছিলেন। কীর্তিবর্মাও কলচুরিরাজ কর্ণকে ১০৬০-১০৬৪ খৃষ্টাব্দের কোন সময় পরাজিত করেছিলেন বলে জানা যায়। সুতরাং খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষদিকেই নাটকটির প্রণয়ন মনে করা হয়। বিবেক, অহঙ্কার, দম্ভ প্রভৃতিকে ব্যক্তিরূপে দাড় করিয়ে বিভিন্ন দর্শনমতের এবং ধর্মীয়, তথাকথিত কৌলিক-তান্ত্রিক দিগের বাদানুবাদমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার এমন রূপকধর্মী নাটক বোধ হয়, প্রবোধ-চন্দ্রোদয়-ই প্রথম। নাটকখানা অত্যন্ত মনোজ্ঞ এবং সর্বত্র আদৃত ছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের শতশত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। এ নাটকখানা কেবল মঞ্চস্থ হয়ে উপস্থিত দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিতর্পণ করত তা নয়, তার বিভিন্ন দর্শনতত্ত্বের আলোচনা তাত্ত্বিকদের কাছেও মনোজ্ঞ। ইহারও অনেকগুলো টীকা আছে। ১। কোনও রাজার মন্ত্রী নাণ্ডিল্যয়াপ্প কর্তৃক প্রণীত চন্দ্রিকা টীকা, ২। গণেশের 'চিচ্চন্দ্রিকা' টীকা, ৩। রুদ্রদেবের 'গুণবতী' টীকা, ৪। সদাত্মমুনিকৃত টীকা, ৫। রামদাসকৃত টীকা, ৬। মহেশ্বরকৃত টীকা, ৭। অপ্পয়দীক্ষিতকৃত টীকা, ৮। 'প্রৌঢ়প্রকাশিকা' টীকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী

এ শতাব্দীর গ্রন্থোৎপত্তির ইতিহাসও বিষ্ময়করররূপে উজ্জ্বল। সকলের নামোল্লেখ করাও সম্ভব হবেনা।

আনন্দতীর্থ:- সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বের নাম বাসুদেবাচার্য। ইনি ১১১৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইনি অচ্যুত প্রেক্ষাচার্যের অথবা শুদ্ধানন্দের শিষ্য এবং 'মধ্ব' সম্প্রদায়ের বৈদান্তিক। এঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে পদ্মনাভ-তীর্থ, নরহরিতীর্থ, মাধবতীর্থ এবং অক্ষোভ্যতীর্থ প্রধান। গ্রন্থগুলো হচ্ছে ১। আত্মোপদেশ-টীকা, ২। আর্যাস্তোত্র, ৩। ঈশাবাস্যোপনিষদ্-ভাষ্য, ৪। উপদেশসাহস্রী টীকা, ৫। উপনিষৎপ্রস্থান, ৬। উপাধিখণ্ডন, ৭। ঋগ্বেদের শ্লোকভাষ্য, ৮। ঐতরেয়োপনিষদ্-ভাষ্য, ৯। কাঠকোপনিষৎ-টিপ্পনী,। ১০। কেনোপষিদ্-ভাষ্য-টিপ্পনী, ১১। কৌষীতক্যুপনিষদ্-ভাষ্য-টিপ্পনী, ১২। খপুষ্প টীকা, ১৩। গুরুস্তুতি, ১৪। গোবিন্দভাষ্যপীঠক, ১৫। গোবিন্দাষ্টক-টীকা, ১৬। গৌড়পাদীয়ভাষ্যটীকা, ১৭। ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্য-টিপ্পনী, ১৮। তৈত্তিরীয়শ্রুতিবার্তিক-টীকা, ১৯। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য টিপ্পনী, ২০। ত্রিপুটীপ্রকরণ-টীকা, ২১। নারায়ণোপনিষদ্-ভাষ্য-টিপ্পনী, ২২। ন্যায়বিবরণ, ২৩। পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়া-বিবরণ, ২৪। প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য-টিপ্পনী, ২৫। বৃহজ্জাবালোপনিষদ্ ভাষ্য, ২৬। বৃহদারণ্যক-ভাষ্য-টিপ্পনী, ২৭। বৃহদারণ্যক-বার্তিক-টীকা, ২৮। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য-টীকা, ২৯। ব্রহ্মানন্দ, ৩০। ভক্তিরহস্য, ৩১। ভগবদ্গীতা-প্রস্থান, ৩২। ভগবদ্গীতা-ভাষ্য বিবেচন, ৩৩। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্-ভাষ্য-টিপ্পনী, ৩৪। মিতভাষিণী, ৩৫। মুণ্ডকোপনিষদ্-ভাষ্য-টিপ্পনী, ৩৬। রামোত্তরতাপনীয়-ভাষ্য, ৩৭। বাক্যবৃত্তি-বিবরণ, ৩৮। বাক্যসুধা-টীকা, ৩৯। বিষ্ণু-সহস্রনাম-ভাষ্য, ৪০। বেদান্তবার্তিক, ৪১। শঙ্করবিজয়, ৪২। শঙ্করাচার্যাবতারকথা, ৪৩। শতশ্লোকী টীকা, ৪৪। সংহিতোপনিষদ্-ভাষ্য-টিপ্পনী, ৪৫। সৎতত্ত্ব, ৪৬। সূত্রপ্রস্থান, ৪৭। স্মৃতিবিবরণ, ৪৮। স্মৃতিসারসমুচ্চয়, ৪৯। স্বরূপনির্ণয়-টীকা, এবং ৫০। হরিমীড়ে-স্তোত্র-টীকা। এছাড়া ৫১। গ্রন্থ-মালিকাস্তোত্র নামক একখানা বৃহৎ গ্রন্থও রয়েছে। আনন্দতীর্থ বাঙালী সম্ভবত ছিলেন না। এতগুলো গ্রন্থ এবং শিষ্য প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিশেষ অবদান রেখে গেছেন তিনি। মধ্ববৈদান্তিক ধারায় আনন্দতীর্থের গ্রন্থগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বানন্দ : বন্দ্যঘটীয় গাঞি, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। এঁর টীকাসর্বস্ব' বিখ্যাত। অমরকোষের এই টীকায় বহু বাংলা শব্দ ব্যবহার করে অর্থপ্রকাশ করা হয়েছে যা' প্রাচীন বাংলার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ওসব বাংলা শব্দ যে তৎকালের কথ্য গৌড়ী প্রাকৃত (অনেকের মতে পূর্বী) ভাষার সাথে সাথেই ব্যবহৃত ছিল, তা' বহুকাল আগেথেকে না হলে প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে কি?

আসড় : এঁর গ্রন্থ দু'খানা। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে বিবেকমঞ্জরী নামক একখানা জৈনগ্রন্থ এবং কালিদাসের মেঘদূতের টীকা।

উমাপতিধর : লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন বলে বলা হয়, কিন্তু সদুক্তিকর্ণামৃতে এঁর যে বচন উদ্ধৃত হয়েছে তাতে দেখা যায়—ইনি চাণক্যচন্দ্র নামক রাজার অধীনে 'চন্দ্রচূড়চরিত' নামক একখানা কাব্য লিখেছেন। গীতগোবিন্দে এঁর উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি বাঙালী কবি।। এছাড়া, আর এক উমাপতিধর উপাধ্যায় নামে এক গ্রন্থকারকে পাওয়া যায় যিনি হরিহরদেব নামক রাজার অধীনে 'পারিজাতহরণ' নামক একখানা নাটক প্রণয়ন করেছেন। ইনিও খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বলে ধারণা করা হয় কিন্তু দ্বাদশ শতকে বাংলার পূর্ববঙ্গে যে দেববংশের রাজাদের নাম পাওয়া গিয়েছে তন্মধ্যে তো হরিহরদেবের নাম নেই। তবে পারিজাতহরণ নাটক খুব প্রসিদ্ধ ছিল বলে মনে হয়।

জয়দেব : পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম রামাদেবী। এঁর বিখ্যাত গ্রন্থ গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব সৃষ্টি। জয়দেব বাংলার স্বনামধন্য গীতিকাব্যকার। আধুনিক বৈষ্ণবদের রাধা-কৃষ্ণের লীলা আস্বাদনের ধারা জয়দেবের গীতগোবিন্দ-অবলম্বনেই প্রবাহিত। তাঁর ভাষাবিন্যাস অতুলনীয় মাধুর্যের উৎস। গীতগোবিন্দ ভক্তিরসের অনবদ্য সাহিত্য।

নরপতি : প্রসিদ্ধ ধারানগরী-নিবাসী আম্রদেবের পুত্র। তাঁর দু'খানা গ্রন্থই অতি প্রসিদ্ধ—জ্যোতিষ্কল্পবৃক্ষ এবং নরপতিজয়চর্যা। জ্যোতিষশাস্ত্রের এ গ্রন্থদ্বয় এখনো পরিচিত গ্রন্থ। নরপতিজয়চর্য্যা গ্রন্থখানা ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রণীত। এ গ্রন্থখানাকে স্বরোদয়শাস্ত্রীয় বলা হলেও ফলিত জ্যোতিষ, শাকুন এবং স্বরোদয় শাস্ত্রের একত্র সমাবেশ ঘটিয়ে অতি উপাদেয় করে রচনা করা হয়েছে।

বল্লভাচার্য : ইনি বৈশেষিকদর্শনের একটি টীকা ন্যায়লীলাবতী নামে, প্রণয়ন করেছিলেন। এঁর কাল নিয়ে মতান্তর আছে তবে, দার্শনিক উদয়নাচার্যের পরে এবং গঙ্গেশের পূর্বে, ইহা প্রতিপন্ন হয়।

ভাস্কর আচার্য (২য়): এঁর বিখ্যাত সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের গ্রন্থ—সিদ্ধান্তশিরোমণি ১১৫১ খৃষ্টাব্দে এবং করণকুতূহল ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রণীত। অপব গ্রন্থগুলো—করণকেশরী, গণিতপদী, গ্রহগণিত, গ্রহলাঘব, জ্ঞানভাস্কর, রেখাগণিত, লিঙ্গশাস্ত্র, সূত্রগণিত, সূর্যসিদ্ধান্তব্যাখ্যা এবং ভাস্করদীক্ষিতীয় জ্যোতিষ। সব ক'খানাই অতি উপাদেয় গ্রন্থ এবং এদেশে পূর্বাপব প্রচলিত। বর্ত্তমান ধারার গণিতের এই প্রাচীন গ্রন্থগুলো যে কত নিখুঁত তা' ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

মহেশ্বর: কৃষ্ণের পৌত্র এবং ব্রহ্মের পুত্র— এই গ্রন্থকার বিশ্বপ্রকাশ নামক অভিধান ১১১১ খৃষ্টাব্দে প্রণয়ন করেছেন। উক্ত অভিধানের বিস্তার মূলক বা বিবৃতগ্রন্থ-'শব্দভেদপ্রকাশ' এবং 'সাহসাঙ্কচরিত' নামক কাব্যও প্রণয়ন করেছেন। উল্লেখযোগ্য আভিধানিকরূপে মহেশ্বর চিহ্নিত।

রুয্যক: ইনি কাশ্মীরীয় এবং অলঙ্কারসর্বস্ব নামক গ্রন্থের প্রণেতা। এ গ্রন্থও সাহিত্যতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, সম্ভবত, এদেশেও পৃথক্‌ আলোচিত হয়েছে। ইনিও দ্বাদশতাব্দীর গ্রন্থকার।

বৰ্দ্ধমান: গোবিন্দসূরির শিষ্য। তিনি 'গণরত্নমহোদধি' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ ১১৪০ খৃষ্টাব্দে প্রণয়ন করেছেন। অপর গ্রন্থদ্বয়—ক্রিয়াগুপ্তক এবং সিদ্ধরাজ-বর্ণন। জৈন গ্রন্থকারদের মধ্যে বৰ্দ্ধমান একজন প্রমাণপুরুষরূপে গণ্য যাঁর গ্রন্থত্রয় সর্বদেশে সর্বকালের সুধীজনের প্রশংসা লাভ করেছে। ক্রিয়াগুপ্তক গ্রন্থখানা এমনভাবে রচিত যে তার আসল ক্রিয়াপদটি খুজে পাওয়াও দুষ্কর এবং না পাওয়া গেলে অর্থে আপদেশিকতার ভ্রম অনিবার্য।

বিজ্ঞানেশ্বর: বিজ্ঞানেশ্বর ছিলেন একজন সার্থক টীকাকাব। যজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির উপরে তাঁর ঋজুমিতাক্ষরা বা সংক্ষেপে মিতাক্ষরা একটি উল্লেখযোগ্য টীকা। পূর্বোক্ত স্মৃসংহিতাগুলো দেশ-কালের উৰ্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। কোথায় বা কখন প্রণীত হয়েছে তার যথার্থ কালিক নির্ণয় না থাকলেও আর্য সনাতনী সংস্কৃতিতে সমাজের সর্বত্র সেগুলো মান্য। সেকারণে উক্ত স্মৃতির বা সংহিতার বহু টীকা-টিপ্পনীও প্রণীত হয়ে সমাজের চাহিদা পূরণ করে থাকে। যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতির অনেকগুলো টীকাই আমাদের কাল পর্যন্তও এসে পেঁছেছে যেমন, অপরার্ক-প্রণীত টীকা, কুলমণিশুক্লকৃত টীকা, দেববোধকৃত টীকা, ধর্মেশ্বরেকৃত টীকা, মথুরানাথকৃত মিতাক্ষরা টীকা (কেবল আচারাধ্যায়ের), মিত্রমিশ্রকৃত বীরমিত্রোদয়া নামক টীকা,

রঘুনাথভট্টকৃত টীকা, বিজ্ঞানেশ্বরকৃত ঋজুমিতাক্ষরা বা মিতাক্ষরা টীকা এবং শূলপাণিকৃত দীপকলিকা টীকা। এসবের মধ্যে বিজ্ঞানেশ্বরের টীকাটির মত জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব অন্য টীকাগুলোর হয়নি। এ কারণেই ঋজুমিতাক্ষরারও অনেক টীকা প্রণীত হয়েছে। টীকার উপর প্রণীতীকে সেগুলোকে উপটীকা বলা যেতে পারে বটে কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বরের ঋজুমিতাক্ষরা সারগর্ভ আকড়গ্রন্থরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিধায় তার টীকাগুলো টীকাহিসাবেই স্বীকৃত। গুস্তব অপার্টের তালিকায় ঋজুমিতাক্ষরার একটি টীকা Theodor Aufrecht লিখেছেন oppert 4605 সংখ্যা দিয়ে (মিতাক্ষরা প্রসঙ্গে), যার প্রণেতার নাম পাওয়া যায় নি। তা'ছাড়া নন্দপণ্ডিতকৃত প্রমিতাক্ষরা, বালম্ভট্টকৃত টীকা, যা লক্ষ্মীদেবী-প্রণীত বলে জানা যায় (কেবল ব্যবহার কাণ্ডের টীকা), মধুসূদন গোস্বামিকৃত মিতাক্ষরাসার নামক টীকা, মুকুন্দলালকৃত টীকা, রাধামোহন শর্ম-কৃত সিদ্ধান্তসংগ্রহ-টীকা, বিশ্বেশ্বকৃত সুবোধিনী (কেবল ব্যবহারাধ্যায়ের) টীকা এবং হলায়ুধভট্টকৃত টীকা। অনায়াসেই বুঝা যায় যে ঋজুমিতাক্ষরা বা মিতাক্ষরা কত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে উত্তরাধিকার আইন-বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে জীমূতবাহনের দায়ভাগের চেয়েও অধিক গুরুত্বে মিতাক্ষরা গ্রাহ্য হয়। বিজ্ঞানেশ্বরের কাল সঠিক জানা না থাকলেও মিতাক্ষরার উপরে প্রণীত 'সুবোধিনী'র নিবন্ধনের পূর্বেই তাঁকে নিবেশ করে নিতে হয়।

বিশ্বেশ্বর ভট্ট : রাজা মদনপাল এবং তার পুত্র 'মান্ধাতা'র তিনি সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলো— মদনপারিজাত, মহাদানপদ্ধতি, এবং মহার্ণবকর্মবিবাক (এ-গ্রন্থখানা মদনপালের গ্রন্থকর্তৃত্বাধীন বলে প্রচারিত হয়েছে)। এছাড়া, বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা'র সুবোধিনী নামক টীকা, এবং স্মৃতিকৌমুদী বিশ্বেশ্বর ভট্টের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইনিও বাংলার লোক এবং বিশিষ্ট গ্রন্থকার।

ভূলোকমল্ল সোমেশ্বরদেব : ইনি ১১২৭ ৩৮ খৃষ্টাব্দ রাজত্ব করেছেন। এঁর অভিলষিতার্থচিন্তামণি বা মানসোল্লাস গ্রন্থখানা অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ। সংস্কৃত বিশ্বকোষ বলতে এগ্রন্থখানা-ই প্রধান। এদেশেও তা' প্রচারিত ছিল সন্দেহ নেই। এর 'গীতিবিনোদন' অধ্যায়ের প্রাকৃত অনেকটা বাংলাভাষার কাছাকাছি পূর্বরূপ।

ষড়্‌গুরুশিষ্য : অন্যকোন নাম ব্যবহার না করে ওই নামেই তিনি পরিচিত। গুরু ছয়জন হচ্ছেন বিনায়ক, শূলপাণি, গোবিন্দ, সূর্য, ব্যাস এবং শিবযোগী। গ্রন্থ দুখানা—আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রব্যাখ্যা, এবং বেদান্তদীপিকা। দ্বিতীয় গ্রন্থখানা ১১৮৭ খৃঃ প্রণীত।

বাগ্‌ভট (জৈন) : বগ্‌ভট বা নেমিকুমার নামে এই গ্রন্থকার—১। অলঙ্কার-তিলক, ২। বাগ্‌ভটালঙ্কার, ৩। শৃঙ্গারতিলককাব্য এবং ৪। ছন্দোহনুশাসন নামক একটি টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

কবিরাজ : জয়ন্তপুরীর কদম্বকামদেবের আমলে 'রাঘবপাণ্ডবীয়' নামে একখানা কাব্য তিনি প্রণয়ন করেছেন যা' অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং এদেশে বহুল প্রচারিত। অন্যের রচনা অপর 'রাঘবপাণ্ডবীয়' নামক কাব্যও আছে বটে, তবে তা' কবিরাজের গ্রন্থের মত জনপ্রিয় নয়। এ গ্রন্থখানার অনেকগুলো টীকাও রয়েছে যেমন,—চরিত্র-বর্দ্ধনকৃত টীকা, পদ্মনন্দী-ভট্টারক-কৃত টীকা, পুষ্পদন্তকৃত টীকা, লক্ষণপণ্ডিত কৃত সারচন্দ্রিকা টীকা, বিশ্বনাথকৃত টীকা, শশধরকৃত---প্রকাশ টীকা।

রামভদ্র মুনির 'প্রবুদ্ধরৌহিণেয়' (৬ অঙ্কের নাটক) ; রামচন্দ্রের কৌমুদী-মিত্রানন্দ (১০অঙ্কের প্রকরণ) ; **শঙ্খধর কবিরাজের** লটকমেলক (দুই অঙ্কের প্রহসন) ; **যশশ্চন্দ্রের** (জৈন) মুদিতকুমুদচন্দ্র (নাটক) **জয়দেবের** (গীতগোবিন্দকার থেকে ভিন্ন) প্রসন্নরাঘব (৭ অঙ্কের নাটক) ; দ্বাদশ শতকের **বৎসরাজ**-রচিত--কীরাতার্জুনীয় (ব্যাযোগ), রুক্মিণীহরণ (ঈহামৃগ), ত্রিপুবদাহ (ডিম), সমুদ্রমথন (সমবকার), কর্পূরচরিত (ভান) এবং হাস্যচূড়ামণি নামক প্রহসন-প্রভৃতি বহুগ্রন্থ এদেশে প্রসারলাভ করেছিল।

অলকার : এঁর অন্য নাম লঙ্কক। এঁর পিতামহ মন্মথ, পিতা-বিশ্বেশ্বর এবং ভাই-মঙ্খ, শৃঙ্গার এবং ভৃঙ্গ। তিনি ছিলেন কাশ্মীররাজ জয়সিংহের মন্ত্রী। এঁর শ্রীকণ্ঠচরিত অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ।

পুরুষোত্তমদেব : অনেকের মতে ইনি একজন বাঙালী, স্বনামধন্য গ্রন্থকার। হারাবলী গ্রন্থে তিনি জনমেজয় এবং ধৃতিসিংহকে সমসাময়িক বলেছেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে গ্রন্থ রচনা করেছেন? এঁর অনেক গ্রন্থ—১। উষ্মভেদ, ২। একাক্ষর-কোষ, ৩। কারকচক্র, ৪। জকারভেদ, ৫। জ্ঞাপকসমুচ্চয়, ৬। ত্রিকাণ্ডশেষ, ৭। দ্বিরূপকোষ, ৮। দ্ব্যর্থকোষ, ৯। পরিভাষার্থমঞ্জরীবিবরণ, ১০। পরিভাষাবৃত্তি, ১১। ভাষাবৃত্তি, ১২। বর্ণদেশনা, ১৩। শব্দভেদপ্রকাশকোষ, ১৪। শকারভেদ, এবং ১৫। হারাবলী। এঁর প্রত্যেক গ্রন্থই বিদ্যার্থীদের একান্ত সহায়ক এবং বাংলা-দেশেরও সর্বত্র ঘরে ঘরে তা' রক্ষিত ও আলোচিত হয়েছে। এঁর 'ভাষাবৃত্তি' যদিও পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর একটি বিবৃতিমাত্র, তথাপি তা' পৃথক্ ব্যাকরণের মর্য্যাদা পেয়ে আসছে এবং তা দ্বারা 'ভাষাবৃত্তি বৈয়াকরণিক সম্প্রদায়' পর্য্যন্ত গঠিত হয়েছে। সৃষ্টিধর শর্ম্মা 'ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃতি, নামক তার সমীচীন টীকা করেছেন।

শরণদেব : ইনিও একজন বাঙালী জৈন বৈয়াকরণিক। ইনি প্রণনয় করেছেন দুর্ঘটবৃত্তি নামক কঠিন কঠিন শব্দের একখানা কোষগ্রন্থ।

শিহলণ : ইনি এই শতকের একজন কাশ্মীরীয় গ্রন্থকার। এঁর শান্তিশতক নামক গ্রন্থখানা নীতিগ্রন্থ হিসাবে অতি প্রসিদ্ধ। বিদ্যার্থিকালেই গণ-সূত্র অভিধান-চাণক্যশ্লোক এবং নিত্যপাঠ্য স্তোত্রের মত শান্তিশতক মুখস্থ করে রাখার অভ্যাস দাড়িয়ে গিয়েছিল বাঙালী ছাত্র সমাজে।

ধোয়ী : এঁর 'পবনদূত' নামক শৃঙ্গাররসাত্মক খণ্ডকাব্যের কথা জানা যায় যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এঁর আরও অবদান আছে।

অনিরুদ্ধ ভট্ট : ইনি সেনরাজ বল্লালসেনের গুরু। এঁর চাতুর্মাস্যপদ্ধতি (?), ভগবত্তত্ত্বমঞ্জরী, এবং হারলতা নামক গ্রন্থত্রয় প্রসিদ্ধ। স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য নিজ-মতের পরিপোষণের জন্য 'হারলতা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বল্লালসেনদেব : স্বনাম ধন্য সম্রাট। এঁর দু'খানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে— দানসাগর এবং অদ্ভুতসাগর। সনাতন আর্য সংস্কৃতির মধ্যথেকে বেড়িয়ে গিয়ে জৈন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েও শেষপর্যন্ত, নতুন তত্ত্ব ও তথ্যে অনুসারীদের মধ্যে পুরাপুরি স্বস্তি আনতে বা স্থাপনে অসুবিধায় পড়ে অথবা জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষমতাশালী পণ্ডিতরাই স্ব স্ব মানসিকতার গভীরে নিয়ত স্ফুরিত অভিরুচি নিজ ধর্মশাস্ত্রের বাণীতে নিবেশিত করেছেন। কত জৈন-বৌদ্ধ দেব-দেবীর যে এভাবে আবির্ভাব ঘটল তার পরিসংখ্যানও সহজ সাধ্য নহে। আর্য ধারায় যেমন পুরাণপাঠ উপস্থিত তাবৎ জনতার মধ্যে একদিকে অতীতের কাল্পনিক মহনীয়তার প্রতি আকর্ষণ জাগিয়ে তোলে, অন্যদিকে নিজ সমাজ-সঙ্ঘে আকড়ে থাকতে স্বতপ্রণোদিত স্পৃহা জাগায়। ঠিক সেই ভাবে, স্ব স্ব মতাবলম্বীদের ভাঙন রোধ করার মূল লক্ষ্যে একই ধারায় পুরাণ-তন্ত্র-ধর্মশাস্ত্র-প্রণয়নও পূর্ণোদ্যমে জৈন-বৌদ্ধদের মধ্যে চলেছে বহুকাল। অতিরিক্ত সুচতুরতায় হিন্দুর মহাপুরাণ-উপপুরাণের মধ্যে সুযোগমত অংশবিশেষ ঢুকিয়েও তত্ত্বগত ভিত মজবুত করার চেষ্টাও বৌদ্ধদের মধ্যে ছিল। এটা বিশ্বাস করার অকাট্য প্রামাণ তুলে ধরেছেন বল্লালসেন দানসাগরে।

দানসাগর বল্লালসেনের প্রথম গ্রন্থ। এ গ্রন্থের পরিপাটী অতুলনীয়। ভট্ট অনিরুদ্ধ এবং সম্ভবত আরও অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ব্যাপৃত ছিলেন দানসাগর রচনায়। তাঁরা শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করেছেন এ ব্যাপারে। দানসাগর গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য—পূণ্যপ্রদ দান। তার আনুষঙ্গিক নানা বিষয় উপস্থাপনে শাস্ত্র-সমর্থন

এবং ইতিকর্তব্যতায় অপরিহার্য মন্ত্রাদি নির্দেশ করতে-ঋগ্‌বেদ থেকে ৫৬টি, শুক্ল এবং কৃষ্ণ-উভয় যজুর্বেদের ৪০টি, সামবেদের ৩৩টি, অথর্ববেদের ৪৬টি মন্ত্রের উদ্ধৃতির সহিত গোপথব্রাহ্মণ থেকে ৩টি, তণ্ডিব্রাহ্মণ থেকে ১টি, নিরুক্ত থেকে ১টি, শাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র থেকে ২টি, অগ্নিপুরাণের ৯৭টি, আদিপুরাণের ৪১টি, আদিত্যপুরাণের ৩১টি, কালিকাপুরাণের ৩৭টি, কূর্মপুরাণের ২৫টি, নন্দিপুরাণের ৬৫টি, নরসিংহ পুরাণের ১৬টি, পদ্মপুরাণের ১০টি, ব্রহ্মপুরাণের ৩৩টি, ভবিষ্যপুরাণের ৪০টি, মৎস্যপুরাণের ৩৫টি, মার্কণ্ডেয়পুরাণের ২টি, লিঙ্গপুরাণের ৫টি, বরাহপুরাণের ১৬টি, বামনপুরাণের ১৮টি, বায়ুপুরাণের ৭টি, বিষ্ণুপুরাণের ৭টি, শাম্বপুরাণের ৪টি, শিবপুরাণের ১৫টি, এবং স্কন্দপুরাণের ৪৮টি বচন-প্রমাণের উদ্ধৃতির বাইরেও,

অঙ্গিরাস্মৃতির ৩টি, আপস্তম্ব-স্মৃতির ৪টি, কাত্যায়নস্মৃতির ২:টি, গোতম-স্মৃতির ২টি, ছাগলেয় স্মৃতির ১টি, জাবাল স্মৃতির ৩টি, দক্ষস্মৃতির ৬টি, দেবল-স্মৃতির ২৯টি, পুলস্ত্যস্মৃতির ২টি, পৈঠীনসি-স্মৃতির ২টি, বৌধায়ন স্মৃতির ৩টি, মনুস্মৃতির ৪২টি, মরীচিস্মৃতির ৩টি, যমস্মৃতির ৫৩টি, যাজ্ঞবল্কস্মৃতির ৩৩টি, বশিষ্ঠস্মৃতির ১৬টি, বিষ্ণুস্মৃতির ৩ ৷টি, শাতাতপস্মৃতির ১৮টি, শঙ্খ-লিখিতের স্মৃতির ১টি, সম্বর্তস্মৃতির ১৫টি, বৃহস্পতিস্মৃতির ৩৬টি, ব্যাসস্মৃতির ২৯টি, এবং হারীত-স্মৃতির ১১টি প্রমাণ-বচন উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে দানসাগরে। তা'ছাড়া,

অভিধান, আয়ুর্বেদ, গন্ধশাস্ত্র, পাণিনি ব্যাকরণ, এবং রত্নাচল থেকে উদ্ধৃতির সহিত বিষ্ণুধর্ম থেকে ২৮টি বাল্মীকির রামায়ণ থেকে ৫টি এবং বেদব্যাসের মহাভারত থেকে ২১৬টি, প্রমাণ-বচনের উদ্ধৃতি দিয়ে ধর্ম-শাস্ত্রীয় নিবন্ধ-দানসাগর প্রণীত হয়েছে। বশিষ্ঠস্মৃতি শুধু বশিষ্ঠ এবং বৃদ্ধবশিষ্ঠ হিসাবে দুপ্রস্ত, শাতাতপস্মৃতিও শাতাতপ এবং বৃদ্ধশাতাতপ নামে দুভাগে, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি কেবল যাজ্ঞবল্ক্য এবং যোগিযাজ্ঞবল্ক্যরূপে দু'প্রকারে, বৃহস্পতিস্মৃতি দানবৃহস্পতিস্মৃতি এবং শুধু বৃহস্পতি বলে দু'প্রকারে এবং দান-ব্যাস, লঘুব্যাস আর ব্যাস আখ্যায় ব্যাসস্মৃতি তিন প্রকারে দানসাগরে উল্লিখিত হয়েছে।

উল্লিখিত ৬০/৬৫ প্রকার প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থথেকে তেবশত পয়ষট্টিটি উদ্ধৃতি সাড়ে ষোলশত বারেরও বেশী ব্যবহার করে যে গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় দানসাগরে তার সৌষ্ঠব এবং নির্দোষতার প্রয়োজনে ওসব শাস্ত্র রীতিমত পরীক্ষা করে নেয়াও হয়েছিল। চলতি শাস্ত্রের অনেক ক'খানি দানসাগরে কেবল যে গ্রহণ করা হয় নি তা নয়, কেন গ্রহণ করা হল না সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাষায় বক্তব্যও দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে প্রতিপন্ন হবে যে, কোন কোন প্রাচীন শাস্ত্রের কুত্রাপি কলুশ ঢুকেছে এবং যোগ্য অনুসন্ধানে তার যথাযথ নিরূপণ-নির্দ্ধারণ করাও চলে।

মোট ৭৫টি আবর্তে (পরিচ্ছেদ স্বরূপ) সংগ্রথিত এ গ্রন্থে প্রথমে উপক্রমণিকা অংশে মঙ্গলাচরণ, গ্রন্থকর্তার পরিচিতি, গ্রন্থকর্তার প্রার্থনা, গৃহীত শাস্ত্র-গ্রন্থের নাম, গ্রন্থের মুখ্য—বিষয় দানের বিশেষ বিশেষ নাম এবং এ গ্রন্থে অনুক্ত দানগুলোর নাম অনুক্রমে উল্লেখ করার পরে 'অসংগৃহীত গ্রন্থনামানি' শিরোনাম দিয়ে ইচ্ছা করে কতিপয় গ্রন্থ সংগ্রহ না করার অর্থাৎ বাদ দেয়ার কারণ দর্শান হয়েছে মোট ১১টি শ্লোকে। যথা—

ভাগবতপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এবং নারদীয়পুরাণে দানসংক্রান্ত বিষয় নাথাকায় এ তিনখানা ইচ্ছাকরেই এ নিবন্ধে গ্রহণকরা হয়নি।[১]

মৎস্যপুরাণে কথিত মহাদানের বিষয়াবলীর একান্ত তুল্য লক্ষ্য করে বৃহৎ লিঙ্গপুরাণও এ নিবন্ধে গ্রহণকরা হলনা,[২]

পাষণ্ডিগণ কর্তৃক কলুশিত অষ্টম এবং নবম কল্পদু'টি বাদ দিয়ে সপ্তমকল্প পর্যন্ত ভবিষ্যপুরাণ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা হল।[৩]

বিষ্ণুরহস্য এবং শিবরহস্য নামক পুরাণদ্বয় সমাজে প্রসিদ্ধ থাকলেও প্রকৃত পক্ষে, উহা সঙ্কলনবিশেষ বলে স্থির করে এ নিবন্ধে তা গ্রহণকরা হল না।[৪]

ভবিষ্যোত্তরপুরাণও সমাজে প্রসিদ্ধ এবং আর্যাচারের অবিরুদ্ধ হলেও মৌলিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় প্রমাণ-গ্রন্থবর্গ থেকে পৃথক করা হয়েছে।[৫]

স্কন্দপুরাণে চলতি আকার-প্রকার বিবেচনা করে প্রকৃত এক খণ্ডের অধিক পৌণ্ড্রখণ্ড-রেবাখণ্ড-অবন্তিখণ্ডের কথা-কাহিনীর অন্তর্গত অতিরিক্তাংশের (যোজনা লক্ষ্য করে),[৬]

এবং—গরুড়পুরাণ, ব্রাহ্মপুরাণ, আগ্নেয়পুরাণ, এবং তেইশ হাজার শ্লোকে উপনিবদ্ধ থাকলেও, বিষ্ণুপুরাণ,[৭]

এবং ছয় হাজার শ্লোকে উপনিবদ্ধ অপর লিঙ্গপুরাণেও দীক্ষাদানপদ্ধতি, প্রতিষ্ঠা-পদ্ধতি, পাষণ্ডিদের যুক্তিতর্কের বিস্তার, বিভিন্ন মণি-রত্নের শুদ্ধা-শুদ্ধত্বের পরীক্ষণ প্রভৃতি থাকায়,[৮]

---

১. ভাগবতঞ্চ পুরাণং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চৈব নারদীয়ঞ্চ। দানবিধিশূন্যমেতৎ ত্রয়মিহ ন নিবদ্ধমবধার্য্য।
২. বৃহদপি লিঙ্গপুরাণং মৎস্যপুরাণোদিতৈর্মহাদানৈঃ। অবধার্য্য তুল্যসারং দাননিবন্ধেঽত্র ন নিবদ্ধম্।
৩. সপ্তম্যেব পুরাণং ভবিষ্যমপি সংগৃহীতমতিযত্নাৎ। ত্যক্তাষ্টমীনবম্যৌ কল্পৌ পাষণ্ডিভির্গ্রস্তৌ।
৪. লোকপ্রসিদ্ধমেতদ্বিষ্ণুরহস্যঞ্চ শিবরহস্যঞ্চ। দ্বয়মিহ ন পরিগৃহীতং সংগ্রহরূপত্বমবধার্য্য।
৫ ভবিষ্যোত্তরমাচারাবিরুদ্ধমবিবোধিচ। প্রামাণ্যজ্ঞাপকাদৃষ্টের্গ্রন্থাদস্মাৎ পৃথক্ কৃতম্॥
৬. প্রচরদ্রূপতঃ স্কন্দপুরাণৈকাংশতোঽধিকম্। যৎ খণ্ডত্রিতয়ং পৌণ্ড্র-রেবা-বন্তিকথাশ্রয়ম্।
৭. তার্ক্ষ্যং পুরাণমপরং ব্রাহ্মমাগ্নেয়মেবচ। ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং পুরাণমপি বৈষ্ণবম্।
৮. ষট্সহস্রমিতং লৈঙ্গং পুরাণমপরং তথা। দীক্ষা-প্রতিষ্ঠা-পাষণ্ডযুক্তি-রত্নপরীক্ষণৈঃ।

এবং অসংলগ্ন বংশাবলী এবং চরিত কথা, অভিধান, ব্যাকরণ-বিষয়ক বিধি-নিষেধ, তত্ত্বগত পরিপ্রেক্ষায অসঙ্গত এবং পরস্পরবিরুদ্ধ কাহিনীর সন্নিবেশ দেখে,[১]

ভণ্ড-পাষণ্ড মিথ্যা ধর্মধ্বজাধারী মীনকেতনাদিরই ওসব লোক-ঠকান কাণ্ড স্থির করে, ওসব গন্থ অবজ্ঞাত হল (অবজ্ঞাভবে বাদ দেয়া হল),[২]

আর, যে প্রামাণ্য শাস্ত্রে পুরাণ-উপপুরাণের সংখ্যায়ণ আছে তার বাইবের এবং সমর্থনের অযোগ্য ক্রিয়াকাণ্ডের কথা থাকায় একান্ত পক্ষেই পাষণ্ডদের শাস্ত্রের মতানুসারী বিবেচনায় দেবীপুরাণও এখানে প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হল না।[৩]

বল্লালসেনের দানসাগরে প্রাচীন শাস্ত্রের যে নিখুঁত অনুশীলনের নিদর্শন আছে তা' রীতিমত বিস্ময়ের বিষয় এবং আদর্শস্থানীয়। হাজার হাজার বছর ধরে চলমান শাস্ত্র-গ্রন্থের স্থলবিশেষে কোন কলুশতা ঢোকান হয়েছে। পাষণ্ড বা পাষণ্ডি পদে এখানে বৌদ্ধদের নির্দেশ করা হয়েছে। শাস্ত্রের মৌলিক প্রতিপাদ্যে ওসব প্রক্ষেপ অবাঞ্ছিত-অশ্রদ্ধেয় হলেও তা' সংস্কৃত ভাষার আশ্রয়েই করা হয়েছে তাই, ইতিবৃত্তে ও সব কেবল নতুন যোজনা।

দানসাগর প্রণয়নের কাল যে আকারে-প্রকারে অনুলিখিত গ্রন্থে পাওয়া গিয়েছে তা' বিসংবাদিত। 'অদ্ভুত সাগর' সমাপ্তির পূর্বেই পুত্র-লক্ষ্মণসেনের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে বল্লালসেন সস্ত্রীক ত্রিবেণী-সঙ্গমে তপশ্চর্যায় নিরত হ'ন। লক্ষ্মণসেন পিতার আরব্ধ অদ্ভুতসাগর সমাপিত করেন। তা'ছাড়া, লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী শ্রীধর-দাস, সদুক্তিকর্ণামৃত নামক একখানা গুরুত্বপূর্ণ কবিবচন সংগ্রহের গ্রন্থ করেছেন। তার সমাপনীপুষ্পিকাশ্লোক থেকে অভ্রান্তভাবেই লক্ষ্মণসেনের সিংহাসনারোহণের কাল পাওয়া যায়, যা'দ্বারা বল্লালসেনের রাজত্বের শেষ বৎসরটি ধরা চলে। অথচ, বিজয়সেনের (বল্লালসেনের পিতা) দেওপাড়া প্রশস্তিলিপি, ব্যারাকপুর তাম্রশাসন; বল্লালসেনের নিজের নৈহাটি তাম্রশাসন এবং লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-তাম্রশাসন, তর্পণদীঘি-তাম্রশাসন, সুন্দরবন ফুলতলা তাম্রশাসন, আনুলিয়া-তাম্রশাসন, ঢাকা

১. মৃষা বংশানুচরিতৈঃ কোষব্যাকরণাদিভিঃ। অসঙ্গতকথাবন্ধপরস্পরবিরোধতঃ।
২. তন্মীনকেতনাদীনাং ভণ্ডপাষণ্ডলিঙ্গিনাম্। লোকবঞ্চনমালোক্য সর্বমেবাবধীরিতম্।
৩. তত্তৎপুরাণোপপুরাণসংখ্যা বহিষ্কৃতং কশ্মলকর্মযোগাৎ।
পাষণ্ডশাস্ত্রানুমতং নিরূপ্য দেবীপুরাণং ন নিবন্ধমত্র।

কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি
হতে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত
শ্রীমদ্‌বল্লালসেন বিরচিত
দানসাগর, ৫৭—৬৭ শ্লোক

প্রতিমা-লিপি এবং শক্তিপুর তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু এই ৮খানা প্রত্নলিপির সাহায্যেও কালনির্ণয়ে সন্দেহের উচ্ছেদ হয় নি। তাই, সংক্ষেপে হলেও এসম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার :

অদ্ভুতসাগর-এর প্রথম অংশেই আছে---[১]

> "শাকে নবাষ্টখেন্দ্বয় আরেভেহদ্ভুতসাগরম্।
> গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরালানস্তম্ভবাহুর্মহীপতিঃ ।।"

যদিও শ্লোকটিতে একটু ত্রুটি আছে,[২] তথাপি কালনির্ণয় সহ অর্থ স্পষ্ট আছে — গৌড়েন্দ্রের হস্তিবন্ধন আলানের (স্তম্ভের) ন্যায় পীবর ভুজদ্বয়বিশিষ্ট এই মহীমতি ১০৮৯ শকাব্দে অদ্ভুতসাগর গ্রন্থের আরম্ভ করেছিলেন। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" নিয়মে নব-অষ্ট-খ (শূন্য)-ইন্দু, পরিষ্কার উল্লিখিত শকাব্দ প্রতিপন্ন করে।

উল্লিখিত শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে —

গ্রন্থেহস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষামহা — দীক্ষাপর্বণি দক্ষিণং নিজকৃতের্নিষ্পত্তিমভার্থ্য সঃ। নানাদানতিলাজ্যসম্বলনতঃ সূর্যাত্মজাসঙ্গমং গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জরপুরং ভার্যানুযাতো গতঃ ।।	অর্থ –এই গ্রন্থ অসমাপ্ত থাকতেই একান্ত অনুকূল উদারমনা পুত্রকে সাম্রাজ্যরক্ষারম হা-দীক্ষায় দীক্ষিত করার মাধ্যমে কর্মজীবনের সমাপ্তি টেনে গঙ্গা-তীরে দৈব আবাস নির্মাণ করিয়ে নানাবিধ দানীয়দ্রব্য-তিল-ঘৃত মাত্র সম্বল লয়ে বিনীতভাবে, ভার্যাসমভিব্যাহারে মহীপতি চলে গেছেন ।।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতি শ্লাঘ্যো যদুদ্যোগতো,- নিষ্পন্নোহদ্ভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালভূমিভুজঃ।	ভূপতি শ্রীমৎ লক্ষ্মণসেন অতি-শয় প্রশংসাভাজন, যাঁর উদ্যোগ বশত বল্লালভূপতির সৃষ্টি (আরব্ধ) অদ্ভুতসাগর সুসমাপিত হল ।।

অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ প্রণয়ন করার ব্যাপারে যে শ্রীনিবাস মহীন্তাপনীয় নামক মহা-পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছিল তা'ও অদ্ভুতসাগরেই বিধৃত আছে —

> "মীমাংসা নয় মাংসলস্মৃতি পরামর্শ প্রকর্ষস্ফুর-
> -দ্বেদাঙ্গাগম [কোবিদ] স্তু সুমতি র্গ্রন্থেহত্র পৃথ্বীপতিঃ।

১. Bhandarkar Report on Sans. Mss. 1897, P. IXXXV.

২. সংশোধন করলে [...ন্দ্রেসমা...]

যুক্তাযুক্তনিরূপণপ্রণয়িনং প্রীত্যা মহীন্তাপনী-
বংশোত্তংশ মহার্হরত্ন মলয়শ্রী শ্রীনিবাসং ব্যধাৎ॥

অর্থ—মীমাংসাদর্শনে দক্ষতাবশে তত্ত্ব-সমৃদ্ধ ধর্মশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সমন্বয়ে বেদ-অঙ্গশাস্ত্র-আগমশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যুক্ত-অযুক্ত নিরূপণের ব্যাপারে সাগ্রহ উদ্যোগী, মহীন্তাপনীয় বংশাবতংস, গুণে মহামূল্য রত্নকল্প এবং স্নিগ্ধতায় মলয়শ্রীর (শ্বেতচন্দন) সহিত তুলনীয় পণ্ডিত শ্রীনিবাসকে সুমতি স্বয়ং ভূপতি-ই নিযোগ করেছিলেন।

বুঝাগেল যে, শ্রীনিবাস মহীন্তাপনীয় ছিলেন অদ্ভুতসাগর গ্রন্থের প্রণয়নে ভার-প্রাপ্ত এবং তা' লক্ষ্মণসেনের উদ্যোগেই শেষটায় সমাপিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য —দ্বাদশ শতকে যে পদবী ছিল মহীন্তাপনীয়, তা' এখন শুধু 'মহিন্তা' হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। কালের কি গুণ!

লক্ষ্মণসেনের উল্লিখিত ২৭তম রাজ্যাব্দ নির্ণয়ের সাহায্যে সিংহাসনে আরোহণের সঠিক অব্দ সদুক্তিকর্ণামৃতের পুষ্পিকাথেকে পাওয়া যায়। যা দানসাগর এবং অদ্ভুত সাগরের কালনির্ণয়ে সহায়ক।

সদুক্তিকর্ণামৃতের সমাপনী পুষ্পিকা-শ্লোক—

শাকেঽত্র সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতে শরদাম্,
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশেঽব্দে।
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরার্থহেতবে কুতুকাৎ,
শ্রীধরদাসেনেদং সুদক্তিকর্ণামৃতং চক্রে॥

সপ্তবিংশতি অধিক শতযুক্ত দশ শত শকাব্দ = ১২৭ +
১০০০
১১২৭ শকাব্দ

যাহা লক্ষ্মণসেনের রস ৬
এক ১
বিংশ ২০
= ২৭ রাজ্যাব্দ।

১১২৭ শকাব্দে, অর্থাৎ শ্রীমৎ লক্ষ্মণসেনের ২৭ রাজ্যাব্দে সৌরফাল্গুন মাসের বিশ তারিখ শ্রীধরদাস কর্তৃক সদুক্তিকর্ণামৃত সমাপিত হল।

এই প্রসঙ্গে Indian Historicals. Quaterly III 187-9 Pages—অনুসারে

"Now as the 27th regnal year of king Lakshmana sena is found corres-pond to 1127 saka, the first year of his reign must necessarily have been1100 saka or 1178 A D. This date of his accession is not in opposition to, but on the contrary, entirely agrees with the infomation supplied by the much disputed verses of the Danasagara and Adbhutasagara, from Which we know this much that Lakshmana sena came to the thrown after 1178—79 A.D

I. H. Q III, 187-9 pp.

এখানে আমার ছোট্ট একটি মন্তব্য এই যে, উপরের ইংরেজীর মধ্যে যে লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসনারোহণের শকাব্দ ১১০০ ধরা হয়েছে, সেটা ১১০১ শকাব্দ হওয়া উচিত। অন্যথা, ১১২৭ শকাব্দ, ২৭ রাজ্যাব্দ হতে পারে না, হয়ে যায় ২৮।

শ্রীনিবাস মহীন্তাপনীয়ঃ এঁর নিজস্ব গ্রন্থ ১। গণিতচূড়ামণি ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রণীত। অপর গ্রন্থ, জ্যোতিষের শুদ্ধিদীপিকা।

শ্রীধরদাস ঃ এঁর গ্রন্থের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে। সদুক্তিকর্ণামৃত শ্রীধরদাসের সৃষ্টি। কবিবচনসংগ্রহের এ অপূর্ব গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। নাম— সদুক্তিকর্ণামৃত। সে অমৃত পাঁচটি প্রবাহে উপবিভক্ত— ১। অমর-প্রবাহ, ২। শৃঙ্গার-প্রবাহ, ৩। চাটুপ্রবাহ, ৪। অপদেশপ্রবাহ এবং ৫। উচ্চাবচপ্রবাহ। প্রত্যেকটি প্রবাহই বীচিময় বা তরঙ্গময়। অমরপ্রবাহে বীচি ৯৫টি, শৃঙ্গারপ্রবাহে ১৭৯টি, চাটুপ্রবাহে ৫৪টি, অপদেশপ্রবাহে ৭২টি, এবং উচ্চাবচ প্রবাহে ৭৪টি। প্রত্যেকটি বীচিতে বা তরঙ্গে ৫টি করে শ্লোক আছে। এভাবে মোট ৪৭৬টি বীচিতে বা তরঙ্গে মোট শ্লোকসংখ্যা ৫৭৬০। বলা বাহুল্য যে, যে ক'খানা গ্রন্থ (পাণ্ডুলিপি গ্রন্থ বা হাতে লেখা গ্রন্থ) পাওয়া গিয়েছে, তার সব ক'খানাবই কিছু কিছু অঙ্গক্ষয় ঘটে যাওয়ায় পুষ্পিকাংশে বিধৃত সংখ্যায়নের পরিপূরণ হয় না। বীচিগুলোর নামকরণ বা প্রবাহের অন্তর্গত তরঙ্গগুলোর সমাবেশ এমনভাবে করা হয়েছে যে, শুধু তার নামের সাহায্যেই তৎকালীন বাঙালীর মন-মানস, চিন্তা-চেতনা ধর্ম-সামাজিক অবস্থা—যাবতীয় একসঙ্গে আঁচ করা চলে। আজ যাঁদের আমরা পাই না, যাঁদের গ্রন্থের সন্ধান নেই, যাঁরা জীবৎকালে সাংস্কৃতিক অবদান দিয়েছেন এমন অনেকের শুধু সংক্ষিপ্ত ২/৪টি শ্লোক ধরে রেখেও সদুক্তিকর্ণামৃত সমাজের অনেক উপকার করেছে। এ গ্রন্থে মোট ৪৮৫ জন গ্রন্থকার-কবির বাছাই বাছাই কিছু কথা সংগৃহীত আছে। যাঁদের মধ্যে বহু বাঙালী মনীষী রয়েছেন। প্রোক্ত গ্রন্থকারদের মধ্যেকার একজনের নাম বঙ্গাল। তাঁর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—

"ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিম সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ।" ।। বঙ্গালস্য।।

অভঙ্গশ্লেষের সাহায্যে গঙ্গার সহিত বঙ্গালবাণীর গুণসাম্য এমন সুন্দরভাবে পরিবেশিত খুব কমই দেখা যায়। কবিগণ যার মধ্যে একেবারে ডুবে যান, এমন বঙ্কিম গতির লাবণ্যে মনোজ্ঞ গভীর গঙ্গা এবং বঙ্গালবাণী (বাঙালীর ভাষা) অথবা বঙ্গালনামক কবির বাণী স্বতই পবিত্রতা সম্পাদন করে থাকে। ৪৮৫ জন প্রাচীন

কবি-সাহিত্যিক দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই বাঙালী। নামের সাহায্যে, গাঞি-আখ্যার সাহায্যে, অনেককে চিনে নেয়া যায়। যেমন—বাসুদেব সেন, গদাধর নাথ, দিবাকর দত্ত, ত্রিপুরারি পাল, কালিদাস নন্দী, তরণী নন্দী, কমল গুপ্ত, কবিরাজ সেন, শ্রীকুলশেখর, গদাধর বৈদ্য, চপলদেব, জয়মাধব, বৈদ্যজীবদাস, তথাগতদাস, ধরণী ধর, নারায়ণ দত্ত, পশুপতি ধর, প্রভাকর দত্ত, প্রভাকর মিত্র,; এবং ভবগ্রামীণ বাথোক, রত্নমালীয় পুণ্ড্রোক, ভট্টশালীয় পীতাম্বর, তীরভুক্তীয় সর্বেশ্বর, তালহরীয় রঙ্ক, কেন্দ্রনীল নারায়ণ, গোতিথীয় দিবাকর-প্রভৃতি। সুতরাং, দ্বাদশ খৃষ্টীয় শতকের এই গ্রন্থে বাঙালীর গৌরবিত দিক্‌গুলো অল্পেই অনধাবনীয় নয় কি? সদুক্তিকর্ণামৃত প্রসঙ্গে Theodor Aufrecht সাহেবের কথা অনুসারে বলা যায় যে, অন্তত ২০০/৩০০ বাঙালী কবি-সাহিত্যিকের রচনা এ গ্রন্থে আছে।

হেমচন্দ্র সূরি : খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের এক কৃতী জ্ঞানতাপস জৈন হেমচন্দ্র ছিলেন পালরাজ কুমার পালের শিক্ষক। যদিও সেন সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে পালরাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে মগধে সীমাবদ্ধ ছিল এবং বাংলার তৎকালীন রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে তা' ভিন্ন দেশ-ই বটে, কিন্তু হেমচন্দ্র সম্ভবত একজন বাঙালী, এবং জৈনসংস্কারদ্বারা সর্বত্র চালিত ছিলেন না বরং উদার দৃষ্টির পরিচয়ই দিয়েছেন অনেকগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থে। তিনি ১০৯২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর সুদীর্ঘ ৮১ বছরের জীবনকালের বহুমুখী সাংস্কৃতিক অবদানের কিছুটা বিধৃত রয়েছে তাঁর গ্রন্থে,—সেগুলো হচ্ছে, ১। অনেকার্থকোষ অথবা অনেকার্থসংগ্রহ, ২। অনেকার্থশেষ, ৩। অভিধানচিন্তামণি এবং ৪। তারটীকা, ৫। অলঙ্কারচূড়ামণি অথবা কাব্যানুশাসন, ৬। কাব্যানুশাসনের বৃত্তি বা টীকা, ৭। উণাদিসূত্র-বৃত্তি, ৮। ছন্দোহনুশাসন এবং ৯। তার টীকা, ১০। দেশীনামমালা[১] অথবা দেশীশব্দ সংগ্রহ ১১। দেশীনামমালার বৃত্তি, ১২। ধাতুপাঠ এবং তার ১৩। বৃত্তি, ১৪। ধাতুপারায়ণ এবং তার ১৫। বৃত্তি, ১৬। ধাতুমালা, ১৭। নিঘন্টুশেষ, ১৮। বলাবলসূত্রবৃহদ্বৃত্তি, ১৯। বালভাষা ব্যাকরণ সূত্র-বৃত্তি, ২০। শব্দানুশাসন এবং তার ২১। বৃত্তি, আর ২২। শেষসংগ্রহ নামমালা অথবা শেষসংগ্রহসারোদ্ধার। সর্বদর্শনসংগ্রহে আর্হত্‌দর্শনের মধ্যে হেমচন্দ্রর উল্লেখ রয়েছে।

হলায়ুধ : বিখ্যাত সেনরাজ লক্ষ্মণ সেনের মহাধর্মাধিকৃত ইনি স্বকৃত 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়েছেন—। এঁর পিতা ধনঞ্জয় ছিলেন জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ্‌

১. এ গ্রন্থখানাই প্রমাণ-যে বাংলাদেশে চলতি প্রাকৃত ভাষা. গৌড়ীপ্রাকৃত (অনেকের মতে পূর্বী) মগধেও প্রচলিত ছিল। তৎকালীন দেশী শব্দই উক্ত প্রাকৃতের শব্দ। তা' বাংলাভাষার পূর্বরূপ বলে অনেকে মনে করেন।

মহাপণ্ডিত এবং ক্রিয়ান্বিত। তাঁকে 'জড়জ্জ্যোতিষ' বলে আখ্যায়িত করেছেন হলায়ুধ। হলায়ুদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ঈশান, অপর অগ্রজের নাম পশুপতি। গ্রন্থের প্রামাণ্যে এঁর কোন পদবী দেয়া চলে না। ভট্ট বা মিশ্র কোন প্রকার পদবী নির্দশের পক্ষে হলায়ুধের অতগুলো গ্রন্থও নির্দেশ দেয় না। কেবল "বংশে বাৎস্যায়নমুনেবিব সদাচারস্য বিশ্রামভূঃ" ইত্যাদির সাহায্যে বাৎস্যগোত্রীয বলে জানা যায়। মনে হয়, ইনি শ্রোত্রিয় ছিলেন সম্ভবত বৈদিক। বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে যদি তদন্তর্গত হতেন তা'হলে অবশ্যই তা', লেখা থাকত। বল্লাল সেনের কৌলিন্য কেবল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাঢ়ীয় শ্রেণীর শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে, পঞ্চ-গোত্রের মধ্যেকার ভরদ্বাজ গোত্রীয়দিগকে মুখোপাধ্যায়/মুখার্জী (মুখটি গাঞি বলে); কাশ্যপ গোত্রীয় চট্ট বা চট্টল গাঞির শ্রোত্রিয় রাঢ়ীয়দিগকে চট্টোপাধ্যায়/চাটার্জী; বন্দ্য বা বন্দ্যঘটায় গাঞির সাণ্ডিল্যগোত্রীয় শ্রোত্রিয়দিগকে বন্দ্যোপাধ্যায়/ব্যানার্জী; এবং সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয় রাঢ়ীয়দিগকে গঙ্গোপাধ্যায়/গাঙ্গুলী—কৌলিন্য সূচক উপাধি বা পদবী দেয়া হয়েছিল। কায়স্থদের মধ্যে কেবল ঘোষ, বসু, গুহ এবং মিত্র চারটি পদবী বল্লালী কৌলিন্যের জ্ঞাপক মর্যাদান্বিত পরিচিতি। এছাড়া, অন্যকোন গোত্রীয়দিগকে বল্লালী খেতাব বা কৌলিন্য পদবী দেয়া হয় নি। সুতরাং বাৎস্যগোত্রীয় হলায়ুধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তা' বোধ হয় বৈদিক শ্রেণীর। এদেশের যাবতীয় ব্রাহ্মণ-ই কিন্তু, রাঢ়ীয়, বরেন্দ্রী বা বারেন্দ্র এবং বৈদিক এই তিন শ্রেণীতে উপবিভক্ত দেখা যায়। তম্মধ্যে বৈদিক শ্রেণীর বাংলাদেশে আগমন বিষয়ে কুলজী গ্রন্থগুলো যে বর্মরাজ---সামল বর্মার (শ্যামল বর্মা?) সম্পর্ক স্থাপন করে তা' কতদূর সত্য---বলা যায় না। ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থে-হলায়ুধ রাঢ়ীয় এবং বরেন্দ্রীদের কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেছেন---অর্থ—"ছন্দ-দেবতা-বিনিয়োগ বিষয়ে জ্ঞানমূলক রীত্যনুসারী বেদাধ্যয়ন না করে, রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র সম্প্রদায় কেবল মীমাংসাদর্শনের অনুগত হয়ে বেদের কোন একাংশের অবলম্বনে যজ্ঞের ইতিকর্তব্যতার বিচার মাত্র করে থাকেন।"[১] এরকম আরও মন্তব্য রাঢ়ীয় বএং বারেন্দ্রগণের বিরুদ্ধে সরাসরি লিখিত থাকা দ্বারা অনেকে তাঁকে বৈদিক শ্রেণীর বলে থাকেন। পক্ষান্তরে, তাঁর নামের সাথে ব্যবহৃত 'আবসথিক শব্দের সাহায্যে তাঁকে কোন প্রকারে, গাঞিসম্পর্কান্বিত---আবসথগাঞি, অর্থাৎ বাৎস্যগোত্রীয় রাঢ়ী মনে করা চলে। আবসথিক শব্দের অন্য অর্থও আছে---স্বয়ং কৃত অগ্ন্যাধানে নিত্যাগ্নিহোত্রী, অগ্ন্যাগারে কৃতবসতি। যা হোক

১. রাঢ়ীয় বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নৈর্বিনা কিয়দেকদেশ বেদার্থস্য কর্মমীমাংসাদ্বারে যজ্ঞে ইতিকর্তব্যতা বিচারঃ ক্রিয়তে। — ব্রাহ্মণসর্বস্ব, প্রথম অংশ।।

হলায়ুধের রাঢ়ীয়দের এবং বরেন্দ্রীদের শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক্‌পরিবর্তনের সমালোচনার মাধ্যমে এটা পরিষ্কার পাওয়া গেল যে, বৈদিক সম্প্রদায় নিয়মিত বেদপাঠ এবং অন্যান্য ইষ্টকর্মে বেশী অধিসক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে, রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র সম্প্রদায় বিচারমূলক শাস্ত্রে—মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে বেশী মশ্‌গুল হয়েছিলেন। তা' হওয়া যে একান্ত স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনমূলক তা' অস্বীকার করার উপায় আছে? আচার্য শঙ্কর বা তৎপূর্বেকার কুমারিলভট্ট প্রমাণ করে গিয়েছেন যে কেবল আবৃত্তি জানলেই হয় না, তা' সভা-সমিতি-বিচার-বিবেচনায় লাগেও না, লাগে— শাস্ত্রের যুক্তিতর্কমূলক তত্ত্বজ্ঞান। তৎপ্রয়োজনেই রাঢ়ী-বরেন্দ্রীরা শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক্‌পরিবর্তন করেছিলেন - একধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে লক্ষ্য করেও এ যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। বল্লালসেন যে কৌলিন্যের প্রবর্তন করেছেন— তাতেও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অনুমিত হয়। সমাজে, সংখ্যায় প্রাবীণ্যে, প্রতিপত্তিতে, অর্থে, সম্পদে, রাজকীয় পদাধিকারের গুরুত্বে হয়তো, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদের ঠাঁই একটু উপরেই ছিল, যার দিকে একটি রাজকীয় চোখ রেখেই কৌলিন্য-খেতাবাদির মর্যাদাণ্বিত অবস্থায় দৃঢ়করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসন-সংরক্ষণের সুরাহাও করা হয়েছিল। বল্লালসেন ছিলেন রাজা সম্রাট। তাই, রাজকীয় দৃষ্টিভঙ্গী বাদ দিয়ে তাঁর কাজকর্মের সঠিক ব্যাখ্যাও, অবশ্যই খাটে না। কেন না, কৌলিন্য সৃষ্টির মূলে অন্যকোন বেদ-স্মৃতি প্রভৃতিব তাত্ত্বিকভিত্তি নেই। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণই যেকোন দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদাব। বল্লালনসেনেব কুলীন গণও (ব্রাহ্মণদের বেলায়) শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণই বটে। হলায়ুধের গ্রন্থ—১। দ্বিজনয়ন, ২। পণ্ডিতসর্বস্ব, ৩। মীমাংসাসর্বস্ব, ৪। ব্রাহ্মণসর্বস্ব, ৫। শৈবসর্বস্ব, এবং ৬। শ্রাদ্ধ-পদ্ধতিটীকা।। হলায়ুধ নিজেই ব্রাহ্মণসর্বস্বে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতির শ্রাদ্ধাদিপদ্ধতি এবং অপর অগ্রজ ঈশানের দ্বিজাহ্নিকপদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। বৈষ্ণবসর্বস্ব' নামক অপর এক গ্রন্থের পূর্বাস্তিত্বেরও উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে, সে গ্রন্থের প্রণেতার নাম করেন নি। অধিকন্তু ব্রাহ্মণসর্বস্বের মধ্যেই স্মার্তাগ্নিপদ্ধতি এবং আবসথ্যাধাননিবদ্ধ নামক অপর দু'খানা স্বকৃত গ্রন্থের সন্নিবেশ করেছেন।

হলায়ুধ : ইনি পূর্বোল্লিখিত পুরুষোত্তম দেবের পুত্র। তিনি ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে "পুরাণ সর্বস্ব" নামক একখানা গ্রন্থ, লিখেছিলেন। আমার, এ প্রবন্ধে এই হলায়ুধ ৩য়, যাঁদের কারোর-ই ভট্ট বা মিশ্র প্রভৃতি কোন পদবী পাওয়া যায় না। তবে, এই তৃতীয়জনের 'দেব' পৈত্রিক পদবী মেনে নেয়া চলে। এ হলায়ুধ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর বাইরের ব্যক্তি। তথাপি, এঁর প্রসঙ্গ অন্য প্রয়োজনে হলায়ুধের পাশেই লিখিত হল।

বল্লালসেনের অদ্ভুতসাগর এবং হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থদ্বয়, যে সকল প্রাক্তন গ্রন্থ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে--তার তালিকা দেয়া হল। অদ্ভুতসাগরে উদ্ধৃত— ১। বৃদ্ধগর্গের স্মৃতি, ২। পরাশরের স্মৃতি, ৩। বশিষ্ঠের সংহিতা, ৪। বার্হস্পত্য সংহিতা, ৫। কঠশ্রুতি, ৬। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, ৭। আথর্বণ সংহিতা, ৮। গার্গজ্যোতিষ, ৯। কালাবলী, ১০। সূর্যসিদ্ধান্ত, ১১। বিন্ধ্যবাসীর জ্যোতিষশাস্ত্র, ১২। বাদরায়ণীয় জ্যোতিঃসংহিতা, ১৩। বালিহোত্রের বচন, ১৪। বিষ্ণুগুপ্তের জ্যোতির্গ্রন্থ, ১৫। সুশ্রুত সংহিতা, ১৬। পীলকাচার্যের জ্যোতিষ, ১৭। রাজপুত্রের জ্যোতিষ, ১৮। দেবলের সংহিতা, ১৯। ভার্গবীয় সংহিতা, ২০। বৈজবাপ জ্যোতিষ, ২১। কাশ্যপ সংহিতা, ২২। নারদ সংহিতা, ২৩। বরাহ মিহিরের ময়ূরচিত্রক, ২৪। চরক সংহিতা, ২৫। যমনেশ্বরের জ্যোতিষ, ২৬। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, ২৭। বসন্তরাজীয়-শাকুন শাস্ত্র, ২৮। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ২৯। স্কন্দপুরাণ, ৩০। ভাগবত, ৩১। আদি-পুরাণ (মহাপুরাণ), ৩২। পদ্মপুরাণ, ৩৩। মৎস্যপুরাণ, ৩৪। রামায়ণ, ৩৫। মহাভারত, ৩৬। খিলহরিবংশ, এবং ৩৭। বিষ্ণুধর্মোত্তর (গরুড় পুরাণের অংশ)।

ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থে ১। অগ্নিপুরাণ, ২। অঙ্গিরস্মৃতি, । অত্রিসংহিতা, ৪। অনুক্রমণিকা, ৫। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, ৬। ঈশানকৃত দ্বিজানিকপদ্ধতি, ৭। ঔশনস-স্মৃতি, ৮। কঠশাখা, ৯। কাত্যায়নীয়স্মৃতি, ১০। কূর্মপুরাণ, ১১। গোভিলস্মৃতি ১২। গৌতম ধর্মশাস্ত্র, ১৩। ছন্দোগ ব্রাহ্মণ, ১৪। ছন্দোগপরিশিষ্ট, ১৫। জাতকর্ণ্য-স্মৃতি, ১৬। জাবালিসংহিতা, ১৭। দক্ষসংহিতা, ১৮। দেবলস্মৃতি, ১৯। নারদসং-হিতা ২০। নরসিংহ পুরাণ, ২১। পশুপতিকৃত শ্রাদ্ধাদিপদ্ধতি, ২২। পারস্করস্মৃতি সংহিতা। ২৩। পৈঠিনসি-স্মৃতি, ২৪। পদ্মমহাপুরাণ, ২৫। পুরু-স্মৃতি, ২৬। ভবিষ্যপুরাণ, ২৭ মনুসংহিতা, ২৮। মরীচিসংহিতা, ২৯। মহাভারত, ৩০। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৩১। মীমাংসাসর্বস্ব, ৩২। মৈত্রায়ণীয় পরিশিষ্ট, ৩৩। মৈথিল পুস্তক, ৩৪। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, ৩৫। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, ৩৬। যমসংহিতা, ৩৭। যজ্ঞপার্শ্বীয়স্মৃতি, ৩৮। যজুর্বেদভাষ্যধৃত স্মৃতি ৩৯। রহস্য-স্মৃতিনিবন্ধ, ৪০। লঘুবিষ্ণুস্মৃতি, ৪১। লঘুহারীতস্মৃতি, ৪২। বশিষ্ঠ স্মৃতি, ৪৩। বারাহপুরাণ, ৪৪। বিষ্ণুস্মৃতি, ৪৫। বৃহদ্বিষ্ণুস্মৃতি, ৪৬। বৃহদযমস্মৃতি, ৪৭। বৃহস্পতিসংহিতা, ৪৮। বৃদ্ধশাতাতপস্মৃতি, ৪৯। বৃহন্মনুসংহিতা, ৫০। বৃদ্ধাপস্তম্ব, ৫১। বায়ুপুরাণ, ৫২। ব্রহ্মপুরাণ, ৫৩। বেদব্যাস, ৫৪। বিষ্ণুধর্মোত্তর, ৫৫। বৌধায়নস্মৃতি, ৫৬। বৈষ্ণব-সর্বস্ব, ৫৭। শৌচসর্বস্ব, ৫৮। শঙ্খলিখিত স্মৃতি, ৫৯। শাতাতপস্মৃতি, ৬০। শাম্বপুরাণ, ৬১। শ্রুতি, ৬২। শৌনকস্মৃতি, ৬৩। শাট্যায়নস্মৃতি, ৬৪। শুদ্ধি-দীপিকা, ৬৫। সুমন্তস্মৃতি, এবং ৬৬। হারীত সংহিতা॥

গোরক্ষনাথ : ইতি মীননাথ নামক যোগীগুরুর শিষ্য। যোগশাস্ত্রে গোরক্ষনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং দক্ষতা ছিল। তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ, যার অবলম্বনে একটি যোগসাধক সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়েছে। এঁর আবির্ভাব কাল নিয়েও অনেক মতান্তর আছে। তবে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতানুসারে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বলে ধরা যায়। তৎপূর্বে হলে' তাঁর যোগদর্শনের (পাতঞ্জলি দর্শনের) তত্ত্বানুসারী জ্ঞানগর্ভ সমীচীন গ্রন্থের অন্তত এক খানারও পূর্বোল্লেখ বা পূর্ববর্তী টীকাকার পাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু তা পাওয়া যায় না। গ্রন্থগুলো হচ্ছে— ১। গোরক্ষশতকম্/জ্ঞানশতকম্/জ্ঞানপ্রকাশশতকম্ ২। চতুরশীত্যাসনানি, ৩। জ্ঞানামৃতম্, ৪। যোগচিন্তামণিঃ, ৫। যোগমহিমা, ৬। যোগমার্তণ্ডঃ, ৭। যোগসিদ্ধান্তপদ্ধতি, ৮। বিবেকমার্তণ্ড: এবং ৯। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ। প্রথম লিখিত গ্রন্থখানা যোগশাস্ত্রের সারগর্ভ তত্ত্বে ভরপুর এবং ইহার দু'টি টীকাও আছে। ছিন্নমস্তার (দশমহাবিদ্যার অন্যতম) অষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রটি এঁর তান্ত্রিক সাধনার ইঙ্গিতবহ। তা' রয়েছে এঁর ১০ সংখ্যক গ্রন্থ—গোরক্ষসংহিতা'র মধ্যে। দ্বিতীয় গ্রন্থখানায়, যোগসাধনায় অপরিহার্য—৮৪টি আসন এবং তার গঠন ও ফলাফল বিবৃত হয়েছে। এঁর কোন গ্রন্থে কুত্রাপি চৌরাশীজন সিদ্ধাচার্যের পরম্পরার কথা নেই। আছে চৌরাশী প্রকার সিদ্ধ (ফললাভে যার সফলতা প্রমাণিত হয়েছে) যোগাসনের নিয়ম কানুন-মাহাত্ম্য-সিদ্ধিলাভে উপযুক্ততার কথা। নবমগ্রন্থ—সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি' নির্বাচিত আঙ্গিকের সমণ্বয়ে যোগসাধনার ফলপ্রসূ পদ্ধতি। এ ছাড়া, ৩নং থেকে ৮নং পর্যন্ত ৬ খানা গ্রন্থই যোগতত্ত্ববিষয়ের। আনন্দতীর্থের শঙ্করবিজয়গ্রন্থের (ব্যাসগিরিকৃত গ্রন্থের নহে) সারসঙ্কলনাত্মক সংক্ষেপশঙ্করজয়'কার মাধবাচার্যই প্রথম ব্যক্তি যিনি মৎস্যেন্দ্রনামের উল্লেখ করেছেন। আর উল্লেখ করেছেন স্বাত্মারাম নামক যোগীন্দ্র যিনি বর্ণদীপিকা এবং হঠপ্রদীপিকা নামক দু'খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এছাড়া, প্রোক্ত জ্ঞানামৃত গ্রন্থের টীকাকার সদানন্দ, যোগচিন্তামনির টীকাকার ভবানীসহায়, যোগমার্তণ্ড গ্রন্থের উল্লেখক—সূর্যপণ্ডিত—সবাই খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আগের ন'ন। সুতরাং ময়নামতীগীতিকার গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতীকে সমতটের দেববংশের গোবিন্দদেবের মা বলে নির্বাচন এবং গোবিন্দদেব এবং ঐ গোপীচাঁদ এক এবং অভিন্ন বলার পেছনে কোন প্রমাণ সত্যিই আছে কি ?[১]

গঙ্গেশ উপাধ্যায় : এঁর কালিক এবং কৌলিক পরিচয় আবিষ্কার করার জন্য খ্যাতিমান গবেষক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বাঙালীর সারস্বত অবদান' গ্রন্থে দীর্ঘ

১. ডঃ আহমদ শরীফ প্রণীত বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২১৩, পৃঃ 'চ' অনুচ্ছেদ।

আলোচনা করে দেখিয়েছেন--ইনি কাশ্যপ গোত্রীয় ছাদন বংশের মৈথিল ব্রাহ্মণ। তাঁর তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের উপরে নরহরি উপাধ্যায়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ-বটেশ্বরদত্ত কর্তৃক দোষোদ্ভাবন-প্রভৃতি বহু জটিল আলোচনায় গিয়েও কালসম্বন্ধে কোন সঠিক নির্ণয় দিতে পারেন নি। তবে তাঁর বংশ-গোত্র সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। তিনি কোথাকার অধিবাসী ছিলেন এবং কবে বা কখন ছিলেন—এটাই জ্ঞাতব্য। বরিশাল জিলার সদর মহকুমার গৌরনদী (বর্তমানে উপজেলা) এলাকাধীন 'বাসুদেবপাড়া' গ্রামে গঙ্গেশোপাধ্যায়ের বাড়ী--বড়টোলবাড়ী—বড় ভট্টাচার্য-- বাড়ী বলে এখনো জনশ্রুতি রয়েছে। আমার দীর্ঘ সংস্কৃত বিদ্যার্থিজীবনে, আমার পরমপূজ্যপাদ অধ্যাপক—গৈলা সিদ্ধীশ্বরী কালীবাড়ীর দীনবন্ধুপদরত্ন, হয়রতপুর গ্রামের অশ্বিনীকুমার কাব্যতীর্থ, ফরিদপুর গয়ঘর-গঙ্গানগরীয় কৃষ্ণদাস তর্কতীর্থ, বরিশাল হস্তিশুণ্ডগ্রামের রাজেন্দ্রনাথ (দশরথ) তর্কতীর্থ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক বিক্রমপুর ইছাপুরা গ্রামীয় তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অনন্তকুমার তর্কতীর্থ প্রমুখ অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে শুনেছি যে- "গঙ্গেশোবঙ্গে রঘুদেবো কাশ্যাম্' প্রবাদটিতে ভিন্নকালীয় দুই মহাপণ্ডিতের নাম বিধৃত, তাঁর প্রথম ব্যক্তি গঙ্গেশ-গঙ্গেশোপাধ্যায়, যাঁর বাড়ী বাসুদেব পাড়ার গ্রামে। তৎকালে প্রচলিত এবং আমাদের জীবনকালেও যাতে অনেকবার অংশগ্রহণ করেছি--সেই পণ্ডিত--সভায় আহূত যত বড় মহাপণ্ডিত বা মহামহাপণ্ডিতই হন না কেন, দেখেছি বাসুদেবপাড়ার মথুরা ভট্টাচার্যের সম্মানী সর্বাগ্রে এবং একটু বেশী। মথুরা ভট্টাচার্য তেমন কোন পণ্ডিত ছিলেন না, সে সম্মান সেই গঙ্গেশোপাধ্যায়ের সম্মান। বাসুদেবপাড়ার সেই বাড়ীতে ক্রমিক পরিজন বৃদ্ধির ফলে এতগুলো গৃহস্থের সমন্বয় ঘটেছিল যে, এক বাড়ীতেই ১৮টা টোল পরিচালিত হয়েছে। বাকলা নামক পরগণাটি বহুপুরানা এবং বাঙ্গড়োরা পরগণার চেয়ে প্রাবীণ্যে বড় হয়েছিল ঐ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের প্রাধান্যেই। মঙ্গলকাব্যকার বিজয়গুপ্ত যে তাঁর নিজের পরগণা বা 'বাঙ্গড়োরা তকসিম' বলে উল্লেখ করেছেন, আমি নিজেও সেই পরগণা-এবং গ্রামের লোক। বাকলা-বাঙ্গরোড়া পাশাপাশি। বল্লালসেন-লক্ষণসেনের আমলে মিথিলাপও ছিল অন্যতম প্রদেশমাত্র। সুতরাং বাকলার কোন আহ্বানে সারাদিয়েই হোক, বা অন্য কোন কারণে হোক গঙ্গেশোপাধ্যায় এতদ্দেশী লোক হয়েছিলেন বলেই যেন জানা যায়। তার যুগান্তকারী 'তত্ত্বচিন্তামণি' নব্যন্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আকড় গ্রন্থ। তাঁর জন্ম এবং গ্রন্থরচনা দ্বাদশ খৃষ্টীয় শতকের শেষ সময়ের হবে। তাঁর পুত্র বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের গ্রন্থরচনার কাল গৌরীনাথ শাস্ত্রীও ১২২৫ খৃঃ বলেছেন।[১]

১. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, (সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৭৬ সাল) পৃঃ ২০০. ১ম অনুচ্ছেদ।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী

হলায়ুধমিশ্র : শেখ জালালউদ্দিন তাবরেজীর মাহাত্ম্য কথামূলক শেক [খ] শুভোদয়া গ্রন্থ বোধ হয় এঁর-ই রচনা। এঁর অপর গ্রন্থ-জ্যোতিঃসারঃ (L 226). ১১৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১২৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এ গ্রন্থের রচনা কাল, অনেকে স্বীকার করেন এবং শেকশুভোদয়ার মধ্যে এমন কিছু প্রাকৃত গান আছে যার মধ্যে বাংলাভাষা যেন চন্দ্রোদয়কালীন বিকশমান কুমুদিনীর ন্যায় কায়িক লাবণ্য-সুষমায় পূর্ণ হতে চলেছে। গ্রন্থকার বাঙালী ছিলেন। কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের মধ্যে এঁর উক্ত গ্রন্থখানা আছে।

যুবরাজ প্রহ্লাদন : ইনি রাজা ধারাবর্ষের সহোদর। ১২০৮ খৃষ্টাব্দে 'পার্থ-পরাক্রম' নামক একখানা নাট্যসাহিত্য (ব্যায়োগ) প্রণয়ন করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

অরিসিংহ এবং অমরচন্দ্র : উভয়ে জৈন ধর্মাবলম্বী গ্রন্থকার। উভয়ে একত্রে কবিতারহস্য এবং কাব্যকল্পলতা গ্রন্থদ্বয়ের সম্পাদনা করেছেন। অমরচন্দ্রের নিজস্ব অপর গ্রন্থ—বালভারত। মহাভারতের পর্যানুক্রমিক ঘটনা অতিসংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে সে গ্রন্থে।

দেবপ্রভসূরি : পাণ্ডবচরিত্র এবং মৃগবতীচরিত্র নামক দু'খানা মহাকাব্য তাঁর রচনা। মৃগবতীচরিত্রে কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের কাহিনী।

ভাবদেবসূরি—একজন জৈন গ্রন্থকার। পার্শ্বনাথচরিত নামক এক মহাকাব্য প্রণয়ন করেছেন। জৈনদের মধ্যে কেবল নয়, কাব্যিকগুণে গ্রন্থখানা সাধারণের আকর্ষণীয়।

যশপাল : ইনি মোঢ়বংশীয় রাজা ধনদেবের মন্ত্রি-পুত্র এবং অজয়াদেবের মন্ত্রী ছিলেন। ত্রয়োদশ শতক খৃষ্টকালের দ্বিতীয় পাদের লোক বলে ধারণা করা যায়। এঁর নতুন ধারার নাটক মোহরাজপরাজয়, মনে হয়, এদেশেও বিস্তার লাভ করেছিল।

নারায়ণ: রাজা ধবলচন্দ্রের অন্যতম সভাপণ্ডিত। বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের অনুকরণে 'হিতোপদেশ' নামক একখানা কথাসাহিত্য প্রণয়ন করেছেন। গ্রন্থখানা সর্বত্র আদৃত উপদেশাত্মক কাহিনীময়। প্রসিদ্ধি আছে ইনি একজন বাঙালী পণ্ডিত।

জহ্লণদেব: গ্রন্থের পুষ্পিকায় এঁর নাম—আরোহণ ভগদত্ত জহ্লণদেব। এঁর সপ্তশতীছায়া, সূক্তিমুক্তাবলী এবং সোমপালবিলাস (মহাকাব্য) প্রসিদ্ধ গ্রন্থত্রয়।

সোমপ্রভ: ইনিও একজন জৈন পণ্ডিত। এঁর 'শৃঙ্গারবৈরাগ্যশতক' নামক ভোগ এবং ত্যাগের মাহাত্ম্যভিত্তিক নীতিশিক্ষার অপূর্ব গ্রন্থ জৈন সমাজে বিশেষ আদৃত ছিল।

বোপদেব: ইনি দেবগিরির রাজা মহাদেবের অধ্যাপক ছিলেন। এঁর পিতার নাম কেশব—বিখ্যাত বৈদ্যক। এঁর গ্রন্থগুলোর বিশেষত্বে বাংলাদেশে সর্বত্র প্রসারপ্রাপ্ত এবং কোন কোন গ্রন্থ পাণিনি এবং কলাপের প্রসারও, অনেকটা কমিয়ে রেখেছে। গ্রন্থগুলো হচ্ছে—১। কবিকল্পদ্রুম, ২। কাব্য কামধেনু, ৩। ত্রিংশচ্ছ্লোকী অশৌচসংগ্রহ, ৪। ধাতুপাঠ, ৫। ধাতুকোষ ৬। পরমহংসপ্রিয়া, ৭। সাম্বজীপ্রতাপকৃত- পরশুরামপ্রতাপ নামক বিখ্যাত ধর্মশাস্ত্রনিবন্ধের টীকা, ৮। ভাগবতমহাপুরাণের স্কন্ধানুক্রমণী, ৯। মহিম্নস্তবটীকা, ১০। মুক্তাফল, ১১। মুগ্ধবোধ নামক এক স্বতন্ত্র ব্যাকরণ, ১২। শতশ্লোকী এবং তার টীকা, ১৩। শতশ্লোকীচন্দ্রকলা, ১৪। শার্ঙ্গধরসংহিতার (আয়ুর্বেদিক) গূঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকা, এবং ১৫। সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ (এই বৈদ্যক শাস্ত্রের রচয়িতা, অনেকের মতে বোপদেবের পিতা কেশব)। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণখানার বহু টীকা। তন্মধ্যে অনেক টীকা বাঙালী পণ্ডিতদের সৃষ্টি। টীকাগুলো যথা—১। কার্তিকেয়সিদ্ধান্তকৃত টীকা, ২। কাশীশ্বর (বাঙালী) কৃত টীকা, ৩। গঙ্গাধরকৃত সেতুসংগ্রহ নামক টীকা, ৪। গোবিন্দরাম (বাঙালী) কৃত শব্দদীপিকা টীকা, ৫। দয়ারাম বাচস্পতি (বাঙালী) কৃত টীকা, ৬। দুর্গাদাস (বাঙালী) কৃত সুবোধা টীকা, ৭। দেবীদাস (বাঙালী) কৃত টীকা, ৮। ভোলানাথ (বাঙালী) কৃত সন্দর্ভামৃততোষিণী টীকা, ৯। মধুসূদন (বাঙালী) কৃতটীকা, মধুমতী, ১০। মিশ্রকৃত 'দুটা'-টীকা, ১১। রতিকান্ত তর্কবাগীশ (বাঙালী) কৃত টীকা, ১২। সুবোধিনী, রাধাবল্লভ কৃত টীকা ১৩। রামশর্মা অথবা রাম বাগীশ (বাঙালী) কৃত টীকা, ১৪। রঘুনাথতনয়—রামভদ্র (বাঙালী) কৃত টীকা, ১৫। রামানন্দাচার্যকৃত টীকা, ১৬। বিদ্যানিবাসকৃত টীকা, ১৭। শ্যামদাসতনয়-শ্রীবল্লভকৃত টীকা বালবোধিনী, এবং ১৮। মুগ্ধবোধপ্রদীপ নামক টীকা। এঁর কাল বিসংবাদিত।

ক্রমদীশ্বর : এঁর ব্যক্তিগত পরিচয় কোন রকমেই জানা যায় না। তবে, গ্রন্থ রচনার কাল ত্রয়োদশ খৃষ্টীয় শতকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে দেশেরই লোক হ'ন না কেন, বাংলাদেশে, বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক-ভাবে এঁর 'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণের প্রচলন ছিল। 'সংক্ষিপ্তসার' এবং তার টীকাই মাত্র ক্রমদীশ্বর প্রণয়ন করেছিলেন, পরে জুমর নন্দী, রসবতী নামক টীকা বা বৃত্তি রচনা করে ব্যাকরণখানাকে পূর্ণরূপ দান করেন। গোয়ীচন্দ্রও ইহার একটি সমীচীনটীকা করেছেন, যার উপটীকা—'কৌমুদী' প্রণয়ন করেছেন অভিরাম বিদ্যা-লঙ্কার, কেশবদেব করেছেন ব্যাকরণদুর্ঘটোদ্‌ঘাট-নামক উপটীকা; চন্দ্রশেখরীয় উপটীকা, নারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারকৃত ব্যাকারণদীপিকা এবং হরিরামবাচস্পতিকৃত উপটীকাই প্রধানত প্রাপ্ত। টীকাকারগণের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রশেখর ব্যতিরেকে অন্য সবাই এবং রসবতী-কার জুমরনন্দীও এদেশের লোক ছিলেন মনে হয়। জুমর নন্দী একজন সামন্তভূস্বামী ছিলেম বোধহয় উত্তর বঙ্গে কোথাও। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সূত্রে জুমর নন্দীর উপাধি-মহারাজাধিরাজও পাওয়া যায়।

অর্জুনবর্মদেব : সুভটবর্মদেবের পুত্র, ১২২৬ খৃষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর 'রসিকজীবনী' নামক কাব্য এবং অমরুশতকের টীকাই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

অক্ষোভ্যতীর্থ : এঁর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বনাম গোবিন্দ শাস্ত্রী। ইনি মাধবতীর্থের উত্তর সূরি। এঁর মৃত্যু খৃঃ ১ ৪৮। শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত জয়তীর্থ। সন্ন্যাসপূর্ব-কালীন গ্রন্থ আথর্বণরহস্য-টীকা, দর্শন রসিকদের কাছে বিশেষ উপায়-গ্রন্থরূপে প্রসিদ্ধ ছিল।

আশাধর : বিখ্যাত জৈন শাস্ত্রকার। এঁর পিতার নাম সল্লক্ষণ এবং পুত্রের নাম ছাহড়। এঁরা ব্যাঘ্ররাওয়াল বংশীয় ছিলেন। তাঁর 'ত্রিষষ্ঠিস্মৃতিশাস্ত্র' গ্রন্থ ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে সমাপিত। স্মৃতিশাস্ত্রে যত নিবন্ধকারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তন্মধ্যে আশা-ধরের তুল্য বহুগ্রন্থের রচয়িতা দ্বিতীয় ব্যক্তি পাওয়া কঠিন। এঁর উক্ত স্মৃতি নিবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে ৬৩ প্রকার নিবন্ধ রয়েছে। অন্যগ্রন্থ—অদ্বৈতবিবেক, অষ্টাঙ্গহৃদয়োদ্যোত, কাব্যালঙ্কার টীকা, কুবলয়ানন্দকারিকার টীকা, গ্রহগণিত এবং কোবিদানন্দ। সনাতনী নমুনায় নতুন নতুন শাস্ত্রগ্রন্থের উদ্ভাবনে জৈনরাও যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে চেষ্টিত ছিল—তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত আশাধরের স্মার্তগ্রন্থ। সনাতনী আর্যদের মধ্যে

প্রদেশভেদে স্মার্ত-মতের পার্থক্য বিদ্যমান। রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব বাংলাদেশে এবং ভারতের উত্তরপ্রদেশে মাত্র চলে, নিকটবর্তী আসামে-উড়িষ্যায় মিথিলায়ও চলে না, সেসবস্থানে আলাদা স্মৃতিনিবন্ধ রয়েছে। আর, অন্যান্য প্রদেশে বা স্থানে তো বিভেদ প্রচুর-ই দেখা যায়। তবে, জৈনরা সর্বত্র সমস্বার্থানুসন্ধিৎসায় অভিন্ন মতের প্রবর্তনের এক কঠিন প্রয়াস স্বীকার করেছিলেন। ব্যাঘ্ররাওয়াল বংশের অস্তিত্ব এবং প্রাবল্য রাজপুতনা-প্রভৃতি অঞ্চলে হলেও তা' উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গীতে আপনভাব-গ্রথিত ছিল। আশাধর তাঁ'ই জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বত্র সমান মর্যাদার আসনে ছিলেন। সাংস্কৃতিক আলোচনায় এ সব বিষয় অনুপেক্ষণীয়—সন্দেহ নেই।

উদয়প্রভ সূরি অথবা উদয় প্রভদেব সূরি : এঁর আরম্ভসিদ্ধি নামক ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থখানা খুব প্রসিদ্ধ। ১২৪১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানা রচিত বলে জানা যায়।

গুণাকর : ইনি নাগার্জুনের যোগরত্নমালা নামক তন্ত্রায়ুর্বেদীয় গ্রন্থের একটি উপযুক্ত টীকা প্রণয়ন করেছেন যা' অতিদুরূহ নাগার্জুনের উক্তির সমীচিন অনুশীলনে আয়ুর্বেদিকদের যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানা প্রণীত।

গণপতি ব্যাস—ঐতিহাসিক ভোজ-রাজধানী ধারানগরীর ধ্বংসের কাহিনী-সংবলিত 'ধারাধ্বংশ' নামক কাব্য, খৃষ্টীয় ১২৭২ অব্দে প্রণয়ন করেছিলেন। এখন গ্রন্থখানা দুর্লভ হয়েছে।

জিনপ্রবোধ সূরি : এঁর পূর্বনাম পর্বত, পিতার নাম শ্রীচন্দ্র এবং গুরুর নাম জিনেশ্বর। ইনি ১২২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেছেন। ইনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণিক এবং কাতন্ত্র বা কলাপী (কালাপ) সম্প্রদায়ের অন্যতম গ্রন্থকার। কলাপব্যাকরণের ত্রিলোচনদাস কবীন্দ্রকৃত 'কাতন্ত্র-বৃত্তি-পঞ্জিকা' নামক বিখ্যাত টীকার "কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকাদুর্গপদপ্রবোধ" নামক এক উপটীকা তিনি করেছেন। ইনিও একজন বাঙালী জৈন পণ্ডিত। এঁর টীকাটির সাহায্যে অপর এক বিরাট বৈয়াকরণিক এবং আয়ুর্বেদিকের সুখ্যাত পঞ্জী বা পঞ্জিকা,---কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা'র প্রণেতার কাল সম্বন্ধে বিশেষ ঐতিহাসিক আলোচনা করা চলে। সে সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনাও করা হয়েছে।

জয়তীর্থ : সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে ঢুণ্ঢো রঘুনাথ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন পদ্মনাভতীর্থ এবং অক্ষোভ্য তীর্থের শিষ্য। স্মৃত্যর্থসাগরে নৃসিংহ কর্তৃক

উল্লিখিত তিনি ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেছেন। আনন্দতীর্থের বহুগ্রন্থের সমীচীন টীকা এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছেন। গ্রন্থগুলো হচ্ছে—১। আনন্দতীর্থের ঈশ্বাবাস্যোপনিষদ্-ভাষ্যের টীকা, ২। আনন্দতীর্থের ঋগ্বেদ ভাষ্যের টীকা, ৩। আনন্দতীর্থের কথালক্ষণ'এর টীকা, ৪। আনন্দতীর্থের কর্ম-নির্ণয়'এর টীকা, ৫। গ্রন্থমালিকাস্তোত্র (?), ৬। আনন্দতীর্থের উপাধিখণ্ডনগ্রন্থের তত্ত্বপ্রকাশিকাবিবরণ নামক টীকা, ৭। আনন্দতীর্থের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের তত্ত্বপ্রকাশিকা নামক টীকা, ৮। তত্ত্ববিবরণ, ৯। আনন্দতীর্থের তত্ত্ববিবেক গ্রন্থের টীকা, ১০। আনন্দতীর্থের তত্ত্বসংখ্যানগ্রন্থের টীকা, ১১। আনন্দতীর্থের তত্ত্বোদ্যোত গ্রন্থের টীকা, ১২। আনন্দতীর্থের ব্রহ্মসূত্রানুব্যাখ্যান নামক টীকার উপর ন্যায়সুধা নাম্নী টীকা ১৩। অনুব্যাখ্যাননায়বিবরণের পঞ্জিকা নামক টীকা, ১৪। আনন্দ-তীর্থের প্রমাণলক্ষণের উপরে ন্যায়কল্পলতা নামক টীকা, ১৫। পদ্যমালা বা পূজাপথ্যমালা, ১৬। আনন্দতীর্থের প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানমণ্ডন গ্রন্থের টীকা, ১৭। প্রমাণপদ্ধতি, ১৮। আনন্দতীর্থের ভগবদ্গীতাভাষ্যের টীকা-প্রমেয়দীপিকা ১৯। আনন্দতীর্থের ভগবদ্গীতা-তাৎপর্যনির্ণয় গ্রন্থের টীকা-ন্যায়দীপিকা, ২০। আনন্দতীর্থের প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যটীকা, ২১। আনন্দতীর্থের মায়াবাদখণ্ডন গ্রন্থের টীকা, ২২। আনন্দতীর্থের বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয় গ্রন্থের টীকা, ২৩। বেদান্তবাদাবলী এবং ২৪। ষট্‌পঞ্চাশিকা। আচার্য শঙ্কর এবং রামানুজ-উভয়ের ধারার বিরোধিতা-মূলক আনন্দতীর্থের বৈদান্তিক মতবাদ বাংলাদেশে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে।

জয়ন্তভট্ট: ইনি ভারদ্বাজ নামে প্রসিদ্ধ পিতার পুত্র। ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে 'জয়ন্তী' নামে কাব্যপ্রকাশের টীকা প্রণয়ন করেছেন। এঁর পৈত্রিক পরিচিতি 'ভারদ্বাজ' শব্দপেয়ে অনেকে তাঁকে ন্যায়বার্তিককার ভারদ্বাজ উদ্যোতকরের সহিত অভিন্ন মনে করে অনেক বিভ্রান্তিকর কথা লিখেছেন। মনে রাখা দরকার উদয়নাচার্যেরও গুরু বাচস্পতি মিশ্র (দার্শনিক) বার্তিকের টীকা করেছেন। সুতরাং ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের শেষ দশকের জয়ন্তভট্টকে পৃথক্‌ব্যক্তিরূপে না বুঝলে ক্রমধারা বঝা যাবে না। এ জয়ন্ত ভট্টের অন্য কোন গ্রন্থ নেই।

দেবেন্দ্রসূরি: জৈনগ্রন্থকার। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের 'শব্দানুশাসন' গ্রন্থের লঘুন্যাসবৃত্তি নামক একটি বৃহৎ টীকা প্রণয়ন করেছেন। ইনি একজন বাঙালী শাব্দিক কিনা সঠিক বলা যায় না।

নরসিংহ ভট্ট: ইনি রামেশ্বরের পুত্র এবং মল্লিনাথের পিতা বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁর পৌত্রদ্বয়ের নাম নারায়ণ এবং নরহরি। এঁর গ্রন্থ-

কাব্যপ্রকাশ-টীকা। উল্লিখিত নরহরি ১২৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি নরসিংহভট্টের রচনা ধরা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—এই মল্লিনাথ, বিখ্যাত টীকাকার কোলাচল মল্লিনাথ থেকে ভিন্ন ব্যক্তি।

নরহরি: পরবর্তীকালে সরস্বতী তীর্থ। এঁর গ্রন্থ পাওয়া যায় দু'খানা—কাব্যপ্রকাশটীকা এবং মেঘদূত টীকা। নরসিংহ ভট্টের পুত্র মল্লিনাথের পুত্র তিনি।

নরহরিতীর্থ: পূর্বের নাম—রাম শাস্ত্রী। ইনি আনন্দতীর্থের শিষ্য এবং পদ্মনাভতীর্থের উত্তরাধিকারী। এঁর কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কেবল এঁর মৃত্যুর খৃষ্টাব্দ ১২৪২ নির্দ্ধারিত থাকায় ঐতিহাসিক প্রয়োজনে লিখিত। আনন্দতীর্থ এবং তাঁর শিষ্য জয়তীর্থের কালনির্ণয়ে নরহরিতীর্থের মৃত্যুর সময় সহায়ক।

মাণিক্যচন্দ্র সূরি: জৈন গ্রন্থকার। এঁর গ্রন্থ দু'খানা-কাব্যপ্রকাশের 'সঙ্কেত' নামক টীকা এবং 'পার্শ্বনাথরচিত' কাব্য। দ্বিতীয় খানা ১২২০ খৃষ্টাব্দে প্রণীত।

ভাসর্বজ্ঞ: বিশিষ্ট নৈয়ায়িক। এঁর আবির্ভাব কাল নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। তবে, বহুপূর্বেই যে তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। ১২৫২ খৃষ্টাব্দে শারঙ্গভট্টের পুত্র রাঘব ভট্ট' এঁর গ্রন্থের টীকা করেছেন বিধায়, অগত্যা, তাঁর পূর্বে এঁর কথা অবশ্য বক্তব্য হয়ে পড়ে। এঁর গ্রন্থ দু'খানা-ন্যায়সার এবং ন্যায়ভূষণ। ন্যায়সার গ্রন্থখানার ৩টী টীকাও পাওয়া যায়। উক্ত রাঘবভট্ট 'ন্যায়-সারবিচার' নামক টীকা ১২৫২ খৃষ্টাব্দে প্রণয়ন করেছেন। অপর একটি টীকার প্রণেতা—বিজয়হংসগণি। আর একটি টীকা পাওয়া গিয়েছে জয়সিংহ সূরি-প্রণীত। জয়সিংহসূরি এবং বিজয়হংসগণি একব্যক্তি কিনা—নির্ণয় করার সুযোগ নেই।

রেণুক আচার্য: সোমেশ্বর দীক্ষিতের পৌত্র, মহেশের পুত্র, উক্ত গ্রন্থকার 'পারস্কর গহ্যকারিকা' নামক প্রামাণিক গ্রন্থখানা ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রণয়ন করেছেন। ভাস্কর, দেবভদ্র, রঘুনন্দন, কমলাকর প্রভৃতি স্মার্ত মহারথীগণ রেণুকাচার্যের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। বাংলায় স্মার্ত নিবন্ধের উপজীব্য হিসাবে তাঁর গ্রন্থের প্রসার এদেশে অবশ্যই ছিল।

বিদ্যাধর: এঁর 'একাবলী' অলঙ্কারশাস্ত্রীয়, কেলিরহস্য কাব্য এবং রতিরহস্য কামশাস্ত্র। কোলাচল মল্লীনাথ, উক্ত একাবলী'র তরলা নামকটীকা করেছেন।

কোলাচল মল্লিনাথও উত্তরবঙ্গের অধিবাসী হয়েছিলেন? তাঁর টীকাই যথেষ্ট প্রমাণ যে গ্রন্থখানা এদেশে আদৃত ছিল। কোন অপ্রসিদ্ধ বা অপ্রচলিত গ্রন্থের টীকা তিনি করেন নি।

বিদ্যানাথ: এঁর সাহিত্যতত্ত্বশাস্ত্রের গ্রন্থ 'প্রতাপরুদ্র যশোভূষণ এবং নাট্য-সাহিত্য---প্রতাপরুদ্রকল্যাণ। মল্লিনাথের (কোলাচল) পুত্র কুমারস্বামী, প্রথম গ্রন্থখানার 'রত্নার্প'ণা নামক টীকা করেছেন।

সোমেশ্বরদেব: ইনি একজন বিখ্যাত প্রশস্তিকার। আবু পর্বতে উৎকীর্ণ সোমেশ্বরদেব প্রণীত প্রশস্তি খৃ: ১২৩০-৫২ মধ্যের বলে স্বীকৃত। এঁর পাঁচখানা গ্রন্থই প্রসিদ্ধ-১। কাব্যপ্রকাশ টীকা, ২। কাব্যাদর্শ (দণ্ডীর কাব্যাদর্শের তুলনায় অনেক কম প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত), ৩। কীর্তিকৌমুদী (মন্ত্রী বাস্তপালের ঐতিহাসিক জীবনী, অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ), ৪। রামশতক, এবং ৫। সুরথোৎসব, কাব্য। এগ্রন্থগুলো বাংলাদেশে সর্বত্র পণ্ডিত সমাজে বহুধা আলোচিত।

সোমচন্দ্রগণি: তিনি বোধহয়, সোমপণ্ডিত নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন, কারণ B.3 সংখ্যক পাণ্ডুলিপি গ্রন্থে উল্লিখিত দু'টি নাম-ই পাওয়া যায়। এঁর গ্রন্থ কেদার-ভট্টের বৃত্তরত্নাকরের টীকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৃত্তরত্নাকর গ্রন্থখানাও এদেশে বহুল প্রচলিত ছিল। গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী প্রচারিত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত কেদার-ভট্টের বৃত্তরত্নাকর, কালিদাসের শ্রুতবোধ' ক্ষেমেন্দ্রের 'সুবৃত্ততিলক', হেমচন্দ্রসূরির 'ছন্দোহনুশাসন' প্রভৃতি পূর্ববর্তী ছন্দোগ্রন্থের তুলনায় অতিরিক্ত মর্যাদা পেয়েছে বৃত্তরত্নাকর। এঁর মধ্যে ১৩৬ প্রকার সংস্কৃত ছন্দের বিবরণ আছে। ছন্দঃশাস্ত্রে বাঙালী পণ্ডিতদের অবদানই বেশী। মহাকবি কালিদাস না হলেও হেমচন্দ্র সূরি, কেদারভট্ট, এবং গঙ্গাদাস—সবাই বাঙালী ছন্দশাস্ত্রকার। সোমচন্দ্রগণির টীকা ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রণীত।

দিঙনাগ ও ধীরনাগ: এঁদের উভয়ের কর্তৃত্বাধীন 'কন্দমালা' নামক একখানা নাট্যসাহিত্য প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়।

সুভট: এঁর দূতাঙ্গদ নামক ছায়ানাটক, এ ধারার গ্রন্থের মধ্যে প্রথম। বুঝা কঠিন যে, তৎকালে (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে) কি প্রকার ছায়া-সম্পাতে নাটকখানা মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা ছিল। বাংলাদেশে এ নাটকখানার ব্যবহার ছিল কিনা নিশ্চিত বলা যায় না।

জয়সিংহ: এঁর হম্মীরমর্দন নাটকখানা ঐতিহাসিক পটভূমিকায় প্রণীত এবং তা' সর্বত্রই আলোচিত হয়েছে।

হস্তিমল্ল: এঁর বিক্রান্তকৌরক এবং মৈথিলীকল্যাণ নামক নাটকদ্বয় উল্লেখযোগ্য নাট্যসাহিত্য।

শার্ঙ্গদেব: কাশ্মীরী সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ। এঁর 'সঙ্গীতরত্নাকর' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এঁর পিতার নাম সোঠল এবং পিতামহের নাম ভাস্কর।

মঙ্খ: ইনি কাশ্মীরী। তথাপি তাঁর অলঙ্কার সর্বস্ব, শ্রীকণ্ঠচরিত এবং মঙ্খকোষ নামক গ্রন্থত্রয় সুপরিচিত এবং বহু অনুশীলিত বটে। কাশ্মীর রাজ জয়সিংহের (১২২৯--১২৫০খৃ:) সমসাময়িক।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী

মেরুতুঙ্গ: একজন জৈন ভিষক্ এবং গ্রন্থকার। এঁর দু'খানা গ্রন্থই প্রসিদ্ধ—১। প্রবন্ধচিন্তামণি এবং ২। সুশ্রুতের কঙ্কালাধ্যায়ের বার্তিক। উভয় গ্রন্থই ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে সমাপিত। অপর, কঙ্কালী নামক এক প্রাচীন গ্রন্থকারের 'রসকঙ্কালি' নামক গ্রন্থের উপরে 'বার্তিক' তাঁর বলেও মত পাওয়া যায়।

চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর: ইনি মিথিলার মন্ত্রী বীরেশ্বর ঠক্কুরের পুত্র। তিনি নিজেও মিথিলারাজ হরসিংহ দেবের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর অনেক গ্রন্থে পূর্ববর্তী কল্পদ্রুম, কামধেনু, পারিজাত, প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থগুলোর এবং হলায়ুধের নাম উল্লিখিত হয়েছে। অপরদিকে স্মার্তরঘুনন্দন ভট্টাচার্য, কমলাকর, অনন্তদেব, কেশব এবং নীলকণ্ঠ, স্মার্তগ্রন্থকার-রূপে চণ্ডেশ্বর এবং তাঁর গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থাবলীরূপে এঁর গ্রন্থ 'স্মৃতি-রত্নাকর' নামে অভিহিত হলেও পৃথক্‌ভাবে গ্রন্থগুলো হচ্ছে—১। ক্রিয়ারত্নাকর, ২। গৃহস্থরত্নাকর, ৩। দানরত্নাকর (১৩১৪ খৃষ্টাব্দে প্রণীত), ৪। নীতিরত্নাকর, ৫। পূজারত্নাকর, ৬। বিবাদরত্নাকর (এ গ্রন্থখানাও ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে প্রণীত), ৭। ব্যবহার রত্নাকর, ৮। শুদ্ধিরত্নাকর; ৯। আধিবিধি, ১০। দাসবিমোক্ষবিধি, এবং ১১। স্বামিপাল বিবাদতরঙ্গ। সবক'খানা গ্রন্থই যদিও উল্লেখযোগ্য, তথাপি, আইন এবং মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিবাদরত্নাকর এবং ব্যবহাররত্নাকর অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ এবং উপাদেয় গ্রন্থ। তিনি ছিলেন পদাবলীকার বিদ্যাপতির খুল্ল পিতামহ।

বর্দ্ধমানোপাধ্যায়: ইনি পূর্বোল্লিখিত গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র এবং ছাত্র। এঁর গ্রন্থের প্রসঙ্গে নব্যন্যায় সম্প্রদায়ের যাবতীয় গ্রন্থকারই এঁকে 'মহামহোপাধ্যায় চরণা:' বলে সসম্মান আখ্যায়িত করায়, বুঝা যায় 'উপাধ্যায়' সাংস্কারিক উপাধি। এঁর পিতার প্রসঙ্গেও মিথিলার পঞ্জীতে (কুলপঞ্জী) 'মহামহোপাধ্যায় তত্ত্বচিন্তামণি-কারক পরমগুরু গঙ্গেশ্বর' বলে মহামান্য উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব, পাণ্ডিত্যে পিতা-পুত্র উভয়েই তৎকালীন সর্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনিও বহু গ্রন্থের প্রণেতা। গ্রন্থগুলো হচ্ছে—১। অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ, ২। ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশ, ৩। ন্যায়পরিশিষ্ট প্রকাশ, ৪। কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ, ৫। কিরণাবলী প্রকাশ, ৬। ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ, ৭। খণ্ডনপ্রকাশ, ৮। বৌদ্ধাধিকারপ্রকাশ, ৯। তর্কপ্রকাশ, ১০। স্মৃতিপরিভাষা, ১১। শ্রাদ্ধপ্রদীপ, ১২। আচারপ্রদীপ প্রভৃতি।

তিনি কেবল একজন মহানৈয়ায়িকই ছিলেন না, মহাস্মার্তও বটে। গৌরীনাথ শাস্ত্রীর মতে তাঁর কাল ১২২৫ খৃঃ এর আশপাশ।

মোক্ষাদিত্য-ব্যাসঃ এঁর মাত্র 'ভীমবিক্রম' নামক একখানা ব্যায়োগ, ১৩২৯ খৃষ্টাব্দে প্রণীত, যাদ্বারা গ্রন্থকার হিসাবে মোক্ষাদিত্যব্যাস প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন।

রামকৃত দৈবজ্ঞ: পিতার নাম নৃসিংহ দৈবজ্ঞ। এঁর তিনখানা গ্রন্থই জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। যথা—নলিকাবন্ধপদ্ধতি, তাজিককৌস্তুভ এবং লীলাবতী-বৃত্তি গণিতামৃতলহরী। সবক'খানা-ই বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। তাজিক কৌস্তুভ বিবৃতি গ্রন্থ হলেও যথেষ্ট সহায়ক গ্রন্থ। তা' ছাড়া, ভাস্করাচার্যের লীলাবতী গ্রন্থের বিবৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। এঁর গণিতামৃতলহরী ১৩ ৯ খৃষ্টাব্দে প্রণীত। ইনি একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ-গ্রন্থকার।

ব দিরাজতীর্থ: এঁর দুখানা কাব্য গ্রন্থ ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই প্রণীত হয়েছিল। দু'খানা গ্রন্থই কাব্য। তীর্থপ্রবন্ধ এবং রুক্মিণীশবিজয়—প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

ব্যাসতীর্থঃ ব্যাসযতি' এবং ব্যাসরাজ নামেও ইনি খ্যাত। এঁর প্রতিষ্ঠিত মঠের বা আশ্রমের নাম ব্যাসরাজমঠ। এঁর গুরুর নাম ব্রাহ্মণ্যতীর্থ। ব্যাসযতি ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেছেন। এঁর গ্রন্থপ্রণয়নের সাহায্যে ধারণা করা যায় যে, ইনি জয়তীর্থ-আনন্দতীর্থের উপরে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গ্রন্থগুলো হচ্ছে—১। অনু-জয়তীর্থবিজয়, ২। তর্কতাণ্ডব, ৩। ভেদোজ্জীবন এবং ৪। ন্যায়ামৃত। এ ছাড়া বহু টীকা গ্রন্থ যেমন, আনন্দতীর্থের কাঠকোপনিষদ্‌ভাষ্যের টীকা, আনন্দতীর্থের কেনোপনিষদ্ ভাষ্যের টীকা, আনন্দতীর্থের ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ভাষ্যের টীকা, আনন্দতীর্থের তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ভাষ্যের টীকা, আনন্দতীর্থের বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্যের টীকা, আনন্দতীর্থের মাণ্ডুক্যোপনিষদ্‌ভাষ্যের টীকা, আনন্দতীর্থের মুণ্ডকো-পনিষদ্‌ভাষ্যের টীকা, আনন্দতীর্থের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের জয়তীর্থকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা নামক টীকার তাৎপর্যচন্দ্রিকা নামক উপটীকা। স্বপ্রণীত ন্যায়ামৃত গ্রন্থের কণ্টকো-দ্ধার নামক টীকা, জয়তীর্থের প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডনবিবরণ'এর ভাবপ্রকাশিকা নামে টীকা, এবং জয়তীর্থকৃত অন্যান্য টীকাগুলোর উপটীকাবলী মন্দারমঞ্জরী।

রাজশেখর মলধারিগচ্ছমণ্ডনঃ ইনি ছিলেন সুধাকলসের গুরু। তিনি মাত্র 'প্রবন্ধ কোশ' নামক একখানা উপাদেয় গ্রন্থ লিখেছেন। কাল নির্ণয়ে অব্যবহিত পরবর্তী সুধাকলস-এর কাল দ্রষ্টব্য।

সুধাকলস: ইনি কাশ্মীরী পণ্ডিত এবং সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ। রাজশেখর মলধারি গচ্ছমগুনের শিষ্য আলোচ্য গ্রন্থকার তিনখানা গ্রন্থ-প্রণয়ন করেছেন। ১। একাক্ষর নামমালা, ২। সঙ্গীতোপনিষৎ (১৩২৪ খৃঃ) এবং ৩। সঙ্গীতোপনিষৎ সার (১৩৫০ খৃষ্টাব্দে প্রণীত)। এ সব গ্রন্থই আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত ছিল।

প্রেমনিধি: ইনি ইন্দ্রপতির পুত্র মৈথিল। ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে ধর্মাধর্মপ্রবোধিনী নামক একখানা বিচারমূলক স্মৃতিনিবন্ধ প্রণয়ন করেছিলেন। পুরা নামটি, মনে হয়, প্রেম-নিধি ঠক্কুর।

নারায়ণ: পূর্বোল্লিখিত নৃসিংহ দৈবজ্ঞের পুত্র। ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে গণিতপাটী-কৌমুদী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং এ গ্রন্থ আমাদের দেশে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

ধর্মগুপ্ত: এর পিতার নাম রামদাস। ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে 'রামাঙ্ক নাটিকা' প্রণয়ন করেছেন।

চিন্নভট্ট: ইনি বিষ্ণুদেবারাধ্যের পুত্র এবং সর্বজ্ঞের অনুজ। রাজা হরিহরের অধীনে গ্রন্থ রচনা করেছেন। হরিহরের কাল চতুর্দশ শতক খৃষ্টীয়াব্দের শেষপাদ। গ্রন্থগুলো ন্যায়দর্শনের অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। গ্রন্থত্রয় হচ্ছে—তর্কভাষাপ্রকাশিকা, নিরুক্তিবিবরণ, এবং চিন্নভট্টিয়-ন্যায়।

গুণাকর সুরি: ইনি বিষ্ণুচন্দ্র সূরির শিষ্য ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে ভক্তামরস্তোত্রের টীকা প্রণনয় করেছেন। বৃহত্তর গ্রন্থখানা হল —ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়'এর টীকা।

মিসরূমিশ্র: চন্দ্রসিংহের পত্নী-লক্ষ্মী বা লছিমাদেবীর নির্দেশে 'পদার্থচন্দ্রিকা' এবং 'বিবাদচন্দ্র' নামক দু'খানা গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছেন। চন্দ্রসিংহ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের শেষ পাদে সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন।

চন্দ্রশেখর: পণ্ডিত নারায়ণের পৌত্র এবং সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের পিতা। এঁর 'ভাষার্ণব' গ্রন্থখানায় তৎকালে প্রচলিত বহু ভাষার বিবরণ রয়েছে। অপর গ্রন্থখানার নাম—পুষ্পমালা নাটক। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তাঁর ভাষার্ণব গ্রন্থখানা পাওয়া যাচ্ছে না।

চণ্ডীদাস: উল্লিখিত চন্দ্রশেখরের অনুজ এবং সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের খুল্ল-তাত। তিনি নিজেই লিখেছেন যে তাঁর বন্ধু লক্ষ্মণভট্টের অনুরোধে 'বাক্যপ্রকাশ'-এর

এক টীকা প্রণয়ন করেছেন। অপর গ্রন্থ—ধ্বনিসিদ্ধান্তসংগ্রহ। গোবিন্দ প্রণীত কাব্য-প্রদীপে এবং বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে।

বিশ্বনাথ কবিরাজ: চতুর্দশ খৃষ্টীয় শতকের গ্রন্থকারদের মধ্যে বিশ্বনাথ কবিরাজ অনন্য। তাঁর সাহিত্যদর্পণ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলাদেশে তথা অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশেও দণ্ডীর কাব্যাদর্শ এবং মম্মটের কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থের প্রভাব অনেকাংশে খর্ব হয়েছে। বিশ্বনাথ তাঁর পিতার নাম—চন্দ্রশেখর, এবং প্রপিতামহের নাম নারায়ণ দাস উল্লেখ করেছেন। পিতৃব্য চণ্ডীদাসের উক্তিরও উদ্ধৃতি আছে সাহিত্যদর্পণে। বিশ্বনাথের গ্রন্থ, বোধহয় ৭ খানা। ১। কুবলয়াশ্বচরিত, ২। চন্দ্রকলা, ৩। প্রভাবতীপরিণয়, ৪। প্রশস্তিরত্নাবলী (এ গ্রন্থে তিনি ১৬টি ভাষা ব্যবহার করেছেন), ৫। রাঘববিলাস, ৬। সৌগন্ধিকাহরণ এবং ৭। সাহিত্যদর্পণ।

কাব্যানুশাসন বিষয়ের অনেক ক'খানা বইর উল্লেখ করা হয়েছে। সেসব কাব্যাদর্শ, কাব্যপ্রকাশ এবং সাহিত্যদর্পণের মত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। কাব্যপ্রকাশের মর্যাদা যদিও সর্বোপরি তথাপি ছাত্রসমাজে সাহিত্যর্পণ বেশী প্রচলিত। সাহিত্য-দর্পণে বিশ্বনাথ আত্মপরিচয় দিয়েছেন সংক্ষেপে—'মহাকবি শ্রীচন্দ্রশেখরের পুত্র শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ কৃত প্রবন্ধ সাহিত্যদর্পণ[১] - - -'। উল্লিখিত সাতখানার অতিরিক্ত কাব্যপ্রকাশ-দর্পণ নামক তাঁর একটি টীকাও আবিষ্কৃত হয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজের পরিচিতি প্রায় সম্পূর্ণ করার উপাদান দিয়েছে। সেখানে লিখিত হয়েছে---'কলিঙ্গ ভূমণ্ডলের মহারাজাধিরাজ শ্রীনরসিংহদেবের সভায় ধর্মদত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করে সকল সহৃদয় গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান কবিপণ্ডিত আমার পিতামহ শ্রীমৎ নারায়ণদাসপাদ যা' বলেছিলেন,[২] - - -। এই টীকার ১০ম উল্লাসের সমাপনী পুষ্পিকায় স্বীয় রাজকীয় পদ-প্রতিষ্ঠার কথাও লিখে রেখেছেন তিনি— শ্রীমৎ-নারায়ণের চরণারবিন্দে মধুকরের ন্যায় অনুরাগী, আলঙ্কারিক-চক্রবর্ত্তী, ধ্বনিপ্রস্থানে পরম আচার্য, অষ্টাদশ ভাষায় পারদর্শী, সঙ্গীত বিদ্যায় বিদ্যাধরতুল্য, কলাবিদ্যায় মালতী-মধুকররূপী বিবিধ বিদ্যার পারাবারে কর্ণধার স্বরূপ, সান্ধিবিগ্রহক মহাপাত্র (প্রধানমন্ত্রী) শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজকৃত

১ শ্রীচন্দ্রশেখর মহাকবিচন্দ্র সূনু
শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজকৃতং প্রবন্ধম্।
সাহিত্যদর্পণমমুং সুধিয়ো বিলোক্য...

২ যদাহঃ শ্রীকলিঙ্গ ভূমণ্ডলাখণ্ডল মহারাজাধিরাজ শ্রীনরসিংহদেব সভায়াং ধর্মদত্তং স্থগয়ন্তঃ সকলসহৃদয় গোষ্ঠীগরিষ্ঠ কবিপণ্ডিতাস্মৎপিতামহ শ্রীমন্নারায়ণদাসপাদাঃ।

কাব্যপ্রকাশদর্পণে অর্থালঙ্কারনির্ণয় নামক দশম উল্লাস সমাপ্ত হ'ল।[১] কাব্যপ্রকাশের ৫১টি টীকার খবর পেলেও এ টীকাটির খবর পান নি। Theodor Aufrecht কিন্তু সে তথ্য উপস্থাপন করেছেন ঝলকীকার আচার্য বামন স্বকৃত বালবোধিনী টীকার সঙ্গে কাব্যপ্রকাশ-সম্পাদনার প্রস্তাবনায়। কাব্যপ্রকাশের একটি টীকা যে পিতৃব্য চণ্ডীদাস প্রণয়ন করেছেন তাও লিখেছেন বিশ্বনাথ। রসপ্রকরণের 'কুরু রুচিং' পদ-দ্বয়কে একটি পদরূপে বৈপরীত্যে (রুচিঙ্কুরু) ব্যাখ্যানের মাধ্যমে বিশ্বনাথকে উড়িষ্যাদেশীয় বলে অনুমান করা হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়—তিনি সাহিত্যদর্পণের সংস্পর্শে বঙ্গে কেন সারা-ভারতে-ই সুখ্যাত, আর, তাঁর নিম্নলিখিত সমাপনী পুষ্পিকার মধ্যে ব্যবহৃত 'ভুজঙ্গ' পদটি পূর্ব-উল্লিখিত বালবলভীভুজঙ্গ খেতাবটির সহিত মিলিয়ে দেখলে বোধ হয়, উভয়ত্র পরিষ্কার ধারণা হতে পারে।

রুদ্র সূরি: তিনি একজন জৈন বৈয়াকরণিক। ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দে, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর 'শব্দচিন্তামণি' নামে একটি সমীচীন টীকা করেছেন। বাংলাদেশে পাণিনিব্যাকরণও চিরকালই, অন্যান্য ব্যাকরণের পাশাপাশি অনুশীলিত হয়ে আসছে। রুদ্রসূরির টীকাটি দুরূহ পাণিনির অধ্যয়নে অনেক সহায়তা করেছে বলেই মনে হয়।

বিদ্যানিধিতীর্থ: এঁর পূর্বনাম কৃষ্ণাচার্য, ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেছেন। মধ্বসম্প্রদায়ের একজন উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক এবং গুরু ছিলেন তিনি।

দিনকর মিশ্র: ধর্মাঙ্গদের পুত্র তিনি ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ নামক মহাকাব্যের 'সুবোধিনী' টীকা এবং শিশুপালবধ মহাকাব্যের একটি টীকা প্রণয়ন করেছেন।

ভানুদত্ত: ইনি একজন মৈথিল সাহিত্যিক। এঁর পিতার নাম গণপতিনাথ। যে চারখানা সাহিত্য তিনি লিখেছেন সব ক'খানাই উপাদেয় গ্রন্থ এবং এদেশে তার নাম আছে। গ্রন্থ হচ্ছে—

১। অলঙ্কারতিলক, ২। রসতরঙ্গিণী, ৩। রসমঞ্জরী এবং ৪। শৃঙ্গারদীপিকা। অলঙ্কারতিলক গ্রন্থের তেমন জৈলুস্ টের পাওয়া যায় নি কিন্তু রসতরঙ্গিণী বহুল আলোচিত গ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত। এঁর বারটারও বেশী টীকার মধ্যে অনেক বাঙালী টীকাকার রয়েছেন।

১. শ্রীমন্নারায়ণ চরণারবিন্দ মধুকরালঙ্কারিকচক্রবর্তি ধ্বনিপ্রস্থানপরমাচার্যাষ্টাদশভাষাবিলাসিনী-ভুজঙ্গ সঙ্গীতবিদ্যাবিদ্যাধর কলাবিদ্যামালতী-মধুকর বিবিধবিদ্যার্ণব কর্ণধার সান্ধিবিগ্রহিক মহাপাত্রশ্রীবিশ্বনাথকবিরাজকৃতৌ কাব্যপ্রকাশদর্পণে অর্থালঙ্কারনির্ণয়োনাম দশম উল্লাসঃ।

সিংহভূপাল: ইনি ছিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ। শার্ঙ্গদেব-প্রণীত সঙ্গীতসুধাকর গ্রন্থের সঙ্গীতরত্নাকর নামক বিখ্যাত বিবৃতি সঙ্গীতবিষয়ক এক আকড় গ্রন্থরূপেই সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষপাদে উক্ত গ্রন্থের প্রণয়ন সম্পন্ন করেছিলেন। সে গ্রন্থের অনুসরণ এদেশেও প্রচুর হয়েছে।

শার্ঙ্গধর: গ্রন্থসূত্রেই এঁর পারিবারিক পরিচিতি পাওয়া যায়—ইনি রাঘবদেবের পৌত্র এবং দামোদরের পুত্র। লক্ষ্মীধর এবং কৃষ্ণ ছিলেন দুই অনুজ সহোদর। এঁর শার্ঙ্গধরপদ্ধতি ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থরূপে খুবই গুরুত্ববহ। অপর গ্রন্থ—শার্ঙ্গধর সংহিতা আয়ুর্বৈদিক গ্রন্থ। শার্ঙ্গধরসংহিতার বহু টীকা প্রণীত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি টীকার প্রণেতা বোপদেব। মুগ্ধবোধব্যাকরণের প্রণেতা বোপদেবও ভিষগ্বর কেশবের পুত্র এবং নিজেও আয়ুর্বেদনিষ্ণাত ছিলেন। সুতরাং মুগ্ধবোধকার এবং এই টীকাকার অভিন্ন ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব। তা হলে শার্ঙ্গধরের কাল আরো বহু পূর্বেই ধর্তব্য।

অনুভূতি স্বরূপাচার্য: এঁর প্রসঙ্গে, সরস্বতীসূত্র বা সারস্বত সূত্রের উৎপত্তি বিষয়ক বিশ্বাস স্মর্তব্য। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীকে বিদ্যার তথা ভাষার সহিত অভেদোপচারে গ্রহণ করার চিরন্তনী শাস্ত্রোক্তি-রীতি-প্রতীতি অনুসারেই দেবভাষা বলে কথিত সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণের সাথেও দৈবীশক্তির সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। কলাপ ব্যাকরণের 'কলাপ' শব্দটির জন্য চলতি প্রবাদটি হচ্ছে দেবাদিদেব শঙ্কর প্রথমে কলাপের সূত্রগুলো বলেছিলেন, তা' শ্রবণ করে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় ময়ূরের পালকের (কলাপে) সাহায্যে তা' প্রথম লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[১] তাই ব্যাকরণের নাম হল কলাপ। এ ক্ষেত্রেও স্বয়ং বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীই সরস্বতীসূত্র বা সারস্বতসূত্র রচনা করেছিলেন, তাই ব্যাকরণটির নাম হল—সারস্বত ব্যাকরণ। মূল সারস্বতসূত্রের উপরে রামচন্দ্রশর্মকৃত সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা-টীকা এবং তার উপরে রচিত লোকেশশঙ্করের তত্ত্বদীপিকা নামক উপটীকা অবলম্বনে সারস্বতচন্দ্রিকা নামক এক বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, মনিনন্দের উপটীকা এবং মথুরানাথের উপটীকার মাধ্যমে অনুমেয় অন্যকোন সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা নামক সারস্বতসূত্রের টীকা-বৃত্তির মৌলিকতা ধরে অপর এক সারস্বত চন্দ্রিকার বৈয়াকরণিক সম্প্রদায়েরও উদ্ভব ঘটেছে। এই উভয় সম্প্রদায় বাদে অনুভূতি স্বরূপাচার্যকৃত সারস্বতসূত্রের অতিচমৎকার বিচার-বিশ্লেষণ-বিন্যাস-উদাহরণ

১. শঙ্করস্য মুখাদ্বাণীঃ শ্রুত্বা চৈব ষড়াননঃ।
লিলেখ শিখিনঃ পুচ্ছে কলাপ ইতি কথ্যতে॥ কলাপচন্দ্র॥

প্রত্যুদাহরণ প্রভৃতির উপর 'সারস্বতপ্রক্রিয়া' নামক এক বিবাট বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। অনুভূতিস্বরূপাচার্যের সারস্বতপ্রক্রিয়া বা সারস্বতী প্রক্রিয়া নামক বৃত্তির উপরে যে কত টীকা টিপ্পনী তৈরি হয়েছে তা' ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। বহু স্থানে ইহার অন্তত ২৬ প্রকার টীকার-ভাষ্যেব সংরক্ষণ এবং তালিকা রয়েছে। টীকাকারদের মধ্যে কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিত আছে। সারস্বতী প্রক্রিয়া বাংলাদেশেও বহুল প্রচারিত অন্যতম ব্যাকরণ। পরিভাষার জটিলতা কম থাকায় এবং সূত্রগুলো সহজবোধ্য হওয়ায় উক্ত তিন শ্রেণীতেই সারস্বত ব্যাকরণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। টীকাকারদের মধ্যে একজনের নাম ক্ষেমেন্দ্র। ক্ষেমেন্দ্র নামেও অনেক গ্রন্থকার পাওয়া যায়। তাই, তিনি, খৃষ্টীয় একাদশ শতকের বিখ্যাত ক্ষেমেন্দ্র-ব্যাসদাস থেকে ভিন্ন ব্যক্তি বলেই মনে হয়।

পদ্মনাভদত্ত : এর পিতার নাম দামোদর দত্ত এবং পিতামহের নাম শ্রীদত্ত। নতুন পরিভাষা সহকারে এক সংস্কৃত ব্যাকরণ-রচনা-ই-এঁর বিশেষ কীর্তি। ইনি একজন বাঙালী ভিষক্‌। পূর্বোল্লিখিত খ্যাতনামা বাঙালী ভিষক্‌-গ্রন্থকার--চক্রপাণিদত্তের বংশধর বলে জানা যায়। ভূরিপ্রয়োগ নামক অভিধান, সুপদ্মব্যাকরণ, উণাদিবৃত্তি, ধাতুপাঠ, পরিভাষা এবং পৃথ্বীধরের ভুবনেশ্বরীস্তোত্রের সিদ্ধান্ত সরস্বতী-টীকা এঁর গ্রন্থ। নিশামিশ্র, বিষ্ণুমিশ্র, কাশীশ্বর, রূপনারায়ণ সেন এবং রামভদ্র নামক টীকাকারদেব বিভিন্ন টীকার অবলম্বনে সুপদ্ম ব্যাকরণও একটি বৈয়াকরণ সম্প্রদায় গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। বলা বাহুল্য যে মূল গ্রন্থকার এবং টীকা-টিপ্পনীর মাধ্যমে তাব বিস্তারকারক সকলেই বাঙালী। এসব প্রচীন স্বাধীন উপজীবিকা-নির্ভর জ্ঞানসাধকদের মহনীয় ঐতিহ্যের দিকে এখনও যদি আত্মজিজ্ঞাসু হয়ে বাঙালীরা তাকায় তা'হলে কুহেলীময় বিদেশীকায়দায় শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্কীর্ণপথে এতদিন বসে যে হীনমন্যতা (?) বহু ক্ষেত্রে আবর্জনার ন্যায় জমেছে তা' অপসারণে এবং গৌরবেব আত্মপ্রত্যয়ে একনিষ্ঠ হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখর : ধীরেশ্বরেব পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র, কবিশেখর জ্যোতিরীশ্বর, কর্ণাটের রাজা নরসিংহের অনুরোধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর ধূর্তসমাগম নামক প্রহসন, এইশ্রেণীর সাহিত্যে একটি অনন্য যোজনা। অপর গ্রন্থ—'পঞ্চসায়ক'--আদিরসাত্মক খণ্ডকাব্য। তা'ও যথেষ্ট আদৃত গ্রন্থ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে,--গ্রন্থকারকে কর্ণাট দেশীয় দেখে কেহ যেন না ভাবেন যে, তাঁদের সহিত এদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কি করে থাকে? পরবর্তীকালে আমরা

যে মহাবৈষ্ণব গ্রন্থকার---সনাতন গোস্বামী, রূপগোস্বামী এবং জীবগোস্বামীদিগকে অনন্য সাধারণ ত্যাগী, কৃতী, বৈষ্ণব সাহিত্যকাররূপে নদীয়ায় পেয়েছি, তাঁরা বাঙালী বলেই 'সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্'র আমল থেকে আজপর্যন্ত সবার সশ্রদ্ধ স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁরাও মূলত কর্ণাটী ব্রাহ্মণ। জীবগোস্বামী থেকে ঊর্ধতন সপ্তম পুরুষ-'সর্ব্বজ্ঞ' কর্ণাটের রাজা ছিলেন। এসব ইতিবৃত্ত, উক্ত গোস্বামী মহাশয়দের গ্রন্থসূত্রেই জানা যায়।

সায়ন এবং মাধব : এঁবা দু'জন সহোদর ভ্রাতা। এঁরা বিজয়নগরের রাজা প্রথম হরিহর এবং বুক্কের (১৩৫০-৭৯ খৃষ্টাব্দ) পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তৎপরে সন্ন্যাসী জীবনে দীর্ঘকাল শাস্ত্রাধ্যাপনা, শিষ্যপ্রশিক্ষণ এবং গ্রন্থরচনা কাজে লিপ্ত ছিলেন। সম্প্রদায় গঠনের মধ্যদিয়ে এঁদের শাস্ত্র-সাধনা বহুবিস্তৃত দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এঁদের গ্রন্থকর্তৃত্ব কখনো সায়নের নামের পুষ্পিকায় কখনো বা মাধবের (পরবর্তী-কালে সায়নাচার্য এবং মাধবাচার্য) নামিক পুষ্পিকায় পাওয়া যায়। তাই, অগত্যা এঁদের উভয়ের একত্রিত গ্রন্থকর্তৃত্বমূলক তালিকা-ই নির্বিশেষে চলে আসছে। অথচ, এঁদের গ্রন্থ অনুসারে পৃথক্ করা চলে। মাধবাচার্য পরবর্তীকালে 'বিদ্যারণ্য' বা 'বিদ্যারণ্যস্বামী,' বলেও অভিহিত হয়েছেন। সে নামের পুষ্পিকাও পাওয়া যায়।

সায়ন বা সায়নাচার্য্যের গ্রন্থ : ১। অনুভূতি প্রকাশ অথবা সর্বোপনিষদর্থ-প্রকাশ, ২। অষ্টকটীকা (তৈত্তিরীয়সংহিতার টীকা), ৩। আত্মানাত্মবিবেক, ৪। সামবেদের আর্ষেয়ব্রাহ্মণ-ভাষ্য, ৫। ঋগ্বেদভাষ্য, ৬। ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্য, ৭। ঐতরেয়ারণ্যকভাষ্য, ৮। ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্য, ৯। কাঠকভাষ্য অথবা তৈত্তি-রীয়ব্রাহ্মণভাষ্য, ১০। কৌষিতক্যুপনিষদ্ভাষ্য, ১১। গোভিলগৃহ্যসূত্রভাষ্য, ১২। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য---দীপিকা, ১৩। জীবন্মুক্তিবিবেক, ১৪। তাণ্ড্যব্রাহ্মণভাষ্য ১৫। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণভাষ্য, ১৬। তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্য, ১৭। তৈত্তিরীয়ারণ্যক-ভাষ্য, ১৮। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য, ১৯। ত্র্যম্বকভাষ্য (রুদ্রভাষ্য), ২০। দর্শ-পূর্ণমাস-যজ্ঞতন্ত্র, ২১। দশোপনিষদ্ভাষ্য, ২২। দেবতাধ্যায় (সামব্রাহ্মণ) ভাষ্য, ২৩। পঞ্চদশী (বেদান্ত), ২৪। পঞ্চীকরণ, ২৫। পাণিনীয়শিক্ষাভাষ্য, ২৬। পুরুষসূক্তটীকা, ২৭। বৃহদারণ্যকভাষ্য, ২৮। বৌধায়নশ্রৌতসূত্রব্যাখ্যা, ২৯। মণ্ডলব্রাহ্মণভাষ্য, ৩০। মন্ত্রপ্রশ্নভাষ্য, ৩১। যজ্ঞতন্ত্র সুধানিধি, ৩২। যজ্ঞবৈভবখণ্ড-টীকা, ৩৩। যাজ্ঞিক্যুপনিষদ্ভাষ্য, ৩৪। রাত্রিসূক্তভাষ্য, ৩৫। শতপথব্রাহ্মণভাষ্য, ৩৬। শতরুদ্রীয়ভাষ্য, ৩৭। শ্রীসূক্তভাষ্য, ৩৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্য-প্রকা-শিকা, ৩৯। ষড়্বিংশব্রাহ্মণভাষ্য, ৪০। সরস্বতীসূক্তভাষ্য, ৪১। সর্বদর্শনসংগ্রহ

(বেদান্তদর্শনবাদে ১৫ প্রকার দর্শন বিষয়ক), ৪২। সামব্রাহ্মণভাষ্য, ৪৩। সামবিধানব্রাহ্মণভাষ্য, ৪৪। সামবেদভাষ্য, ৪৫। সিংহানুবাকভাষ্য, এবং ৪৬। স্বরবিগ্রহশিক্ষাভাষ্য।

মাধবাচার্যের গ্রন্থ: (উভয় প্রকারের পুষ্পিকাযুক্ত)

ক ॥ মাধবাচার্য নামাধীন—

১। অদ্ভুত দর্পণ (নাটক), ২। অধিকরণরত্নমালা অথবা জৈমিনীয়ন্যায়মালা, ৩। অভিনব মাধবীয় (ধর্মশাস্ত্র-নিবন্ধ), ৪। আচারমাধবীয় অথবা পরাশরস্মৃতিভাষ্য, ৫। আশ্বলায়নদর্শপূর্ণমাসসূত্রভাষ্য, ৬। উপগ্রন্থসূত্রবৃত্তি, ৭। কর্মকালনির্ণয় অথবা কালনির্ণয়, ৮। কর্মবিপাক (ধর্মশাস্ত্র), ৯। কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ১০। গোত্রপ্রবরনির্ণয়, ১১। জাতিবিবেকশতপ্রশ্ন, ১২। জ্ঞানখণ্ডভাষ্য অথবা জ্ঞানযোগখণ্ডভাষ্য, ১৩। পঞ্চভেদ, ১৪। ধাতুবৃত্তি, ১৫। পঞ্চশরব্যাখ্যা (বেদান্ত), ১৬। পরাশরস্মৃতিব্যাখ্যা (আচারমাধবীয়-পূর্বোল্লিখিত ৪নং গ্রন্থের নামান্তরে) ১৭। ব্রহ্মগীতাটীকা, ১৮। মাধবীয় স্মৃতিনিবন্ধ, ১৯। মাধবীয়ভাষ্য (আনন্দতীর্থকৃতভাষ্যের উপভাষ্য), ২০। মুক্তিখণ্ডটীকা, ২১। মুহূর্তমাধবীয় (জ্যোতিষ), ২২। যোগবাশিষ্ঠসারসংগ্রহ, ২৩। রামতত্ত্ব প্রকাশ (ভক্তি), ২৪। লঘুজাতকটীকা (জ্যোতিষ), ২৫। ব্যবহারমাধব (আইন-স্মৃতি), ২৬। শিবখণ্ডভাষ্য, ২৭। শিবমাহাত্ম্যভাষ্য, ২৮। সূতসংহিতাতাৎপর্যদীপিকা, এবং ২৯। স্বাধ্যায়ব্রাহ্মণভাষ্য।

খ ॥ বিদ্যারণ্য নামের অধীন—

১। ৩০। অপরোক্ষানুভবটীকা, ২। ৩১। আশীর্বাদপদ্ধতি/ব্রহ্মবিদাশীর্বাদপদ্ধতি, ৩। ৩২। কল্পভাষা, ৪। ৩৩। কৃষ্ণচরণপরিচর্যাবিবৃতি, ৫। ৩৪। কৈবল্যো-পনিষদ্দীপিকা, ৬। ৩৫। চরণব্যুহভাষ্য, ৭। ৩৬। তৈত্তিরীয়বিদ্যাপ্রকাশবার্তিক, ৮। ৩৭। তৈত্তিরীয়সন্ধ্যাভাষ্য, ৯। ৩৮। দক্ষিণামূর্ত্যষ্টকটীকা, ১০। ৩৯। দর্শপূর্ণমাসপ্রয়োগ, ১১। ৪০। পুরুষার্থসুধানিধি, ১২। ৪১। প্রমেয়সার সংগ্রহ, ১৩। ৪২। মহাবাক্যনির্ণয়, ১৪। ৪৩। বেদান্তবার্তিকব্যাখ্যা, ১৫। ৪৪। ব্যাসদর্শন-প্রকার, ১৬। ৪৫। সন্ধ্যাভাষ্য, ১৭। ৪৬। সহস্রনামকারিকা, ১৮। ৪৭। স্মৃতিসংগ্রহ, ১৯। ৪৮। শঙ্করাচার্যকৃত 'হরিমীড়ে' স্তুতির টীকা।

কোলাচল মল্লিনাথ এবং তাঁর পুত্র কুমারস্বামী—

কোলাচল মল্লিনাথের অনেক গ্রন্থ। কালিদাসের কুমারসম্ভব, মেঘদূত এবং রঘুবংশের টীকার নাম **সঞ্জীবনী**, শিশুপালবধের টীকা **সর্বঙ্কশা**, নৈষধীয়চরিতের

টীকা জীবাতু, কিরাতার্জ্জুনীয়ের টীকা ঘণ্টাপথ, একাবলীর টীকা তরলা, তার্কিকরক্ষার টীকা নিষ্কণ্টিকা। তা'ছাড়া উদারকাব্য, অমরকোষ, ভট্টকাব্য এবং রঘুবীরচরিত গ্রন্থগুলোরও টীকা করেছেন তিনি।

বিদ্যাপতি :, চণ্ডীদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং চণ্ডেশ্বরঠক্কুরের পৌত্র বিদ্যাপতি, আমাদের কাছে পদাবলীর কর্তারূপেই সমধিক প্রসিদ্ধ। যদিও তাঁর রাধা-কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক পদগুলো মৈথিল ভাষায় প্রণীত তথাপি যেহেতু বাঙালীদের তৎকালীন কথ্যভাষা-ছিল গৌড়ীপ্রাকৃত (পূর্বীপ্রাকৃত) এবং সেই প্রাকৃত ভাষায় এবং মৈথিল ভাষায় বৈসাদৃশ্যের তুলনায় সাদৃশ্যই বেশী, আর উক্ত প্রাকৃত ভাষার বিবর্তনের মধ্যদিয়েই বাংলাভাষার উৎপত্তি হয়েছে, সেহেতু মৈথিল ভাষার মধ্যেও উদীয়মান বাংলার ফুটিফুটি অবস্থার মুকুল-গুচ্ছ চোখে পড়ে। সুদীর্ঘ জীবনে মিথিলারাজ শিবসিংহ, নরসিংহ এবং রাণী বিশ্বাসদেবীর অনুপ্রেরণায় তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যারমধ্যে--- ১। গঙ্গাবাক্যাবলী, ২। দান-বাক্যাবলী, ৩। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, ৪। পুরুষপরীক্ষা, ৫। বর্ষকৃত্য, ৬। বিভাগসার, ৭। ব্যাড়ী-ভক্তিতরঙ্গিণী এবং ৮। কীর্তিলতা--সংস্কৃত-গ্রন্থ। এছাড়া, বিদ্যাপতি-পদাবলী বা কৃষ্ণকীর্তন পদাবলী, বিদ্যাপতির অসামান্য রচনা। বিদ্যাপতি চতুর্দশ খৃষ্টীয় শতকের কিছুকাল পরপর্যন্তও (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কয়েক বছর) বেঁচেছিলেন।

এছাড়াও কৃষ্ণানন্দের সহৃদয়ানন্দ, বামনভট্টবাণের নলাভ্যুদয় প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ গ্রন্থকারের অস্তিত্ব খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে একটানা মুসলিম-শাসনের ফলে বাংলার মনীষিতায় ভাটা পরার কথা অথবা তদন্যথায় অনেক বাংলাগ্রন্থের উৎপত্তির আশাবাদ — কোন ক্রমেই সমর্থন-যোগ্য নয়। বাংলাভাষা ছিল তবে তা' গ্রন্থে গ্রহণ করার উপযোগী বলে গ্রন্থকারদের কাছে তখনও বিবেচিত হয় নি। পূর্বাপর যে ভাষায় সাহিত্য-সাধনা চলে এসেছে সেই দু'টি ভাষায় – সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে, তা'ছাড়া খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীথেকে আরবী, ফারসী ভাষায় গ্রন্থরচনা, সাহিত্যচর্চা, শুধু অক্ষুণ্ণ-ই ছিল না, বরং কালানু-ক্রমিক বিকাশের ধারায় বেড়েই গিয়েছিল। বাংলাভাষায় রচিত তৎকালীন গ্রন্থ না পেয়ে, অনেকে তৎকালীন গ্রন্থকার-পণ্ডিত সমাজের প্রতি যে ভাষাবিদ্বেষের ধূয়া তোলেন তা' একান্ত নিরপেক্ষ চিন্তা-প্রসূত নয়। বঙ্গের জনতার প্রাকৃতিক ভাষা — অর্থাৎ কথ্যভাষার ব্যবহারের এক বিশেষ লব্জথেকেই ধীরে ধীরে বাংলাভাষার উৎপত্তি ঘটেছে, বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচেষ্টার ফলে নয়। বাংলাভাষা তার নিজস্ব

সম্ভার আহরণে সংস্কৃত ভাষাকেই ব্যবহার করে বেশী, পালি-প্রাকৃতকে নয়। পালি-প্রাকৃতের শব্দ বাংলাতে প্রায় ঠাঁই-ই পায় নি। পেয়েছে সংস্কৃত শব্দ যা' তৎসম নামে পরিচিত। তদ্ভবের বিবর্তন প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে এসেছে এই মাত্র। আর, দেশী শব্দগুলো সংস্কৃতও নয়, প্রাকৃতও নয়। সেটা কুক্ষিস্থ করেছে বাংলাভাষা তার নিজস্ব সামর্থ্যে। বিদেশী শব্দগুলোও আত্মস্থ করে নেয়ার যোগ্যতা বাংলা-ভাষার একান্তই নিজস্ব। বাংলাভাষা যে আকারে ও প্রকারে জনসমাজে চালু হয়ে গিয়েছিল তা, সর্বজনবোধ্য-সহজ-সরল ছিল — সন্দেহ নেই। যার জন্য রাজশক্তিও সেটাকে প্রশাসনিক প্রয়োজনে অধিকতর উপযোগী বিবেচনা করেছে এবং তা'ই বাস্তবে দ্রুত বাংলাভাষার বিকাশে সহায়তাও করেছে। সেজন্য তৎকালীন পণ্ডিত সমাজ-উচ্ছিন্ন হয় নি, তা'হলে পরবর্তীকালে যে নবদ্বীপ গৌরব— সর্ববাংলার গৌরব, পঞ্চদশ-ষোড়শ খৃস্টীয় শতকেই, মিথিলার সুচির গুরুগৌরব খর্ব করেছিল তা' কোনক্রমেই সম্ভব হত না। মুসলিম শাসকগণ লক্ষ্যকরে থাকবেন যে, "তিন্তিরি পাতার ঝোল খেয়েও" জ্ঞান-সাধক পণ্ডিতগণ নিভৃতে শাস্ত্রানুশীলনেই নিরত ছিলেন, রাজত্বে হস্তক্ষেপ করেন নি — বিদ্রোহ ঘটাননি। সুতরাং অপরিহার্য ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসা আর্য সনাতনী হিন্দু সমাজ তথা জৈন-বৌদ্ধসমাজ নিজ নিজ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্ভব মত উন্নতি সাধন করেছেন। অচিরাগত মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে স্থান করে নিয়ে তাঁদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটিয়েছেন। আর, যে সব ছোট ছোট ধর্মীয় সামাজিক সম্প্রদায় নতুন চিন্তা-চেতনায় নিরত ছিল তাঁরাও, চলতে পেরেছে--মনে করা চলে।

দীর্ঘ আলোচনায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে পাণিনির কাল (খৃষ্টপূর্ব ৭ম্ শতাব্দী) পর্যন্ত এবং তৎপরে খৃষ্টাব্দের পূর্বপর্যন্ত, আর, তার পরবর্তী শতাব্দীমূলক আলোচনায় খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীপর্যন্ত সাংস্কৃতিক বিকাশের গ্রন্থোৎপত্তির ধারায় অনবিচ্ছিন্নক্রমে সংস্কৃত ভাষার যত গ্রন্থ লক্ষ্য করা গেলে, সে তুলনায় প্রাকৃত ভাষার গ্রন্থ অনেক কম। কালানুক্রমে প্রাপ্ত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের সাথে বিষয়বিভাগ-মূলক একটি সংক্ষিপ্ত নিম্নতালিকাতেই প্রায় সব ক'খানা প্রচলিত প্রাকৃত গ্রন্থের নামোল্লেখ হতে পারে— যেমন,

অনুবাদ সাহিত্য—১। প্রাকৃত চন্দ্রিকা, বেণীসংহার নাটকের প্রাকৃত অংশের অনুবাদ।

অভিধান বা কোষসাহিত্য,

১। প্রাকৃতাধ্যায়, হেমচন্দ্রের 'শব্দানুশাসন'এর ৮ম পরিচ্ছেদ।

২। প্রাকৃতপ্রবোধ, নরচন্দ্র প্রণীত। হেমচন্দ্রের প্রাকৃতাধ্যায়ের টীকা,

৩। প্রাকৃত প্রক্রিয়াবৃত্তি, উদয়সৌভাগ্যগণি (জৈন) প্রণীত হেমচন্দ্রের প্রাকৃতাধ্যায়ের টীকা। এর অপর নাম বুৎপত্তি-দীপিকা বা প্রাকৃতবৃত্তি ঢুণ্টিকা।

৪। প্রাকৃত নামলিঙ্গানুশাসন অভিধান।

কাব্য

১। বৃহৎকথা, গুণাঢ্য-রচিত।

২। গাথাসপ্তশতী (গহাসত্তসই) / গাথাকোষ, রাজা হাল-প্রণীত

৩। প্রাকৃত ভাষা কাব্য।

৪। প্রাকৃত সপ্ততি কাব্য।

ছন্দঃশাস্ত্র

১। প্রাকৃত কোষ, প্রণেতা রত্নশেখর। চন্দ্রকীর্তিসূরি প্রণীত এর একটি টীকা আছে।

২। প্রাকৃতছন্দষ্টীকা

৩। প্রাকৃত পিঙ্গল/প্রাকৃতছন্দঃসূত্র/পিঙ্গলছন্দঃ সূত্র, পিঙ্গলমুনিকৃত সর্বপ্রাচীন।

বেদান্ত

১। প্রাকৃত পঞ্চীকরণ।

ব্যাকরণ

১। প্রাকৃতচন্দ্রিকা, (১) করঞ্জ কবিসার্বভৌম বামনাচার্যকৃত।

২। প্রাকৃতচন্দ্রিকা, (২) কৃষ্ণপণ্ডিত বা শেষকৃষ্ণকৃত।

৩। প্রাকৃত মঞ্জরী, কাত্যায়নকৃত টীকা (বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ গ্রন্থের)।

৪। প্রাকৃতলক্ষণ, চণ্ড নামক বৈয়াকরণিকের প্রণয়ন।

৫। প্রাকৃতভাষান্তরবিধান— চন্দ্র প্রণীত।

৬। প্রাকৃতব্যাকরণ-বৃত্তি— ত্রিবিক্রমদেব-বিরচিত।

৭। প্রাকৃতসর্বস্ব— মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র প্রণীত।

৮। প্রাকৃতানন্দ— রঘুনাথ শর্মকৃত।

৯। প্রাকৃতকল্পতরু— রামতর্কবাগীশকৃত।

১০। প্রাকৃতলঙ্কেশ্বর/প্রাকৃত কামধেনু, লঙ্কেশ্বর প্রণীত।
১১। প্রাকৃত প্রকাশ, বররুচি প্রণীত।
১২। প্রাকৃত সঞ্জীবনী, বসন্তরাজ প্রণীত।
১৩। প্রাকৃত ব্যাকরণ, সমন্তভদ্র প্রণীত।
১৪। প্রাকৃত ব্যাকরণ, হেমচন্দ্রসূরি প্রণীত।
১৫। প্রাকৃত সূত্র, বাল্মীকি প্রণীত। প্রাপ্ত সর্বাদিম প্রাকৃত গ্রন্থ।
১৬। প্রাকৃতকৌমুদী।
১৭। প্রাকৃত রহস্য/ষড়্ ভাষাবার্তিক।
১৮। প্রাকৃত সংস্কার।
১৯। প্রাকৃতাষ্টাধ্যায়ী।
২০। প্রাকৃত দীপিকা, চণ্ডীদাস শর্ম-রচিত। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের ৮ম্‌ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাত্মক ব্যাকরণ।
২১। প্রাকৃতপাদ, নারায়ণ কর্তৃক প্রণীত, ঐ

সাহিত্যতত্ত্ব

১। প্রাকৃতমণিদীপিকা
২। প্রাকৃতচিন্দ্রকা (৩)/প্রাকৃতমনোরমা, আচার্য ভামহকৃত।

এছাড়া, ঘনশ্যামের ভাষামঞ্জরী এবং ত্রিকালজ্ঞ কবির ভাষামঞ্জরী—উভয়ই চলতি প্রাকৃতের সাহিত্য। বরদরাজ এবং বেঙ্কটশুভশাস্ত্রীব— পৃথক ২ খানা ভাষা-মঞ্জরী নামক সাহিত্যও আছে। ভাষামঞ্জরী নামক ব্যাকরণ, বৃহদ্‌ভট্ট এবং বরদভট্ট—উভয়ের ভাষামঞ্জরী নামক পৃথক্‌ দু'খানা প্রাকৃতাদি বিভিন্ন ভাষার ছন্দের গ্রন্থও প্রাকৃত পালি-অপভ্রংশ ভাষার গ্রন্থরূপেই পরিচিত।

পালিভাষায় অসংখ্যবৌদ্ধ গ্রন্থ তৈরি হয়েছে। তন্মধ্যে বহুগ্রন্থেব, পূর্বেই উল্লেখ করাও হয়েছে। ধাতুপাঠ বা গণপাঠ— সংস্কৃত-প্রাকৃতাদি ভাষার বুৎপত্তি-নির্ণয়ে সহায়ক। সংস্কৃত ধাতুপাঠের নিয়মে পালিভাষারও ধাতুপাঠের প্রাচীন গ্রন্থ আছে- - তন্মধ্যে, ধাতুপাঠ' এবং 'ধাতুমঞ্জুষা' গ্রন্থদ্বয়, সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য ভাষাবিদ্‌ পাশ্চাত্য পণ্ডিত অধ্যাপক এণ্ডারসন এবং স্মিথ সম্পাদনা করেছেন। অপর 'সদ্দনীতি' নামক গণপাঠের গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন উক্ত স্মিথ সাহেব একক ভাবে।--এ গ্রন্থত্রয় পালিভাষা জ্ঞানে একান্ত সহায়ক এবং সুপ্রাচীন।

অবহট্‌ঠ ভাষায় রচনা

'চর্যাগীতি' বিষয় আলোচনা পৃথকভাবেই করণীয়। এ বিষয়টির নাম নিয়ে, কাল নিয়ে, ব্যক্তি নিয়ে, ব্যক্তি পারম্পর্য নিয়ে, আলোচ্য বিষয় নিয়ে অর্থাৎ এ প্রসঙ্গের যাবতীয় বিষয় নিয়েই এমন এক বিতর্কিত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যার কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা এযাবৎ তো হয়নি-ই, কোন কালে হবে কিনা—তাও কে জানে? নষ্টাবশিষ্ট যতটকু চর্যাগীতির অংশ বর্তমান গবেষকদের হাতে এসেছে, শুধু সেটুকুর সাহায্যে যত আলোচনা করাই হোক না কেন—তা' ঐ বিতর্ক-পর্যবসিত-ই থেকে যাবে। 'গৈ' ধাতুর অর্থ—গান করা, তার উত্তরে 'ক্ত' বা 'ক্তি' প্রত্যয়ের যোগে, যথাক্রমে, 'গীত' এবং 'গীতি' পদ গঠিত হয়। তা' দেখতে ভিন্নাকার হলেও অর্থে সমান। 'ক্ত' এবং 'ক্তি' উভয়ই ভাববাচ্যীয় প্রত্যয়, অর্থ তাই এক— গান। তবে, গীতি পদটা যেন একটু সুন্দর মনে হয়। তাই 'চর্যাগীতি' নামে উল্লেখ করতেই ভাল লাগে। সে চর্যাগীতিগুলোও গান। ভগবদভিমুখী ভক্তির অনুকূল সুর-তাল-লয় যোগে সাধক-ভাবুকদের এই গীতি একপ্রকার শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহন ছিল—সন্দেহ নেই। অথচ ইহার ভাষাকে স্রেফ প্রাকৃতও বলা চলে না। দেশী বলাও সঙ্গত নয়, কেননা-তদ্ভবপদও পাওয়া যায়। আর মিশ্র ভাষা বললেও, ইহার প্রয়োগে যে আংশিক বিশেষত্ব উদ্দিষ্ট ছিল বলে ধারণা হয়, তা' মিশ্র ভাষার স্বকীয়তা দ্বারাই প্রতিপাদনীয় হতে পারে না। সেকারণেই চর্যাগীতি'র পৃথক আলোচনা ই সঙ্গত।

বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি যে 'চর্যাগীতি'র ভাষাকে সন্ধা ভাষা অথবা সন্ধ্যা (আলো-আঁধার) কিংবা উভয়-আখ্যাই দিয়েছেন—তা'ও যুক্তি যুক্ত। বাস্তবে যে—"হেবজ্র তন্ত্রে সন্ধ্যাভাষাকে মহাভাষা-সময়-সংকেত (Conventional signs) ও যোগিনী-দের ব্যবহৃত গুহ্যভাষা বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১]" তা-ই ঠিক। 'সময়' শব্দটার মুখ্য অর্থই ৫ টা—১। শপথ, ২। আচার, ৩। কাল, ৪। সিদ্ধান্ত, ৫। সংবিৎ।[২] যোগিনীদের অথবা সিদ্ধাচার্য সম্প্রদায়ের নিজস্ব আচার বা সিদ্ধান্ত অনুসারেই সন্ধ্যাভাষা অর্থ নিরূপণ করে, তাই তা' সর্বসাধারণের কাছে আলো-আঁধারি হয়ে দাড়ায়। এ ভাষা, বিবর্তনের সন্ধিক্ষণে চলমান রূপের বিলয়ন এবং চলিষ্যমান

১. ডঃ আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, পৃঃ ২৪৩

২. "সময়ঃ শপথ্যাচার-কাল-সিদ্ধান্ত-সংবিদঃ" অমরকোষ।

রূপের আভাস — উভয়ই করে থাকে। উড়িয়া-বাংলা-আসামী ভাষাত্রয়ের একীভূত প্রাক্তন রূপ এই চর্যাগীতিতে বিধৃত আছে। বৌদ্ধদের মধ্যে যে গুহ্যতান্ত্রিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, তাঁদের অনুসরণীয় অন্যতম গুহ্যতন্ত্র—দ্বাত্রিংশৎ-কল্পতন্ত্রের অন্তর্গত 'হেবজ্র ডাকিনীজাল সম্বরতন্ত্র' এবং তার উপরে আচার্য কাহ্নপাদকৃত টীকা হেবজ্রপঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থের ভিত্তির উপর গড়ে' ওঠা সিদ্ধতান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদ-ই 'চর্যাগীতি'র প্রতিটি পদে লক্ষ্য করা যায়। তা' সন্ধাভাষা বা সন্ধ্যা (আলো-আঁধারি) ভাষা রূপে আখ্যায়িত বা বিশ্লেষিত হলেও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে সন্ধ্যাভাষা বা সন্ধ্যাভাষা পদদ্বারা কোন নির্দিষ্ট ভাষা বুঝায় না। যে কোন ভাষা-ই কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের আচার বা সিদ্ধান্ত অনুসারী অর্থে প্রযুক্ত হয়ে সন্ধাভাষা বা সন্ধ্যাভাষা কথা দ্বারা নির্দেশ্য হতে পারে। তাই, চর্যাগীতি-পদাবলীর ভাষা অন্য দৃষ্টি ভঙ্গীতে আখ্যেয়।

প্রকরণগ্রন্থ হিসাবে সাহিত্যতত্ত্বে দণ্ডীর কাব্যাদর্শ-ই সুপ্রাচীন এবং বিভিন্ন প্রাচীন ভাষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম নির্দেশক গ্রন্থ। তাতে, প্রথমে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং মিশ্র—এই চার প্রকার ভাষার উল্লেখ করে, প্রাকৃত ভাষার আবার প্রকারভেদ—লিখেছেন—

''মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্।।"
শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী।
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্।।
আভীরাদিগিরঃ কাব্যেষ্বপভ্রংশ ইতি স্মৃতঃ।
শাস্ত্রেষু সংস্কৃতাদন্যদপভ্রংশতয়োদিতম্।।

(সূক্তি (সু + উক্তি) রত্নের সাগর স্বরূপ 'সেতুবন্ধ' প্রভৃতি কাব্য যে ভাষায় প্রণীত, মহারাষ্ট্রে প্রচলিত সেই কথ্য প্রাকৃত ভাষাই প্রাকৃত শ্রেণীতে উৎকৃষ্ট। তা' ছাড়া শৌরসেনী, গৌড়ী, লাটী এবং এরকম অন্যান্য অনেক ভাষার ব্যবহার চোখে পড়ে। কাব্যে বা সাহিত্যে আভীর প্রভৃতির ভাষা অপভ্রংশ ভাষা বলে কথিত হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে অর্থাৎ বৈদিকসাহিত্যে, দর্শনশাস্ত্রে, ধর্মশাস্ত্রে, সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষাগুলোকেই অপভ্রংশ বলা হয়েছে।

তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারনাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে, Bu-ston এর বৌদ্ধ-ধর্মের ইতিহাসে, Blue Annals নামক গ্রন্থে এবং পুরাতত্ত্বনিবন্ধাবলী প্রভৃতি

এ সম্পর্কিত তথ্যবহুল গ্রন্থে, একজন চর্যাগীতি-কারকেও মহারাষ্ট্রীয় লোক বলে উল্লেখ না করায়, এবং চর্যাকারদের প্রণীত বলে স্বীকৃত কোন গ্রন্থের সূত্রেও সেরকম কথা না থাকায়, ধরে নেয়া যায় যে শৌরসেনী, গৌড়ী, লাটী বা অন্যান্য কোন শ্রেণীর প্রাকৃত-ভাষা অবলম্বন করেই চর্যাগীতির পদাবলী রচিত হয়েছে। ইহার প্রচলনের বা পরিচলনক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে এগুলোকে অনেকেই অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ ভাষার পদাবলী বলে স্বীকার করেন। এখন যে কয়টি চর্যাগীতি পদ পাওয়া গিয়েছে তা' ছাড়াও অনেক পদ থাকার কথা, কিন্তু যতক্ষণ তা' পাওয়া না যায়, ততক্ষণ প্রাপ্ত পদ কয়টি-ই গেয়-পাঠ্য, আলোচ্য-আস্বাদ্য ছিল—বলতে হয়। প্রাপ্ত চর্যাগীতিগুলোর পদকাররূপে পাওয়া যায় মোট ২৩ জন। তন্মধ্যে কাহ্ন পা'র পদ ১৩টি, ভুসুকুর ৭টি, সরহের ৪টি, কুক্কুরীর ৩টি। শবর-শান্তি-লুইপা'র প্রত্যেকের ২টি করে, আর বাকী সকলের ১টি করে পদ।

পদকারগণ হচ্ছেন :

১। শবরী বা শবর পা, ইনি নাকি, বৌদ্ধ পণ্ডিত কমলশীলকে, ডাকিনী বজ্রগুহ্যগীতি' এবং 'মর্মোপদেশ, গ্রন্থ দুটির রচনায় সহায়তা করেছিলেন। সে হিসাবে এঁর কাল ৬৮০--৭৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধরতে হয়। অবশ্য এ নিয়ে বিসংবাদ আছে।

এঁর গ্রন্থ হিসাবে পাওয়া যায়---১। উল্লিখিত চর্যাগীতির দু'টি গীতি বা পদ, এবং ২। চিত্তগুহ্য গম্ভীরার্থক গীতি, ৩। মহামুদ্রাবজ্রগীতি, ৪। শূন্যতাদৃষ্টি, ৫। সহজ সম্বর স্বাধিষ্ঠান, এবং ৬। সহজোপদেশ স্বাধিষ্ঠান। ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র মতে—ইনি বাঙালী ছিলেন।

২। লুইপা : লামা তারনাথের বরাত দিয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌, এঁকেও বাঙালী বলেছেন। তিনি নাকি উড়িষ্যার রাজা এবং মন্ত্রীর গুরু ছিলেন! শবরী পা ছিলেন লুইপা'র গুরু। মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং লুইপা'কে অনেকে অভিন্ন ব্যক্তি বললেও ডঃ শহীদুল্লাহ্‌, পৃথক ব্যক্তিই মনে করেছেন। লুই পা'র শিষ্য দারিক পা। চর্যা-গীতিতে লুইপার ২টি গীতি বা পদ রয়েছে। অপর, একখানা গ্রন্থ অভিসময়-বিভঙ্গ। শান্তরক্ষিত অভিসময়মঞ্জরী গ্রন্থে লুইপা'র উল্লেখ করেছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন লুইপার ৬ খানা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন---তন্মধ্যে ১খানা উক্ত অভিসময়বিভঙ্গ এবং অপর ৫ খানা---তত্ত্বস্বভাব, দোহাকোষ, বুদ্ধোদয়, ভগবদ-ভিসময় এবং গীতিকা। কাল অনুসারে শান্তরক্ষিতের (মৃত্যু ৭৫৫ খৃঃ) কিছু আগে কার বলে লুই পা'কে মানতে হয়।

৩। **দারিক পা :** ইনি লুইপার শিষ্য বলে জানা যায়। এঁর চর্যাগীতি'র মধ্যেকার দু'টি গীতি পদ ছাড়াও মহাগুহ্যতন্ত্রোপদেশ, তথতাদৃষ্টি এবং সপ্তমসিদ্ধান্ত নামে তিন খানা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

৪। **কুক্কুরী পা :** ইনিও লুইপার শিষ্য। চর্যাগীতি-র মধ্যে এঁর ৩টি পদ রয়েছে। তা'ছাড়া এঁর তিনখানা গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবং ডঃ সুকুমার সেন। গ্রন্থত্রয়----যোগভাবানুপদেশ, স্রবপরিচ্ছেদন এবং মহামায়া-সাধন। 'বজ্র-যোগিনী' গ্রন্থের সূত্রে শিষ্য পরম্পরা পাওয়া যায়—লুই-কুক্কুরী-ইন্দ্রভূতি-লক্ষ্মীংকরা-বিরূপা।

৫। **বিরূপ পা :** বিরূপ পা পাওয়া যায় দু'জন। একজন লক্ষ্মীঙ্করার শিষ্য। অপরজন জালন্ধরী পা'র শিষ্য এবং তাঁর শিষ্য ডোম্বী পা। এর মধ্যে কোন জন চর্যাগীতিকার, তা' বলা যায় না। রাহুল সাংকৃত্যায়ন-এঁর অনেক গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন— ১। অমৃত সিদ্ধি, ২। দোহাকোষ, ৩। কামচণ্ডালিকাদোহাকোষ, ৪। বিরূপগীতিকা, ৫। বিরূপবজ্রগীতিকা, ৬। বিরূপ চতুরশীতি' ৭। মার্গ-ফলান্বিতাব বাদক, এবং ৮। সুনিষ্প্রপঞ্চতত্ত্বোপদেশ।

৬। **ডোম্বী পা :** বিরূপ পা'র শিষ্য। চর্যাগীতি'র ১টি পদ বা গীতি বাদেও, অক্ষরদ্বিদেশ, গীতিকা এবং নাড়ীবিন্দুদ্বারেযোগচর্যা নামক ৩ খানা গ্রন্থের খবর দিয়েছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। 'পুরাতত্ত্বনিবন্ধালী'র মতে ডোম্বী লুইপা'র শিষ্য।

৭। **কম্বলাম্বর পা/কমরী পা/কামলী পা :** ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র মতে ইনি ইন্দ্রভূতি ও জালন্ধরী পা'র গুরু, এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে এঁর শিষ্য বজ্র-কণ্ঠ এবং প্রশিষ্য দারিক পা। চর্যাগীতি'তে এঁর একটি পদ রয়েছে। তা'ছাড়া 'অসম্বন্ধদৃষ্টি, 'অসম্বন্ধসর্গদৃষ্টি' ও গীতিকা' নামে অপর ৩ খানা সংস্কৃত গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। সরহের দোহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজ্র কামলী পা'র উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত গ্রন্থে এঁর অপর নাম বা বিশুদ্ধনাম-কম্বলাচার্য বা কম্বলাম্বর।

৮। **আর্যদেব :** এঁকে চর্যাগীতিকার বা চর্যা-পদকার আর্যদেব/আজদেব বলা-ই সঙ্গত। •ঐতিহাসিক তারনাথের বরাতদিয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ্ এঁকে গোরক্ষনাথের শিষ্য এবং আউগতকের প্রথম পাদের লোক বলেছেন। সুকুমার সেন এঁর অপর ২খানা গ্রন্থ 'কানেরীগীতিকা' ও 'চর্যামেলায়নপ্রদীপ' উল্লেখ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল,— অত্র প্রবন্ধে, প্রাপ্ত Record, বিভিন্ন প্রমাণমূলক বিশিষ্ট-লেখ, গ্রন্থের আভ্যন্তরিক তথ্য— প্রভৃতির উপর নির্ভর করে, কালানুক্রমিক বিন্যাসের ধারায় মৎস্যেন্দ্র বা মৎস্যেন্দ্রনাথের---মীননাথের শিষ্য-গোরক্ষনাথকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র বা সংক্ষেপে আত্মারাম কর্তৃক প্রণীত 'হঠপ্রদীপিকা' এবং মাধবাচার্যাকৃত 'সংক্ষেপ শঙ্করজয়' গ্রন্থেই মৎস্যেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ পাওয়া যায় প্রথম। দু'খানা গ্রন্থই অনতিপ্রাচীন। হঠপ্রদীপিকাব টীকাকার-উমাপতি, ব্রহ্মানন্দ, মহাদেব, রামানন্দতীর্থ, ব্রজভূষণ-সকলেই খৃষ্টীয় ষোড়শ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। গোরক্ষনাথ একজন বিশিষ্ট গ্রন্থকাব এবং যোগসাধক। তাঁব গ্রন্থগুলোর মধ্যে, গোরক্ষশতক বা জ্ঞান শতক খুব-ই প্রসিদ্ধ, অথচ তার টীকাকার-মথুবানাথ শুক্ল খৃষ্টীয় আঠার-শতকের এবং যোগসূত্র ও গোরক্ষশতক' এর টীকাকার শঙ্করও বাংলাসাহিত্যের আদি-মধ্য-যুগেব পরবর্তী। 'চতুরশীত্যাসন' গ্রন্থেব টীকা-ই হয় নি। জ্ঞানামৃত গ্রন্থের টীকাকার-সদানন্দ আধুনিক ব্যক্তি। যোগচিন্তামণির টীকাকার হয়তো, ভবানী-সহায় নামক কোন আধুনিক পণ্ডিত। যোগমহিমা গ্রন্থেরও টীকা নেই। যোগমার্তণ্ড গ্রন্থেরও টীকা নেই এবং উল্লেখ-কারক সূর্যপণ্ডিত কালনির্ণয় নামক মাধবাচার্যকৃত গ্রন্থের টীকাকার। যোগসিদ্ধান্তপদ্ধতিরও টীকা হয় নি। বিবেকমার্তণ্ড গ্রন্থেরও টীকা হয় নি। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি গ্রন্থেরও টীকা কেউ করেন নি। এসমস্ত বিষয় বিবেচনা করে মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য উল্লিখিত বিশিষ্ট যোগসাধক গ্রন্থকার-গোরক্ষনাথকে খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীর পূর্বে নেয়া-ই অসম্ভব। অপর একটি বিষয় হল প্রাচীন পাণ্ডুলিপির R. G Bhandarkar এর তালিকাভুক্ত Bhr 220 নং এবং Kashinath Kunte (Lahore) এর তালিকাভুক্ত Kacin 30 নং যোগ-চিন্তামণি গ্রন্থদ্বয়ে গোরক্ষনাথের পদবী 'মিশ্র' লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ মীননাথের শিষ্য এবং খ্যাতনামা যোগ-গ্রন্থকার গোরক্ষনাথ, মিশ্র পদবীধারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কোনক্রমেই দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বের নহেন। এমতাবস্থায় সমাধান কি হতে পারে—পাঠকবর্গই বিবেচনা করবেন।

৯। **কঙ্কণ পা:** চর্যাগীতি-গ্রন্থে এঁর ১টি পদ বা গীতি রয়েছে।

১০। **মহীধর পা/মহী পা/মহিত্তা**—ড: শহীদুল্লাহ্‌'র মতে তিনি কাহ্ন পা'র শিষ্য, সুকুমার সেনের মতে কাহ্ন পা'র (আচার্য কৃষ্ণ) বংশধর; রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে দারিক পা'র শিষ্য। চর্যাগীতি-গ্রন্থে একটি পদ ছাড়া, 'বায়ুতত্ত্ব' এবং 'দোহাকোষ-গীতিকা' নামক গ্রন্থও তাঁর রচনা বলে জানা যায়।

১১। **ধাম পা বা ধর্মপাদ :** ড: শহীদুল্লাহ্ এঁকে কাহ্ন পা-র শিষ্য বলেছেন। সুকুমার সেন বলেন যে—ঐতিহাসিক তারনাথ জালন্ধরী পার শিষ্যদের মধ্যে এক 'ধাম' নামের উল্লেখ করেছেন। চর্যাগীতি গ্রন্থের একটি পদ বাদেও তাঁর 'কাল-ভাবনামার্গ', 'সুদৃষ্টিগীতিকা' এবং 'হুঙ্কারচিতবিন্দুভাবনাক্রম' নামক গ্রন্থত্রয়ের কথা রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক উল্লিখিত।

১২। **ভদ্রপাদ বা ভাদে পা:** চর্যাগীতির একটি গীতিবাদে 'সহজানদৃষ্টিগীতিকা' নামক একখানা গ্রন্থও তাঁর প্রণীত বলে সুকুমার সেন বলেছেন। ড: শহীদুল্লাহ্ এঁকে কাহ্ন পা'র শিষ্য বলেছেন। তারনাথ, ভাদেপা'র গুরু বলে কাহ্ন পা বাদেও জালন্ধরী পা'র উল্লেখ করেছেন বলে সুকুমারসেনের উক্তিতে পাওয়া যায়।

১৩। **জয়ানন্দ বা জয়নন্দী :** এঁর একটি মাত্র পদ চর্যাগীতি'র মধ্যে আছে।

১৪। **শান্তিপাদ:** চর্যাগীতি গ্রন্থে প্রাপ্ত দু'টি গীতির রচয়িতা শান্তিপাদ। তাঁর 'সহজ-গীতি' এবং 'সুখদুঃখ পরিত্যাগ-অদ্বয়দৃষ্টি' নামক দু'খানা গ্রন্থের হদিস্ পাওয়া যায়।

১৫। **বীণাপাদ :** ড: শহীদুল্লাহ্‌র মতে এঁর গুরুব নাম বুদ্ধবাদ। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে ভাদে পা বা ভদ্রপাদ। সুকুমার সেনেব মতে বীণাপাদ নামে কেহ চর্যাকার-ই নেই। যে বীণাপাদেব নাম পাওয়া যায় তিনি ছিলেন বিরুয়ার বংশধর। তবে তাঁর 'বজ্রডাকিনীনিষ্পন্নক্রম' নামক একখানা গ্রন্থ আছে। 'হেরুঅবীণা' অংশবিশিষ্ট চর্যাগীতিটি বীণাপাদের বলে অনেকে স্বীকার করেন। হেরুঅবীণা পদটি হেরুকবীণা প্রাকৃত পদের অবহট্‌ঠ কি না—ভাববার বিষয়। তা' হলে সম্বন্ধে ষষ্ঠীর জ্ঞাপক 'ক' এর সম্পর্কে হেরু নামক অপর চর্যাকার অনুসন্ধেয় হয়।

১৬। **সরহ :** এ প্রসঙ্গে সবচেযে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ড: শহীদুল্লাহ্‌র মতে রাহুলভদ্র এবং সরহ ভিন্নব্যক্তি কিন্তু সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে অভিন্ন। অবহট্‌ঠ রচনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন সরহের দোহাকোষ। রাহুল সাংকৃত্যায়ন সরহের রচনা বলে—১। কায়কোষ অমৃত, ২। বজ্রগীতি, ৩। চিত্তকোষ, ৪। অজবজ্রগীতি, ৫। ডাকিনী, গুহ্যবজ্রগীতি, ৬। দোহাকোষোপদেশগীতি, ৭। দোহাকোষ, ৮। তত্ত্বোপদেশ শিখরদোহাকোষ, ৯। ভাবনাফলদৃষ্টিচর্যাদোহাকোষ, ১০। বসন্ততিলক দোহাকোষ, ১১। চর্যাগীতিদোহাকোষ, ১২। মহামুদ্রোপদেশকোষ, এবং ১৩। সরহপাদগীতিকা উল্লেখ করেছেন। সুকুমার সেনের মতে—"তাঁর দোহাকোষের প্রাপ্ত প্রাচীতম পুঁথির

লিপিকাল ১১০১ খৃষ্টাব্দ, সে সময়ে সরহের দোহা লোপোন্মুখ হয়েছিল। অতএব সরহ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। এটিই সরহের জীবৎকালের নিম্নতম সীমা।" চর্যাগীতি গ্রন্থে সরহের চারটি পদ বা গীতি আছে। অধ্যাপক সুকুমার সেন কর্তৃক উল্লিখিত সরহের গ্রন্থগুলোর নাম, অনেকটা ভিন্ন ধরনের। যেমন—দোহা-কোষ (মহামুদ্রোপদেশক, উপদেশগীতি, দ্বাদশোপদেশ, মর্মোপদেশ, তত্ত্বোপদেশশিখর), চর্যাগীতি (ভাবনাদৃষ্টিগীতিকা), কায়বাক্‌চিত্তমনসিকায়। চর্যাগীতি' গ্রন্থে সরহের চারটি গীতি ছাড়া, সুকুমার সেন কর্তৃক উল্লিখিত চর্যাগীতি-সমবিষয়ক ভিন্ন গ্রন্থ আছে।

১৭। **ভুসুকু:** এই নামে দু'জন পাওয়া যায়—শান্তিদেব ভুসুকু সৌরাষ্ট্রীয় এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিষ্য বাঙালী ভুসুকু। রাহুল সাংকৃত্যায়ন শান্তিদেব ভুসুকুর 'সহজগীতি' নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। **পদকার ভুসুকুর (বাঙালী)** ৮টিপদ বা গীতি, চর্যাগীতি গ্রন্থে রয়েছে।

১৮। **গুণ্ডরী পা:** চর্যাগীতি'র মধ্যে এঁর একটি পদ আছে।

১৯। **চাটিল বা চাটিল্ল পা:** চর্যাগীতি গ্রন্থে এঁর একটি পদ পাওয়া গিয়েছে।

২০। **ঢেণ্টণ পা:** চর্যাগীতি'র মধ্যে এঁর একটি পদ আছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন এঁর অপর এক 'চতুর্যোগভাবনা' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

২১। **তাড়ক পা:** চর্যাগীতি'র মধ্যে এঁর একটিমাত্র পদ আছে।

২২। **তন্তি পা:** চর্যাগীতি গ্রন্থে এঁর একটি পদ আছে। তবে, রাহুল সাংকৃত্যায়ন এঁকে ঢেণ্টন পা'র সাথে অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। তা' অবশ্য অন্যেরা স্বীকার করছেন না। তা'হলে সর্বস্বীকৃত ২৩জন চর্যাকার না হয়ে ২২জন হয়ে যেত।

২৩। **কাহ্ন পা:** ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ্‌ এঁকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের মনে করেছেন এবং চর্যাগীতি'তে ১ টি পদ ছাড়াও 'দোহাকোষ' এবং 'হেবজ্রপঞ্জিকা যোগরত্নমালা' নামক গ্রন্থদ্বয় এঁর রচনা বলে স্বীকার করেছেন। এঁর গুরুর নাম জালন্ধরী পা, তাঁর গুরু ইন্দ্রভূতি। রাহুল সাংকৃত্যায়ন শহীদুল্লা সাহেবের মতের সাথে অল্প-বিস্তর পৃথক ধারণা প্রকাশ করেছেন। তবে, এঁর গ্রন্থহিসাবে পাঁচখানার নাম করেছেন। যথা ১। গীতিকা, ২। মহাঢুণ্ঢন, ৩। বসন্ততিলক, ৪। অসম্বন্ধদৃষ্টি এবং ৫। দোহাকোষ। সুখময় মুখোপাধ্যায় এই মতের খুববেশী বিরুদ্ধে বলেন নি। তবে, সুকুমার সেন কাহ্ন দু'জন বলে মত দিয়েছেন। একজন জালন্ধরী পা'র শিষ্য, যাঁর নামান্তর বিরুআ। চর্যাগীতি'র মধ্যে প্রথম কাহ্ন-পা'র পদ ৬টি, অপর কাহ্ন পা'র পদ ৭টি। এক কাহ্ন পা' হেবজ্রতন্ত্রের টীকা 'যোগরত্নমালা' লিখেছেন॥

অবহট্‌ঠ রচনা বিষয়ক আলোচনার মধ্যে উল্লিখিত ২৩ জনকে চর্যাপদের কবি বলে ধরা হয় এবং তাঁদের প্রণীত অনেক গ্রন্থের সহকৃত উল্লেখও পাওয়া যায়। সে সব গ্রন্থ কি অবহট্‌ঠ রচিত? কাহ্ন পা'র যোগরত্নমালা, যাহা 'হেবজ্র পঞ্জিকা' পদদ্বারা বিশেষিত হয়েছে তার প্রারম্ভটি এই—

"শ্রী হেবজ্রং নমস্কৃত্য পরমানন্দরূপিণং।
পূর্বাচার্য ক্রমাম্নায়ো হেবজ্রো লিখ্যতে ময়া।।

প্রথম পটলের সমাপনী পুষ্পিকা: "ইতি যোগরত্নমালায়াং কৃষ্ণাচার্যপাদকৃতৌ হেবজ্রপঞ্জিকায়াং প্রথম: পটল:"।

প্রথম পটলের উল্লিখিত সমাপনী পুষ্পিকায় 'কৃষ্ণাচার্যপাদ' কিন্তু গ্রন্থ-সমাপনী অংশে—

"শ্রী হেবজ্র পঞ্জিকা যোগরত্নমালা সমাপ্তা। কৃতিরিয়ং পণ্ডিতাচার্য শ্রীকাহ্ন-পাদানামিতি।" অতএব দেখা যায় গ্রন্থকার তাঁর নাম যেভাবে লিখেছেন তা' লিপিকবদের নিজস্ব ভণিতায় অমনি অবহট্‌ঠায়িত হয়ে গিয়েছে।

অবহট্‌ঠের চর্যাগীতিকারদের অতিরিক্ত রচনা বলে' উল্লিখিত
গ্রন্থের সমন্বিত তালিকা

শবরী পা ১—৫	১। চিত্তগুহ্যগম্ভীরার্থকগীতি, ২। মহামুদ্রাবজ্রগীতি, ৩। শূন্যতাদৃষ্টি, ৪। সহজ-সম্বর-স্বাধিষ্ঠান, ৫। সহজোপদেশ স্বাধিষ্ঠান।
লুই পা ৬—১১	৬। অভিসময় ৭। তত্ত্বস্বভাব ৮। দোহাকোষ ৯। বুদ্ধোদয় ১০। ভগবদভিসময় ১১। গীতিকা
দারিক পা ১২—১৪	১২। মহাগুহ্যতন্ত্রোপদেশ ১৩। তথতাদৃষ্টি, ১৪। সপ্তমসিদ্ধান্ত

কুক্কুরী পা	১৫। যোগভাবানুপদেশ
১৫—১৭	১৬। স্রবপরিচ্ছেদন
	১৭। মহামায়া সাধন
বিরূপ পা	১৮। অমৃতসিদ্ধি
১৮—২৫	১৯। দোহাকোষ
	২০। কামচণ্ডালিকাদোহাকোষ
	২১। বিরূপ গীতিকা
	২২। বিরূপ বজ্রগীতিকা
	২৩। বিরূপচতুরশীতি
	২৪। মার্গফলান্বিতাববাদক
	২৫। সুনিঃপ্রপঞ্চতত্ত্বোপদেশ
ডোম্বী পা	২৬। অক্ষরদ্বিদেশ
২৬—২৮	২৭। গীতিকা
	২৮। নাড়ীবিন্দুদ্বারে যোগচর্যা
কম্বলাম্বর পা	২৯। অসম্বন্ধ দৃষ্টি
২৯—৩১	৩০। অসম্বন্ধ স্বর্গদৃষ্টি
	৩১। গীতিকা
আর্যদেব	৩২। কানেরী গীতিকা
৩২—৩৩	৩৩। চর্যামেলায়ন প্রদীপ
মহী পা	৩৪। বায়ুতত্ত্ব
৩৪—৩৫	৩৫। দোহাকোষ গীতিকা
ধাম পা	৩৬। কাল ভাবনামার্গ
৩৬—৩৮	৩৭। সুদৃষ্টিগীতিকা
	৩৮। হুঙ্কারচিতবিন্দুভাবনাক্রাস
ভাদে পা	৩৯। সহজানন্দ দৃষ্টি গীতিকা
শান্তি পা	৪০। সহজগীতি
৪০—৪১	৪১। সুখ-দুঃখ পরিত্যাগাদ্বয়দৃষ্টি
বীণা পা	৪২। বজ্রডাকিনী নিষ্পন্নক্রম
৪২	

সরহ ৪৩--৫৪	৪৩। কায়কোষামৃত ৪৪। বজ্রগীতি ৪৫। চিত্তকোষ ৪৬। অজবজ্রগীতি ৪৭। ডাকিনীগুহ্যবজ্রগীতি ৪৮। দোহাকোষ ৪৯। তত্ত্বোপদেশশিখর দোহাকোষ, ৫০। ভাবনাফল দৃষ্টিচর্যা দোহাকোষ ৫১। বসন্ততিলক দোহাকোষ ৫২। চর্যাগীতি দোহাকোষ ৫৩। মহামুদ্রোপদেশ দোহাকোষ ৫৪। সরহপাদ গীতিকা
ভুসুকু ৫৫	৫৫। সহজ গীতি
ঢেন্টন পা ৫৬	৫৬। চতুর্যোগ ভাবনা
কাহ্ন পা ৫৭—৬২	৫৭। হেবজ্রপঞ্জিকাযোগরত্নমালা ৫৮। গীতিকা ৫৯। মহাঢুণ্টন ৬০। বসন্ততিলক ৬১। অসম্বন্ধ দৃষ্টি ৬২। দোহাকোষ

উল্লিখিত ১৭ জন চর্যাগীতিকারের চর্যাগীতিপদের চেয়ে অতিরিক্ত মোট ৬২ খানা গ্রন্থ যে বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম, তাতে সন্দেহ নেই। তন্মধ্যে সরহের দোহা-কোষগুলো এবং অন্যান্য দোহাকোষ অবহট্‌ঠের মূল্যবান সাহিত্যাবদান। অপরাপর গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষার, তা' বড়জোর, বৌদ্ধসংস্কৃতের বলা চলে।

মোট ১৭ জন চর্যাগীতিকারদের যে ৬২ খানা গ্রন্থের তালিকা করা হয়েছে তারমধ্যে ৯ খানা গ্রন্থের নামে 'দোহাকোষ' শব্দ, এবং ১৯ খানা অপর গ্রন্থের নামে গীতি শব্দ আছে।' এ দ্বারা গ্রন্থগুলো যে সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গানাত্মক তা' ধারণা হয়। ভক্তিমূলক পদ-সম্বলিত ভক্ত তুলসী দাসের রামচরিতমানস গ্রন্থখানার

গীতিপদগুলোও তুলসীদাসের দোহা বলে কথিত হয়। রামচরিতমানস-হিন্দিতে লেখা। চর্যাগীতির ভাষা অবহট্‌ঠ (অপভ্রংস--অপভ্রষ্ট) তাতে দোহা পদটিও ভজন-গীতি অর্থেই প্রযুক্ত। সহজ সাধনায় গানের সরস আবেদনে হৃদয়ের অন্তস্তল হতে ভক্তিভাব দোহন করাই কি তাৎপর্য ? ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক উত্তোলিত—

জরদ্‌গবঃ কম্বলপাদুকাভ্যাং দ্বারস্থিতো গায়তি মঙ্গলানি।
তং ব্রাহ্মণী পৃচ্ছতি পুত্রকামা রাজন্‌ রুমায়াং লসুনস্য কোঽর্ঘঃ।।

শ্লোকটিতে কম্বলপাদুকাভ্যাং-পদটির সাহায্যে যেন কম্বল পা' এঁর সূচনা হয়েছে। এখানে রুমা পদটি দ্বারা চট্টগ্রামের (প্রাচীন) বান্দরবন জেলার রুমা, এবং চাটিল পদটি যদি চট্টল (সুপ্রাচীন চট্টগ্রামের নাম) পদের অপভ্রংশ--অবহট্‌ঠ হয় তবে যেন সহজ-বোধ্যও হয়। কম্বলে আবৃত পদে দ্বারে দাড়িয়ে বৃদ্ধ মঙ্গল গান করতেছিলেন। তাঁকে রাজন বলে সম্বোধন করে পুত্রকামা ব্রাহ্মণী জিজ্ঞেস করেছিলেন রুমায় রসুনের দাম কি? এখনও আমরা সন্ন্যাসীদিগকে অনেক সময় 'মহারাজ' বলে সম্বোধন করি কিন্তু পুত্রকামনায় রসুনের দাম জিজ্ঞাসার তাৎপর্য বোধগম্য নয়। এটাই অর্থের অস্পষ্টতা।

এপর্যন্তের আলোচনায় ভৌগোলিক বৃহত্তম বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্রম-ধারার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক কালথেকে খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘকালে অগণিত বিষয়াবলীর সম্যক্‌ আলোচনা একান্তপক্ষেই এক বিরাট কাজ যা', মাদৃশজনের পক্ষে আকাশ-কুসুম বৈ তো নয়। তথাপি, যাঁরা সুপ্রাচীন বঙ্গদেশবাসীকে বা বাঙালীকে অতিসাম্প্রতিক স্তরোন্নীত জাতি বলে মনে করেন, আমার এ সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকুও তাঁদের সে ধারণার যুক্তিসহ দৃঢ় ভিত্তি না থাকার যথার্থ ইঙ্গিত দিবে। নানা অপরিহার্য কারণেই অনেক বিষয় বাদ দিতে হয়েছে, অনেক মহামান্য ব্যক্তিদের নামোল্লেখ করা পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তথাপি নিরপেক্ষভাবে, কালানুক্রমিকতায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিকগুলো তুলে ধরার ঐকান্তিকতা, আশাকরি, পাঠকবর্গের দৃষ্টি এড়াবে না। শত শত গ্রন্থ-গ্রন্থকারদের কথা বাদ পড়ে রইল। অথচ, এ বাঙালী সমাজের জন্য তাঁদেরও অবদান রয়েছে। আজ যে ফলে ফুলে পল্লবে, বর্ণে, মাধুর্যে, সুষমায় ভরপুর বাঙালী-সমাজ-মহীরুহকে লক্ষ্য করি, তা' অবশ্যই একদা অঙ্কুরিত-দ্বিদলিত ছোট চাড়াটির মত ভবিষ্যৎ-প্রতীক্ষ হয়ে কালের সাথে, পরিবেশের সাথে সংঘাত-সহযোগের অপরি-হার্য বিবর্তন ধারার মধ্যদিয়ে চলেছে। তাই-জানা-না জানা, কালের অতলে তলিয়ে যাওয়া সে সব মনীষীদের প্রতি পরিপূর্ণ আন্তরিক শ্রদ্ধানিবেদন করে, উপসংহার

করছি। সংস্কৃতির মূল পুরাতন শাস্ত্রগ্রন্থ বা প্রথা। তার অবলম্বনে বহুধা বিভক্ত বিস্তৃত সাংস্কৃতিক দিক্‌গুলো আলোচনায় আনা, এ স্বল্প পরিসর গ্রন্থে সম্ভব হল না। ধর্মীয়, সামাজিক, নৈত্যিক-মাসিক-বার্ষিক উৎসবগুলো, আর্থিক-শৈক্ষিক সমুন্নয়ন মূলক ব্যক্তি-গোষ্ঠী-সমাজের-কাজ প্রভৃতি সংস্কৃতির অসংখ্য দিকগুলোর সংক্ষিপ্ত তম পরিচায়নও দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। সময় এবং সুযোগ পেলে সে রকম বৃহত্তর আলোচনার আশা কার্যে রূপায়িত করার চেষ্টা করব। সংস্কৃতিমাত্রই কোন না কোন ক্রিয়ার মাধ্যমে সাধিত হয়। পূর্ত ক্রিয়া সমাপ্ত হলেও তার ফল থাকে দাড়িয়ে। তা'দেখে অতীত ক্রিয়ার অনুমান হয়। কিন্তু নাচ, গান, বক্তৃতা, রোগের সেবা, সমাজসেবা প্রভৃতি তাৎক্ষণিক ক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে একমাত্র সে সম্বন্ধে কোন বর্ণনা প্রভৃতি থাকলে পরবর্তীকালে জানা যেতে পাবে। অসংখ্য সংস্কৃতির দূর অতীতের সাক্ষ্যরূপে তাই প্রাচীন পুঁথি-পত্রের আশ্রয় নিয়ে অথবা তৎকালীন কোন দ্রব্য, যা' এখন আমাদের কাছে প্রত্ন বা পুরাতন, নিয়ে তার মধ্যথেকে ব্যবহারিক দিক্ অনুধাবন করে সংস্কৃতির অঙ্গ ধারণায় আনা চলে। জাতি এবং উপজাতিরূপে স্থূলভাবে দু'ভাগে বিভক্ত সম্পূর্ণ জনতা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং আহার নিদ্রা-জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় অন্যান্য যাবতীয় সংস্কৃতির অঙ্গগুলোও সর্বশ্রেণীর সর্বজন-সাধারণ ছিল না এটা নিশ্চিত কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রধানদ্বারা অথবা বেশীর সাহায্যে ব্যপদেশ করার রীতি চিরসিদ্ধ। সে প্রেক্ষিতে সমগ্র বঙ্গ-ভূস্থলীর জনতার জীবন-জীবিকার অনুশীলনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান কাম্য। গ্রন্থের ধারা ধরে তাই সুদূর অতীত থেকে বর্তমানের দিকে এগিয়ে আসার একটি চেষ্টা এ গ্রন্থে আছে। সংস্কৃতির অনুশীলনকামীদের কাছে এটা কেবল দিগ্-দর্শনের ভূমিকায়ও যদি গৃহীত হয় তবেই সার্থক হয়। একদিন সামগ্রিক দৃষ্টির পথও সুগম হবে।

অভিধান

পূর্বে সূচিত গ্রন্থশেষে প্রদেয় অভিধান বিষয়ের এ অংশটি অতিরিক্ত যোজনা বিশেষ। কালানুক্রমিক আলোচনায় গ্রন্থকারদের নামের সঙ্গেই তাঁদের স্ব স্ব অভিধান নির্দেশিত হয়েছে। অভিধান বা শব্দার্থনির্ণয়ের গ্রন্থও অতি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়েছে। সুপ্রাচীন অভিধান হিসাবে অগ্নিপুরাণকেই প্রথম নির্দেশ করতে হয় যদি না পরবর্তী কোনকালে অভিধানের অংশটি, বল্লালসেনের দানসাগরে উল্লিখিত পথে অগ্নিপুরাণে নিবেশিত হয়ে থাকে। সুগতের সংজ্ঞা এবং সৌগত মতানুসারী যেসমস্ত শব্দ পাওয়া যায় সেগুলো অন্তত যে প্রক্ষেপ তা' মেনে নিতে হয়। শাস্ত্র-নির্ভর সমাজে শাস্ত্রের প্রমাণ-ই দৃঢ়, তাই সামাজিক প্রেরণা থেকে ওসব যে কোন তরফ থেকে নিবেশিত হতে পারে। অর্থ ঠিক করার যে কোন নিবীথ তো অবশ্যই প্রাচীনকালেও ছিল। নিরুক্ত যেমন বৈদিশ পদের ব্যুৎপত্তিতে অবলম্বন তেমন অন্যপদের ব্যুৎপত্তিও অবশ্যই নিয়মতন্ত্র অনুসারেই হতে হয়। ব্যাকরণ-প্রসিদ্ধ অর্থাৎপত্তি, প্রকরণ, লিঙ্গ, ঔচিত্য, দেশভেদ এবং কাল ভেদের মাপে শব্দের বা পদের অর্থ নির্ণীত হতে পারে। তদনুসারে সব ক্ষেত্রে কাজ চলে না। চলে নি বলেই পূর্বমীমাংসায় অর্থ নির্দ্ধারণের উপায় বলা হয়েছে—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান এবং সমীক্ষা। শাস্ত্রান্তরে আরও অনেক নতুন উপায়ের স্বীকৃতি আছে। পাণিনির উত্তরকালে ব্যুৎপত্তিতে সঙ্গত পদ গঠনে প্রধানত পাণিনির মতই গ্রহণ করা হয় আর, পাণিনির স্বীকৃত তাঁর কালের বা আরও আগেকার বৈয়াকরণদের মতও স্বীকার করা হয় বটে কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণদ্বারা যত পদ ব্যুৎপাদিত হয় তারচেয়ে অনেক বেশী পদ বেদব্যাস প্রয়োগ করেছেন। একারণেই বেদব্যাসের মহাভারত, খিলহরিবংশ, বৃহদ্দেবতা, মহাপুরাণ—উপপুরাণ প্রভৃতির বহু পদ 'পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সাহায্যে নির্ণীত হয় না। পূর্বে উল্লিখিত নয়প্রকার ব্যাকরণের পথ ধরে বেদব্যাসের শব্দচয়ন অনেক ব্যাপক ছিল—মেনে নেয়া চলে। একটি প্রাচীন শ্লোক বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সিদ্ধবৎ আবৃত্ত হয় যার সাহায্যে মাহেশ ব্যাকরণ বা মাহেশ্বর ব্যাকরণের মর্যাদা অনেক বেশী ছিল—প্রতিপন্ন হয়। শ্লোকটিতে বলা হয়েছে মাহেশ ব্যাকরণের অর্ণব হতে বেদব্যাস যেসকল পদ-রত্ন আহরণ করেছিলেন সেসব পদরত্ন কি পাণিনির গোষ্পদে আছে? (যান্যুজ্জহার মাহেশাৎ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ। তানি কিং

পদবস্থানি সন্তি পাণিনি-গোস্পদে॰), এখন কেহ মাহেশ ব্যাকরণ অস্বীকার করলেও কোন লাভ হয় না কেননা, স্বয়ং পাণিনিই তা' স্বীকার করে নিয়েছেন, অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম চৌদ্দটি প্রত্যাহারসূত্রই মাহেশ্বর-সূত্র। মাহেশব্যাকরণ অতীতের অতলে তলিয়ে গেলেও তার অমন সুন্দর প্রত্যাহারসূত্র কয়টি এখনও পাণিনির মধ্যে বেঁচে আছে। মরণোত্তর চক্ষু-দানের বিষয় চক্ষুটি বা চক্ষুদু'টি উত্তর-ব্যক্তির দেহে তো জীবন্তই থাকে। কেবল তার খবর যাদের জানা তারাই বলতে পারে বা ভাবতে পারে। বৃক্ষচ্ছায়া, উপচ্ছায়া, ভূচ্ছায়া প্রভৃতি পদে চ এবং ছ্ একত্রিত হওয়া[১] অথবা অবগাহ্য পদের অকার লোপে 'বগাহ্য' হওয়ায়[২] প্রমাণ দিতে ব্যাকরণের আশ্রয় নেয়া ছাড়া পথ নেই। ব্যাকরণের সাহায্য নিয়েও বহু রূঢ়, যোগরূঢ়, রূঢ়যৌগিক বা নিপাতনসিদ্ধ পদে ব্যুৎপত্তি করা যায় না। সংস্কৃত ভাষাটা বড়, যার তাবৎ পদ-পদার্থের নিশানা-কিনারা করা সহজ সাধ্য নয়।

'কাতন্ত্রধাতুপাঠ' অথবা বোপদেবের 'কবিকল্পদ্রুম' গ্রন্থে অপরিহার্য হিসাবে যে কমপক্ষে ১৭০০ টিরও বেশী ধাতু নিরূপিত আছে কেবল সে কয়টির সাহায্যেও চলতি উপসর্গের সম্পর্কে, ব্যাকরণিক প্রত্যয়াদির বশে, বিভিন্ন সমাসের ব্যবহারে শব্দের এত ব্যাপক অবস্থা হয় যে তার নিরূপণ একটু একটু করে যে কোন সতর্ক অভিধান-প্রণেতাকেও অসাধ্য– অসমাপনীয় সমস্যায় ফেলে দেয়। যেমন লিখেছেন Professor Monier Monier-Willams—

. . ..."that my predecessor in the Boden chair, Professor H.H. wilson, once intended to compile a Sanskrit Dictionery in which all the words in the language were to be scientifically arranged under about 2000 rutes, and that he actually made some progress in carryingout that Project. ... ...
Accordingly he preferred, and I think wisely preferred, to turn his attention to the expansion of the second edition of his first Dictionery—a task the prosecution of which he eventually entrusted to a well-Known Sanskrit Scholar, the late Professor Goldstucker Unhappily, that eminent Orientalist was singularly unpractical in some of his Idias, and instead of expanding Wilson's Dictionery, begam to convert it into a vast cyclopaedia of Sanskrit learning, including essays and controversial disecussions of all kinds. He fini-

১ দ্বির্ভাবং স্বরপরশ্ছকারঃ.—কলাপসূত্র।

২. বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
টাপঞ্চাপি হলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা॥

shed the printing of 480 pages of his own work, which only brought him to the word "Arindama?"

Nevertheless I could not quite renounec an idea which my classical training at Oxford had forcibly impressed upon my mind viz that the primary objcet of a Sanskrit Dictionery should be to exhibit by a lucid etimological arrangement, the structure of a Language which, as most people Know, is not only the elder sister of Greek, but the best guide to the structure of Greek, as well as of every other members of the Aryan or Indo European family—a language, in short which is the very key stone of the science of comperative Philology."

Quoted from the Ist. page
of Introduction to the
'Sanskrit English Dictionery'
by
Monier Monier-Williams
2nd. Edn 1899, oxford.

এটা আধুনিক কালের চিন্তাধারার কথা। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ভাষার তুলনামূলক তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রাচীন বর্ণসমাম্নায়িক পদ্ধতি যাকে সংক্ষেপে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি বলা হয়, বিশেষ উপযোগী সন্দেহ নেই কিন্তু এদেশের অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের সাথে ইউরোপীয় জাতি শ্রেণীর সংসর্গের পূর্বকালেও অভিধানের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। তখন উক্ত বর্ণানুক্রমিক শব্দ সাজান অপেক্ষা সহজে মুখস্থ করার উপযোগিতার মূল্য বেশী ছিল। যে উপায়ে শব্দের পুংস্ত্ব-স্ত্রীত্ব-নপুংসকত্ব নির্দ্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ নির্দ্ধারণসহ অনায়াসে মুখস্থ হয় সে অনুসারে প্রধানত শ্লোকনিবদ্ধ করে অভিধান প্রণীত হত। অগ্নিপুরাণে যে অভিধান অংশ আছে তা'-ই এ বিষয়ে উদাহরণ।

সুপ্রাচীন এক অভিধানের নাম ভাগুরি-কোষ। ভাগুরি পাণিনিরও পূর্বকালের বৈয়াকরণ এবং কোষকার। পূর্বোল্লিখিত আপিশলির পিতা বলে ধরা হয় পিশলিকে। পিশলি শব্দটির পূর্বাংশ অপি' এর অকারের লোপে, বগাহ্য (মহাকবি কালিদাসের কুমার সম্ভব মহাকাব্যের প্রথম শ্লোকে) পদের প্রথমাংশ অব-এর অকারলোপে এবং হলন্ত শব্দের শেষে টাপ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার (যেমন ক্ষুধা, নিশা ইত্যাদি) ভাগুরির সিদ্ধান্ত বলে স্বীকৃত। তাঁর যে একখানা অভিধান ছিল তা' অশব্যই প্রাপ্ত অভিধান গ্রন্থের বোধ হয় আদিমতম। Theodor Aufrecht লিখেছেন —

"His lexicon is still in existence if any faith can be attached to oppert II, 4790."

একজন বৈদেশিক সংস্কৃতবিদ যতটা সংরক্ষণশীল চিন্তায় ভাগুরির কোষ সম্বন্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আমাদের মধ্যে ততটা প্রাচীন সম্পদের রক্ষার আগ্রহ নেই। থাকলে ভাগুরির কোষ মুদ্রিতও হতে পারত। মেদিনীকর, রায়মুকুট, মহীপ, কেশব, হেমচন্দ্র, মহেশ্বর, হলায়ুধ, ক্ষীরস্বামী প্রভৃতি শাব্দিক যে ভাগুরির উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি অবশ্যই প্রামাণিক কোষকার ছিলেন। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় এক জ্যোতির্বিদ্ ভাগুরির উল্লেখ করেছেন। সে ভাগুরি পৃথক ব্যক্তিও হতে পারেন। কেশবার্কও উল্লেখ করেছেন এবং গর্গ সংহিতায় এবং ভোজের রাজমার্ত্তণ্ডেও জ্যোতির্বিদ ভাগুবির উল্লেখ আছে। বিবাদরত্নাকরে ভাগুরি উল্লিখিত একজন আইন প্রণেতারূপে। কমলাকরও সেভাবে উল্লেখ করেছেন। ভাগুরিব স্মৃতিরও উল্লেখ আছে Rice 214 নং গ্রন্থে। একাধিক প্রাচীন শাস্ত্রকারেব নাম ভাগুরি থাকা অসম্ভব নহে। সব ক'জনই সুপ্রাচীন এবং প্রাচীন কালের।

প্রাচীন অন্যতম অভিধান নামলিঙ্গানুশাসন। এ গ্রন্থ অমরসিংহেব অমর রচনা। অমরসিংহের নাম অনুসারেই ইহা অমবকোষ অথবা এত সুন্দব কোষ কোনকালে নষ্ট হবে না—মরবে না ধবে অমরকোষ নামদিয়ে লোকব্যবহার একান্তই গ্রন্থখানার প্রশস্তি বিশেষ। এ অভিধান অনায়াসে মুখস্থ কবে রাখা যায়। টোলবিভাগে পড়তে গেলে প্রথমে যে ব্যাকরণ দিয়ে পড়া শুরু করতে হয় তাতে গণ এবং সূত্রের পাশাপাশি এ অভিধানখানাও মুখস্থ কবে বাখার জোর তাগিদ অধ্যাপকগণ দিতে থাকেন। বিদ্যা-অধিগম করাই এতদঞ্চলে মুখস্থ করা বলে গণ্য হত। সেকারণেই অভিধান রচনাও সেদিকে লক্ষ্যরেখে করা হয়েছে।

আলোচিত গ্রন্থাংশে বহু অভিধানেব উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে সাধারণ এবং বিষেশ বিষয়মূলক উভয় শ্রেণীর অভিধান পাওয়া যাবে। এখন চলতি মুদ্রিত-ক্রয়যোগ্য অভিধানের শ্রেণীতে ছোট বড় বহু কোষ আছে। যেমন— অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী, মহীপকৃত অনেকার্থতিলক, আচার্য হেমচন্দ্র বিরচিত অনেকার্থ-সংগ্রহোনাম কোশ, আচার্য বসুবন্ধুপ্রণীত অভিধর্মকোশ, হেমচন্দ্রকৃত অভিধানচিন্তামণি, ভোজকৃত নামমালিকা. ভীমাচার্যকৃত ন্যায়কোশ, মেদিনীকরকৃত মেদিনীকোষ, মহেশ্বরকৃত বিশ্বপ্রকাশকোষ, বৈজয়ন্তীকোষ Edited by Gustav oppert Ph. D হংসরাজকৃত বৈদিক কোষ, মথুরেশকৃত শব্দরত্নাবলী, শব্দস্তোম মহানিধি, কবিরাজ উমেশচন্দ্রগুপ্ত-সঙ্কলিত বৈদ্যকশব্দসিন্ধু কোষ, হলায়ুধভট্টকৃত হলায়ুধ কোশ, মঙ্খকৃত মঙ্খ কোষ—প্রভৃতি অনেক প্রাচীন এবং আধুনিক কোষ পাওয়া যায়।

বৃহৎ কোষ হিসাবে ৩ প্রস্ত মুদ্রিত প্রতি-মুদ্রিত হয়ে প্রচলিত আছে। রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সম্পাদিত 'শব্দকল্পদ্রুম', তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্পাদিত 'বাচস্পত্য'

এবং ভূলোকমল্ল সোমেশ্বর সম্পাদিত 'অভিলষিতার্থচিন্তামণি' (মানসোল্লাস)। প্রত্যেক গ্রন্থই বহুখণ্ডে বিভক্ত এবং বহুমূল্য অভিধান। এ তিন গ্রন্থ সংস্কৃতের বিশ্বকোষ স্বরূপ।

অভিধান বিষয়ের প্রাচীন অনেক গ্রন্থ এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে ক'খানাও পাওয়া গিয়েছে তারও সব ক'খানা মুদ্রিত হয় নি। প্রাচীন সব অভিধানই যে খুব তারিফ করার মত ছিল বা আছে সে কথা বক্তব্য নয়। ছিল, রক্ষা করে রাখতে না পারা কোন প্রশংসার নয়। অন্যদিকে, বৈদেশিক শক্তির কবলে পড়ে প্রায় দু'শ বছরের একটানা পরাধীনতায় আমাদের মধ্যে অনেকের বৈমুখ্য ঘটেছে স্বকীয় অতীত সংস্কৃতির প্রতি কিন্তু বিদেশী অসংখ্য পণ্ডিতজনেরও আগমন ঘটেছিল ওই পরাধিনতার কালেই। তাঁদের মধ্যে এমন অনেক প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন যাঁরা সারাজীবন সংস্কৃতভাষার তাবৎ শাস্ত্রগ্রন্থ অনুশীলন করেছেন। সে অনুশীলনের ধারায় বহু সংস্কৃত অভিধানও প্রণীত হয়েছে। যেমন – Practical Sanskrit Dictionery by A. A. Macdonell, Sanskrit English Dictionery by C, Cappeller, Sanskrit English Dictionery by Theodor Benfey, Sanskrit English Dictionery by Monier Monier—Williams ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায় শব্দের স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব-নপুসকত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অর্থনির্ণয়ে একান্ত দরকার। ওসব বৈয়াকরণ সংস্কারের অনুকুল শব্দধর্ম। অর্থের স্ত্রীত্ব পুংস্ত্বাদি বিবেচ্য নয়। 'দার' শব্দের অর্থ স্ত্রী হলেও সেটি পুংলিঙ্গ শব্দ। 'অপ্' শব্দের অর্থ জল কিন্তু শব্দটি স্ত্রী-লিঙ্গ। 'মিত্র' শব্দটি পুংলিঙ্গ হলে অর্থ হয় সূর্য, ক্লীবলিঙ্গ হলে অর্থ হয় বন্ধু-বান্ধবী, সখা-সখী ইত্যাদি। এসব মৌলিক তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্যরেখে অমরকোষ নামে প্রসিদ্ধ অভিধানখানার নাম স্বয়ং প্রণেতাই দিয়েছেন -- নামলিঙ্গানুশাসনম্। প্রকৃতপক্ষে শব্দের অর্থ এবং লিঙ্গ উভয়ই নির্দ্ধারণীয় এবং তার অনুশাসন বা শাস্ত্রই অভিধান।

বাংলাভাষার মধ্যে যে পাঁচ প্রকার শব্দ বিদ্যমান (তৎসম-তদ্ভব-দেশী-বিদেশী-মিশ্র) তন্মধ্যে তৎসম শব্দের সংখ্যা শতকরা ৭০/৭৫টি। সুতরাং সে শব্দগুলোর অর্থ জানতে সংস্কৃত অভিধানই অবলম্বন। সুবল মিত্রের বাংলা অভিধান, আশুতোষ দেবের বাংলা অভিধান প্রভৃতিতে তৎসম শব্দগুলোর অর্থ দেয়া আছে কিন্তু তা' সংস্কৃত অভিধানথেকেই গৃহীত। তদ্ভব শ্রেণীর শব্দগুলো সংস্কৃত অভিধানে নেই কেননা, সেগুলো সংস্কৃত শব্দ নয়, সংস্কৃত থেকে জাত—বিবর্তিত। অতএব বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত অভিধানে প্রাপ্য। সে সম্বন্ধে পূর্বোক্ত অমরকোষ-ই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সহজতর গ্রন্থ।

উল্লিখিত ইংরেজী-সংস্কৃত বা সংস্কৃত ইংরেজীর অভিধানের মত অন্যান্য বহু ভাষার অর্থের সহিতও সংস্কৃত অভিধান আছে। কর্ণপূর বিরচিত—সংস্কৃত এবং

পারসী ভাষার সংস্কৃত-পারসিক-কোষ, আধুনিক সংস্কৃত হিন্দি কোষ, Mongal Sanskrit Dictionery by Prof. Raghuvira. Tebetan Sanskrit Dictionery by Dr. Lokesh chandra, Abhidhanappadipika a Sanskrit Pali Dictionery by Moggalana Thero ইত্যাদি।

অভিধান বা কোষগ্রন্থ বেদাঙ্গের মধ্যে না থাকাই একপ্রকার প্রমাণ যে বেদ-বেদাঙ্গের মত এগুলো আদিম স্তরের নয়। শব্দের অর্থ নির্ণয় করার প্রাথমিক গ্রন্থ ব্রাহ্মণাংশের মধ্যে নিহিত। তারপরে কোন কালে নিরুক্ত প্রণীত হয়ে বৈদিক সাহিত্যের অর্থ-নিরূপণে সহায়তা করেছে। পূর্বোল্লিখিত যাজ্ঞবল্ক্যের সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষায় নিরুক্তও এক প্রকার ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সাহায্যে অর্থ জানা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, কেবল ব্যাকরণে অধীতীদের পক্ষেই সম্ভব। সাময়িক সংক্ষিপ্ত প্রয়াসে অর্থ জানতে উপযোগী গ্রন্থই অভিধান যা' ক্রমে ক্রমে প্রণীত হয়ে সমাজের সর্বস্তরের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে।

সংযোজন ২

সমকালিক দিল্লীর স্থলতান এবং ইংলণ্ডের রাজাদের সহিত বাংলার মুসলিম শাসকবর্গের যে তালিকা বা সারণী Encyclopaedia Britanica গ্রন্থে প্রদত্ত হয়েছে, তা' তুলনামূলক আলোচনায় খৃষ্টাব্দ-সমন্বিত হিজরী সন বিশেষিত বিধায় অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসার পরিপূরক। ইংরেজী বানান সঠিক লক্ষ্য করার প্রয়োজনে ইংরেজিতে প্রদত্ত হল।

Encyclopaedia Britanica
vol. 3, page 596

Bengal

First period.

Early Muhammedan Conquerors of Bengal.

A D	A.H.	Governors of Bengal.	Emperors of Hindustan.	Kings of England.
1204	600	Baktiar khilji	Kutub	John
1206	602	Muhammad Sheran ..	Do	Do
1208	605	Ali Mordan	Do	Do
1212	609	Ghyas uddin	Altamas	Do
1227	624	Nasiruddin	Do	Henry III
1230	627	Alauddin	Do	Do
1237	634	Tughan khan	Sultana Rizia	Do
1244	642	Taimur khan ...	Bahram II ..	Do
1246	641	Saifuddin	Nasiruddin Muhammad .	Do
1253	651	Mulk uzbek	Do	Do
1257	656	Jalaluddin	Do	Do
1258	657	Irsilan khan	Do	Do
1260	659	Tatar khan	Do .	Do
1277	676	Tughral khan	Balban	Edward I

Second period.

Indipendent Muhammedan kings of Bengal.

1304	741	Jakiruddin	Muhammad III	Edward III
1343	743	Ilyas Shah	Do	Do
1358	760	Sikandor Shah	Firug III	Do
1367	769	Ghyasuddin II	Do	Do
1373	776	Sultan Asalatin	Do	Do
1383	785	Samsuddin	Do	Richard II
1385	787	Raja Ganes	Do	Do
1392	794	Jalal uddin	Muhammad Iv ...	Do

বিভিন্ন অব্দের তালিকা

বর্তমানবিশ্বে খৃষ্টপূর্ব অথবা খৃষ্টকালের পরিপ্রেক্ষায় যাবতীয় ইতিহাস আলোচিত হচ্ছে। সে হিসাবে, এ উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বিভিন্ন অব্দ অনুসারে পরিজ্ঞাত হলেও কোন্ অব্দ কখন আরব্ধ হয়েছে জানা থাকা একান্ত দরকার এবং তার একত্র সংগৃহীত তালিকা তৎক্ষণাৎ সঠিক কালটি ধরতে অবশ্যই সাহায্য করে।

১। বীরনিবাণ সংবৎসর	(সংক্ষেপে সংবৎ=অব্দ)		৫২৭--২৬	খৃষ্টপূর্বাব্দে	আরব্ধ।
২। বুদ্ধনির্বাণ	”	”	৪৮৭ (?)	”	”
৩। মৌর্য	”	”	৩২০ (?)	”	”
৪। সেলিউকিড়ি	”	”	৩১২—১১	”	”
৫। চৈত্রাদিবিক্রম	”				
অথবা					
মালববিক্রম	,, (গত)	,,	৫৭—৫৬	”	”

১। শকসংবৎ (গত) আরব্ধ হয়েছিল খৃষ্টীয় ৭৮-৭৯ অব্দে					
২। কলচুরিসংবৎ					
বা					
চৈদিসংবৎ	,,	,,	খৃষ্টীয়	২৪৮---৪৯	অব্দে।
৩। গুপ্তসংবৎ	”	”	”	৩১৯·—২০	”
৪। গাঙ্গেয়সংবৎ	”	”	”	৫৭০ (?)	”
৫। হর্ষসংবৎ	”	”	”	৬০৬—৭	”
৬। ভাটিকসংবৎ					
বা					
ভাটিকানসংবৎ	,,	,,	খৃষ্টীয়	৬২৩—২৪	অব্দে।
৭। কোল্লমসংবৎ	,,	,,	”	৮২৪—২৫	”
৮। নেওয়ারী বা					
নেপালী সংবৎ	”	’	”	৮৭৮—৭৯	”
৯। চালুক্য বা					
চালুক্যবিক্রমসংবৎ	”	”	”	১০৭৫—৭৬	”

১০। সিংহসংবৎ	"	"	"	১১১৩—১৪	"
১১। লক্ষণ সেন সংবৎ	"	"	"	১১১৮—১৯ (?)	"
১২। পড়ুবৈপ্পু সংবৎ	"	"	"	১৩৪০ --৪১	"
১৩। রাজ্যাভিষেক সংবৎ	"	"	"	১৬৭৩ --৭৪	"

এছাড়া,

১। শাহুর সংবৎ	"	"	"	৫৯৯—৬০০	"
২। উত্তরী ফসলী সন	"	"	"	৫৯২--৯৩	"
৩। দক্ষণী ফসলী সন	"	"	"	৫৯০--৯১	"
৪। বিলায়তী সন"	"	"	"	৫৯২—৯৩	"
৫। আমলী সন	"	"	"	৫৯২—৯৩	"
৬। বাংলা সন	"	"	"	৫৯৩---৯৪	"
৭। মগী সন	"	"	"	৩৩৮—৩৯	"
৮। ইলাহি সন	"	"	"	১৫৫৫—৫৫	"

বিভিন্ন সন বা অব্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, জি. এইচ্‌ ওঝা প্রণীত হিন্দি "প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা" এব মদীয় বঙ্গানুবাদ গ্রন্থে বাংলায় পাওয়া যাবে।

খৃষ্টাব্দের ৩১০০ বছর পূর্বে কলিযুগ সংবৎসর শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ কলিযুগ সংবতের ৩১০১তম বৎসরে খৃষ্টাব্দের আরম্ভ।

সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রাচীন পাণ্ডুলিপির তথ্য-নির্দেশক সমন্বিত প্রধান প্রধান তালিকা

Adyar. A partial list of rare Mss. belonging to the Adyar Library, contains the names of 60 works.

AK. Report for the Search of Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency, by Abaji Bishnu Kathavate. Bombay, 1901, in 8 parts.

AS. Catalogue of printed books and Manuscipts in Sanskrit belonging to the Oriental Library of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1899—1901.

ASB. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

Ashburner. Containing 14 Manuscripts preserved in the India Office Library, London.

B. A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the private Library of Gujarat, Kathiavad, Kachchha, Sindh and Khandesh, by G. Buhler. Bombay, 1871-73, 8 vols

BA Report of Sanskrit Manuscripts, 1874-75 by G. Buhler, Girgaum, 1875.

BC. A collection of Mss. belonging to the Modern Sans. Literature presented to the Library of India office by A. C. Burnell.

BD Report on the Search for Sans. Mss. by Ramakrishna Gopal Bhanderkar. Bombay, 1897.

BEN. A Catalogue of Sans. Mss. in the Library of Benares Sanskrit College. Published as a suppliment to the Pandit, 1864-74, Beneras.

BH. A Report on 122 Mss. by R. G. Bhanderkar. Dated 7th July, 1880, Bombay.

BHK. A Report on the Search for Sans. Mss. by R. G. Bhanderkar. Dated Poona, Ist. June, 1882.

BHR. A Report on the Search for Sans. Mss. by R. G. Bhanderkar, Bombay, 1884.

Bhau Daji Catalogue of Mss. and books belonging to the Bhau Daji Memorial, Bombay, 1882.

BIK.	A Catalogue of Sans. Mss. in the Library of H. H. The Maharaja of Bikaner, compiled by Rajendra Lal Mitra, Calcutta 1880.
BL.	Report on the Sans. Manuscripts, Bombay, 1874, compiled under the Superintendence of R. G. Bhanderkar, Part 1.
BL.	Lists of Sans. Mss. in private Libraries in Bombay Presidency, R. G. Bhanderkar, part 1, Bombay, 1893.
Bonn.	Catalogi Librarum Manu Scriptorum Orientalium a Ioanne Gildemistero adornati Fasciculus, Bonnae, 1876.
BP.	Report on the Search for Sans. Mss. in the Bombay Presidency by R. G. Bhanderkar, Bombay, 1887.
BRL.	Catalogue of Collection of Sans. Mss. by, A. C. Burnell Part 1, London, 1870, These manuscripts were presented to the India Office Library, London.
Buhler, **G. Buhler.**	Two lists of Sans. Mss. by G. Buhler. vol. 42 and 530 printed in Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen. Gesellschaft, vol. 42 and 530.
Burnell.	A Classified index to the Sans. Mss. in the Palace at Tanjore by A. C. Burnell, London, 1880.
CB.	Catalogue of the Budhist Sans. Mss. in the University Library, Cambridge by Cicil Bendal, Cambridge, 1883.
Cambr.	A Catalogue of Sans. Mss. in the Library of Trinity College, Cambridge by Theodor Aufrecht, 1869.
C.C.	Catalogus Catalogorum by Theodor Aufrecht, 1891, 1896, 1903.
C.G.	Report on the Search of Sans. and Tamil Mss. by Sheshgiri Shastry No. 1, 1898, No. 2, 1893-94 Madras.
Copenh.	Codices Indici Bibliothecae Regiae Havniensis enumorati et descripti a N. L. Westergaard, 1846.
CR.	A list of Nonmedical Mss Collected in Bengal by Dr. P. Cordior from January 1898 to June 1900.
CS.	A descriptive Catalogue of Sans. Mss. in the Library of Sans. College, Calcutta by Hrishikosha Shastri and Siva Candra Gui. 1895, 1896.
Cu. add	A Selection of Sans. Mss. in the University Library, Cambridge.
D.	A Catalogue of collection of Mss. deposited in the Deccan College by Sridhar R. Bhanderkar. Bombay, 1888.

Debipr.	A list of Sans. Mss. discovered in Oudh by Pandit Deviprasad. Allahabad, 1879
Edinburgh University Library	Marked by Edinburgh University or Edinburgh Un.
FL.	A catalogue of Florentine Sans. Mss. by Th. Aufrecht. Leipzig, 1892.
F.W. **Thamas**	Appendix at the end of the catalogue by Winternitz.
GB.	Die Sanskrit Handschriften der Universitats Bibliothek Zu Gottingen, by F. Kielhorn.
Goldstucker.	List of a few original Mss. now preserved in the Univosity Library of Strassburg.
Gevt Or **Lib. Madras.**	An Alphabetical Index of Manuscripts in the Govt. Oriental Library Madras. 1893.
GU.	Report on the Search for Mss. in Gujrat. by G. Buhler. 1872.
H.	Von E. Hultzsch, ibid. vol. 40. 1. These Manuscripts has been purchased by Bodleian Library, Oxford. Printed in ibid. vol. 40. 1.
Hall	A contribution towards on Index to the Bibliography of the Indian Philosophical System by Fitzedward Hall, Calcutta, 1859.
Haug.	Dr. Martin Haug, Munchon, 1876·
Hpr.	Noticos of Sans. Mss. by Haraprasad Sastri, Calcutta, 1894, 1895.
HZ.	Report on Sans. Mss. in Southern India by E. Hultzsch. No. 1 Madras, 1895 No 11, numbering of Mss. 624-1563.
II.	A list of Mss. Kept in the Library of Indian Institute in Oxford, by the Co-ordination of A. B. Keith.
IO.	The Library of the India office, London.
Jac.	by Professor H. Jacobi, printed Zeischrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft vol. 33, 693.
JI.	Manuscripts in the possession of Prof. Julius Jolly.
Jones.	A Catalogue of Sans. and other Oriental Mss. by Sir William Jones, London, 1807. Manuscripts are preserved in the India Office Library, London.
K.	A Catalogue of Sans. Mss. existing in the Central Provinces. Edited by F. Kielhorn. Nagpur, 1874.

Kacin. Reports on Sans. Mss. by Kacinath kunte (Kashinath kunte).

Katm. List of Sans. works supposed by the Nepalese Pandits in the Libraries at Katmandoo, 1868.

KH. Report on the Search for Sans. Mss. in the Bombay Presidency by F. Kielhorn, Bombay, 1881.

Khm. A Catalogue of Sans Mss. in the Southern Division of the Bombay Presidency. Compiled by F. Kielhorn, Bombay 1869.

L. Notices of Sans. Mss. by Rajendra Lal Mitra, Calcutta, 1871-90 and 1892.

Lahore Report on the compilation of the catalogue of Sans. Mss. by Pandit Kasinath Kunte, Lahore, 1879-80.

do Statement Showing Sans. Mss. in Gujranawala, Delhi Dist. and Punjab by Kasinath Kunte, 1881-82,

Igr. Descriptive Catalogue of Sans Mss in the Library of Asiatic Society of Bengal, Calcutta by Rajendra Lal Mitra, 1877.

Lund. De Codicibus Nonnullis Indicis, Lunds. Univ. Aarskrift Tom XIX.

LZ.. Katalog der Sanskrit-Handscriften der Universitats Bibliothek in Leipzig by Theodor Aufrecht, 1901.

Mack. A descrptive Catalogue of Oriental Mss. for Mackenzie Collection, by H. H. Wilson, Calcutta, 1828. The books were collected in the South India and almost of the same were preserved in the India office.

Mysore. A Supplimentary Catalogue of Sans. works in the Library of the H.H. Maharaja of Mysore, signed by F. Kielhorn.

NCC. New Catalogues catalogorun, University of Madras. 1969.

NP. Catalogue of Sanskrit Manuscripts in Private Librares of the North-Western Provinces, Allahabad 1877-86.

NW. Do part 1' Benares 1874.

Oppert. List of Sans. Mss. private Libraries of Southern-India by Gustav Oppert, Madras, 1880.

Oxf. Catalogus Codicum Sanskriticorum Bibliothecae Bodleianae Confecit, Theodor Aufrecht. Oxonii, 1864.

Oudh. List of Sans. Mss. discovered in oudh by John C. Nesfield, prepared by Pandit Deviprasada. Allahabad, 1878, 1893.

do do, compiled by Pandit Deviprasada. Published in 1890.

P.	List of Sans. Mss. purchased by F. Kielhorn, Dated Poona, Ist. June, 1881.
Paris.	A list sent to Theodor Aufrecht by Mr. Feer, 1886.
Pet	A Catalogue in German Language by Otto Bothlink, Petersburg, 1846.
Peters.	Detailed Report about Search of Sans. Mss. in Bombay circle by Prof. Peterson. Bombay, 1882-87.
do	A fourth Report of operation in Search of Sans. Mss in Bombay circle by Prof. Piterson, Bombay, 1894.
do	do. the 5th. and 6th reports of Prof Peterson Bombay, 1898 and 1899
Pheh	Phehariet Samskitake Pustakonaka, entertained by Theodor Aufrecht.
Poona	Catalogue of Sans. Mss. in the Library of the Deccan College. Part 1 under the Superintendence of F Kielhorn. No 2 under that of R G. Bhanderkar. 1884.
Radh	Pustakanam Sucipatram At the end was written—"likhitam Pandita Rajaramasastrina kasmiravasina Entertained by Theodor Aufrecht
Rep.	Report for the Search of Sans Mss. by Haraprasad Sastri, 1895-1900.
Report.	Detailed Report of a tour in Seach of Sans Mss in Kasmir, Rajputana and Central India by G. Buhler, Bombay, 1877.
Rgb	Report on the Seach for Sans. Mss. in the Bombay Presidency by R. K. Bhanderkar, Bombay, 1894
Rice.	Catalogue of Sans. Mss in Mysore and Coorg by Lewis Rice, Bangalore, 1884.
SB	Catalogue of Sans. Mss in the Sanskrit College Library, Benares Allahabad, 1889 •
Stein.	Catalogue of Sans. Mss in the Raghunatha Temple Library of H. H. Maharaja of Jammu and Kasmir. Prepared by M. A. Stein. Bombay, 1894.
Sucipatra.	A Sucpustaka contains a list of Mss of Fort William, the Asiatic Society, Calcutta etc Calcutta, 1838.
Taylor.	A Catalogue raisonnee of Oriental Mss. by the Rev. William Taylor. Madras, 1857. In Connection of it one catalogue of T. S. Candaswami Jyer is useful. Madras, 1861.

TB. Verzeichniss der Indischen Handsctriften der Koniglichen Universitats Bibliothek by Von Richard Garbe. Tubingen, 1899.

Tod. A list of The Tod Mss. in the Royal Asiatic Society, London.

Tub. Catalogue by Von. R. Roth. Tubingen, 1865.

Ulwar. Catalogue of Sans. Mss. in the Library of H.H. Maharaja of Ulwar by Peter Peterson, Bombay, 1892.

Vienna. A Catalogue of Sans. and Prakrit Mss. by Von Georg Buhler. Wien, 1882.

W./Weber A Catalogue of the Sans. Mss. in Berlin by Von A. Weber in German Language, 1853, 1886 and 1892.

Whish. A Catalogue of South Indian Sans. Mss. (especially those of the Whish collection) in the Royal Asiatic Society, London, compiled by M. Winternitz. London, 1902.

সংশোধনী

৫৯ পৃষ্ঠায় ১৪শ লাইনে ১৩১৩ স্থলে ১৩৩২ হবে

এবং

„ „ ২০-২১ লাইনে সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত স্থলে সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব হবে।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং নির্বাচিত শব্দের নির্ঘণ্ট